শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

[স্বামী সারদানন্দ]

সাধকভাবালোচনার প্রয়োজন

দিব্য ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুরের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিবার অগ্রে আমরা তাঁহার জীবনের অন্য একটি ভাবের আলোচনা করিব,—যে তীব্র অনুরাগ, অলৌকিক উদ্যম ও বহুকালব্যাপী সাধনার ফলে তিনি ঐরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব গুরুভাব ও দিব্যভাবে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহারই যথাসম্ভব ছবি পাঠকের নয়ন-মনের গোচর করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিব।

জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসপাঠে দেখিতে পাওয়া যায়, লোকগুরু বুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্য ভিন্ন পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগাবির্ভূত অবতারপুরুষসকলের জীবনে সাধকভাবের কার্য্যকলাপ বিস্তৃত লিপিবদ্ধ নাই। যে উদ্দাম অনুরাগ ও উৎসাহ হৃদয়ে পোষণ করিয়া তাঁহারা জীবনে সত্য লাভে অগ্রসর হইয়াছিলেন, যে আশা নিরাশা, ভয় বিস্ময়, আনন্দ ব্যাকুলতার তরঙ্গে পড়িয়া তাঁহারা কখন উল্লসিত এবং কখন বা মুহ্যমান হইয়াছিলেন অথচ নিজ গন্তব্যলক্ষ্যে দৃষ্টি নিয়ত স্থির রাখিতে বিস্মৃত হন নাই, তাহার বিশদ আলোচনা তাঁহাদিগের জীবনেতিহাসে পাওয়া যায় না। অথবা জীবনের শেষভাগে অনুষ্ঠিত তাঁহাদের বিচিত্র কার্য্যকলাপের সহিত বাল্যাদি কালের শিক্ষা, উদ্যম ও কার্য্যকলাপের একটা স্বাভাবিক পূর্ব্বাপর কার্য্যকারণ সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

দেখ না—বৃন্দাবনের গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাপক দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণে পরিণত হইলেন তাহা পরিষ্কার বুঝা যায় না। ঈশার মহদুদার জীবনে ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বের কথা দুটা একটা মাত্রই জানিতে পারা যায়। আচার্য্য শঙ্করের দিগ্বিজয়কাহিনী মাত্রই সবিস্তার লিপিবদ্ধ। এইরূপ, অন্যত্র সর্ব্বত্র। ঐরূপ হইবার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে বোধ হয় ভক্তদিগের ভক্তির আতিশয্যেই ঐ সকল কথা লিপিবদ্ধ হয় নাই। নরের অসম্পূর্ণতা দেবচরিত্রে আরোপ করিতে সঙ্কুচিত হইয়াই তাঁহারা ঐ সকল কথা লোক-নয়নের অন্তরালে রাখা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াছেন। অথবা হইতে পারে—মহাপুরুষ চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ মহান্ ভাবসকল সাধারণের সম্মুখে উচ্চাদর্শ ধারণ করিয়া তাহাদের যতটা কল্যাণ সাধিত করিবে,

ঐ সকল ভাবে উপনীত হইতে তাঁহারা যে অলৌকিক উত্তম করিয়াছেন তাহা ততটা করিবে না ভাবিয়া উহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা তাঁহারা অনাবশ্যক বোধ করিয়াছেন। ভক্ত আপনার ঠাকুরকে সর্ব্বদা পূর্ণই দেখিতে চাহেন। নর-শরীর ধারণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাতে যে নরসুলভ দুর্ব্বলতা, দৃষ্টি ও শক্তিহীনতা কোনকালে কিছুমাত্র বর্ত্তমান ছিল তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। বালগোপালের মুখগহ্বরে তাঁহারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত দেখিতে প্রয়াসী হন এবং বালকের অসম্বদ্ধ চেষ্টাদির ভিতর পরিণত বয়সের বুদ্ধি ও বহুদর্শীতার পরিচয়ই কেবলমাত্র পাইবার প্রত্যাশা রাখেন না। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা এবং বিশ্বজনীন উদারতা ও প্রেমের সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠেন। অতএব বিচিত্র নহে, তাঁহারা অবতার পুরুষদিগের সত্যলাভের নিমিত্ত সাধনভজনাদি মানসিক চেষ্টাসমূহ এবং আহার, নিদ্রা, ক্লান্তি, ব্যাধি এবং দেহত্যাগ পর্য্যন্ত শারীরিক অবস্থানিচয়কে, নিজ ঐশ্বরিকস্বরূপে সর্ব্বসাধারণকে ধরা না দিবার জন্য তৎকৃত মিথ্যা ভাণমাত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন। আমাদের কালেই আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি কত বিশিষ্ট ভক্ত ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধিটা (গলদেশের ক্ষত) ঐরূপ মিথ্যা ভাণমাত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়া পরে অন্যরূপ বুঝিয়াছেন।

নিজ দুর্ব্বলতার জন্যই ভক্ত ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। বিপরীত সিদ্ধান্ত করিলে তাঁহার ভক্তির হানি হয় বলিয়াই, বোধ হয়, তিনি নরসুলভ চেষ্টা ও উদ্দেশ্যাদি অবতার পুরুষে আরোপ করিতে চাহেন না। অতএব, তাহাদিগের বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। তবে একথা ঠিক যে ভক্তির অপরিণত অবস্থাতেই ভক্তে ঐরূপ দুর্ব্বলতা পরিলক্ষিত হয়। ভক্তির প্রথমাবস্থাতেই ভক্ত ভগবানকে ঐশ্বর্য্যবিরহিত করিয়া চিন্তা করিতে পারেন না। ভক্তি পরিপক্ক হইলে, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ কালে গভীর ভাব ধারণ করিলে ঐ ঐশ্বর্য্য-চিন্তাই আবার ভক্তিপথের অন্তরায় বলিয়া বোধ হইতে থাকে, এবং ভক্ত তখন উহা যত্নে দূরে পরিহার করেন। সমগ্র ভক্তিশাস্ত্রই একথা বার বার বলিয়াছেন। দেখ না—কৃষ্ণমাতা যশোদা গোপালের দিব্য বিভূতিনিচয়ের নিত্য পরিচয় পাইয়াও তাঁহাকে নিজ বালকবোধেই লালন তাড়নাদি করিতেছেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে জগৎ-কারণ ঈশ্বর বলিয়া জানিয়াও তাঁহাতে কান্তভাব ভিন্ন অন্যভাবের আরোপ করিতে পারিতেছেন না। এইরূপ অন্যত্রও দ্রষ্টব্য।

ভগবানের রূপবিশেষ বা শক্তিবিশেষের সাক্ষাৎ পরিচায়কস্বরূপ

কোনরূপ দর্শনাদি লাভের জন্য আগ্রহাতিশয় জানাইলে, সেজন্যই ঠাকুর তাঁহার স্ত্রী ও পুরুষ সকল ভক্তদিগকেই অনেক সময় বলিতেন—"ওগো দর্শন টর্শন চাওয়াটা (সকল সময়ে) ভাল নয়, ঐশ্বর্য্য দেখলে ভয় আসবে; খাওয়ান, পরান, ভালবাসায় (ঈশ্বরের সহিত) "তুমি আমি" ভাব, এটা আর থাকবে না।" কত সময়েই না আমরা তখন ক্ষুণ্ণমনে ভাবিয়াছি, ঠাকুর কৃপা করিয়া ঐরূপ দর্শনাদি লাভ করাইয়া দিবেন না বলিয়াই আমাদিগকে ঐরূপ বলিয়া ক্ষান্ত করাইতেছেন। সাহসে নির্ভর করিয়া কোনও ভক্ত যদি সে সময় প্রাণের বিশ্বাসের সহিত বলিত—"আপনার কৃপাতে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে ঐরূপ দর্শনাদি করাইয়া দিন"—তাহাতে ঠাকুর মধুর নম্রভাবে বলিতেন—"আমি কি কিছু করিয়া দিতে পারি রে—মার যা ইচ্ছা তাই হয়।" ঐরূপ বলিলেও সে যদি ক্ষান্ত না হইয়া বলিত, 'আপনার ইচ্ছা হইলেই মার ইচ্ছা হইবে"—তাহাতেও ঠাকুর অনেক সময় তাহাকে বুঝাইয়া বলিতেন, "আমি তো মনে করি রে, তোদের সকলের সব রকম অবস্থা, সব রকম দর্শন হোক, কিন্তু তা হয় কৈ?" ঐরূপ বলিলেও ভক্ত ক্ষান্ত না হইয়া বিশ্বাসের জেদ্ চালাইতে থাকিলে ঠাকুর আর কিছু না বলিয়া তাহাকে সস্নেহে দেখিয়া মৃদুমন্দ হাস্যের দ্বারা তাহার প্রতি নিজ ভালবাসার পরিচয় মাত্র দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, অথবা বলিতেন "কি বল্‌বো বাবু, মার যা ইচ্ছা তাই হোক্।" ঐরূপ নির্ব্বন্ধাতিশয়ে পড়িয়াও কিন্তু ঠাকুর বিরক্ত হইয়া তখনি তাহার ঐরূপ ভ্রমপূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করিতেন না। অথবা সমর্থ হইলেও তাহার ভাব নষ্ট করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। আমরা সকলেই ঠাকুরের ঐরূপ ব্যবহার অনেক সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং তাঁহাকে বার বার বলিতে শুনিয়াছি—"কারো ভাব নষ্ট করতে নেই রে, কারো ভাব নষ্ট করতে নেই।"

প্রবন্ধোক্ত বিষয়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও কথাটি যখন পাড়া গিয়াছে তখন একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া পাঠককে বুঝাইয়া দেওয়া ভাল। ইচ্ছা ও স্পর্শমাত্র অপরের শরীরমনে ধর্ম্মশক্তি সঞ্চারিত ও তদনুরূপ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিবার ক্ষমতা আধ্যাত্মিক জীবনে অতি অল্প সাধকের ভাগ্যেই লাভ হইয়া থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ যে কালে ঐ ক্ষমতায় ভূষিত হইয়া প্রভূত লোক-কল্যাণ সাধন করিবেন, ঠাকুর একথা আমাদিগকে বারম্বার বলিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মত উত্তমাধিকারী সংসারে বিরল।

প্রথম দর্শন হইতেই ঠাকুর ঐকথা সম্যক বুঝিয়া বেদান্তোক্ত অদ্বৈতজ্ঞানের উপদেশ করিয়া তাঁহার চরিত্র ও ধর্ম্মজীবন একভাবে গঠিত করিয়া আনিতেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রণালীতে দ্বৈতভাবে ঈশ্বরোপাসনায় অভ্যস্ত স্বামীজির নিকট বেদান্তের সোঽহং ভাবের উপাসনাটা তখন পাপ বলিয়া পরিগণিত হইলেও ঠাকুর তাঁহাকে তদনুশীলন করাইতে নানাভাবে চেষ্টা করিতেন। স্বামীজি বলেন—"দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হবামাত্র তখন তপন ঠাকুর অপর সকলকে যাহা পড়িতে নিষেধ করিতেন, সেই সকল পুস্তকই আমায় পড়িতে দিতেন। অন্যান্য পুস্তকের সহিত তাঁহার ঘরে একখানি 'অষ্টাবক্র-সংহিতা' ছিল। কেহ সেখানি বাহির করিয়া পড়িতেছে দেখিতে পাইলে ঠাকুর অমনি তাহাকে ঐ পুস্তক পড়িতে নিষেধ করিয়া 'মুক্তি ও তাহার সাধন,' 'ভগবদ্গীতা,' বা কোন পুরাণ গ্রন্থ দেখাইয়া দিতেন। আমি কিন্তু তাঁহার নিকট যাইলেই ঐ অষ্টাবক্র-সংহিতাখানি বাহির করিয়া পড়িতে বলিতেন। *অথবা অদ্বৈতভাবপূর্ণ আধ্যাত্মিক-রামায়ণের কোন অংশ পাঠ করিতে* বলিতেন। যদি বলিতাম—কখন কখন স্পষ্ট বলিয়াছিও—'ও বই পড়ে কি হবে? আমি ভগবান্, একথা মনে করাও পাপ। তাই ও বই এ লেখা আছে। ও বই পুড়িয়ে ফেলা উচিত।' ঠাকুর তাহাতে হাসিতে হাসিতে বলিতেন—'আমি কি তোকে পড়তে বল্‌ছি? একটু পড়ে আমাকে শুনাতে বল্‌ছি। খানিক পড়ে আমাকে শুনা না। তাতে তো আর তোকে মনে করতে হবে না, 'তুই ভগবান্।" কাজেই অনুরোধে পড়িয়া অল্পবিস্তর পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইতে হইত।"

স্বামীজিকে ঐভাবে গঠিত করিতে থাকিলেও ঠাকুর স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ তাঁহার অন্যান্য বালকদিগকে কাহাকেও সাকারোপাসনা, কাহাকেও নিরাকার সগুণ ঈশ্বরোপাসনা, কাহাকেও শুদ্ধভক্তির ভিতর দিয়া, আবার কাহাকেও বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ভিতর দিয়া, অন্য নানাভাবে ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর করাইয়া দিতেছিলেন। এইরূপে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ বালক ভক্তগণ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট একত্র শয়ন উপবেশন, আহার বিহার ও ধর্ম্মচর্চ্চা প্রভৃতি করিলেও ঠাকুর অধিকারীভেদে তাহাদিগকে নানাভাবে গঠিত করিতেছিলেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস। কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর গলরোগে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু যেন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অদম্য উৎসাহে

ধীর স্থিরভাবে সকল ভক্তদিগের ধর্ম্মজীবন গঠনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের। আবার স্বামিজীকে সাধনমার্গের উপদেশ দিয়া এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে সহায়তা করিয়াই ঠাকুর ক্ষান্ত নহেন। নিত্য সন্ধ্যার পর অপর সকলকে সরাইয়া দিয়া তাঁহাকে নিকটে ডাকাইয়া একাদিক্রমে দুই তিন ঘণ্টাকাল ধরিয়া তাঁহার সহিত অপর বালক ভক্তদিগকে সংসারে পুনরায় ফিরিতে না দিয়া কিভাবে পরিচালিত ও একত্রিত রাখিতে হইবে তদ্বিষয়ে আলোচনা ও শিক্ষা প্রদান করেন। ভক্তদিগের প্রায় সকলেই ঠাকুরের কথা ও ব্যবহারে ভাবিতেছেন ঠাকুর নিজ সঙ্ঘ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই গলরোগরূপ এতটা মিথ্যা ভাণ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন—ঐ কার্য্য সুসিদ্ধ হইলেই আবার পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইবেন। কেবল স্বামী বিবেকানন্দই দিন দিন প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছিলেন ঠাকুর যেন ভক্তদিগের নিকট হইতে বহুকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিবার মত সকল আযোজন ও বন্দোবস্ত করিতেছেন। তিনিও ঐ কথা সকল সময় ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন কি? সন্দেহ।

সাধনবলে স্বামীজির ভিতর তখন স্পর্শসহায়ে অপরে ধর্ম্মশক্তি-সংক্রমণরূপ ক্ষমতার ঈষৎ উন্মেষ হইয়াছে। তিনি মধ্যে মধ্যে নিজের ভিতর ঐরূপ শক্তির উদয় স্পষ্ট অনুভব করিলেও কাহাকেও ঐভাবে স্পর্শ করিয়া ঐ বিষয়ের সত্যাসত্য এ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারণ করেন নাই। তবে নানাভাবে প্রমাণ পাইয়া বেদান্তের অদ্বৈতমতে বিশ্বাসী হইয়া, তিনি তর্কযুক্তি সহায়ে ঐ মত বালক ও গৃহস্থ ভক্তদিগের ভিতর প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তুমুল আন্দোলনে ঐ বিষয় লইয়া ভক্তদিগের ভিতর কখন কখন তুমুল বিবাদ গণ্ডগোলও চলিতেছে। কারণ স্বামীজির স্বভাবই ছিল, যখনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিবেন তখনি তাহা হাঁকিয়া ডাকিয়া সকলকে বলিয়া তর্কযুক্তি সহায়ে জোর করিয়াও অপরকে উহা গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করিবেন। ব্যবহারিক জগতে সত্য যে অবস্থা ও অধিকারীভেদে নানাকার ধারণ করে বালক তাহা তখনও বুঝিতে পারে নাই।

আজ ফাল্গুনী শিবরাত্রি। বালক-ভক্তদিগের মধ্যে তিন চারি জন স্বামীজির সহিত স্বেচ্ছায় ব্রতোপবাস করিয়াছে। পূজা ও জাগরণে রাত্রি কাটাইবারি তাহাদের অভিলাষ। গোলমালে ঠাকুরের পাছে আরামের ব্যাঘাত হয় এজন্য বসতবাটি হইতে কিঞ্চিদ্দূরে পূর্ব্বে অবস্থিত, রন্ধনশালারূপে

নির্ম্মিত একটি গৃহে পূজার আয়োজন হইয়াছে। সন্ধ্যার পরে বেশ এক পশ্‌লা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এবং নবীন মেঘে সময়ে সময়ে মহাদেবের জটা পটলের ন্যায় বিদ্যুৎপুঞ্জের এককালে আবির্ভাব দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দিত হইয়াছে।

দশটার পর প্রথম প্রহরের পূজা জপ ও ধ্যান সাঙ্গ করিয়া স্বামীজি পূজার আসনে বসিয়াই বিশ্রাম ও কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সঙ্গীদিগের মধ্যে একজন তাঁহার নিমিত্ত তামাকু সাজিতে বাহিরে গমন করিল এবং অপর এক জন কোন প্রয়োজন সারিয়া আসিতে বসতবাটীর দিকে চলিয়া গেল। এমন সময় স্বামীজির ভিতর সহসা পূর্ব্বোক্ত দিব্য বিভূতির তীব্র অনুভবের উদয় হইল এবং তিনিও উহা অন্য কার্য্যে পরিণত করিয়া উহার ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বাসনায় সম্মুখোপবিষ্ট স্বামী অ—কে বলিলেন—'আমাকে খানিকক্ষণ ছুঁয়ে থাক্‌তো'। ইতিমধ্যে তামাক লইয়া গৃহ প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত বালক দেখিল স্বামীজি স্থিরভাবে ধ্যানস্থ রহিয়াছেন এবং অ—চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাঁহার দক্ষিণ জানু স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে ও তাহার ঐ হস্ত ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। দুই এক মিনিটকাল ঐভাবে অতিবাহিত হইবার পর স্বামীজি চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন—'বাস্‌ হইয়াছে। কিরূপ অনুভব কর্‌লি ?'

অ।—ব্যাটারি (Electric Battery) ধর্‌লে যেমন একটা কি ভিতরে আস্‌ছে জান্‌তে পারা যায় ও হাত কাঁপে ঐ সময়ে তোমাকে ছুঁয়ে সেইরূপ অনুভব হতে লাগ্‌লো। অপরব্যক্তি অ—কে জিজ্ঞাসা করিল "স্বামীজিকে স্পর্শ ক'রে তোমার হাত আপনা আপনি ঐরূপ কাঁপ্‌ছিল ?" অ—'হাঁ, স্থির করে রাখ্‌তে চেষ্টা করেও রাখ্‌তে পার্‌ছিলুম না।" ঐ সম্বন্ধে অন্য কোন কথা বার্ত্তাই তখন আর হইল না। স্বামীজি তামাকু খাইলেন। পরে সকলে দুই প্রহরের পূজা জপ ও ধ্যানে মনোনিবেশ করিলেন। অ—ঐকালে গভীর ধ্যানস্থ হইল। এরূপ গভীরভাবে ধ্যান করিতে আমরা তাহাকে ইতিপূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই। তাহার সর্ব্বশরীর আড়ষ্ট হইয়া গ্রীবা ও মস্তক বাঁকিয়া গেল এবং কিছুক্ষণের জন্য তাহার বহির্জ্জগতের সংজ্ঞা এককালে লুপ্ত হইল। উপস্থিত সকলের বেশ মনে হইল স্বামীজির ইতিপূর্ব্বে ঐভাবে স্পর্শ করার ফলেই তাহার এখন ঐরূপ গভীর ধ্যান উপস্থিত হইয়াছে। স্বামীজিও তাহার ঐরূপ অবস্থা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া জনৈক সঙ্গীকে ইঙ্গিত করিয়া উহা দেখাইলেন।

রাত্রি চারিটায় চতুর্থ প্রহরের পূজা শেষ হইবার পরেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ পূজাগৃহে উপস্থিত হইয়া স্বামীজিকে বলিলেন—ঠাকুর ডাকিতেছেন। শুনিয়াই স্বামীজি বসতবাটীর দ্বিতলগৃহে ঠাকুরের নিকটে চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের সেবা করিবার জন্য রামকৃষ্ণানন্দও সঙ্গে যাইলেন।

স্বামীজিকে দেখিয়াই ঠাকুর বলিলেন—"কিরে? একটু জম্‌তে না জম্‌তেই খরচ? আগে নিজের ভিতরে ভাল ক'রে জম্‌তে দে, তখন কোথায় কি ভাবে খরচ কর্‌তে হবে তা বুঝতে পার্‌বি—মা-ই বুঝিয়ে দেবেন। ওর ভিতর তোর ভাব ঢুকিয়ে ওর কি অপকারটা কল্লি বল দেখি? ও এতদিন একভাব দিয়ে যাচ্ছিল সেটা সব নষ্ট হয়ে গেল!—ছমাসের গর্ভ যেন পাত হল! যা হবার হয়েছে, এখন হতে হঠাৎ অমনটা আর করিস নি। যা হোক, ছোঁড়াটার অদেষ্ট ভাল (পরে ভাল হবে)।"

স্বামীজি বলিতেন—"আমি তো একেবারে অবাক। পূজার সময় নীচে আমরা যা যা করেছি ঠাকুর সমস্ত জান্‌তে পেরেছেন! কি করি—তাঁর ঐরূপ মিষ্ট ভর্ৎসনায় চুপ করে রইলুম্।"

ফলে দেখা গেল অ—যে ভাবসহায়ে পূর্ব্বে ধর্ম্ম জীবনে অগ্রসর হইতেছিল তাহার ত একেবারে উচ্ছেদ হইয়া যাইলই, আবার অদ্বৈতভাব ঠিক ঠিক ধরা ও বুঝা কালসাপেক্ষ হওয়ায় বেদান্তের দোহাই দিয়া নাস্তিকের মত অযোগ্য বিপরীত অনুষ্ঠানও কখন কখন করিয়া ফেলিতে লাগিল। ঠাকুর তাহাকে এখন হইতে অদ্বৈতভাবের উপদেশ করিতে ও সস্নেহে তাহার ঐরূপ কার্য্য কলাপের ভুল দেখাইয়া দিতে থাকিলেও অ-র ঐভাবপ্রণোদিত হইয়া জীবনের প্রত্যেক কার্য্যানুষ্ঠানে অগ্রসর হওয়া ঠাকুরের শরীর ত্যাগের বহুকাল পরেই সাধিত হইয়াছিল।

সত্যলাভ অথবা জীবনে উহার পূর্ণাভিব্যক্তির জন্য অবতারপুরুষকৃত চেষ্টাদি মিথ্যা ভাণমাত্র বলিয়া যাঁহারা গ্রহণ করেন ঐ শ্রেণীর ভক্তদিগের ভাব নষ্ট করিতে আমরা প্রয়াসী না হইলেও একথা কিন্তু আমাদিগকে স্পষ্ট বলিতে হয় যে ঠাকুরকে তাঁহাদের ন্যায় অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে আমরা কখন শুনি নাই। বরং অনেক সময় তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি—নরলীলায় সমস্ত কার্য্যই সাধারণ নরের ভাবে হয়, নরশরীর স্বীকার করিয়া ভগবানকে নরেরই ন্যায় সুখ দুঃখ ভোগ করিতে এবং নরেরই ন্যায় উদ্যম, চেষ্টা ও তপস্যা দ্বারা সকল বিষয়ে পূর্ণত্ব লাভ করিতে হয়। জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসও ঐ কথাই

বলে। বাস্তবিক ঐরূপ না হইলে রূপায় ঈশ্বর কৃত নরবপুধারণের যে কোনই সার্থকতা থাকে না, একথা অল্প চিন্তার ফলেই বুঝিতে পারা যায়।

নিজ ভক্তগণকে ঠাকুর যে সকল উপদেশ করিতেন তাহার ভিতর আমরা দুই ভাবের কথা দেখিতে পাইয়া থাকি। তাঁহার কয়েকটি উক্তির এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক কথাটা বুঝিতে পারিবেন। দেখা যায়, একদিকে তিনি তাঁহার ভক্তগণকে বলিতেছেন, "(আমি) ভাত বেঁধেছি, তোরা বাড়া ভাতে বসে যা," "ছাঁচ তৈয়ারি হয়েছে তোরা সেই ছাঁচে নিজের নিজের মনকে ফ্যাল্ ও গোড়ে তোল্," "কিছুই যদি না পার্‌বি তো আমার উপর বকল্‌মা দে," ইত্যাদি। আবার অন্যদিকে বলিতেছেন, "এক এক ক'রে সব বাসনা ত্যাগ কর, তবে তো হবে", "ঝড়ের আগে এঁটো পাতার মত হয়ে থাক," "কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করে ঈশ্বরকে ডাক", "আমি ষোল টাং (ভাগ) করেছি, তোরা এক টাং (ভাগ বা অংশ) ও তো কর," ইত্যাদি। আমাদের বোধ হয়, ঠাকুরের ঐ দুই ভাবের কথার অর্থ অনেক সময় না বুঝিতে পারিয়াই আমরা দৈব ও পুরুষকার, নির্ভর ও সাধনের কোনটা ধরিয়া জীবনে অগ্রসর হইব তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি না।

আমাদের মনে আছে, আমরাই একদিন দক্ষিণেশ্বরে জনৈক বন্ধুর* সহিত মানবের স্বাধীনেচ্ছা কিছুমাত্র আছে কিনা, এই বিষয় লইয়া অনেকক্ষণ বাদানুবাদের পর উহার যথার্থ মীমাংসা পাইবার নিমিত্ত ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হই। ঠাকুর, বালকদিগের বিবাদ কিছুক্ষণ রহস্য করিয়া শুনিতে লাগিলেন পরে গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"স্বাধীন ইচ্ছা ফিচ্ছা কারো কিছু কি আছে রে? ঈশ্বরেচ্ছাতেই চিরকাল সব হচ্চে ও হবে। মানুষ সেটা শেষকালে বুঝ্‌তে পারে। তবে কি জানিস্ যেমন গোরুটাকে লম্বা দড়ি দিয়ে খোঁটায় বেঁধে রেখেছে, গোরুটা খোঁটার এক হাত দূরে দাঁড়াতে পারে, দুহাত দূরেও পারে, আবার দড়ি গাছটা যত লম্বা ততদূরে গিয়েও দাঁড়াতে পারে—মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাটাও ঐরূপ জান্‌বি। গোরুটা এতটা দূরের ভিতর যেখানে ইচ্ছা বসুক, দাঁড়াক্ বা ঘুরে বেড়াক্ মনে করেই মানুষে তাকে বাঁধে। তেমনি ঈশ্বরও মানুষকে কতকটা শক্তি দিয়ে তার ভিতরে সে যেমন ইচ্ছা যতটা ইচ্ছা ব্যবহার করুক বলে ছেড়ে দিয়েছেন। তাই মানুষ মনে কর্‌চে সে স্বাধীন। গোড়াটা কিন্তু

* স্বামী নিরঞ্জনানন্দ। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে হরিদ্বারে ইঁহার শরীর ত্যাগ হয়।

খোঁটায় বাঁধা আছে। তবে কি জানিস্, তাঁর কাছে কাতর হয়ে প্রার্থনা কল্লে তিনি নেড়ে বাঁধতে পারেন, দড়ি গাছটা আরও লম্বা করে দিতে পারেন, চাই কি গলার বাঁধন একেবারে খুলেও দিতে পারেন।"

কথা গুলি শুনিয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে মহাশয়, সাধন ভজন করাও তো মানুষের হাতে নাই? সকলেই তো বলিতে পারে "আমি যাহা কিছু করিতেছি সব তাঁহার ইচ্ছাতেই করিতেছি?"

ঠাকুর—মুখে শুধু বল্লে কি হবে রে? কাঁটা নেই খোঁচা নেই মুখে বল্লে কি হবে? কাঁটায় হাত পড়লেই কাঁটা ফুটে 'উঃ' করে উঠতে হয়। সাধন ভজন করাটা যদি মানুষের হাতে থাক্‌তো তবে তো সকলেই তা কর্‌তে পার্‌তো—তা পারে না কেন? তবে কি জানিস্, যতটা শক্তি তিনি তোকে দিয়েছেন ততটা ঠিক্ ঠিক্ ব্যবহার না কর্‌লে তিনি আর অধিক দেন্ না। এ জন্যই পুরুষকার বা উদ্যমের দরকার। দেখ্ না, সকলকেই কিছু না কিছু উদ্যম ক'রে তবে ঈশ্বর কৃপার অধিকারী হতে হয়। তবে তাঁর কৃপায় দশ জন্মের ভোগটা এক জন্মেই কেটে যায়। কিন্তু (তাঁর উপর নির্ভর করে) কিছু না কিছু উদ্যম কর্‌তেই হয়। ঐ বিষয়ে একটা গল্প শোন—

গোলক-বিহারী বিষ্ণু একবার নারদকে কোন কারণে শাপ দেন যে তাকে নরক ভোগ কর্‌তে হবে। নারদ তো ভেবে আকুল। নানা রূপে স্তব স্তুতি করে তাঁকে প্রসন্ন করে বল্লে—আচ্ছা ঠাকুর নরক কোথায়, কিরূপ, ক' রকমই বা আছে আমার জান্‌তে ইচ্ছা হচ্চে, কৃপা করে আমাকে বলুন। বিষ্ণু তাতে ভুঁয়ে খড়ি দিয়ে স্বর্গ, নরক, পৃথিবী যেখানে যেরূপ আছে এঁকে দেখিয়ে বল্লেন—'এইখানে স্বর্গ, আর এইখানে নরক।' নারদ বল্লে—'বটে? তবে আমার এই নরক ভোগ হ'ল'—বলেই ঐ 'আঁকা নরকের উপর গড়াগড়ি দিয়ে উঠে ঠাকুরকে প্রণাম কল্লে। বিষ্ণু হাসতে হাস্‌তে বল্লেন, 'সেকি?' তোমার নরক ভোগ হ'ল কৈ?' নারদ বল্লে—'কেন ঠাকুর তোমারই সৃজন তো স্বর্গ নরক? তুমি এঁকে দেখিয়ে যখন বল্লে—'এই নরক'- তখন ঐ স্থানটা সত্য সত্যই নরক হ'ল, আর আমি তাতে গড়াগড়ি দেওয়াতে আমার নরক ভোগ হয়ে গেল।' নারদ কথা গুলি প্রাণের বিশ্বাসের সহিত বল্লে কি না?—বিষ্ণুও তাই 'তথাস্তু' বল্লেন। নারদকে কিন্তু তাঁর উপর ঠিক ঠিক বিশ্বাস করে ঐ আঁকা নরকেও গড়াগড়ি দিতে হ'ল, (ঐ উদ্যম টুকু করে) তবে তার ভোগ কাটলো।" এইরূপে কৃপার রাজ্যেও যে উদ্যম ও পুরুষকারের

স্থান আছে তাহা ঠাকুর ঐ গল্পটি সহায়ে কখন কখন আমাদিগকে বুঝাইয়া বলিতেন।

নরদেহ ধারণ করিয়া নরবৎ লীলায় অবতারপুরুষদিগকে আমাদিগেরই ন্যায় অনেকাংশে দৃষ্টিহীনতা, শক্তিহীনতা, অল্পজ্ঞতা প্রভৃতি অনুভব করিতে হয়, আমাদিগেরই ন্যায় উদ্যম করিয়া ঐ সকলের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার পথ আবিষ্কার করিতে হয়, এবং যতদিন না ঐ পথ আবিষ্কৃত হয় ততদিন তাঁহাদের নিজ দেবস্বরূপের আভাস কখন কখন অল্পক্ষণের জন্য উদিত হইলেও উহা আবার প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এইরূপে 'বহুজনহিতায়' মায়ার আবরণ স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহাদিগকে আমাদিগেরই ন্যায় আলোক আঁধারের রাজ্যের ভিতর পথ হাতড়াইতে হয়। তবে স্বার্থসুখচেষ্টার লেশমাত্র তাঁহাদের ভিতর না থাকায় তাঁহারা জীবনপথে আমাদিগের অপেক্ষা অধিক আলোক দেখিতে পান এবং আভ্যন্তরীণ সমগ্র শক্তিপুঞ্জ সহজেই একমুখী করিয়া অচিরেই জীবন সমস্যার সমাধান করতঃ অবশিষ্ট কাল লোককল্যাণসাধনে নিযুক্ত থাকেন।

দেব-মানব ঠাকুরের মানব ভাবের আলোচনায় সে জন্যই আমাদের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়, এবং ঐ জন্যই আমরা তাঁহার মানব ভাব সকল সর্ব্বদা পুরোবর্ত্তী রাখিয়া তাঁহার দেব-ভাবের আলোচনা করিতে পাঠককে অনুরোধ করি। আমাদেরই মত একজন বলিয়া তাহাকে না ভাবিলে তাঁহার সাধন কালের অলৌকিক উদ্যম ও চেষ্টাদির কোন অর্থই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। মনে হইবে, যিনি নিত্য পূর্ণ তাঁহার আবার সত্যলাভের জন্য এ চেষ্টা কেন? মনে হইবে, তাঁহার জীবনপাতী চেষ্টাটা একটা 'লোক-দেখানো' ব্যাপার মাত্র। শুধু তাহাই নহে, ঈশ্বরলাভের জন্য উচ্চাদর্শসমূহ নিজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার উদ্যম, নিষ্ঠা ও ত্যাগ আমাদিগকে ঐরূপ করিতে উৎসাহিত না করিয়া হৃদয় বিষম উদাসীনতায় পূর্ণ করিবে এবং ইহজীবনে আমাদিগের আর জড়ত্বের অপনোদন হইবে না।

ঠাকুরের কৃপালাভের প্রত্যাশী হইলেও তাঁহাকে আমাদিগের ন্যায় মানব-ভাবসম্পন্ন বলিয়া তোমায় গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, কৃপা করিতে সমর্থ ঠাকুর, তোমার দুঃখে সমবেদনার ভাগী হইয়াই তো তোমার দুঃখ মোচনে অগ্রসর হইবেন? অতএব যে দিক দিয়াই দেখ, তাঁহাকে মানবভাবাপন্ন বলিয়া চিন্তা করা ভিন্ন আমাদিগের গত্যন্তর নাই। বাস্তবিক যতদিন না আমরা সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নির্গুণ দেব-স্বরূপে স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব

ততদিন পর্য্যন্ত জগৎ-কারণ ঈশ্বরকে মানব-ভাবাপন্ন বলিয়াই আমাদিগকে ভাবিতে ও গ্রহণ করিতে হইবে। "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ"—কথাটি বাস্তবিকই সত্য। তুমি যদি স্বয়ং সমাধিবলে নির্ব্বিকল্প ভূমিতে পৌছাইতে পারিয়া থাক তবেই তুমি ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপের উপলব্ধি ও ধারণা করিয়া তাঁহার যথার্থ পূজা করিতে পারিবে। আর, যদি তাহা না পারিয়া থাক, তবে তোমার কৃত পূজা ঐ দেব ভূমিতে উঠিবার ও ঐরূপ যথার্থ পূজাধিকার পাইবার চেষ্টামাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে এবং তোমার ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণা বিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন মানবরূপ সীমামধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে।

দেবত্বে আরূঢ় হইয়া ঈশ্বরের দেবস্বরূপের যথার্থ পূজা করিতে সমর্থ ব্যক্তিই বিরল। আমাদিগের মত দুর্ব্বল অধিকারী উহা হইতে এখনও বহুদূরে অবস্থিত। সেজন্য, আমাদিগের ন্যায় সাধারণ ব্যক্তির প্রতি করুণাপরবশ হইয়া আমাদিগের হৃদয়ের পূজা গ্রহণ করিবার জন্যই দেবতার আমাদের ভূমিতে অবতরণ—মানবীয় ভাব ও দেহ স্বীকার করিয়া ঈশ্বরের দেব-মানব রূপধারণ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগাবির্ভূত দেব-মানবদিগের সহিত তুলনায় ঠাকুরের সাধন কালের ইতিহাস আলোচনা করিবার আমাদের অনেক সুবিধা আছে। কারণ, ঠাকুর স্বয়ং তাঁহার জীবনের ঐ কালের কথা সময়ে সময়ে আমাদের নিকট বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করায় সে সকলের জ্বলন্ত চিত্র আমাদের মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। আবার আমরা তাঁহার নিকট যাইবার স্বল্পকাল পূর্ব্বেই তাঁহার সাধকজীবনের বিচিত্রাভিনয় দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীর লোক সকলের চক্ষু সম্মুখে সংঘটিত হইয়াছিল। ঐ সকল ব্যক্তিদিগের অনেকেই তখনও ঐ স্থানে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহাদিগের প্রমুখাৎও ঐ বিষয়ে কিছু কিছু শুনিবার আমরা অবসর পাইয়াছিলাম। কিন্তু ঐ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সাধনতত্ত্বের মূলসূত্রগুলির একবার সাধারণ ভাবে আবৃত্তি করিয়া লওয়া ভাল। আগামী বারে আমরা ঐ বিষয়েই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ক্রমশঃ।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি, এ)

স্বামীজি প্রথমবার বিলাত হইতে ফিরিয়া কয়েক দিন কাশীপুর ৺গোপাল লাল শীলের বাগানে অবস্থান করিয়াছিলেন। শিষ্য তখন প্রতিদিন তথায় যাতায়াত করিত। শুধু শিষ্য কেন স্বামীজির দর্শন মানসে, তখন বহু উৎসাহী যুবকের তথায় ভিড় হইত। মিস্ মুলার স্বামীজির সঙ্গে আসিয়া এখানেই প্রথম অবস্থান করিয়াছিলেন। শিষ্যের গুরুভ্রাতা Goodwin এই বাগানেই স্বামীজির সঙ্গে থাকিতেন।

স্বামীজির সুখ্যাতি তখন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত। সুতরাং কেহ ঔৎসুক্যের বশবর্ত্তী হইয়া, কেহ তত্ত্বান্বেষী হইয়া, কেহ বা স্বামীজির জ্ঞান-গরিমা পরীক্ষা করিতে তখন স্বামীজিকে দর্শন করিতে আসিত।

* * * শিষ্য দেখিয়াছে প্রশ্ন কর্ত্তারা স্বামীজির শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত। তাঁহার উদ্ভিন্ন প্রতিভায় বড় বড় দার্শনিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ নির্ব্বাক হইয়া অবস্থান করিত। এই সময় স্বামীজির কণ্ঠে যেন বীণাপাণি সর্ব্বদা অবস্থান করিতেন এবং এই বাগানে অবস্থান কালে তাঁহার অলৌকিক যোগদৃষ্টি প্রভৃতিরও সময়ে সময়ে পরিচয় পাওয়া যাইত।

কলিকাতা বড়বাজারে বহু পণ্ডিতের বাস। অর্থবান মারোয়ার বণিক-গণের অন্নেই ইঁহারা প্রতিপালিত। ঐ সকল বেদজ্ঞ এবং দার্শনিক পণ্ডিত-গণও এ সময়ে স্বামীজির সুনাম অবগত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট পণ্ডিত স্বামীজির সঙ্গে তর্ক করিবার মানসে একদিন এই বাগানে উপস্থিত হন। শিষ্য সেদিন তথায় উপস্থিত ছিল। সে দিনের ঘটনা তাহার ডায়ারীতে লিপিবদ্ধ না থাকিলেও তাহার মনে আছে।

আগন্তুক পণ্ডিতগণের সকলেই সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেন। তাঁহারা আসিয়াই মণ্ডলীপরিবেষ্টিত স্বামীজিকে সম্ভাষণ করিয়া

* এই বাগানে অবস্থান কালে স্বামীজি একদিন একটী প্রেতাত্মার ছিন্ন মুণ্ড দেখিতে পান। সে যেন করুণ কণ্ঠে সদ্যো মৃত্যুর মুখ হইতে প্রাণ ভিক্ষা করিতেছিল। অনুসন্ধান করিয়া, স্বামীজি পরে জানিতে পারিয়াছিলেন যে সত্য সত্যই ঐ বাগানে কোন ব্রাহ্মণের অপঘাতে মৃত্যু হয়। এই ঘটনা তিনি পরে তাঁহার গুরু ভ্রাতৃগণের কাছে প্রকাশ করেন

সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। স্বামীজিও সংস্কৃতেই তাঁহাদিগকে উত্তর দিতে লাগিলেন। কোন্ বিষয় লইয়া স্বামীজির সঙ্গে সেদিন পণ্ডিতগণের বাদ হয় তাহা শিষ্যের ইদানীং স্মরণ নাই। তবে এই পর্য্যন্ত স্মরণ হয় যে পণ্ডিতেরা সকলেই চীৎকার করিয়া সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন ও স্বামীজিকে দার্শনিক কট প্রশ্ন সমূহ করিতেছিলেন এবং স্বামীজি প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে ঐ বিষয়ক নিজ মীমাংসাদ্যোতক সিদ্ধান্তগুলি বলিতেছিলেন। ইহাও বেশ মনে আছে যে স্বামীজির সংস্কৃত ভাষা পণ্ডিতগণের ভাষা অপেক্ষা শ্রুতি মধুর ও সুললিত হইতেছিল। পণ্ডিতগণও ঐ কথা পরে স্বীকার করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত ভাষায় স্বামীজিকে ঐরূপে অনর্গল কথাবার্ত্তা কহিতে দেখিয়া তাঁহার গুরু ভ্রাতৃগণ পর্য্যন্ত সেদিন স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। গত ৬ বৎসর কাল ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় অবস্থান কালে স্বামীজি যে সংস্কৃত আলোচনার তেমন সুবিধা পান নাই তাহা সকলেরই জানা ছিল। সুতরাং শাস্ত্রদর্শী এই সকল পণ্ডিতগণের সঙ্গে ঐরূপ তর্কালাপে—সেদিন সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল, স্বামীজির মধ্যে অদ্ভুত শক্তির স্ফুরণ হইয়াছে। ঐ বাদ সভায় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, যোগানন্দ, নির্ম্মলানন্দ, তুরীয়ানন্দ ও শিবানন্দ মহারাজ উপস্থিত ছিলেন।

স্বামীজি বাদে সিদ্ধান্ত পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ পূর্ব্বপক্ষবাদী। শিষ্যের মনে পড়ে বিচার হইতে হইতে স্বামীজি এক স্থলে "স্বস্তি" স্থলে "অস্তি" প্রয়োগ করায় পণ্ডিতগণ উপহাস করিয়া উঠেন। তাহাতে স্বামীজি তৎক্ষণাৎ বলেন "পণ্ডিতানাং দাসোঽহং" "ক্ষন্তব্যমেতৎ স্খলনং।" আমি পণ্ডিতগণের দাস, আমার এই ব্যাকরণ স্খলন ক্ষমা করুণ। পণ্ডিতেরাও স্বামীজির ঈদৃশ দৈন্য ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া যান। অনেকক্ষণ বাদানুবাদের পরিশেষে সিদ্ধান্ত পক্ষের মীমাংসা পর্য্যাপ্ত বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করিলেন এবং প্রতিসম্ভাষণ করিয়া গমনোদ্যত হইলেন। দুই চারিজন আগন্তুক ভদ্রলোক ঐ সময় তাঁহাদিগের পশ্চাৎ গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়গণ, স্বামীজিকে কিরূপ বোধ হইল।" তদুত্তরে বয়োজ্যেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও স্বামীজি শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ দ্রষ্টা, মীমাংসা করিতে অদ্বিতীয় এবং স্বীয় প্রতিভা বলে বাদ খণ্ডনে অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন।"

স্বামীজির গুরুভ্রাতৃগণের তাঁহার উপর সর্ব্বদা কি অদ্ভুত ভালবাসাই

দেখা যাইত। পণ্ডিতগণের সঙ্গে স্বামীজির যখন খুব তর্ক বাধিয়া গিয়াছে, তখন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে হলের উত্তর পাশের ঘরে বসিয়া জপ করিতে শিষ্য দেখিতে পায়। পণ্ডিতগণের গমনান্তে শিষ্য তাঁহাকে ঐ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসায় জানিতে পারে যে স্বামীজির জয় লাভের জন্যই তিনি একান্ত মনে ঠাকুরের পাদপদ্মে জানাইতেছিলেন।

পণ্ডিতগণ চলিয়া গেলে শিষ্য স্বামীজির নিকট শ্রবণ করে যে, পূর্ব্বপক্ষকারী উক্ত পণ্ডিতগণ পূর্ব্বমীমাংসা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। স্বামীজি উত্তরমীমাংসা পক্ষ অবলম্বনে তাঁহাদিগের নিকট জ্ঞানকাণ্ডের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিতগণও স্বামীজির সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ব্যাকরণগত একটী ভুল ধরিয়া পণ্ডিতগণ যে স্বামীজিকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন তাহাতে স্বামীজি বলেন যে, অনেক বৎসর যাবৎ সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা না বলায় তাঁহার ওরূপ ভ্রম হইয়াছিল। পণ্ডিতগণের উপর সেজন্য তিনি কিছুমাত্র দোষার্পণ করেন নাই। ঐ বিষয়ে স্বামীজি ইহাও কিন্তু বলিয়াছিলেন যে পাশ্চাত্য দেশে বাদের মূল বিষয় ছাড়িয়া ঐরূপে ভাষায় সামান্য ভুল দেখান প্রতিপক্ষের পক্ষে মহা অসৌজন্য জ্ঞাপক। সভ্যসমাজ ঐরূপ স্থলে ভাবটাই লয়—ভাষাবদিকে লক্ষ্য করে না। "তোদের দেশে কিন্তু খোসা লইয়াই মারামারি চল্‌ছে—ভিতরকার শস্যের কেউ অনুসন্ধান করে না।" এই বলিয়া স্বামীজি শিষ্যের সঙ্গে সংস্কৃতে আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। শিষ্যও ভাঙ্গা ভাঙ্গা সংস্কৃতে জবাব দিতে লাগিল। তত্রাচ তিনি তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐদিন হইতে শিষ্য স্বামীজির অনুরোধে তাঁহার সঙ্গে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে দেবভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত।

"সভ্যতা" কাহাকে বলে—তদুত্তরে সেদিন স্বামীজি বলেন যে, যে সমাজ বা যে জাতি আধ্যাত্মিক ভাবে যত অগ্রসর সে সমাজ ও সে জাতি তত সভ্য। নানা কল কারখানা করিয়া ঐহিক জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতে পারিলেই যে জাতি বিশেষ সভ্য হইয়াছে তাহা বলা চলে না। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা লোকের হাহাকার ও অভাবই দিন দিন বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। পরন্তু ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা সর্ব্বসাধারণকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পন্থা প্রদর্শন করিয়া লোকের ঐহিক অভাব এককালে দূর করিতে না পারিলেও অন্ততঃ অনেক কমাইতে নিঃসন্দেহ সমর্থ হইয়াছিল। ইদানীন্তনকালে ঐ উভয় সভ্যতার একত্র সংযোগ করিতেই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

একালে একদিকে যেমন লোককে কর্ম্মতৎপর হইতে হইবে অপরদিকে তাহাকে তেমনি গভীর অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এইরূপে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যোন্যসংমিশ্রণে জগতে যে নবযুগের অভ্যুদয় হইবে একথা স্বামীজি সেদিন বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। ঐ কথা বুঝাইতে বুঝাইতে একস্থলে স্বামীজি বলিয়াছিলেন—"আর এক কথা ওদেশের লোকেরা ভাবে, যে যত ধর্ম্মপরায়ণ হবে সে বাহিরে চালচলনে তত গম্ভীর হবে, মুখে অন্য কথাটী থাক্‌বে না। একদিকে আমার মুখে উদার ধর্ম্মকথা শুনে ওদেশের ধর্ম্ম যাজকেরা যেমন অবাক্ হয়ে যেত, বক্তৃতান্তে বন্ধুবান্ধবদের সহিত ফষ্টি নাষ্টি কর্‌তে দেখে আবার তেমনি অবাক্ হয়ে যেতো। মুখের উপর কখন কখন বলেও ফেল্‌তো, স্বামীজি, আপনি একজন ধর্ম্মযাজক, সাধারণ লোকের মত এরূপ হাসি তামাসা করা আপনার উচিত নয়। আপনার ওরূপ চপলতা শোভা পায় না। তদুত্তরে আমি বলিতাম "We are children of bliss—why should we look morose and somber?" আমরা আনন্দের সন্তান, আমরা অপ্রফুল্ল-মুখে থাকবো কেন? ঐ কথা শুনে তারা মর্ম্মগ্রহণ করতে পারত কিনা সন্দেহ।"

সেদিন স্বামীজি ভাবসমাধি ও নির্ব্বিকল্পসমাধি সম্বন্ধেও নানাকথা বলিয়াছিলেন। যতদূর সাধ্য নিম্নে তাহার পুনরাবৃত্তি করা গেল।

"মনে কর একজন হনুমানের মত ভক্তিভাবে ঈশ্বরের সাধনা কর্‌ছে। ভাবের যত গাঢতা হতে থাক্‌বে ঐ সাধকের চলন বলন ভাবভঙ্গী এমন কি শারীরিক গঠনাদিও ঐরূপ হয়ে আস্‌বে। "জাত্যান্তর পরিণাম" ঐরূপেই হয়। ঐরূপ একটা ভাব নিয়ে সাধক ক্রমে তদাকারকারিত হয়ে যায়। কোন প্রকার ভাবের চরমাবস্থার নামই ভাবসমাধি। আর আমি দেহ নই মন নই বুদ্ধি নই এইরূপ "নেতি" "নেতি" কর্‌তে কর্‌তে জ্ঞানী সাধক চিন্মাত্রসত্তায় অবস্থিত হ'লে নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভ হয়। এক একটা ভাব নিয়েই সিদ্ধ হতে বা ঐ ভাবের চরমাবস্থায় পৌঁছুতে কত জন্মের চেষ্টা লাগে। ভাবরাজ্যের রাজা আমাদের ঠাকুর কিন্তু আঠারোটা ভাবে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ভাব মুখে না থাক্‌লে শরীর থাকে না—একথাও ঠাকুর বল্‌তেন।"

কথায় কথায় শিষ্য ঐদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মহাশয়, ওদেশে কিরূপ আহারাদি করিতেন?

স্বামীজি ঃ—ওদেশের মতই খেতুম। আমরা সন্ন্যাসী, আমাদের কিছু-তেই জাত যায় না।

এদেশে তিনি ভবিষ্যতে কি প্রণালীতে কার্য্য করিবেন তৎসম্বন্ধেও ঐদিন স্বামিজী বলেন যে মান্দ্রাজ ও কলিকাতায় দুইটী কেন্দ্র করিয়া সর্ব্ববিধ লোক-কল্যাণার্থ নূতনধরণে সাধু সন্ন্যাসী তৈয়িরি করিবেন। আরও বলিলেন, destruction দ্বারা বা প্রাচীন রীতি সমূহ ভাঙ্গিয়া সমাজ বা দেশের উন্নতি লাভ করা যায় না। সর্ব্বকালে সর্ব্বদিনে উন্নতিলাভ constructive process দ্বারা অযথা প্রাচীন রীতি প্রভৃতিকে নূতনভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া গড়িয়াই হইয়াছে। ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রচারক মাত্রই পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ঐরূপে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। একমাত্র বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম destructive ছিল। সেইজন্য ঐ ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে।

শিষ্যের মনে হয়, স্বামীজি ঐভাবে কথা কহিতে কহিতে বলিতে লাগিলেন—'একটী জীবের মধ্যে ব্রহ্ম বিকাশ হইলে হাজার হাজার লোক সেই আলোকে পথ পাইয়া অগ্রসর হয়। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরাই একমাত্র লোক গুরু। একথা সর্ব্বশাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হয়। অবৈদিক অশাস্ত্রীয় কুলগুরুপ্রথা স্বার্থপর—ব্রাহ্মণেরাই দেশে প্রচলন করিয়াছে। সেই জন্যই সাধন করিয়াও লোক এখন সিদ্ধ বা ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারিতেছে না। ধর্ম্মের এই সকল গ্লানি দূর করিতেই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ শরীর ধারণ করিয়া বর্ত্তমানযুগে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত সার্ব্বভৌমিক মত জগতে প্রচারিত হইলে জগতের এবং জীবের মঙ্গল হইবে। এমন অদ্ভুত মহাসমন্বয়াচার্য্য বহু-শতাব্দী যাবৎ ভারতবর্ষে ইতিপূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

স্বামীজির একজন গুরু ভ্রাতা এই সময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ওদেশে তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বসমক্ষে ঠাকুরকে অবতার বলিয়া প্রচার করিলেন না কেন?

স্বামীজি :—কেন জানিস্। ওরা দর্শন বিজ্ঞানের বড় বড়াই করে। তাই যুক্তি তর্ক দর্শন বিজ্ঞান দিয়ে ওদের জ্ঞান গরিমা চূর্ণ করে দিতে না পারলে কোন কিছু প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তর্কে যেই হারিয়ে যারা যথার্থ তত্ত্বান্বেষী হয়ে আমার কাছে অস্‌তো তাদের কাছে ঠাকুরের কথা কইতুম্। নতুবা একেবারে অবতার বাদের কথা বল্লে ওরা বল্‌তো—"ও আর তুমি নূতন কি বল্‌ছো—আমাদের প্রভু ঈশাই তো রয়েছেন।"

তিন চারি ঘণ্টাকাল ঐরূপে মহানন্দে অতিবাহিত করিয়া শিষ্য সে দিন অন্যান্য আগন্তুক ব্যক্তিদিগের সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিল।

ভারতীয় রমণী—তাহাদের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ।

(প্রবুদ্ধ ভারত, ডিসেম্বর, ১৮৯৮)

আমাদের প্রতিনিধি লিখিতেছেন,—

একদিন রবিবার অতি প্রত্যূষে আমি অবশেষে সম্পাদক মহাশয়ের আদেশ প্রতিপালনে সমর্থ হইলাম। ভারতীয় রমণীগণের অবস্থা ও অধিকার এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের মতামত জানিবার জন্য হিমালয়ের একটী সুন্দর উপত্যকায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

আমি যখন স্বামীজির নিকট আমার আগমনের উদ্দেশ্য বিবৃত করিলাম, তখন তিনি বলিলেন, "চলুন, একটু বেড়াইয়া আসা যাক্।" তখনই আমরা বেড়াইতে বাহির হইলাম। আহা কি মনোহর দৃশ্য! এমন দৃশ্য সমগ্র জগতে বিরল।

আমরা কখন রবিকরোজ্জ্বল, অথবা ছায়াবিশিষ্ট পথের মধ্য দিয়া, কখন নিস্তব্ধ পল্লীগ্রামের মধ্য দিয়া, কখন ক্রীড়াশীল বালকবালিকাগণের মধ্য দিয়া এবং কখনও বা সুবর্ণবর্ণ শস্য ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম। কোথাও দেখিলাম, দীর্ঘকায় মহীরুহসমূহ যেন উপরের নীলাকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, আবার অন্য স্থানে কৃষকবালারা হাতে কাস্তে লইয়া শীতের সম্বল পক্ষশীর ভুট্টা কাটিবার জন্য ক্ষেত্রে ঝুঁকিয়া কায করিতেছে;—দেখিতে পাইলাম। কখন বা দেখিলাম, কোনও পথ আপেলের বাগানের দিকে গিয়াছে—তথায় রাশীকৃত রক্তিম আপেলফল চয়ন করিয়া বৃক্ষতলে বাছিয়া রাখা হইয়াছে। আবার ক্ষণকাল পরেই আমরা খোলা মাঠে পড়িলাম—দেখিলাম সম্মুখে অভ্রমালা ভেদ করিয়া আকাশপ্রান্ত হইতে হিমানীগুরু গম্ভীর সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে।

অবশেষে আমার সঙ্গী মৌনভঙ্গ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"নারী সম্বন্ধে আর্য্য ও সেমেটিক * আদর্শ চিরদিনই সম্পূর্ণ বিপরীত।

* হিব্রু, আসীরিয় প্রভৃতি কয়েকটী ভাষাভাষী জাতিকে সেমিটিক জাতি বলে। অনেকের অনুমান—ইহারা আদমের পুত্র শেম হইতে উৎপন্ন।

সেমাইটদের মধ্যে স্ত্রীলোকের উপস্থিতি উপাসনার ঘোর বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত। তাহাদের মতে স্ত্রীলোকের কোনরূপ ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার নাই, এমন কি, আহারের জন্য পক্ষী মারাও * তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। আর্য্যদের মতে সহধর্ম্মিণী ব্যতীত পুরুষে কোন ধর্ম্মকার্য্য করিতে পারে না।"

আমি এইরূপ অপ্রত্যাশিত ও সাফ কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলাম,—

"কিন্তু স্বামীজি, হিন্দুধর্ম্ম কি আর্য্য ধর্ম্মেরই অঙ্গবিশেষ নহে ?"

স্বামীজি ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম পৌরাণিক ভাববহুল, অর্থাৎ উহার উৎপত্তিকাল বৌদ্ধধর্ম্মের পরবর্ত্তী। দয়ানন্দ সরস্বতী দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে, গার্হপত্য অগ্নিতে আহুতি দানরূপ বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, যে সহধর্ম্মিণী ব্যতীত হইতেই পারে না, তাহারই আবার শালগ্রাম শিলা অথবা গৃহদেবতাকে স্পর্শ করিবার অধিকার নাই। ইহার কারণ এই যে, এই সকল পূজা পরবর্ত্তী পৌরাণিক সময় হইতে প্রচলিত হইয়াছে।"

"তাহা হইলে আমাদের মধ্যে নরনারীর যে অধিকারবৈষম্য দেখা যায়, তাহা আপনি সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবসম্ভূত বলিয়া মনে করেন ?"

স্বামীজি বলিলেন,—

"যদি কোথাও বাস্তবিকই অধিকারবৈষম্য থাকে, সে ক্ষেত্রে আমি ঐ রূপই মনে করি ; কিন্তু পাশ্চাত্য সমালোচনার আকস্মিক স্রোতপাতে এবং তুলনায় পাশ্চাত্য নারীদের অবস্থাপার্থক্য দেখিয়াই যেন আমরা আমাদের দেশে নারীদের হীন দশা অতি সহজেই মানিয়া না লই। বহু শতাব্দীর বহু ঘটনাবিপর্য্যয়ের দ্বারা নারীদিগকে একটু আড়ালে রক্ষা করিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি। এই সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদের সামাজিক রীতিনীতি পরীক্ষা করিতে হইবে,—স্ত্রীজাতির হীনতারূপ সিদ্ধান্তের প্রয়োগ করিয়া নহে।"

"তাহা হইলে, স্বামীজি, আমাদের সমাজে নারীগণের বর্ত্তমান অবস্থায় কি আপনি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ?"

* য়াহুদী ধর্ম্মে বৃথামাংস ভোজন নিষিদ্ধ। এইজন্য তাহারা কোন পশু বা পক্ষী প্রথমে দেবোদ্দেশে বলি দিয়া পরে খাইয়া থাকে। ওল্ড টেষ্টামেণ্ট ও স্বামীজি কৃত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' দেখুন।

স্বামীজি বলিলেন,—

"না—তা' কখনই নহে। কিন্তু নারীদিগের সম্বন্ধে আমাদের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া পর্য্যন্ত; নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জ্জন করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে। তাহাদের হইয়া অপর কেহ এ কার্য্য করিতে পারে না, করিবার চেষ্টা করাও উচিত নহে। আর জগতের অন্যান্য স্থানের নারীগণের ন্যায় আমাদের নারীগণও এ যোগ্যতালাভে সমর্থা।"

"আপনি নারীজাতির অধিকারবৈষম্যের কারণ বলিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের উপর দোষারোপ করিতেছেন; জিজ্ঞাসা করি, কিরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম নারীজাতির অবনতির কারণ হইল?"

স্বামীজি বলিলেন,—

"সেই কারণের সৃষ্টি বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সময় ঘটিয়াছিল। প্রত্যেক আন্দোলনেই কোন অসাধারণ বিশেষত্ব থাকে বলিয়াই তাহার জয় ও অভ্যুদয় হয়, কিন্তু আবার উহার অবনতির সময়, যাহা লইয়া তাহার গৌরব, তাহাই তাহার দুর্ব্বলতার প্রধান উপাদান হয়। নরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বুদ্ধের সম্প্রদায়গঠন ও পরিচালনশক্তি অদ্ভুত ছিল আর ঐ শক্তিতে তিনি জগৎ জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম কেবল সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের উপযোগী ধর্ম্ম মাত্র। তাহা হইতে এই অশুভ ফল হইল যে, সন্ন্যাসীর ভেক পর্য্যন্ত সম্মানিত হইতে লাগিল। আবার তিনিই সর্ব্ব প্রথম মঠপ্রথা অর্থাৎ এক ধর্ম্মসদনে সঙ্ঘরূপে বাস করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া নারীজাতিকে পুরুষাপেক্ষা নিম্নাধিকার দিতে হইল, কারণ, বড় বড় মঠস্বামিনীগণ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মঠাধ্যক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোন গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। ইহাতে উদ্দিষ্ট আশু ফললাভ অর্থাৎ—তাঁহার ধর্ম্মসঙ্ঘের মধ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন হইয়াছিল, ইহা আপনি বুঝিতেই পারিতেছেন। কেবল সুদূর ভবিষ্যতে ইহার যে ফল হইয়াছিল, তাহারই জন্য অনুশোচনা করিতে হয়।"

"কিন্তু বেদে ত সন্ন্যাসের বিধি আছে?"

"অবশ্যই আছে, কিন্তু সে সময় ঐ বিষয়ে নরনারীর কোন প্রভেদ করা হয় নাই। যাজ্ঞবল্ক্যকে জনকরাজার সভায় কিরূপ প্রশ্ন করা হইয়াছিল,

তাহা আপনার স্মরণ আছে ত ?* তাঁহার প্রধান প্রশ্নকর্ত্রী ছিলেন বাক্‌পটু কুমারী বাচক্নবী—তখনকার কালে এইরূপ মহিলাগণকে ব্রহ্মবাদিনী বলা হইত। তিনি বলিয়াছিলেন, আমার এই প্রশ্নদ্বয় দক্ষ ধানুষ্কের হস্তস্থিত দুইটী শাণিত তীরের ন্যায় ; এই স্থলে তাঁহার নারীত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত তোলা হয় নাই। আর আমাদের প্রাচীন আরণ্য শিক্ষাপরিষদ্‌সমূহে বালক বালিকার যেরূপ সমানাধিকার ছিল, তদপেক্ষা অধিকতর সাম্যভাব আর কি হইতে পারে ? আমাদের সংস্কৃত নাটকগুলি পড়ুন—শকুন্তলার উপাখ্যান পড়ুন, তার পর দেখুন—টেনিসনের 'প্রিন্সেস্'† হইতে আর আমাদের নূতন কিছু শিখিবার আছে কি না।"

"স্বামীজি, আপনি বড় অদ্ভুতরূপে আমাদের অতীতের মহিমা ও গৌরব আমাদের সমক্ষে প্রকাশ করিতে পারেন !"

স্বামীজি শান্তভাবে বলিলেন,—

"হাঁ, তাহার কারণ সম্ভবতঃ আমি জগতের দুটো দিক্‌ই দেখিয়াছি। আর আমি জানি, যে জাতি সীতা-চরিত্র প্রসব করিয়াছে, ঐ চরিত্র যদি কেবল কাল্পনিকও হয়, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে, নারীজাতির উপর সেই জাতির যেরূপ শ্রদ্ধা, জগতে তাহার তুলনা নাই। পাশ্চাত্য মহিলাগণের স্কন্ধে আইনের বজ্রবাঁধনে যে সব বিঘ্ন সংলগ্ন আছে, আমাদের দেশে ত সে সব মোটেই জানেও না। §

* বৃহদারণ্যক উপনিষদ্। ৩য় অধ্যায়, ৮ম ব্রাহ্মণ।

† টেনিসন প্রণীত 'প্রিন্সেস্' (Princess) কাব্যে বর্ণিত আছে, কোন দেশের বিদুষী রাজকন্যা সুসভ্য দেশ সমূহেও বর্ব্বর জাতিসুলভ নরনারীর নানাবিধ অধিকারবৈষম্য ও নারীজাতির শিক্ষা স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ে হীনদশা দেখিয়া মর্ম্মাহতা হন এবং পিতার নিকট হইতে তদীয় রাজ্যান্তর্গত এক নিভৃত স্থান চাহিয়া লইয়া তথায় এক প্রকাণ্ড বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তদীয় দুইজন শিক্ষিতা সহচরীর সাহায্যে শত শত নারীকে পুরুষাধিকৃত সর্ব্ববিদ্যা শিক্ষা দিতে থাকেন। এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে নারীগণকে সংসারের সমুদয় সংস্রব ত্যাগ করিতে হইত। ইহার সমুদয় কার্য্যকলাপ নারীর দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইত ত্রিসিমানায় কোন পুরুষের আসিবার অধিকার ছিলনা। আসিলে প্রাণ দণ্ড হইবে এইরূপ বিধান ছিল।

§ দৃষ্টান্ত :—ভারতে স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র সম্পত্তি রাখিবার অধিকার অতি প্রাচীন কাল হইতে রহিয়াছে, কিন্তু ইউরোপে অতি অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তথাকার আইনানুসারে এরূপ স্বতন্ত্র স্ত্রীধন রাখিতে পারিতেন না।

আমাদের নিশ্চিতই অনেক দোষও আছে, আমাদের সমাজে অনেক অন্যায়ও আছে, কিন্তু এই সকল উহাদেরও আছে। আমাদের এটী কখন বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, সমগ্র জগতে প্রেম, মার্দ্দব ও সাধুতা বাহিরের কার্য্যে ব্যক্ত করিবার একটা সাধারণ চেষ্টা চলিয়াছে আর বিভিন্ন জাতীয় প্রথা-গুলির দ্বারা যতটা সম্ভব ঐ সব ভাব প্রকাশ করা হইয়া থাকে। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমি একথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, অন্যান্য দেশের প্রথা-সমূহ হইতে ভারতীয় প্রথাসমূহের নানা প্রকার অধিক উপযোগিতা আছে।"

"তবে স্বামীজি, আমাদের রমণীগণের মীমাংসিতব্য কোনরূপ সমস্যা আদৌ আছে কি"?

অবশ্যই আছে—অনেক সমস্যা আছে—সমস্যাগুলিও বড় গুরুতর। কিন্তু এমন একটীও সমস্যা নাই, 'শিক্ষা' এই মন্ত্রবলে যাহার সমাধান না হইতে পারে। প্রকৃত শিক্ষার ধারণা কিন্তু এখনও আমাদের মধ্যে উদয় হয় নাই।"

"তাহা হইলে আপনি প্রকৃত শিক্ষার কি লক্ষণ করিবেন?"

স্বামীজি ঈষদ্ধাস্য সহকারে বলিলেন,—

"আমি কখন কোন কিছুর লক্ষণ নির্দ্দেশ করি না। তথাপি এই ভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে যে, শিক্ষা বলিতে কতকগুলি শব্দ শেখা নহে, উহাকে আমাদের বৃত্তি বা শক্তিসমূহের বিকাশ বলা যাইতে পারে; অথবা বলা যাইতে পারে—শিক্ষা বলিতে ব্যক্তিসকলকে এমন ভাবে গঠিত করা, যাহাতে তাহাদের ইচ্ছা সদ্বিষয়ে ধাবিত ও সুসিদ্ধ হয়। এইরূপ ভাবে শিক্ষিতা হইলে আমাদের ভারতের কল্যাণ সাধনে সমর্থা নির্ভীকহৃদয়া মহীয়সী রমণীগণের অভ্যুদয় হইবে—তাহারা সঙ্ঘমিত্রা, লীলা, অহল্যাবাই ও মীরাবাই * এর পদাঙ্কানুসরণে সমর্থা হইবে—তাহারা পবিত্র, স্বার্থগন্ধশূন্য

* সঙ্ঘমিত্রা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সম্রাট্‌ ধর্ম্মাশোকের কন্যা। ইনি সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বন করিয়া স্বীয় ভ্রাতা মাহিন্দোর সহিত সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন।

লীলার বিষয় যোগবাশিষ্ট রামায়ণে বর্ণিত আছে। ইনি বিদূরথ রাজার মহিষী। সরস্বতী দেবীর আরাধন ফলে ইনি স্বীয় পতি রাজার জীবাত্মাকে নিজ গৃহে অবরুদ্ধ রাখিতে, দেবীর সহিত স্বর্গাদি নানালোকে সূক্ষ্মশরীরে বিচরণ করিতে ও পরিশেষে ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সমর্থা হইয়াছিলেন।

ও বীর রমণী হইবে—ভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শে যে বীর্য্য লাভ হয়, তাহারা সেই বীর্য্যশালিনী হইবে—সুতরাং তাহারা বীরপ্রসবিনী হইবার যোগ্য হইবে।"

"তাহা হইলে, স্বামীজি, আপনার মতে শিক্ষার ভিতর ধর্ম্মশিক্ষাও কিছু থাকা উচিত, আপনি মনে করেন?"

স্বামীজি গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—

"আমি ধর্ম্মকে শিক্ষার ভিতরকার সার জিনিষ বলিয়া মনে করি। এটী কিন্তু মনে রাখিবেন যে, আমি আমার নিজের বা অপর কাহারও ধর্ম্মসম্বন্ধে মতামতকে ধর্ম্ম বলিতেছি না। আমার বিবেচনায় অন্যান্য বিষয়ে যেমন, এ বিষয়ে তদ্রূপ শিক্ষয়িত্রী ছাত্রীর ভাব ও ধারণানুযায়ী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিবেন এবং তাহাকে উন্নতি করিবার এমন সহজ পথ দেখাইয়া দিবেন যাহাতে তাহাকে খুব কম বাধা পাইতে হয়।"

"কিন্তু ধর্ম্মের দৃষ্টিতে ব্রহ্মচর্য্যকে বাড়াইয়া জননী ও সহধর্ম্মিনীর পরিবর্ত্তে যাঁহারা ঐ সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করেন, তাঁহাদিগকে উচ্চাসন দিয়া রমণীগণের উন্নতিতে নিশ্চিত স্পষ্ট আঘাত করা হইয়াছে।

স্বামীজি বলিলেন,—

"আপনার এটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম যদি রমণীগণের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যকে উচ্চাসন দিয়া থাকেন, পুরুষজাতির পক্ষেও ঠিক তদ্রূপই করিয়াছেন।

অহল্যাবাই—হোলকার বংশ প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত মল্হর রাওএর পুত্রবধূ ছিলেন। তদীয় স্বামী তাঁহার শ্বশুরের জীবদ্দশায়ই প্রাণত্যাগ করিয়া এবং তাঁহার পুত্র অল্পদিন রাজ্য পরিচালনার পরই উন্মাদগ্রস্ত হওয়ায় তাঁহাকে ইন্দোরের রাজ্ঞীরূপে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ত্রিশ বৎসর মালব ও তাহার অধীনস্থ অনেক প্রদেশ শাসন করিতে হয়। ইনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা, দয়াশীলা, প্রজার কল্যাণাকাঙ্খিণী, বুদ্ধিমতী ও রাজ্যের সুশাসনে দক্ষা ছিলেন। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই নানাবিধ দেবালয় রাস্তাঘাট প্রভৃতি কীর্ত্তি এখনও বিদ্যমান।

মীরাবাই রাজমহিষী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে কান্তভাবে উপাসনা, অন্তঃপুরে সদা সর্ব্বদা বৈষ্ণব, সাধুগণের সঙ্গ এবং শ্রীকৃষ্ণোদ্দেশ্যে মধুর ও আধ্যাত্মিকভাবযুক্ত কবিতা ও সঙ্গীত রচনায় ইনি কাল কাটাইতেন। রাজার পুনঃ পুনঃ নিবারণ সত্ত্বেও তিনি মনকে কোনরূপে ভগবৎপ্রসঙ্গ হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া পরিশেষে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন।

আরও আপনার প্রশ্ন শুনিয়া বোধ হইতেছে, এ বিষয়ে আপনার নিজের মনেও যেন একটু কি গোলমাল রহিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম মানবাত্মার পক্ষে একটী—কেবল মাত্র একটী কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন—অনিত্যের মধ্যে নিত্যবস্তু সাক্ষাৎকারের চেষ্টা। কিন্তু ইহা কিরূপে সাধিত হইতে পারে,তাহার একমাত্র পন্থা কেহ নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হন না। বিবাহ বা ব্রহ্মচর্য্য, ভাল বা মন্দ, বিদ্যা বা মূর্খতা—যে কোন বিষয় ঐ চরম লক্ষ্যে লইয়া যাইবার সহায়তা করে, তাহারই সার্থকতা আছে। এই বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ প্রভেদ বর্ত্তমান—কারণ,বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান উপদেশ বহির্জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি—তার মোটামুটি ঐ উপলব্ধির একটিমাত্র পন্থা নির্দ্দিষ্ট। মহাভারতের সেই অল্পবয়স্ক যোগীর কথা আপনার কি মনে পড়ে? যিনি ক্রোধজাত তীব্র ইচ্ছাশক্তিবলে এক কাক ও বকের দেহ ভস্ম করিয়া স্পর্দ্ধান্বিত হইয়াছিলেন—মনে পড়ে কি, নগরে গিয়া প্রথমে রুগ্ন পতির শুশ্রূষাকারিণী এক নারী পরে ধর্ম্মব্যাধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল,—যাঁহারা উভয়েই আত্মাবহতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠারূপ সাধারণ মার্গে থাকিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন? *"

"তাহা হইলে আপনি এ দেশের রমণীগণকে কি বলিতে চান?"

"কেন, আমি পুরুষগণকে যাহা বলিয়া থাকি, রমণীগণকে ঠিক তাহাই বলিব। ভারত এবং ভারতীয় ধর্ম্মে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাস্থাপন কর, তেজস্বিনী হও, আশায় বুক বাঁধ, ভারতে জন্ম বলিয়া লজ্জিত না হইয়া উহাতে গৌরব অনুভব কর, আর স্মরণ রাখিও, আমাদের অপরাপর জাতির নিকট হইতে কিছু লইতে হইবে বটে, কিন্তু জগতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আমাদের সহস্রগুণে অপরকে দিবার আছে।"

---

* মহাভারত, বনপর্ব্ব, ধর্ম্মব্যাধ উপাখ্যান।

শ্রীরামানুজ-দর্শন।

[শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ]

(১২)

বেদের প্রামাণ্য ও অভিব্যক্তিবাদ খণ্ডন।

গতবারে আমরা শাব্দপ্রমাণের একটী লক্ষণ ও তাহার প্রযোজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, এক্ষণে উহার অপর একটী লক্ষণ আমাদের আলোচ্য। এই লক্ষণটী মীমাংসক সম্প্রদায়ের অভিমত লক্ষণ এবং ইহা আচার্য্য রামানুজও গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণটীর সহিত এই লক্ষণটীর অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে বেদ সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের কি ধারণা ছিল তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে।

শাব্দপ্রমাণের সেই লক্ষণটী এই যে, "যাহা করণদোষ ও বাধকপ্রত্যয়ের অভাববিশিষ্ট বাক্য" তাহাই শাব্দপ্রমাণ। এখন আমরা ধীরে ধীরে এই লক্ষণটী নিষ্পেষণ করিব এবং দেখিব ইহার ভিতর হইতে কিরূপ অর্থ লাভ হয়।

"করণদোষ ও বাধকপ্রত্যয়ের অভাব" বলিতে করণদোষের অভাব এবং বাধকপ্রত্যয়ের অভাব—দুইই বুঝিতে হইবে। করণদোষ অর্থে যদ্দ্বারা জ্ঞান হয় তাহার দোষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞান হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়াদির দোষ বুঝিতে হইবে। আর বাধকপ্রত্যয়ের অভাব অর্থে যে জ্ঞানটী পূর্ব্বজ্ঞানের বাধা দেয় না, এমন জ্ঞানের অভাব বুঝায়। যেটীকে যাহা বলিয়া জ্ঞান হইল, সেটীকে যদি পরে তাহানয় বলিয়া জ্ঞান হয় তাহা হইলে পরের জ্ঞানটী পূর্ব্বের জ্ঞানের বাধক হয়। মনে করা যাউক, দড়িটীকে সাপ বলিয়া জ্ঞান হইল, কিন্তু পরে আবার জ্ঞান হইল যে, না উহা সাপ নহে, এস্থলে "সাপ"-জ্ঞানের বাধক "সাপ নহে" জ্ঞানটী।

এখন করণদোষ ও বাধকপ্রত্যয়ের অর্থ যদি এইরূপ হইল, তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, যাহা শাব্দপ্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয়,—তাহার যিনি বক্তা, তাঁহার কোন করণদোষ বা জ্ঞান-সাধন ইন্দ্রিয়াদির দোষ ছিল না। আমরা যেমন দেখিতে গেলে চক্ষুর দোষে সাদাকে হলুদে দেখি, ছোটকে বড় ও বড়কে ছোট দেখি, কতক জিনিষ বা দেখিতেই পাই না, এরূপ ভাব সেই শাব্দপ্রমাণ-বক্তার ছিল না—যে বিষয়টীর যেরূপ জ্ঞান হওয়া বাঞ্ছনীয়

তাহার সেইরূপ জ্ঞানই হইত। আর সেই শাব্দপ্রমাণের বক্তার বাক্যে বাধকপ্রত্যয়ের অভাব থাকায়, তাঁহার বাক্য কস্মিন কালে মিথ্যা হয় নাই।

শাব্দপ্রমাণের এই লক্ষণটীর অর্থ মোটামুটি এইরূপ হইলেও ইহার ভিতর গূঢ়ার্থ অনেক আছে। প্রথম, যাঁহার বাক্য শাব্দপ্রমাণের যোগ্য হইবে, তাঁহার করণদোষ না থাকায় তাঁহার যে ইন্দ্রিয়ই নাই এরূপ কল্পনা করা চলে না, পক্ষান্তরে তিনি ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট এইরূপই কল্পনা করা সঙ্গত। এখন ইন্দ্রিয় থাকিতে গেলেই তিনি যে আমাদের মত ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট এক জন জীব হইবেন তাহাইত সহজে আমাদের মনে উদয় হয়। কিন্তু ঠিক আমাদের মত একটী জীব হইতে গেলে করণদোষের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা দুর্ঘট। আমরা নির্দোষ ও সুস্থ ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত হইলেও অনেক ক্ষুদ্র দ্রব্য দেখিতে পাই না, জলে যে পোকা থাকে তাহা ত কেহই সাদা চোখে দেখিতে পায় না, কিন্তু অনুবীক্ষণে তাহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। সুতরাং ইন্দ্রিয় থাকিলেই যে সকল প্রকার জ্ঞান হইবে তাহার কোন প্রমাণ নাই আর যদি সকল প্রকার জ্ঞান না হয়, তাহা হইলে সেই সকল প্রকার জ্ঞান না হওযাই এক প্রকার "করণদোষের" মধ্যে পরিগণিত হইতে বাধ্য। তাহার পর যদিই ধরা যায়,—ইন্দ্রিয় সত্বে, সকল প্রকার জ্ঞান না হইলেও তাহা করণদোষ মধ্যে গণ্য হওযা উচিত নহে, তাহা হইলেও উক্ত শাব্দ-প্রমাণ-বক্তাকে আমাদের মত জীব বলিয়া স্বীকার করিলে বাধকপ্রত্যয়ের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার আশা নাই। কারণ যে জলে আমি দেখিলাম পোকা নাই তাহাকে যদি নির্ম্মল জল বলি এবং পরে তাহাতেই পোকা দেখা যায় তাহা হইলে যে জলকে নির্ম্মল বলিয়াছিলাম তাহাই সমল জল হইল, সুতরাং আমার কথায় বাধকপ্রত্যয়ের অভাব সম্ভব হইল না। অগত্যা স্বীকার করিতে হইবে, যে জীবের বাক্য শাব্দপ্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে, তাঁহার ইন্দ্রিয়াদি থাকিয়াও তিনি আমাদের মত জীব নহেন। আমাদের যেমন ইন্দ্রিয়াদি সত্বেও অনেক জিনিষের জ্ঞান হয় না, তাঁহার সেরূপ হয় না। তাঁহার ইন্দ্রিয় দ্বারা তিনি সকল জিনিষেরই জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। এরূপ জীব না স্বীকার করিলে শাব্দপ্রামাণের পূর্ব্বোক্ত লক্ষণের সার্থকতা থাকে না। বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণের সার্থকতা রক্ষার জন্যই এই প্রকার অদ্ভুত ক্ষমতাশালী এক জীবের সত্তা স্বীকার করিতে হয়। এজন্য "করণ-দোষশূন্য ও বাধকপ্রত্যয়ের অভাববিশিষ্ট বাক্যই শাব্দপ্রমাণ" এই লক্ষণ

মধ্যে উক্ত প্রকার একটী জীব স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা গুপ্ত ভাবে নিহিত রহিয়াছে। এখন দেখা যাউক এজীব কে ?

শাস্ত্রকারগণ এই প্রকার জীবটীকে "ব্রহ্মা" বলিয়া পরিচয় দেন। এই ব্রহ্মা বাক্যপ্রয়োগক্ষম জীবজাতির মধ্যে আদি ও প্রধান ছিলেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়াদি আমাদের মত ইন্দ্রিয় ছিল না, ইনি তাঁহার ইন্দ্রিয় দ্বারা সকল প্রকার জ্ঞেয় পদার্থই জানিতে সক্ষম হইতেন। এই ব্রহ্ম নিজ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যাহা জানিয়াছিলেন, তাহাই জীবহিতার্থ জীবগণকে বলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার বাক্যই শাব্দপ্রমাণ আর এই শাব্দপ্রমাণই বেদ। লোকেও বেদ বলিতে ব্রহ্মার মুখোচ্চারিত কতিপয় বাণীকেই বুঝিয়া থাকে। সুতরাং শাব্দপ্রমাণের এই দ্বিতীয় লক্ষণ হইতে বেদই একমাত্র শাব্দপ্রমাণ অন্য কিছু নহে।

তাহার পর শাস্ত্রকারগণ এই ব্রহ্মার বাক্যকেই শাব্দপ্রমাণ বলিযাই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা ব্রহ্মার এই বাক্যকে তাঁহার স্বকপোলকল্পিত বাক্য বলিতে চাহেন নাই। আমি একটা কিছু নূতন দেখিলাম এবং আমার সুবিধার জন্য আমি তাহার একটা নামকরণ করিলাম, এভাবে ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছেন তাহা বেদ নহে, ব্রহ্মার যে বাণী বেদ নামে খ্যাত, তাহা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভগবানের প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার পর অবুদ্ধি পূর্ব্বক উচ্চারিত। আর এরূপ হওয়ায় ভগবানে নিত্য বিরাজমান যাবতীয় জ্ঞানরাশিই ব্রহ্মার হৃদযে উদয় হইবার পর ব্রহ্মার বাণী বেদ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং যাহা বেদ তাহা প্রকৃত ব্রহ্মারও বাণী নহে। উহা ভগবানেরই বাণী, ব্রহ্মার মুখ দিয়া বাহির হইযাছে মাত্র। ব্রহ্মা যেন যন্ত্র আর ভগবান্ যেন যন্ত্রী। এখন যদি মনে হয় ভগবান্ সর্ব্বকারণ কারণ বলিয়া তাঁহার আমাদের মত শরীর থাকা ত সম্ভব নহে, সুতরাং তিনি আবার কি করিয়া শব্দ উচ্চারণ করিবেন এবং ব্রহ্মাকেই বা শুনাইবেন ? যেমন, মাটী যদি ঘটের কারণ হয় তাহা হইলে মাটীর পিণ্ড দ্বারা ত ঘটের জল আনয়ন কার্য্য হয় না ? তাহা হইলে উত্তরে বলা হয়, যে ভগবানে ইহা সম্ভব। যেহেতু আমাদেরই বাগিন্দ্রিয় না থাকিলেও আমরা যখন মনে মনে শব্দ উচ্চারণ করিয়া কথা কহিতে পারি এবং আমাদের সেই চিন্তা অপরে সংক্রামিত করিতে পারি তখন তিনি তাহা অপেক্ষা ভাল করিয়াই বা না পারিবেন কেন! অপরে চিন্তাসংক্রমণের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। যাঁহারা সামান্য যোগবিদ্যায় পারদর্শী তাঁহাদেরই নিকট ইহা

অতি সহজ কথা। বস্তুতঃ এরূপ ঘটনা আমরা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। সুতরাং ব্রহ্মার বাণী বেদ ব্রহ্মার কল্পনা নহে, আর এইরূপ বেদকে শাব্দপ্রমাণ বলায় কোনও দোষ ঘটিতে পারে না।

বেদকে এই ভাবে শাব্দপ্রমাণ বলায় বেদবিরোধী বহু দার্শনিক পণ্ডিত বেদের বিরুদ্ধে বহু তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে জৈন, বৌদ্ধ ও নাস্তিকগণ সর্ব্বপ্রধান। পরন্তু আজ কাল বেদপ্রামাণ্য খণ্ডনে জৈনগণের মধ্যে যত গ্রন্থাদি দেখা যায়—বৌদ্ধ ও নাস্তিকগণের সেরূপ গ্রন্থ দেখা যায় না। পরন্তু এই জৈন ও বৈদিকগণের বিবাদের বেদ প্রমাণ্যের আবশ্যকতা সম্বন্ধে এত জ্ঞাতব্য বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে যে বেদানুরাগী মাত্রেরই তাহা জ্ঞাতব্য। আমাদের অবলম্বিত গ্রন্থের টীকাকার এই বিবাদের চিহ্নস্বরূপ বৈদিক পক্ষের দুই একটী মাত্র প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছেন—পাঠকগণের বিদিতার্থ তাহা এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম। জৈনগণের এ জাতীয় আপত্তি আজ কালও আমাদের মধ্যে অনেককে করিতে দেখা যায়।

আমরা জৈনগণের গ্রন্থে (যথা "সম্মতি প্রকাশ") দেখিতে পাই, তাঁহারা "বেদে করণদোষ নাই" এ কথাটী স্বীকার করিতে চাহেন নাই। তাঁহারা বলেন বেদ যখন "বাক্য," তখন আমাদের মত জীবেরই বাক্য। উহা যে আদি, প্রধান অদ্ভুত ক্ষমতাশালী ব্রহ্মা নামক কোন জীবের বাক্য তাহা স্বীকার করিবার কোন হেতু দেখা যায় না। কৈ আমরা ত ব্রহ্মাকে দেখিতেছি না, অথবা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণও যে দেখিয়াছেন তাহাও ত আমাদের গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় না—ইত্যাদি।

বৈদিকগণ ইহার উত্তরে বলিয়া থাকেন, যে ব্রহ্মা যে ঐরূপ একজন জীব তাহা আমরা ব্রহ্মার যে বাক্য—বেদ, সেই বেদেই দেখিতে পাই, যথা "ব্রহ্মা হ দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব" ইতি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণও ব্রহ্মাকে তপঃ প্রভাবে দেখিয়া থাকিতেন। যদি বল আমাদের কথা প্রমাণ করিবার জন্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কথা দিয়া প্রমাণ করা উচিত নহে, কোন বেদবিরোধী সম্প্রদায়ের কথা দ্বারা প্রমাণ করা উচিত তাহা হইলে বলিতে পারি যে, তোমাদের মত বেদ-বিরোধী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই ব্রহ্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। দেখ, বুদ্ধদেব যখন সিদ্ধিলাভ করেন, তখন তিনি ব্রহ্মার অনুরোধেই জীবহিতার্থ তাঁহার অমূল্য উপদেশ প্রচারে প্রবৃত্ত হন, নচেৎ তখনই তিনি নির্ব্বাণ লাভে উদ্যত হইয়াছিলেন—একথা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কথা।

জৈনগণের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, যদিই ব্রহ্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও তাঁহার কথাই তাঁহার কথার সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা উচিত নহে। কারণ লোকমধ্যেই দেখা যায় একজনের একটা কথা সত্য কিনা প্রমাণের জন্য অপরকে সাক্ষ্য মানা হয়। সুতরাং ব্রহ্মার কথার সত্যতা ব্রহ্মার কথার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে বলিয়া বেদের প্রামাণ্য অগ্রাহ্য।

বৈদিক ইহার উত্তরে বলেন, যে যদি ব্রহ্মাকে আদি ও সর্ব্বপ্রধান বলিয়া স্বীকার করা হয় তাহা হইলে তাঁহার কথার প্রমাণ্যের জন্য অপর কাহারও কথা প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ অপর কেহই তাঁহার মত ক্ষমতাশালী ছিলেন না। তিনি যে সর্ব্বপ্রধান হইয়াছিলেন তাহার কারণ তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন। আবার ক্ষমতাধিক্যই জ্ঞানাধিক্যের সাধক; সুতরাং অন্ধের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ দ্বারা কোন চক্ষুষ্মানের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে যাইলে যেরূপ ঘটে ব্রহ্মার জ্ঞানের সত্যাসত্য নির্ণয়ে আমাদের সাক্ষ্যও তদ্রূপ হইবার কথা।

আর যদি বল ব্রহ্মার অস্তিত্ব তোমরা মানিবে না অথবা তাঁহার অত্যদ্ভুত ক্ষমতার কথা বিশ্বাস যোগ্য নহে, তাহা হইলে; তোমাদিগকেই তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। প্রমাণের ভার আমাদের স্কন্ধ হইতে তোমাদের স্কন্ধে পড়িল। কিন্তু তোমরা বেদের মত প্রাচীন এমন কোন গ্রন্থই দেখাইতে পারিবে না যাহাতে বেদের মিথ্যাত্ব ঘোষিত হইয়াছে অথবা ব্রহ্মার অত্যদ্ভুত ক্ষমতার বিরুদ্ধে কিছু কথিত হইয়াছে। জগতে এমন কোন সম্প্রদায়েরই এমন কোন গ্রন্থাদি নাই, যাহাতে উক্ত গ্রন্থের গ্রন্থকার বেদের কর্ত্তা কাহাকেও স্বচক্ষে দেখিয়াছেন? আর যদিই বেদের সমকালীন কোন গ্রন্থের অস্তিত্ব অবগত হইতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহাতে বেদ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না থাকাই বেদের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ হইতে পারে না। বেদের সত্যতা যেমন বেদের মধ্যে কথিত হইয়াছে তদ্রূপ যদি তৎকালীয় কোন গ্রন্থে বেদের মিথ্যাত্ব বা বেদের কোন মানব রচনাকর্ত্তা সম্বন্ধে কথিত হইয়া থাকে তবেই তাহার প্রমাণ্য স্বীকার করিতে পারা যায় নচেৎ নহে।

বস্তুতঃ এ জাতীয় তর্কে জৈনগণ বৈদিক সম্প্রদায়কে বিপন্ন করিতে পারেন নাই। কারণ তাঁহারাই স্বয়ং তাঁহাদের তীর্থঙ্কর মহাবীরের কথার প্রামাণ্যের জন্য মহাবীরস্বামীর ইন্দ্রিয়াদির নির্দ্দোষত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, আর তজ্জন্য তাঁহারা বেদের মধ্যে "বাধকপ্রত্যয়ের" অর্থাৎ স্ববিরোধী কথার

দৃষ্টান্ত লইয়া পরস্পরে নানা তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন। পরন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এস্থলেও তাঁহারা বেদের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিতে সক্ষম হন নাই। ইহার নমুনাস্বরূপ দুই একটি কথা বলি ;—

বেদের ভিতর যে সমস্ত আজ্‌গুবি কথা, ব্রহ্মার নিজ কন্যা হরণ, এবং যাগযজ্ঞাদির ফলের কথা আছে, জৈনগণ এইবার এই সমস্ত কথা লইয়া পড়িলেন। তাঁহারা বলিলেন যে বেদের মিথ্যাত্ব প্রমাণের জন্য বেদের আভ্যন্তরীণ কথাই যথেষ্ট। পরন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এস্থলেও বৈদিক আচার্য্যগণ যথারীতি বেদ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন! তাঁহারা অনেক স্থলে উক্ত প্রকার আজ্‌গুবি কথার এমন সদর্থ করিতেন যে বিপক্ষের মনে সংশয় বা অশ্রদ্ধার কোন কারণ থাকিত না, এবং যাগযজ্ঞাদির সত্যতা প্রমাণ জন্য যাগযজ্ঞাদির দ্বারা বহুস্থলে অভীষ্টসিদ্ধি করাইয়া দেখাইয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্য পড়িলে এ প্রকার অনেক ঘটনার বিষয় অবগত হওয়া যায়।

বেদ সম্বন্ধে প্রাচীন সংশয় ও প্রাচীন উত্তরের নমুনা পাঠকবর্গ একটু পাইলেন। এ জাতীয় সংশয় বর্ত্তমান কালেও ইহার বিরুদ্ধে মধ্যে মধ্যে উঠিতে দেখা যায়, পরন্তু ইহার দ্বারা বেদের অপ্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না। তবে আজকাল বেদের বিরুদ্ধে যে গুটীকতক নূতন সংশয়ের আবির্ভাব হইয়াছে তাহার ফলে বেদের প্রামাণ্য একেবারেই অগ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু রামানুজ মতে গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে এসব সংশয়ের মূল্য কতদূর তাহা বুঝিতে একটু চেষ্টা করা উচিত। কারণ, রামানুজ মত অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিক মতের ন্যায় বেদানুকূল মত। বেদের প্রামাণ্যেই ইহাদের প্রামাণ্য। সুতরাং এস্থলে এ বিষয় আলোচনা করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বেদবাক্যের প্রামাণ্য সম্বন্ধে আজকাল যে সব আপত্তি উঠিয়া থাকে তাহার মূল প্রথম অভিব্যক্তিবাদ। দ্বিতীয় জড়বিজ্ঞানানুরাগ এবং তৃতীয় বেদাদি শাস্ত্রবিষয়ক অজ্ঞান। প্রথম অভিব্যক্তিবাদ অবলম্বন করিয়া আজকাল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জীব ও জগতের উৎপত্তি প্রভৃতি নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অগত্যা বেদও তাঁহাদের গবেষণার বিষয় হইয়াছে। ইহার ফলে বেদ অসভ্য জাতীয় চাষার সঙ্গীত, বৈজ্ঞানিক সত্যাসত্যের জন্য ইহার মূল্য নাই, পরন্তু অতি প্রাচীন কালে মনুষ্যসমাজের শাখা বিশেষের ইতিহাসের জন্য ইহার মূল্য আছে। দ্বিতীয় জড়বিজ্ঞানের প্রতি

অনুরাগবশতঃ ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাজাতীয় জীবের প্রতি ঘোর সন্দেহ জন্মিয়াছে, এবং বেদাদি শাস্ত্রবিষয়ক অজ্ঞান বশতঃ উক্ত শাস্ত্রমধ্য হইতে এমন সব স্থল দেখান হয় যাহাতে তৎকালের লোকদিগের অতি সহজ বিষয়েও অনেক ভ্রান্ত ধারণা ছিল বোধ হয়, যেমন সূর্য্যের রথ, সগর রাজসন্তানগণ কর্ত্তৃক সাগর খনন, দেবাসুরের যুদ্ধ ইত্যাদি।

উপরিউক্ত জড়বিজ্ঞানানুরাগ এবং শাস্ত্রবিষয়ক অজ্ঞানমূলক সংশয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। কারণ জড়বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এবং শাস্ত্র প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সংশয়ের পরিসর ক্রমে কমিয়া আসিতেছে, এবং ঘাতের প্রতিঘাতের ন্যায় ও ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার ন্যায় এই জড়বিজ্ঞানবাদের দিনেই যখন থিয়জফিষ্ট প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত মনীষিবৃন্দ কত অদ্ভুত কথাতেই বিশ্বাস করিতেছেন তখন প্রকৃত সত্যান্বেষীর নিকট যথার্থ কথাটা গোপন থাকিতে পারে না। অন্ধকার আলোক আসিলেই যায়, অজ্ঞান জ্ঞানোম্মেষেই নিবৃত্ত হয়, সুতরাং এ জন্য বৈদিক সম্প্রদায়ের বড় চিন্তা নাই। বৈদিক সম্প্রদায়ের যদি কিছু চিন্তার বিষয় থাকে, যদি কখন তাঁহাদিগের বিপক্ষের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয় তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতিপক্ষ উক্ত অভিব্যক্তিবাদীর দল। কারণ ইহারা ঠিক অজ্ঞানী নহেন অথবা কেবল জড়বিজ্ঞানানুরাগী নহেন।

অভিব্যক্তিবাদীর মতে "অব্যক্ত" হইতে "ব্যক্ত" হইতেছে, এবং উত্তরোত্তর ব্যক্তই হইতে থাকিবে। আজ যাহা আছে কাল তাহার উন্নতি হইবে, পূর্ব্বে যাহা ছিল আজ তাহার উন্নতি হইয়াছে। এজন্য পূর্ব্বের মনুষ্যজাতি অত্রকার মনুষ্যজাতি হইতে কখনই উন্নত ছিল না, এবং তজ্জন্য ব্রহ্মার মত অদ্ভুত ক্ষমতাশালী শ্রেষ্ঠজীব পূর্ব্বে থাকা অসম্ভব। ইহাদের মতে এই বর্ত্তমান মনুষ্যজাতি সরীসৃপ চতুষ্পদ ও দ্বিপদাদি জীবজাতি ক্রমে উৎপন্ন এবং যেহেতু অত্যাবধিও মনুষ্য-ভ্রূণে সেই আদিম জীবজাতি হইতে এই উন্নত মনুষ্যজাতির মধ্যগত যাবতীয় জাতিবিশিষ্ট জীবের উদ্বর্ত্তন বা বিকাশ দেখা যায়, অন্যান্য জীবেরও তদনুরূপ ঘটনা ঘটে, সেই হেতু এই অভিব্যক্তিবাদ অভ্রান্ত সত্য। বাঁচিবার ইচ্ছা বশতঃ অবস্থা চক্রে পড়িয়া দেহাদির গঠনের পরিবর্ত্তন হইতে হইতে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন হইয়া এই মনুষ্যজাতির আবির্ভাব হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মার মত শ্রেষ্ঠ জীবের অস্তিত্ব স্বীকার ত দূরের কথা পূর্ব্বকালের মনুষ্যজাতিই শ্রেষ্ঠ মনুষ্যজাতি ছিল না। উহারা তাহাদের

পিতৃপুরুষ শাখামৃগের অনুরূপ গুণসম্পন্ন ছিল। অভিব্যক্তিবাদের এই প্রকার সিদ্ধান্ত বেদপ্রামাণ্যের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে, এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ-প্রধান জড়বিজ্ঞানানুরাগ ও শাস্ত্রবিষয়ক অজ্ঞান, ইহারা উভয়ে বেদ-প্রামাণ্যের মূল শব্দপ্রমাণের প্রতিও অনেককে বীতশ্রদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। আজ কাল যেন সকলেই বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে কাচের পাত্রের মধ্যে সব জিনিষকেই পরীক্ষা করিয়া মানিতে চাহে। সকলেই যেন পূর্ব্বে শ্রেষ্ঠ মানবজাতির সত্তা মানিতে হইলে ভূমধ্যভাগ খুঁড়িয়া তাহাদের উন্নতির লক্ষণাক্রান্ত কঙ্কাল আবিষ্কার করিয়া তাহা মানিতে চাহে। ব্রহ্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইলে প্রেতাত্মার ছায়াচিত্রের ন্যায় তাঁহার চিত্র দেখিতে পাইলে তাঁহাকে মানিব এই প্রকার ভাবিতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে অভিব্যক্তিবাদী কাহার অভিব্যক্তি স্বীকার করেন, দ্রব্যের না গুণের। যদি দ্রব্যের অভিব্যক্তি স্বীকার করেন তাহা হইলে কত চেষ্টাতেও কেন এখন পর্য্যন্ত মূল ধাতু রৌপ্য তাম্রাদিকে সুবর্ণাদিতে পরিণত করিতে পারা যাইতেছে না? আর যদি র‍্যাডিয়ম হইতে হিলিয়মের উৎপত্তির ন্যায় রৌপ্যাদির সুবর্ণাদিতে পরিণতি সম্ভব বলিয়া স্বীকার কর তাহা হইলেও রৌপ্যাদি যে সুবর্ণ হয় তাহা প্রমাণ হইতে পারে না। আর যদিই তাহা হয় তাহা হইলেও তদ্বিপরীত ক্রমে পুনরায় উহাদের পূর্ব্বরূপে পরিণতি কেন স্বীকার করিবে না? আমরা ত তামা হইতে তুঁতে, লোহা হইতে হীরাকস হইতে দেখিয়া আবার তদ্বিপরীত ক্রমে তুঁতে ও হীরাকসকে তামা ও লোহা হইতে দেখিতেছি।

যদি বল তামার তুঁতে হওয়া ও র‍্যাডিয়মের হিলিয়ম্ হওয়া এক প্রকার ব্যাপার নহে, কারণ তামা অম্লবিশেষের যোগে তুঁতে হয়, র‍্যাডিয়ম্ কাহারও সহিত মিলিত হইয়া হিলিয়ম্ হয় না, তাহা হইলে বলিব তাহা অসম্ভব, কারণ জগতে কোন মূল ধাতুই কোথাও সম্পূর্ণ অমিশ্রভাবে থাকে না। তোমার পরীক্ষাগারের কাঁচের পাত্রেও বায়বীয় অপর কিছু না কিছু থাকে, যাহার সহিত সংমিশ্রিত হইয়া র‍্যাডিয়ম্ হিলিয়ম্ হয়। ভাবিয়া দেখ, তুমি যে র‍্যাডিয়ম্ আবিষ্কার করিয়াছিলে তাহাও ইউরেনিয়মের ময়লা খাদ পরীক্ষা করিতে করিতে, অন্য উপায়ে নহে। আজ যদি তোমার র‍্যাডিয়ম্ কিনিতে হয়, তাহা হইলে তোমার অক্সাইড অফ্ র‍্যাডিয়মই কিনিতে হইবে বিশুদ্ধ র‍্যাডিয়ম্ নহে। সুতরাং পরিণতি ব্যাপারে তামার তুঁতে

হওয়া ও র‍্যাডিয়মের হিলিয়ম্ হওয়ার মধ্যে এ অংশে পার্থক্য নাই। মূল কথা যাহাকে যাহাতেই পরিণত করা যাইতে পারুক না, জাতির অপলাপ করা অসম্ভব। যাহার যে অবস্থায় যে জাতিত্ব প্রাপ্তি তাহা নিয়মানুসারেই চলিয়াছে ও চলিতেছে। নিয়ম মানিতে গেলেই জাতি মানিতে বাধ্য হইতে হইবে।

তাহার পর আইস, একবার জীবজাতির কথা ভাবি। আচ্ছা বানর-জাতি যদি অবস্থাচক্রে মাটীতে হাঁটিয়া চলিয়া বনমানুষজাতিতে পরিণত হয়, বনমানুষজাতি তদ্রূপ অবস্থাচক্রে বানরের মত গাছে থাকিয়া থাকিয়া বানর-জাতি হইবে না কেন? নৈসর্গিক পার্থিব উপদ্রবে দেশ জলপ্লাবিত হইলে এরূপ অবস্থাচক্রের পরিবর্ত্তন ত অবশ্যম্ভাবী হইতে পারে, বনমানুষকে তখন গাছে থাকিয়া প্রাণ বাঁচাইতে বাধ্য হইতে হইবে। যদি বল বাঁচিবার ইচ্ছা, ও নিত্য নূতন সুখের ইচ্ছা প্রভৃতি ইচ্ছা বশতঃ অবস্থাচক্রে পড়িয়াও জীব পূর্ব্বরূপ কামনা করে না, ভুক্ত ও উচ্ছিষ্ট পদার্থের প্রতি অনিচ্ছার ন্যায় বনমানুষ আর বানর হইবে না তবে নূতন একটা কিছু হইবে, তাহা হইলে বলিব যে জীবের যেমন নিত্যনূতনের ইচ্ছা স্বাভাবিক, তদ্রূপ নিত্য অথবা পুরাতনের প্রতি আদর বুদ্ধিও স্বাভাবিক। ভ্রমবশতঃ দুঃখ লাভ করিলে আমরা পূর্ব্ব-রূপেরই কামনা করিয়া থাকি, আর ভ্রম আমাদের স্বাভাবিক ঘটনা। সুতরাং বল—অভিব্যক্তির সহিত সুপ্তি বা অনভিব্যক্তি, উন্নতির সহিত অবনতি, সবই সমভাবেই চলিয়াছে।

তাহার পর আবার দেখ, বানরের শুক্রের যে জীবাণুটী বানর হইল, সেই বানরের একটী সন্তান যদি বনমানুষবিশেষ হয়, তাহা হইলে কি করিয়া বলিতে পার যে—উক্ত বনমানুষের পিতৃ-বানরের জীবাণুর বনমানুষে অভিব্যক্তি হইল? যে জীবাণু হইতে বানরটী হইয়াছিল, সে জীবাণুটী ত বানরের শৈশবাবস্থার বহু পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়াছে, পুত্রোৎপাদনের উপযোগী যৌবনাবস্থার ত তাহার কিছুই নাই। এই বানরটীর বনমানুষ-রূপ সন্তান হইবার পূর্ব্বে, এই বানরের মূল জীবাণুর যে অস্তিত্ব কোথায় তাহা কি নির্ণয় করা যায়? তাহার পর উক্ত জীবাণুর যে অংশে সন্তান হয় নাই তাহারই বা গতি কি হইল? এই জন্যই বলি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলে দ্রব্যের অভিব্যক্তি হয় একথা বলা চলে না।

আবার দেখ একই পিতার যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্যে যে সব সন্তান হয়

তাহারা সকলে একরূপ হয় না, এবং একই ব্যক্তি যখন একটী কুসুম সম কুঁড়ি হইতে ফুটিতে ফুটিতে শুখাইয়া যায়, তখন তুমি দ্রব্যের উন্নতি বা অভিব্যক্তি হয় বল কি করিয়া? কল্যকার দেহ আজ নাই, অদ্যকার দেহ কাল থাকিতে পারে না, সেইরূপ একই মনুষ্যজাতি, একই উদ্ভিজ্জজাতি যখন অবস্থা গুণে উন্নতি অবনতি—দুইয়েরই মুখ দেখিয়া থাকে তখন অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করিয়া জগৎ উন্নতির দিকে চলিয়াছে, একথা বল কি করিয়া? যদি কিছু বলিতে হয় বল ইহা পরিবর্ত্তন, ইহা পরিণাম, ইহা অভিব্যক্তি—অনভিব্যক্তি দুইই।

আর যদি বল অভিব্যক্তি হয়—গুণের, দ্রব্যের নহে, তাহা হইলে গুণের পরিবর্ত্তন হইতে হইতে দ্রব্যের পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন স্বীকার করিতে হইবে। কারণ গুণসমষ্টিই ত দ্রব্য। আর যদি দ্রব্যকে গুণসমষ্টি বলিয়া না স্বীকার কর তাহা হইলে একটী দ্রব্যের গুণের অভিব্যক্তি ততটাই স্বীকার্য্য যতটাতে সেই গুণটাকে অন্যজাতীয় গুণ বলিয়া বোধ না হয়; কারণ তাহা হইলে যাহার অভিব্যক্তি হইল তাহাই রহিল না। সুতরাং একটা গুণের কিয়দংশ অভিব্যক্তি যোগ্য এবং কিয়দংশ অভিব্যক্তি যোগ্য নহে বলিতে হইবে। আচ্ছা এখন বল দেখি একটিগুণের যদি একটা অংশ অভিব্যক্তিযোগ্য হয় এবং একটা অংশ অভিব্যক্তিযোগ্য না হয় তাহা হইলে এই অংশ দুইটী কি এক জাতীয়? পরন্তু ইহা কখনই সম্ভব নহে। তাহার পর গুণ ও গুণীর সম্বন্ধ যদি নিত্য বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে ত কোন গুণের যে অংশ অভিব্যক্ত হয় সেই অংশকে তাহার গুণীদ্রব্যের সহিত নিত্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধই বলিতে পার না, যেহেতু নিত্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ গুণের পরিবর্ত্তনে গুণীরও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। আর তাহা হইলে কোন গুণের যে অংশের পরিবর্ত্তন হয় সে অংশকে তাহার গুণী দ্রব্যের সহিত অনিত্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ গুণ বা আগন্তুক গুণ বল। এখন যদি এই আগন্তুকগুণেরই অভিব্যক্তি স্বীকার করিতে চাহ, তাহা হইলে আবার বলিব যে, এই আগন্তুক গুণের আশ্রয়স্থানীয় গুণী দ্রব্যটীর সহিত ঐ আগন্তুক গুণের সম্বন্ধকে তুমি নিত্য বলিয়া মান কিনা? বস্তুতঃ এস্থলে তোমায় এ সম্বন্ধকে নিত্য সম্বন্ধই বলিতে হইবে যেহেতু কোন গুণই কখন তাহার আশ্রয় দ্রব্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। এখন যদি এই আগন্তুক গুণের আশ্রয়স্থানীয় দ্রব্যের সহিত এই আগন্তুক গুণের সম্বন্ধ নিত্য হয়, এবং এই আগন্তুক গুণেরই অভিব্যক্তি হয়

তাহা হইলে এই আগন্তুক গুণেরই এক অংশকে নিত্য বলিতে হইবে, নচেৎ কাহার অভিব্যক্তি হয় এ কথার উত্তরই দিতে পারিবে না। অভিব্যক্তি বা পরিবর্ত্তন স্বীকার করিতে হইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে অপরিবর্ত্তন বা অনভিব্যক্তি অবশ্য স্বীকার্য্য। আর তাহা হইলে পুনরায় উক্ত আগন্তুক গুণের যে অংশ অভিব্যক্ত হয় তাহাকে আবার আগন্তুক নাম দেও এবং যে অংশ অভিব্যক্ত হয় না তাহাকে নিত্য বল। এইরূপে যতই অগ্রসর হইবে, ততই দেখিবে তোমার অভিব্যক্তির নির্ণয় দুর্ঘট হইবে, তোমার নিত্যত্ব ও আগন্তুকত্বের মধ্যে কোন ভেদ থাকা অসম্ভব হইবে, যাহাকে একবার আগন্তুক বলিবে পরক্ষণে তাহারই এক অংশবিশেষকে নিত্য বলিতে বাধ্য হইবে। বল দেখি ইহা অপেক্ষা তোমার বদতোব্যাঘাত দোষ আর কি হইতে পারে? সুতরাং দেখ তোমার অভিব্যক্তি বাদ ক্রমে ক্রমে এক প্রহেলিকা বা মায়া মাত্রে পরিণত হইতেছে, যাহাকে অনিত্য বলিতেছ তাহাই নিত্য হইতেছে।

তাহার পর যদি মায়ারূপী অভিব্যক্তিবাদই স্বীকার করা তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে বল দেখি মনুষ্যত্ব গুণের অভিব্যক্তির মধ্যে মনুষ্যত্বগুণের কোন্ অংশটুকু নিত্য আর কোন্ অংশটুকু অনিত্য? ইহার উত্তর দিতে হইলেই তোমাকে মনুষ্যত্ব গুণের যে একটী জাতি আছে তাহাকেই তাহাহইলে নিত্য বলিতে হইবে। আর ইহার ফলে যদি তুমি মনুষ্যাদি জীবজাতির কোন অংশ নিত্য স্বীকার কর, তাহা হইলে বানর হইতে মানুষ হইয়াছে এ কথা না বলিয়া মানুষ বরাবরই মানুষই আছে, এবং সেই মানুষের প্রথম যে দল এই পৃথিবীতে জন্মে, তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধানকে ব্রহ্মা বলিতে তোমার আপত্তি কি? আর যদি বানর হইতে কর্ম্মবশে মানুষ হয় তাহা হইলে মানুষ কর্ম্মবশে বানর হয়, এ কথা বলিবে না কেন? আর যদি তাহাই হয়—তাহা হইলে মানুষ হইতে বানর হওয়া ও বানর হইতে মানুষ হওয়া—এই দুই পক্ষই স্বীকার করিয়া বানর ও মানুষজাতি দুইই নিত্য বলিবে না কেন? এই রূপে যদি তোমায় জাতির নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে আদিম মানব জাতির মধ্যে প্রধান ব্যক্তির সম্ভাবনা তোমায় মানিতেই হইবে। আর ইহা মানিলে হইলে অযোনিসম্ভব পদ্মযোনির কথা বিশ্বাস করিতে হইবে, এবং ক্রমে তাঁহার মানসপুত্রোৎপত্তি প্রভৃতি যাবতীয় কথাই সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

এখন যদি বল এ জীবকে শ্রেষ্ঠ বলিব কেন, তাহা হইলে বলি—যে জীব, পৃথিবী প্রভৃতি উৎপত্তির পূর্ব্বে মনোময় সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতে ছিলেন, যিনি পৃথিবীসৃষ্টির পর পৃথিবীতে আসিবেন বলিয়া সংকল্পমাত্র বলে নিজ স্থূলদেহ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, যিনি মনুষ্য সৃষ্টির জন্ত নিজ মন হইতে পুত্রোৎপাদন করিতে পারেন, তিনি যদি শ্রেষ্ঠ না হন ত শ্রেষ্ঠ কে তাহা বলা কঠিন। আর এ জীবের মনোময় সূক্ষ্মদেহ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার উপায় নাই—কারণ ইহা অস্বীকার করিলে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হয় এইরূপ কথা স্বীকার করিতে হইবে। এইজন্যই এই জীবকে ব্রহ্মা নাম দিয়া ইহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভৃতি বলিয়া ইহার ক্ষমতাধিক্য স্বীকার করা হয়, এবং ইহার তপস্যালব্ধ ভগবদ্ বাণীই বেদ বলিয়া এত সম্মান করা হয়।

ব্রহ্মার অস্তিত্ব লইয়া আমরা অনেক কথাই বলিলাম, এক্ষণে এই প্রসঙ্গে আর প্রবন্ধবৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন। ফল কথা বেদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে যতই কেন আপত্তি উত্থাপন করা যাউক না ইহার প্রামাণ্যের অপলাপ করা সহজ নহে। অধিক কি যদি ভারতের প্রাচীন ইতিহাস দেখা যায় তাহা হইলে স্পষ্ট দেখা যাইবে যে অনেক বেদ-বিরুদ্ধবাদী অবশেষে এই বেদেরই পদানত হইয়াছেন, অনেক ভারত গৌরব পণ্ডিতপ্রধান এই বেদেরই চরণ সেবা করিয়াছেন। রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারশ্রেষ্ঠগণও এই বেদেরই দোহাই দিয়া যাহা বলিবার বলিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই শাব্দ প্রমাণের মধ্যে বেদই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ভগবানের অবতার হইতে মুনি ঋষি প্রভৃতির বাক্য পর্য্যন্ত সবই বেদের নিকট অবনত মস্তক, ইহাদের বাক্য যদি বেদ-বিরোধী হয় তাহা হইলে তাহাও পরিত্যজ্য।

সুতরাং দেখা গেল শাব্দপ্রমাণের এই দ্বিতীয় লক্ষণ দ্বারা বেদেরই শ্রেষ্ঠ-প্রমাণ্য কথিত হইয়াছে। পূর্ব্ব প্রবন্ধে শাব্দপ্রমাণের যে প্রথম লক্ষণটি দেওয়া হইয়াছে তাহাতেও এই একই কথা উক্ত হইয়াছে। পরন্তু তাহাতে এই দ্বিতীয় লক্ষণের ন্যায় ব্রহ্মার মুখোচ্চারিত বেদের প্রতি এতটা লক্ষ্য প[illegible]ত হয় না, এজন্য আমাদের অবলম্বিত গ্রন্থের গ্রন্থকার এই দ্বিতীয় লক্ষ[illegible]কে প্রথমে বলেন নাই। প্রাচীন গ্রন্থকারগণের রীতি এই যে একটা বিষয়ে মতভেদ বলিতে হইলে নিজ অভিপ্রেত মতটী শেষে বলিয়া থাকেন। এজন্য এই দ্বিতীয় লক্ষণটী গ্রন্থকারের অভিপ্রেত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

মূল গ্রন্থের যে অংশটুকু অবলম্বন করিয়া এত কথা বলিলাম তাহার অনুবাদ এই ;—

"অনুমান নিরূপণ করিয়া শব্দ নিরূপণ করা যাইতেছে—অনাপ্ত কর্তৃক অনুক্তবাক্যজনিত তদর্থ বিজ্ঞানই শাব্দ-জ্ঞান। তাহার কারণই শাব্দ-প্রমাণ। "অনাপ্তানুক্ত" এই কথা বলায় বেদের পৌরুষেয়ত্ব মত নিরস্ত হইল। অথবা শাব্দপ্রমাণ বলিতে—করণদোষ ও বাধকপ্রত্যয়ের অভাব বিশিষ্ট বাক্য বুঝিতে হইবে। "সৃষ্টির আদিতে ভগবান্, চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রম-বিশিষ্ট বেদ সমূহকে স্মরণ করিয়া উপদেশ দেন" এই উক্তির দ্বারা বেদের নিত্যত্ব এবং অপৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ হইল। এতদ্দ্বারা করণদোষাভাব ও বাধক-প্রত্যয়ের অভাবও সিদ্ধ হইল।"

আগামীবারে বেদের তাৎপর্য্য কি তদ্বিষয়ক মতভেদের কথা আলোচ্য।

ক্রমশঃ।

মহর্ষি ফ্র্যান্‌সিস্।

সপ্তম অধ্যায়।

একখানি জীর্ণ কুটীর।

১২১০-১২১১।

রোমনগরে বাসকালে ধর্ম্মযাজকগণ ফ্র্যান্‌সিস্ ও তাঁহার অনুচরবর্গকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। সেজন্য তাঁহাদের ভৃত্যেরাও ইহাঁদের লক্ষ্য করিয়া নানাপ্রকার উপহাস ও বিদ্রূপাদি করিত। রোম হইতে যখন তাঁহাদের প্রস্থান করিবার সময় উপস্থিত হইল তখন তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল যেন তাঁহারা সুদীর্ঘ কারাবাসের পর মুক্তিলাভ করিতেছেন এবং সে জন্য সে সময় তাঁহাদের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। বাড়ীর বাহিরে কিছুকাল থাকিবার পর বালক যেমন বাটীতে ফিরিবার জন্য অধীর হইয়া উঠে, সেইরূপ বহুকাল পরে প্রাণ হইতেও প্রিয়তর জন্মভূমি ও তদন্তর্গত সুপরিচিত শৈলমালার পুনর্দর্শন লাভের আশায় ইহাঁরা যে কি পরিমাণ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন তাহা, যাহারা জীবনে কখনও এরূপ অবস্থায় পড়িয়াছে, কেবল তাহারাই বুঝিতে পারে। সরলহৃদয় ও স্বদেশপ্রেমিক মামক

মাত্রেরই জন্মভূমির প্রতি ঐরূপ প্রগাঢ় ভালবাসার পরিচয় জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত অবধি পাওয়া গিয়া থাকে।

পূর্ব্বকথিত শিরোমুণ্ডনরূপ অনুষ্ঠানটী শেষ হইয়া যাইবার পরেই ইঁহারা মহাত্মা পিটারের সমাধি মন্দিরে যাইয়া উপাসনা করিয়া রোম নগর হইতে বহির্গত হইলেন। দুঃখ, ক্লেশ, ভয়, অশান্তি প্রভৃতি নানারূপে তথায় সহ্য করিলেও, ঐ নগর হইতে বহির্গত হইবামাত্র তাঁহারা সে সমুদয় একেবারে বিস্মৃত হইলেন এবং তাঁহাদের চিত্ত পুনরায় স্বভাবসুলভ প্রসন্নতায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এখন পোপের স্নেহপূর্ণ ও সহানুভূতিব্যঞ্জক কথাগুলিই কেবল তাঁহাদের মনে রহিল এবং তদনুমোদিত নিয়ম সদা সর্ব্বদা পালনের জন্য সাধ্যমত যত্নবান্ থাকিতে তাঁহারা পুনরায় প্রতিশ্রুত হইলেন। অনন্তর পাথেয় সংগ্রহের কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া তাঁহারা রোমনগরের চতুষ্পার্শ্বস্থিত সুবিস্তৃত ক্যাম্‌পানা নামক ভূভাগটী অতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দিবাভাগে তথায় এত অধিক উত্তাপ হয় যে স্থানীয় অধিবাসীরা পর্য্যন্ত সে সময় বাটীর বাহির হইতে সাহস করে না। তন্মধ্যবর্ত্তী পথটী উত্তরাভিমুখীন এবং টাইবার নদী হইতে কিছু দূরে অবস্থিত। পথের বামপার্শ্বে, ভূপৃষ্ঠ হইতে উত্থিত বাষ্পরাজি সমাবৃত শৈলমালা ধীরে ধীরে দূরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বে ছোট ছোট পাহাড়গুলি নিত্যতরঙ্গায়মান ঊর্ম্মিমালার ন্যায় বিরাজিত রহিয়াছে। ইহাদের উপরিভাগে সুবিস্তীর্ণ পশুচারণযোগ্য তৃণভূমি এবং উহার মধ্যে মধ্যে পুষ্পপত্র বিহীন শুষ্কপ্রায় ঘন-সন্নিবিষ্ট বৃক্ষাবলী। উভয় পার্শ্বস্থিত এইরূপ দৃশ্যের মধ্য দিয়া পূর্ব্বোক্ত ধূলিময় পথটী উত্তরদিকে বরাবর চলিয়াছে। যতদূর দেখ অগ্নিতুল্য উষ্ণ কম্পনশীল বায়ুস্তর ভিন্ন অপর কিছুই নয়ন গোচর হয় না। একখানি বাড়ী বা একটী সুন্দর বৃক্ষও সে পথে নাই। অথবা এমন স্বল্প বায়ুতরঙ্গও সে পথে প্রবাহিত নাই যাহার অনুভবে পথশ্রান্ত পথিক ক্ষণেকের তরেও অবসাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। এখানে ওখানে দু' একখানি পরিত্যক্ত ও ভগ্ন কুটীর কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মনে হয় পূর্ব্বে কোন সময়ে কোন সভ্যজাতির এখানে বসতি থাকিলেও এখন উহার কঙ্কালাবশেষ মাত্র দৃষ্ট হইতেছে; এবং দিঙ্‌মণ্ডলে পরিব্যাপ্ত সেই দীর্ঘায়তম শৈলমালা দেখিয়া প্রতীয়মান হয় যেন অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রাচীরের দ্বারা স্থানটি পরিবেষ্টিত

রহিয়াছে। যাহারা কোনরূপ পূর্ব্বায়োজন না করিয়া ইটালীর এই জনহীন, তৃণপর্য্যন্ত শূন্য অংশটী অতিক্রম করিবার চেষ্টা করে তাহাদের শারীরিক ও মানসিক ক্লেশের কথা লিখিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। এই পথে চলিতে চলিতে শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল এবং মন অবসন্ন হইতে থাকে; পদদ্বয় কোমলস্পর্শ ধূলিরাশিতে বসিয়া যায় এবং প্রতি পদবিক্ষেপে ধূলিরাশি উত্থিত হইয়া পথিকের প্রতি লোমকূপে প্রবেশ করতঃ তাহার দেহ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তৃষ্ণায় তাহার মুখ বিশুষ্ক হইয়া উঠে এবং ধীরে ধীরে তাহার সমুদয় শক্তি অন্তর্হিত হইয়া যায়। কিছুক্ষণ ধরিয়া এইরূপে চলিবার পর অবসন্নতা বশতঃ তাহার দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তি একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে। ইহার পরই পথিক জ্বরাক্রান্ত ও গতিশক্তিহীন হইয়া পথিপার্শ্বে পতিত হয়।

রোম নগর হইতে বহির্গত হইবার জন্য তাঁহাদের উৎকণ্ঠা এতদূর বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল যে তাঁহারা সকলেই কঠোর পথের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এবং কোনরূপ আয়োজন না করিয়াই তাঁহারা বহির্গত হইয়া পড়েন। সেজন্য পথিমধ্যে তাঁহাদের অবস্থা এতদূর শোচনীয় হইয়াছিল যে ভাগ্যক্রমে একজন পথিক যদি তাঁহাদিগকে সাহায্য না করিতেন তাহা হইলে তাঁহারা সকলেই সেদিন মৃত্যুমুখে নিশ্চয় পতিত হইতেন। তাঁহাদের অবসন্ন ভাব ও মোহাবেশ অপসৃত হইবার পূর্ব্বেই কিন্তু ঐ পথিকটী তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। করুণাময় জগদীশ্বরের অসীম করুণার অভ্রান্ত পরিচয়স্বরূপ এই ঘটনায় সন্ন্যাসীরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা এতদূর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে রোম নগর হইতে ৪০ মাইল উত্তরে অর্টি (Orte) নামক নগরে পহুঁছিয়াই কিছুকাল বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঐ নগরের অনতিদূরে একটী জনশূন্য স্থানে সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদেরই উপযোগী একটী আশ্রয় তাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন আশ্রয়টী অপর কিছুই নহে—একটী সমাধি মন্দির। এরূপ সমাধি মন্দির তথায় সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় এবং এখনও ভিক্ষুকেরা সময় সময় সে সকল স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। এখানে পহুঁছিয়াই ইহাঁদের মধ্যে জন কতক ভিক্ষার জন্য নগরাভিমুখে গমন করিলেন। অপর সকলে প্রকৃতি দেবীর সেই শান্ত পবিত্র ও নিভৃত আশ্রমে বসিয়া চিন্তাশূন্য হৃদয়ে ও প্রফুল্ল চিত্তে, ভবিষ্যতে কিভাবে কার্য্য করিবেন সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে

লাগিলেন। আহা! যাঁহারা এইরূপে নশ্বর ও তুচ্ছ পার্থিব বিষয়ের প্রতি আসক্তি পরিহার করিতে পারেন তাঁহারা জীবনে কতই না আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন! এই স্থানে ইঁহারা দুই সপ্তাহ কাল বাস করিয়াছিলেন। স্থানটী তাঁহাদের এতদূর ভাল লাগিয়াছিল যে তথা হইতে চলিয়া যাইবার সময় তাঁহাদের কষ্ট হইয়াছিল। সাধন ভজন ও পরমার্থ চিন্তাতেই সম্পূর্ণ-ভাবে আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য ফ্র্যান্সিসের হৃদয়ে এই সময়ে প্রবল আগ্রহ জন্মে। তাঁহার মনোমধ্যে এই চিন্তার উদয় হয় যে, জনসাধারণের উপ-কারার্থ স্থানে স্থানে ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা ও উপদেশ দেওয়া অপেক্ষা কোন নির্জ্জন স্থানে বাস করিয়া ঈশ্বরারাধনায় নিমগ্ন থাকিতে পারিলে অধিকতর আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্ভাবনা। নিভৃত গুহামধ্যে বাস করিয়া সাধন ভজনে জীবনটা কাটাইয়া দিবার ইচ্ছা ফ্র্যান্সিসের জীবনে, বহু-বার মনোমধ্যে উদিত হইয়াছিল। কিন্তু বিশ্বপ্রেমের নিকট নিজ উন্নতি-বিধান স্বার্থদুষ্ট প্রতীয়মান হওয়ায় তিনি হৃদয়ের সে প্রিয়তম বাসনা আনন্দিত চিত্তে ত্যাগ করিয়াছিলেন। অর্টিতে (Orte) তে বাস করিবার সময় ফ্র্যান্সিস্ ও তদনুচরবর্গের মধ্যে প্রচার সংক্রান্ত নানা বিষয় লইয়া নানা বিচারাদি হয়। ফলে, ভবিষ্যতে তাঁহারা কি ভাবে কার্য্য করিবেন সে বিষয় এখানেই সুন্দর ভাবে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে সকলের অপেক্ষা ফ্র্যান্সিসের হৃদয়ই ইহার পরে নব উদ্যম ও আগ্রহে পরিপূর্ণ হয়, এবং মহা কর্ম্মযোগীর ন্যায় জীবন যাপন করিবার জন্য তিনি এখন হইতে সমুৎসুক হইয়া উঠেন। পূর্ব্বোক্ত আশ্রয়স্থল হইতে বহির্গত হইয়া কিছু দূর যাইয়া তাঁহারা একটী উপত্যকার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্যাম্পানা নামক ভূভাগটী অতিক্রম করিয়া যখন তাঁহারা এই উপত্যকায় আসিয়া উপনীত হইলেন তখন তথাকার স্নিগ্ধ, শৈত্য ও পক্ষিসকলের শ্রুতিসুখকর বিচিত্র কূজন শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। উপত্যকার মধ্য দিয়া কলনাদিনী একটী স্রোতস্বিনী উপলখণ্ড ও শৈলগাত্র আলিঙ্গন করিয়া আপন মনে প্রবাহিত হইতেছিল। সে শব্দ শুনিয়া তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল যে নির্ঝরিণীটী পার্শ্ববর্ত্তী অরণ্যস্থিত তরুরাজীর সহিত প্রেমালাপ করিতেছে। পথে শুষ্ক ও প্রাণহীন নির্জ্জনতার জন্য তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে যত ক্লেশ অনুভব করিয়াছিলেন এখন সহর মধ্যে লোকালয়ে আসিয়া ততদূর আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

পথে চলিবার সময় লোকালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেই তাঁহারা তত্রত্য অধিবাসিগণকে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করাইতেন। শান্তি জনিত সুখ যে কত মধুর এবং অনুষ্ঠিত পাপ কর্ম্মের জন্য অনুতাপের যে বিশেষ প্রয়োজন প্রায় এই দুইটী বিষয়ই ইঁহারা তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। অতিশয় সরলপ্রাণ ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের ধারণা হইয়াছিল রোমনগরে তাঁহাদিগকে অতি যত্নের সহিত অভ্যর্থনা করা হইয়াছে। ঐ কথা স্মরণ করিয়া তাঁহারা এত অধিক আনন্দ পাইতেন যে সকলের নিকটেই ঐ বিষয়ে তাঁহারা গল্প করিতেন। তাঁহারা না জানিলেও তাঁহাদের ঐরূপ কার্য্যের উপকারিতাও ছিল। কারণ, ঐ সকল কথা ঐরূপে বলার ফলে তাঁহাদের সম্বন্ধে কাহারও মনে আর কোনরূপ মিথ্যা সন্দেহ উপস্থিত হইত না। ফ্র্যান্সিস্ যখন উপদেশ দিতেন তখন তিনি একদিকে অসৎ কার্য্যের জন্য শ্রোতাগণকে যেমন তীব্র তিরস্কার করিতেন অপরদিগকে আবার তেমনই তাহাদের প্রতি অশেষ ভালবাসার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেন। এই দুই কারণে তাঁহার উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া লোকে সহজেই মুগ্ধ ও তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হইয়া পড়িত এবং সে জন্য তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিবার নিমিত্ত সকলেরই হৃদয়ে প্রবল ইচ্ছার উদয় হইত। কারণ দেখিতে পাওয়া যায় ভালবাসা ও সহানুভূতির গুণে লোকে যত অধিক ও সহজে আকৃষ্ট এবং বশীভূত হয় এমন আর কিছুতেই হয় না। সে জন্য যিনি অন্তরের সহিত তাহাদের ভাল বাসেন ও মঙ্গল কামনা করেন এমন কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলেই লোকে তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া এবং মুক্ত কণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে না। লোকে যখন দেখিল ও বুঝিতে পারিল যে এই নূতন ধর্ম্মপ্রচারকগণ অতি কঠিন নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া নিজ নিজ জীবন পরিচালিত করিয়া থাকেন তখন শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে তাহারা দলে দলে চারিদিক হইতে আসিয়া পরম আগ্রহের সহিত তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, পুরোহিত, শিক্ষিত সম্প্রদায় এমন কি ধনী লোকেরাও পথে প্রকাশ্য স্থানে সাধারণ লোকের সহিত মিশিয়া ইঁহাদের উপদেশ শ্রবণ করিতেন। ইঁহাদের উপদেশ শ্রবণ করিয়া সকলেই ইঁহাদের প্রচারিত মত গ্রহণ করিতেন না সত্য; কিন্তু যিনি এই নবীন সন্ন্যাসী ফ্র্যান্সিস্কে পথে একবার দেখিতেন অথবা তাঁহার মুখ বিনিঃসৃত দু'চারিটী উপদেশ একবার শ্রবণ করিতেন তিনিই

অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেন যে ইনি একজন মহা শক্তিমান্‌ পুরুষ। ইঁহার সৌম্য মূর্ত্তি, মধুর কণ্ঠ ও অমিয় উপদেশ একেবারে বিস্মৃত হওয়া, আর তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইত না। ফ্র্যান্সিসের বাক্যে এমনই অদ্ভুত-শক্তি ছিল যে উহার প্রভাবে শ্রোতা নিজ অতীত জীবনের কথা স্মরণ করিয়া চিন্তা ও ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িত।

নিজ অদ্ভুত চরিত্রশক্তিবলে ফ্র্যান্‌সিস্‌ প্রকৃতই দীপ্তিমান্‌ প্রভাত-নক্ষত্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার সরল কথায় শ্রোতার হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যাইত এবং তাহার সকল সংশয় দূর হইয়া যাইত। তিনি জোর করিয়া যেন কলুষতাময় পার্থিব চিন্তা স্রোত হইতে তাহাদের মনের উদ্ধার সাধন করিতে এবং তাহাদের অনিচ্ছা সত্বেও তাহাদিগকে এমন এক পবিত্র সমুন্নত ভাবরাজ্যে তুলিয়া দিতেন যে তাহারা দেখিত সেখানে নিশিদিন নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজমান রহিয়াছে এবং পরম পিতা পরমেশ্বরের অমিয়মধুর বাণী ভিন্ন অন্য কোন ধ্বনিই আর শ্রবণ গোচর হইতেছে না। এই অদ্ভুত শক্তিশালী নবীন সন্ন্যাসীর দেবচরিত্র প্রভাবে সমগ্র দেশবাসী যেন এক নূতন জীবনীশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল। ঊষরভূমি শস্যশ্যামল ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল এবং শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল! আর যাঁহাদের অন্তরে ধর্ম্মভাবের প্রকৃত অভ্যুদয় হইয়া হৃদয়াকাশে বিশ্ব প্রেমের বিচিত্র সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হইয়াছিল তাহারাই কেবল মহর্ষি ফ্র্যান্‌সিস ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ যে অপূর্ব্ব আনন্দের অধিকারী হইয়াছেন, এ বিষয়ে বুঝিতে সমর্থ হইতেন। বর্ত্তমানকালে বিজ্ঞান সম্মত সভ্যতা এবং শিল্প বাণিজ্যের দিনে আমরা সকলেই অর্থলভ্য সুখ সাচ্ছন্দ্যের জন্য লালায়িত হইয়া ভূমানন্দের উৎস যে আমাদের আয়ত্তাধীন ও অন্তর্নিহিত রহিয়াছে সে বিষয় একবার ভুলিয়াও চিন্তা করিয়া দেখি না। অর্থ সাহায্যে যে আনন্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে, চিত্তবিক্ষেপ ও অবসাদ তাহার অনিবার্য্য নিত্য সহচর। সাধন ভজন দ্বারা চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইলে যে আনন্দের অধিকারী হওয়া যায় তাহার সহিত উহার তুলনাই হয় না। কারণ এ আনন্দ মধুর ও শান্তিপ্রদ। উহা সংযত হইলেও অতিশয় গভীর ও হৃদয়োন্মাদকারী, অবিনাশী ও নিত্য। উহাতে হৃদয়, তনু, মন অবসন্ন না হইয়া বরং প্রতি মুহূর্ত্তেই সজীব হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। অতি দুঃখের বিষয় যে ঐরূপ সর্ব্বমঙ্গলনিদান আনন্দ-

লাভের জন্য আমরা জীবনের অধিকাংশ সময়েই এখন ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া থাকি।

এ্যাসিসি নগরের সমতল ক্ষেত্রে, সহরের মধ্য হইতে এক ঘণ্টার পথ মাত্র দূরে, পেরুজিয়া ও রোম নগরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একখানি অতি জীর্ণ কুটীর পড়িয়াছিল। একটী ক্ষীণকায় জলধারা সুবাশিও (Subasio) শৈল হইতে নির্গত হইয়া এই কুটীরখানির পার্শ্ব দিয়া বহিয়া যাইতেছিল। এই ভগ্নকুটীর খানির সে সময় কেহ অধিকারী ছিল না। পূর্ব্বে তথায় একটী কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফ্র্যান্সিস্ নিজ অনুচরবর্গের সহিত আসিয়া তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এ্যাসিসির সহরতলীর মধ্যে এই স্থানটী অতিশয় নির্জ্জন ছিল এবং এখান হইতে চতুঃপার্শ্বের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে অনায়াসেই যাতায়াত হইতে পারিত। বোধ হয় উহার নিকটে কতকগুলি গুহা ছিল বলিয়াই স্থানটী ফ্র্যান্সিস আশ্রমরূপে মনোনীত করিয়াছিলেন। গুহাগুলি সুবাশিও (Subasio) শৈলে উঠিবার মধ্যপথে অবস্থিত। পূর্ব্বোক্ত জলপ্রবাহ হইতে কুটীরখানির সম্মুখ দিয়া উপরদিকে একঘণ্টা কাল পিচ্ছিল ও বন্ধুর পথে অগ্রসর হইবার পর এই গুহা গুলির নিকটে আসিয়া পৌঁছান যাইত। পথটি অতি দুর্গম ছিল বলিয়া মনুষ্যের সমাগম তথায় একেবারেই ছিল না তথায় যাইলে মনে হইত যেন স্থানটী লোকালয় হইতে শতশত মাইল দূরে অবস্থিত। কোনরূপ বিঘ্নদের আশঙ্কা ছিল না বলিয়া ঐ গুহাগুলির নিকটে অসংখ্য হিংস্রপক্ষী নির্ভয়ে বিহারাদি করিত। এই নির্জ্জন স্থানটী ফ্র্যান্সিস্ অতিশয় ভালবাসিতেন এবং প্রায়ই দু'একটী শিষ্যের সহিত তথায় যাইয়া কিছুকাল বাস করিতেন। সে সময় তাঁহার আহারাদি সংগ্রহের ভার কোন শিষ্যই গ্রহণ করিতেন। আহারীয় সংগ্রহ কার্য্য শেষ হইলে তাঁহারা প্রত্যেকে এক একটী গুহাতে প্রবেশ করিতেন এবং তথায় ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতেন। এই ছোট ছোট তাপসাশ্রমগুলি অতিশয় নির্জ্জন ছিল বলিয়া তথায় কোনরূপ চিত্তবিক্ষেপের সম্ভাবনা ছিল না আবার সহরের নিকটবর্ত্তী ছিল বলিয়া তথা হইতে সহরে যাইয়া প্রচার কার্য্যেরও বেশ সুবিধা হইত। ফ্র্যান্সিস্ যথায় যাইতেন তথায় এইরূপ গুহা প্রায়ই দেখিতে পাইতেন। আপিনাইন্ পর্ব্বতের অরণ্যমধ্যস্থিত আশ্রম গুলিতে এখনও যাইলে তথাকার পবিত্র ভাব অনুভব করিয়া অদ্যাবধি ফ্র্যান্সিসের

বিমলাত্মার পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে, এইরূপে লোকহিতকর নানাবিধ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলেও তিনি নিজ আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয় কখন ক্ষণেকের তরেও বিস্মৃত হন নাই

গুহামধ্যে পূর্ব্বোক্ত ভাবে কিছুকাল ধ্যান ধারণাদি করিবার পর পুনরায় যখন তাঁহারা জীর্ণ কুটীর খানিতে ফিরিয়া আসিতেন তখন জনসাধারণের চিত্ত তাঁহাদের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শ্রদ্ধাবান্‌ ও আকৃষ্ট হইত। পূর্ব্বে যাহারা তাঁহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত এখন তাহারাই ইহঁাদের আচরণে প্রশংসা করিতে লাগিল। স্থানীয় ধর্ম্মযাজক তাঁহাদিগকে ঈর্ষার চক্ষে দেখিলেও তাঁহাদের পবিত্র চরিত্রপ্রভাবে আর তাঁহাদের উপর পূর্ব্ববৎ যথেচ্ছ আচরণ করিতে পারিতেন না। এইরূপে সকলেই এখন ইঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতে লাগিল এবং যতই দিন যাইতে লাগিল ততই লোকে ইহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। এই সময়কার একটী বিশেষ ঘটনায় ফ্র্যান্সিসের মহানুভবতা হৃদয়ঙ্গম করিতে জনসাধারণের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। ইহার মাসকয়েক পূর্ব্বে রাজ্যাভিষেকের সময় রোমরাজ্যের সম্রাট্‌ মহা সমারোহে ইটালির প্রধান প্রধান পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। প্রজাবর্গের চিত্তে ভয় ও ভক্তির উদ্রেক করাই উহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ফ্রান্‌সিস্‌ নিজকার্য্যের অবহেলা করিয়া ঐ সমারোহ স্বয়ং দেখিতে যান নাই এবং নিজ অনুচরবর্গকেও উহা দেখিতে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি নিজেদের মধ্যে একজনের দ্বারা রাজাকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে এই সমুদয় আড়ম্বরপূর্ণ পার্থিব সমারোহাদি অতীব ক্ষণস্থায়ী কিছুকাল পরে ইহার আর কোন নিদর্শনই থাকিবে না। সাধারণের মনে কিন্তু কিছুকাল পরে এইরূপ ধারণা হয় যে রাজ্যাভিষেকের সময় ফ্র্যান্‌সিস্‌ ঐ পত্রে রাজাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি শীঘ্রই কোন কারণে পোপের দ্বারা দণ্ডিত হইবেন। সে যাহাই হউক, এই ঘটনায় ফ্র্যান্‌সিসের ঐরূপ মহা তেজস্বিতার পরিচয় পাইয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়াছিল। ফ্র্যান্সিস্‌ এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু করিয়াছিলেন সে সমুদয় অপেক্ষা এই ঘটনায় সাধারণে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা লাভ করিবার পক্ষে বিশেষ সহায্য পাইয়াছিল। কারণ, সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, সাধারণ লোকে মানব হৃদয়ের সূক্ষ্ম ও সমুন্নত ভাবগুলি সকল সময় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না; কিন্তু রাজশক্তি অথবা অন্য কোন শক্তির সম্মুখে, ন্যায় বা

অন্যায় পথাবলম্বনে কেহ নিজ বীর্য্য ও তেজস্বিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে দেখিতে পাইবামাত্র তাহারা তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে থাকে। তাহারা এই ঘটনায় বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল যে ফ্র্যান্‌সিস্ ধনী, কিম্বা দরিদ্র, শিক্ষিত কিম্বা অশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত কিম্বা সাধারণ লোক সকলের কার্য্যকলাপই সমভাবে বিচার করিয়া দেখিতেন এবং চরিত্রের উৎকর্ষাপকর্ষতা দেখিয়াই তিনি অপরের প্রতি সম্মানাদি দেখাইতেন। পূর্ব্বোক্ত জীর্ণ কুটীরখানিতে ফ্র্যান্সিস্ ও তাঁহার অনুচরবর্গ কত কাল বাস করিয়াছিলেন তাহা ঠিক জানিতে পারা যায় না। তবে অনুমান হয় ১২১০ খৃঃ অব্দের শেষ কয় মাস এবং ১২১১ খৃঃ অব্দের প্রথম কয় মাস ইঁহারা তথায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই কয় মাস ইঁহারা নিকটবর্ত্তী সহর ও গ্রামগুলিতেই ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। কুটীরখানিতে বাস করিবার সময় এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহাতে ফ্র্যান্‌সিস্ ও তদনুচরবর্গের মধ্যে যে কতদূর আন্তরিক ভালবাসা ছিল তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

উহাদের মধ্যে দুইটী সামান্য দৃষ্টান্তমাত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আহারাদি সম্বন্ধে ইঁহারা অতি কঠোর নিয়ম পালন করিতেন। একদিন রাত্রে সকলে নিদ্রা যাইতেছেন এমন সময় ফ্র্যান্‌সিসের বোধ হইল তাঁহাদের মধ্যে একজন যেন কাঁদিতেছেন। ফ্র্যান্সিস তৎক্ষণাৎ উঠিলেন এবং অতিরিক্ত অল্পাহারের জন্য ক্ষুধায় কাতর হইয়া তিনি ঐরূপ করিতেছেন বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া অন্যত্র লইয়া যাইয়া সামান্য খাদ্য যাহা সঞ্চিত ছিল তাহা বাহির করিলেন এবং নিজে অগ্রে না খাইলে পাছে তিনি খাইতে কুণ্ঠিত হন এই আশঙ্কায় তাঁহার সহিত ঐ খাদ্য খাইতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে এইরূপ অতিরিক্ত কঠোরতা করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

ফ্র্যান্‌সিস অনেক সময় অপরের মনের ভাব জানিতে পারিতেন। একদিন একজন পীড়িত শিষ্যকে কিছু আঙ্গুর খাওয়াইবার জন্য তাঁহার হাত ধরিয়া একটী দ্রাক্ষাক্ষেত্রে লইয়া গেলেন এবং তথায় এক থোলো সুন্দর দ্রাক্ষাফল পাড়িয়া তাঁহার হাতে দিয়া তাঁহার হাত হইতেই একটী একটী করিয়া দ্রাক্ষাফল খাইতে লাগিলেন। বলিতে গেলে ঘটনাটী কিছুই নহে। কিন্তু এই সামান্য ঘটনায় সন্ন্যাসীটী তাঁহার প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন

যে পরে একথা যখনই বলিতেন তখনই তাঁহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিত।

ফ্র্যান্সিস্ ও তদনুচরবর্গ অনেক কষ্ট নীরবে সহ্য করিতেন। এ্যাসিসি নগরের সমতলক্ষেত্রের যে স্থানে ইহাঁরা বাস করিতেন বর্ষার সময় বন্যার জলে সে স্থানটী প্রতিবৎসর ডুবিয়া যাওয়ায় সে সময় ইহাঁদিগকে পূর্ব্বোক্ত জীর্ণ কুটীরখানি মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হইত। সে সময় নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্র হইতে সামান্য শাক পাতা সংগ্রহ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করা ভিন্ন ইহাঁদের আর অন্য উপায় থাকিত না। কুটীর খানিও আবার এত সঙ্কীর্ণ পরিসর ছিল যে যখন তথায় তাহাঁরা সকলে আসিয়া মিলিত হইতেন তখন তাহাঁদের স্বচ্ছন্দে থাকিবার সঙ্কুলান হইত না। ঐরূপ সময়ে আশ্রমের মধ্যস্থিত একটী স্তম্ভের গাত্রদেশে ফ্র্যান্সিস্ প্রত্যেক সন্ন্যাসীর নাম এবং তাহাঁর স্থান নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়া দিতেন। কিন্তু ঐ প্রকার অসুবিধাসকলের জন্য তাহাঁদের আনন্দের কোনদিন ব্যাঘাত ঘটিত না। ফ্রান্সিসের চিত্ত এইকালে অতিশয় প্রসন্ন ছিল। কোনরূপ দুশ্চিন্তা আসিয়া তাহাঁর হৃদয় এপর্য্যন্ত সমাচ্ছন্ন করিতে পারে নাই এবং নিজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি কখন অনাদর প্রদর্শন করিতেন না। যতই দিন যাইতে লাগিল মানব জাতির প্রতি তাহাঁর যে মহান্ কর্ত্তব্য আছে সে সম্বন্ধে তাহাঁর ধারণা ক্রমশঃ ততই দৃঢ় হইতে লাগিল। সেজন্য তিনি নিজ প্রদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদিতেও যোগদান করিতেন। তিনি স্বয়ং সরলভাবে ও সদুদ্দেশ্যে ঐ সকল বিষয়ে যোগদান করিলেও নির্ব্বোধ, অহঙ্কারী ও অলস লোকদের দ্বারা প্রকৃত সাধু ও সমুন্নত হৃদয়ের ভাবগুলি কর্ম্মক্ষেত্রে কতই যে বাধা পাইতে পারে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। তাহাঁর হৃদয়ে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল; অণুমাত্র সন্দেহও সে বিশ্বাসকে কখন কলুষিত করিতে পারিত না। লোকে যখন শুনিল তাঁহার সঙ্ঘের নিয়মাবলী পোপ অনুমোদন করিয়াছেন তখন তাহারা বিস্মিত হইল এবং সকলেই অতিশয় আগ্রহের সহিত তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আসিতে লাগিল। পুরোহিতেরা, কোনরূপ বিঘ্ন উৎপাদন করা দূরে থাকুক বরং তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন এবং বক্তৃতা দিবার জন্য সেণ্ট জর্জ্জ উপাসনা মন্দিরটী তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য এত অধিক লোকের সমাবেশ হইতে লাগিল যে ঐ মন্দিরটীতে

তাহাদের সকলের স্থান আর সংকুলান হইল না! সেজন্য এ্যাসিসি নগরের প্রধান উপাসনা মন্দিরটী ঐ উদ্দেশ্যে খুলিয়া দিতে হইয়াছিল। উপদেশ দিবার সময় ফ্র্যান্সিস্ যে বিশেষ কোন নূতন কথা বলিতেন তাহা নহে। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস অটল ও অচল ছিল বলিয়া তাঁহার উপদেশাবলী শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অনেকেরই হৃদয়ের অন্তস্তল অবধি স্পর্শ করিত। নিজের বিদ্যা ও বুদ্ধির পরিচয় দিবার জন্য তিনি বক্তৃতাদি দিতেন না। তাঁহার ভিতরে যে ঐশী শক্তির বিকাশ হইয়াছিল সেই শক্তির দ্বারা অপরকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিবার জন্য কে যেন তাঁহার দ্বারা এই ভাবে কার্য্য করাইয়া লইতেছিলেন! যুদ্ধ বিগ্রহাদির বিভীষিকা,জনসাধারণের পাপানুষ্ঠান, বড়লোকদের চরিত্রহীনতা, পুরোহিতদিগের অতৃপ্ত অর্থপিপাসা ও স্মরণাতীত কাল হইতে দীন দরিদ্র লোকদের প্রতি অনাদর প্রদর্শন প্রভৃতি বিষয়সকল সম্বন্ধে যখন তিনি বক্তৃতা দিতেন তখন শ্রোতা মাত্রেই অতিশয় বিচলিত হইয়া নিজ নিজ অপরাধ অন্তরে অন্তরে অনুভব করিত। নানা কারণে দেশমধ্যে ইতিপূর্ব্বেই অশান্তি বিরাজ করিতেছিল। তদুপরি ফ্র্যান্সিসের ঐরূপ আবেগময়ী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সাধারণ লোকে এক প্রকার উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। এ্যাসিসি নগরের প্রধান উপাসনা মন্দিরটীতে বহু সংখ্যক লোক সমবেত হইলে ফ্র্যান্সিস্ যখন নির্ভয়চিত্তে বক্তৃতা করিতেন তখন উহা শ্রবণ করিয়া সকলেই এক অলৌকিক শক্তি প্রভাবে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পড়িত এবং তাহাদের মনে হইত যেন ইনিই একাধারে তাহাদের প্রকৃত হিতৈষী,সুহৃদ্,অধিনেতা ও অত্যাচারকারিগণের দণ্ডবিধাতা! মনের যে সকল চিন্তার অস্তিত্ব তাহারা নিজের নিকটেও স্বীকার করিতে ভয় পাইত সেই সকল বিষয় তিনি সর্ব্বসমক্ষে উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করিয়া বলিতেন। এবং ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ নির্ব্বিশেষে সকলকেই অনুষ্ঠিত পাপ কর্ম্মের জন্য অনুতাপ করিতে ও পরস্পরকে ভালবাসিতে শিক্ষা দিতেন। এই সকল কথা তিনি প্রকৃত ভাবের সহিত বলিতেন বলিয়া সকলেই উহার শক্তি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিত। তাঁহার চরিত্র ও কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া সকলের মনে সাক্ষাৎ ঈশার অনুচরগণের কথা উদয় হইতে লাগিল। কারণ তিনি তাঁহাদেরই ন্যায় নির্ভীক চিত্ত ও কোমলপ্রাণ ছিলেন এবং তাঁহাদেরই ন্যায় জনসাধারণের ন্যায়বিরুদ্ধ কর্ম্মের প্রকাশ্যে নিন্দা করিতেন। লোকের মনে হইতে লাগিল,

ঈশা ও তদনুচরবর্গের আবির্ভাবের সময় পাপাচরণের জন্য ইস্‌রেল্‌বাসিগণের হৃদয়ে যেরূপ তীব্র অনুতাপের উদয় হইয়াছিল, এ্যাসিসি বাসিগণের বুঝিবা এখন সেইরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়। কারণ তাঁহার উপদেশ ও উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতার এমনই অদ্ভুত শক্তি ছিল যে তৎপ্রভাবে সকলেই নিজ নিজ ভবিষ্যৎ জীবনে ঐ উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিতে উৎসুক হইয়া উঠিত। কুটীরবাসী তাঁহার অনুচরবর্গ নিত্য এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া অসীম উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিতেন এবং রাত্রিকালে তাঁহাদের মনে হইত যেন তাঁহারা দেখিতেছেন যে তাঁহাদের গুরুদেব অগ্নিতুল্য সমুজ্জল রথে চড়িয়া স্বর্গারোহণ করিতেছেন।

ফ্র্যান্‌সিসের বক্তৃতায় যে লোকে এতদূর আকৃষ্ট হইত তাহার কারণ ছিল। তাঁহার সমসাময়িক বক্তারা সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়া এবং ভাষা বৈচিত্র্য ও নিজ পাণ্ডিত্য দেখাইয়াই শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদের সে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া লোকে হৃদয়ে শান্তি কিম্বা আনন্দ অনুভব করিতে পারিত না। কিন্তু ফ্র্যান্‌সিস্‌ যখন বক্তৃতা দিতেন তাহা শ্রোতৃবর্গের অধ্যাত্মিক উন্নতি ভিন্ন অন্য কোন বিষয়েই তাঁহার দৃষ্টি থাকিত না। সেজন্য তাঁহার বক্তব্য বিষয় তিনি যেমন পরিষ্কাররূপে বুঝিতেন সেইরূপ অপরকেও সরল ভাষায় পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতেন এবং দৈনন্দিন জীবনের নিত্য কর্ত্তব্য সকলের সম্পাদনে যাহাতে তাহারা উন্নতি লাভ করিতে পারে তদ্বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য সর্ব্বদা স্থির থাকিত। আধ্যাত্মিক উন্নতি ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধে তাঁহার খুব স্পষ্ট ধারণাই ছিল। তিনি হাতে হাতে ঐ উন্নতির প্রমাণ চাহিতেন। তিনি বলিতেন যাহারা যথার্থই ঈদৃশ উন্নতিলাভ করিতে অভিলাষী তাহাদিগকে এই মুহূর্ত্তে অন্যায়রূপে উপার্জ্জিত অর্থ ত্যাগ করিতে হইবে এবং যদি কাহারও সহিত শত্রুতা থাকে তাহা হইলে তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে হইবে।

এ্যাসিসি নগরে এই সময়ে উচ্চ ও নিম্নপদবীস্থ লোকদের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল। সাধারণ লোকেরা সামাজিক ও শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে নিত্য নূতন নূতন শক্তি চাহিতেছিল কিন্তু উচ্চ পদবীস্থ লোকেরা যখন বুঝিতেন যে না দিলে আর উপায়ান্তর নাই, মহা বিপদের সম্ভাবনা, তখনই কেবল তাহাদিগকে ঐ সকল বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা প্রদানে সম্মত

হইতেছিলেন। ফ্র্যান্‌সিস্‌ মধ্যস্থ হইয়া তাহাদের এই বিবাদ মিটাইয়া দেন এবং উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করেন। এইরূপে ফ্র্যান্‌সিসের সাহায্যে বহুকাল পরে পুনরায় দেশমধ্যে শান্তি স্থাপন হইয়াছিল।

ফ্র্যান্‌সিস্‌ প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসী সঙ্ঘের এপর্য্যন্ত নামকরণ হয় নাই। একদিন কোন লোক তাঁহার সম্মুখে সঙ্ঘের নিয়মাবলী পাঠ করিতেছিলেন। পাঠ করিবার সময় 'saint minores' এই কথাটী শ্রবণ করিয়া তিনি আপন সঙ্ঘের 'order of the Brothers minor' এই নাম রাখিলেন। এই সময় হইতেই তিনি মহর্ষি (Saint) নামে অভিহিত হ'ন।

শ্রীহরিদাস দত্ত।

ভারতের সাধনা।

"প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা ভাব আছে; বাইরের মানুষটা সেই ভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র,—ভাষামাত্র। সেইরূপ প্রত্যেক জাতের একটা জাতীয় ভাব আছে। এই ভাব জগতের কার্য্য করছে, সংসারের স্থিতির জন্য আবশ্যক। যে দিন সে আবশ্যকতাটুকু চলে যাবে, সেদিন সে জাত বা ব্যক্তির নাশ হবে। আমরা ভারতবাসী যে এত দুঃখ, দারিদ্র্য, ঘরের বাইরে উৎপাত সয়ে বেঁচে আছি, তার মানে, আমাদের একটা জাতীয় ভাব আছে, সেটা জগতের জন্য এখনও আবশ্যক।'

"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য"—স্বামী বিবেকানন্দ।

(১) প্রাচীন ভারতে নেশন প্রতিষ্ঠা।

পাশ্চাত্যে "নেশন" কথাটার ভারি প্রচলন, কিন্তু শব্দটার ঠিক বাঙ্গালা অনুবাদ হয় বলিয়া মনে হয় না, তার কারণও আছে। অথচ প্রসঙ্গের সূত্রপাতেই প্রশ্ন উঠিতেছে যে ভারতে কখনও নেশন ছিল কি না, বা হইতে পারে কি না।

পাশ্চাত্যে যেখানে নেশন গড়িয়া উঠিয়াছে, সেখানে দেখিতে পাই, দীর্ঘকাল একত্র বসবাস করিবার পর একটা লোকসমষ্টি ঐ নেশন সংজ্ঞা পাইয়াছে। নানা ঘটনাবিপর্য্যয়ের নাড়াচাড়ায়, ভাষা, ভাব, ধর্ম্ম প্রভৃতির সাম্য ও বৈষম্যের ঘাতপ্রতিঘাতে, একটা লোকসমষ্টি অনেক কাল

পরে নেশনে পরিণত হয়। কিন্তু নেশনপরিণতি যখন একবার ঘটিয়াছে, তখন আর পূর্ব্ব অবলম্বন ও উপকরণগুলি অপরিহার্য্য বলিয়া গণ্য হয় না। গর্ভাশয়ে যে সমস্ত অবলম্বন শিশুজীবনের পক্ষে অপরিহার্য্য, ভূমিষ্ঠ হইবার পর সেগুলি আর অপরিহার্য্য নহে ; সেইরূপ যে সকল ঐক্যসূত্রের অবলম্বনে একটী লোকসমষ্টির মধ্যে "নেশনত্বের" সঞ্চার হয়, নেশন একবার গড়িয়া উঠিলে সে সমস্ত ঐক্যসূত্র আর অপরিহার্য্য নহে। পাশ্চাত্যে অনেকস্থলে ভাষা, ধর্ম্ম ও জাতির বৈচিত্র্যসত্ত্বেও অপ্রতিহত-ভাবে নেশনের উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে।

সেইজন্য আরও সূক্ষ্মভাবে আধুনিক নেশনগুলিকে পরীক্ষা করিলে তিনটী মূল লক্ষণ পাওয়া যায়। প্রধান লক্ষণ এই যে প্রত্যেক পরিণত নেশনের একটী সার্ব্বজনীন ও সর্ব্বব্যাপক লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট থাকে বা নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিতেছে,—ইংরাজীতে যাহাকে বলে Immanent End। দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে নেশনের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ ও রীতিনীতিতে, অর্থাৎ সর্ব্ববিধ সাধনায় ঐ লক্ষ্যই আশু না হউক চরম সাধ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে। যে পরিমাণে যে নেশন তদনুষ্ঠেয় সর্ব্ব কর্ম্মের মধ্যে স্বীয় লক্ষ্যের প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য্য, সেই পরিমাণে সে দৃঢ়-সম্বদ্ধ ও সুপরিপুষ্ট। তৃতীয়তঃ এই প্রতিষ্ঠাকে সুবিহিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য নেশন একটী কেন্দ্রশক্তি স্বীকার করে, সাধারণতঃ নেশনের লক্ষ্য যাহার বা যাহাদের উপলব্ধ, সে বা তাহারাই ঐ কেন্দ্রশক্তির প্রয়োজক। অতএব কোন্ লোকসমষ্টি নেশনে পরিণত তাহা বুঝিতে হইলে, তিনটী লক্ষণ প্রয়োগ করিয়া দেখিতে হইবে,—যথা, লক্ষ্যৈকনির্দ্দেশ, সর্ব্বসাধনায় লক্ষ্যৈকসাধ্যত্ব এবং সাধ্যসাধনার যোগস্থাপনে এক কেন্দ্রশক্তির নিয়ন্তৃত্ব।

পাশ্চাত্য নেশনসমূহ একই লক্ষ্য অবলম্বনে গড়িয়া উঠিয়াছে ; এককথায় তাহাদের সে লক্ষ্য—ঐহিক প্রতিপত্তি। তবে উহাদের মধ্যে পরস্পরে একটু বিশেষত্বও রহিয়াছে। সেটা এই যে এক একটা নেশন এক একটা বিশেষ সূত্রে স্বকর্তৃত্বের ভাবটী অপেক্ষাকৃত সহজে বুঝিতে পারে ; যেমন, ইংরাজ নেশন আয়ব্যয়ের অধিকারসূত্রে স্বকর্তৃত্ব সহজে বুঝে। যে রূপ কর্তৃত্বসূত্রেই হউক, ঐহিক প্রতিপত্তিলাভই পাশ্চাত্য নেশন-সমূহের চরম উদ্দেশ্য।

যার যেরূপ লক্ষ্য সেইরূপ লক্ষ্য যে ব্যক্তিতে সুসিদ্ধ, তার প্রভাবও সেই

ব্যক্তিতে স্বভাবতঃ আকৃষ্ট। প্রাচীনকালে নেশন গঠনের সূচনায়, ঐহিক প্রতিপত্তিই পাশ্চাত্যে লক্ষ্যরূপে আশ্রিত হইয়াছিল, তাই ঐ লক্ষ্যসিদ্ধির প্রতীকরূপে রাজাই নেশন-গঠনে নিয়ন্তার আসন পাইয়া আসিয়াছেন। প্লেটোর "রিপাব্লিক" বা দেশে জ্ঞানীর শাসনতন্ত্রতা ইউরোপের একটা স্বপ্নমাত্র; প্রাচীন খৃষ্টানদের ধর্ম্মমণ্ডলী ইউরোপের জমিতে টিকিল না, একটা প্রভাবমাত্র রাখিয়া নেপথ্যে সরিয়া পড়িল। ঐহিক প্রতিপত্তি যেখানে লক্ষ্য, রাজশক্তির নিয়ন্তৃত্ব সেখানে অনিবার্য্য এবং রাজশক্তি যেখানে নিয়ন্ত্রী, রাজনীতির উপরই সেখানে সকল ব্যবস্থার ভার সমর্পিত হইবেই।

তবে রাজনীতি রাজশক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন পাশ্চাত্য দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকারে গড়িয়া তুলিয়াছে। রাজা ঐহিক প্রতিপত্তির আদর্শস্থানীয় বটে, কিন্তু যখন সমগ্র লোকসমষ্টি সেই প্রতিপত্তির ভিখারী তখন রাজাকে প্রজামধ্যে উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল সমৃদ্ধির বণ্টন করিতে হয়। কিন্তু সম্পদের নেশা "চমৎকারা", স্বার্থপরতা উহার অঙ্গীভূত। এই জন্য স্বার্থপর রাজার সহিত প্রজার বিরোধকুজ্ঝটিকায় পাশ্চাত্য ঐতিহ্যগগন সর্ব্বকালেই আচ্ছন্ন। রাজনীতি এই বিরোধের সামঞ্জস্য ঘটাইয়া এক এক দেশে এক এক রকম শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্যে সর্ব্বত্র রাজশক্তিই কেন্দ্রশক্তি, তবে উহা সম্প্রতি প্রজাকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত লক্ষ্যাভিজ্ঞ নেতৃগণের মধ্যে অবস্থিত; এবং রাজপদ কোথাও বা প্রজাকর্ত্তৃক অপাকৃত, কোথাও বা রাজশক্তির প্রাচীন নিদর্শনরূপে উচ্চাসনপ্রদানে স্বীকৃত।

ঐহিক প্রতিপত্তিকে লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করায় পাশ্চাত্য নেশনসমূহে রাজনীতির প্রাধান্য অনিবার্য্য হইয়াছে। যদি বল, নেশন মাত্রেরই ঐ এক লক্ষ্য স্বীকার করা চাই, নচেৎ নেশন বলিয়া সে গণ্য হইবে না, তবে এই খানেই আমাদের পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল, অর্থাৎ এই খানেই স্বীকার করিতে হয় যে ভারতে কখন নেশন ছিলও না, হইবেও না। কিন্তু যখন দেখিতেছি নেশনের মূল লক্ষণে লক্ষিত হইয়া প্রাচীন কালেও একটা লোকসমষ্টি মানবেতিহাসে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রাখিয়াছে, তখন একটা সংকীর্ণ অর্থে নেশন শব্দকে আবদ্ধ করা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক। পাশ্চাত্য দেশে লক্ষ্যবিশেষের সাধনে সম্প্রতি যেমন এক একটা বিশাল সাধকসমবায় গড়িয়া উঠিয়াছে, প্রাচীন ভারতেও সেইরূপ একটা সমবায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। লক্ষ্যৈক-

নিষ্ঠতা উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে বিদ্যমান, কেবল লক্ষ্যের নির্ব্বাচনেই তদুভয়ের পার্থক্য। লক্ষ্যের ঐরূপ নির্ব্বাচনে লোকসমষ্টির স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করিয়া, একটী মাত্র লক্ষ্যের সঙ্গেই যদি নেশনত্ব সংলগ্ন করিয়া দাও, তবে বলিব ভারতে নেশন কখনও গড়িয়া উঠে নাই, কিন্তু তদনুরূপ সাধকসমবায় নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তবে "ন্যাসান্যাল" শব্দটী আজকাল নাকি "ভারতীয়" অর্থে অধিকাংশ স্থলেই গৃহীত হইয়াছে, সেই জন্য আমাদের বুঝা আবশ্যক কি অর্থে এদেশে নেশন শব্দের প্রয়োগ করা চলে।

নেশনের তিনটী প্রধান বা মৌলিক লক্ষণ প্রাচীন ভারতেও অভিব্যক্ত হইয়াছিল। একটী লক্ষ্যকে অবলম্বন করিয়া এদেশেও বিশাল লোকসমষ্টি গড়িয়া উঠিয়াছিল; তাহাদের সর্ব্ববিধ ক্রিয়াকলাপে, সর্ব্ববিধ সাধনায় একই লক্ষ্য অনুস্যূত থাকিয়া চরম সাধ্যরূপে গণ্য হইয়াছিল এবং সমস্ত সাধনাকে সেই চরম সাধ্যের সহিত সংযুক্ত করিবার জন্য নিয়ন্তৃশক্তিও সুনির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু ভারতে নেশন গড়িবার ছাঁচটী পাশ্চাত্যের ছাঁচ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিলে ভারতে যাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে নেশন না বলিয়া থাকিতে পার না, কিন্তু জগতে ঐরূপ নেশন আর কোথাও গঠিত হয় নাই।

তাহার কারণও যথেষ্ট রহিয়াছে। প্রথমতঃ লক্ষ্যনির্দ্দেশে প্রবল পার্থক্য। পাশ্চাত্যের লক্ষ্য ঐহিক প্রতিপত্তি, ভারতের লক্ষ্য বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। পাশ্চাত্যে ঐশ্বর্য্যের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণই পথনির্ণায়ক, ভারতে বেদ বা পরম জ্ঞানই পথনির্ণায়ক, সেই জন্য পাশ্চাত্যে নেশন-লক্ষ্য আলোচনার মধ্য দিয়া ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া আসিয়াছে, ভারতে নেশন-লক্ষ্য প্রথমেই, সেই বৈদিক যুগেই, সুনির্ণীত। পাশ্চাত্যে সুচিরার্জ্জিত স্থূল অভিজ্ঞতার উপর নেশনের প্রতিষ্ঠা, ভারতে সমাধিলব্ধ সত্যের উপর নেশনের প্রতিষ্ঠা।

পাশ্চাত্য ও ভারতের মধ্যে এই নেশন-লক্ষ্যের পার্থক্যই আর সমস্ত পার্থক্যের মূল ভিত্তি। এই পার্থক্য যিনি বুঝিয়াছেন, আর সমস্ত রকম পার্থক্য তিনি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ। আমরা দেখিয়াছি পাশ্চাত্য নেশনে রাজনীতি কেন চরমমীমাংসক, রাজনীতিক্ষেত্রেই কেন নেশনের নিয়ন্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত, প্রাচীন ভারতে চরম মীমাংসার ভার রাজনীতি গ্রহণ করে নাই,—রাজশক্তি ভারতীয় নেশনের নিয়ন্তৃপদ পায় নাই।

কারণ সহজেই অনুমেয়; লক্ষ্যবিৎই লক্ষ্যসাধনে নিয়ন্তা হন, অর্থাৎ লক্ষ্য যাঁহাতে সুসিদ্ধ, কর্ম্মক্ষেত্রে লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠায় তিনিই নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ইউরোপে রাজশক্তিতেই পাশ্চাত্য নেশন-লক্ষ্য সর্ব্বাপেক্ষা সুসিদ্ধ, তাই রাজশক্তিই স্বভাবতঃ নিয়ন্তৃপদ পাইয়াছেন। ভারতের লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞে সুসিদ্ধ, তাই ব্রহ্মজ্ঞই ভারতীয় নেশনের নেতা ও নিয়ন্তা। রাজার কর্ম্মক্ষেত্রে যাহা অবলম্বন তাহাই রাজনীতি, সেই রাজনীতিই পাশ্চাত্যে চরম মীমাংসক। ব্রহ্মজ্ঞ কর্ম্মক্ষেত্রে যাহা আশ্রয় করেন, তাহা পরম জ্ঞান বা বেদ, সেই বেদই ভারতে মীমাংসক।

এই জন্য আমরা বলিতে বাধ্য যে পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমাদের দেশে যাঁহারা বর্ত্তমান যুগে রাজনীতিকে প্রধান সাধনক্ষেত্র বলিয়া ধারণা করিয়াছেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। যাঁহারা মনে করেন রাজনৈতিক সাধনাই আমাদের সকল সমস্যার পূরণ করিবে, পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহ তাঁহাদের এখনও কাটে নাই। পাশ্চাত্য রাজনীতিকে পরিহার করা শুধু এই কারণেই আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য নহে; আরও কারণ আছে, তাহা পরে বিবৃত হইবে।

ভারতীয় নেশনের লক্ষ্য ও নিয়ন্তার পরিচয় পাইলাম। এখন সেই নিয়ন্তা লক্ষ্যকে কর্ম্মে কিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহাই বিবেচ্য *। পূর্ব্বেই বলিয়াছি নেশনের তৃতীয় লক্ষণ; সর্ব্বকর্ম্মে সাধ্য-সাধনার পারম্পর্য্য ও অর্থাৎ মনুষ্যোচিত সর্ব্ববিধ কর্ম্ম বা সাধনায় নেশনের লক্ষ্যকেই পরম-সাধ্যরূপে স্বীকার করা। পাশ্চাত্য নেশনসমূহে এই তৃতীয় লক্ষণটী ক্রমশঃ অধিকতর পরিস্ফুট হইতেছে। সমস্ত কর্ম্মবিভাগই ঐহিক প্রতিপত্তিরূপ নেশন-লক্ষ্যের পরিপোষকতায় নিয়োজিত হইতেছে। জ্ঞানই বল, বিজ্ঞানই বল, ধর্ম্ম-সাধনই বল,—যে সাধনা যে পরিমাণে নেশন-লক্ষ্যের পরিপোষক, সেই পরিমাণে উহা সমগ্র নেশনকর্ত্তৃক সমাদৃত ও আশ্রিত। পাশ্চাত্যে অধুনা সমস্ত তত্ত্ব ও সমস্ত ব্যবহারকে নেশনের কাজে লাগাইবার স্পষ্ট প্রয়াস বিদ্যমান। সেখানে সর্ব্ববিধ সাধনার গতি ঐহিক প্রতিপত্তির দিকে; এই পতিনির্ণয়ের মূলসূত্র ভোগাধিকার বা right অর্থাৎ ভোগাধিকারের তারতম্যে ঐহিক প্রতিপত্তির হিসাব হয়। ঐহিক প্রতিপত্তিই মুখ্য উদ্দেশ্য, ভোগাধিকারের বৃদ্ধি উহার গৌণ

* গত পৌষ মাসের উদ্বোধনে "স্ত্রীশিক্ষাসমস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গের আলোচনা করা হইয়াছে। সেই আলোচনার ফলেই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা ও রচনা।

সোপানস্বরূপ। কিন্তু অধিকারসামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া ঐ বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হয়, নতুবা সর্ব্বত্রই তুমুল বিরোধ বাঁধিয়া যায়; ধর্ম্ম ও চারিত্রনীতির দ্বারা পাশ্চাত্য নেশন ঐ সামঞ্জস্যরক্ষার উদ্দেশ্য সংসাধিত করিয়া লয়। রজঃপ্রধান পাশ্চাত্যের মূলমন্ত্র,—বিরোধের সামঞ্জস্য, এই মন্ত্রসহায়ে সে লক্ষ্যের প্রতি অগ্রসর হয়। প্রথমেই ভোগের অভিমুখে গতি, দ্বিতীয়তঃ ভোগাধিকার লইয়া বিরোধ, তৃতীয়তঃ সেই বিরোধের একটা সামঞ্জস্য; তার পর আবার নূতন ভোগের প্রতি গতি হইতে আরম্ভ ও আবার একটা সামঞ্জস্যে স্থিতি। লক্ষ্যাভিমুখে উন্নতির ইহাই পাশ্চাত্য প্রণালী। ইহা ব্যষ্টিতে যেমন প্রযোজ্য, সমষ্টিতেও তেমনি, নেশনের অভ্যন্তরে যেমন কার্য্যকরী বাহিরেও তেমনি।

পাশ্চাত্যে যেমন ভোগাধিকার বা স্বাধিকারের বৃদ্ধিই চরমলক্ষ্যের প্রতি গতিনির্ণায়ক, ভারতে তেমনই স্বধর্ম্মের বৃদ্ধিই ঐ গতি নির্ণয় করে। পাশ্চাত্যে যার যত স্বাধিকার বা rights বেশী সে তত লক্ষ্যের সন্নিকট, ভারতে যার যত স্বধর্ম্ম বেশী সে তত লক্ষ্যের সন্নিকট। অতএব পাশ্চাত্যে অধিকারার্জ্জন এবং প্রাচ্যে ধর্ম্মার্জ্জনই মানুষের নেশন-নির্দ্দিষ্ট আশু লক্ষ্য।

ভারতীয় নেশনে ব্রহ্মজ্ঞ নিয়ন্তা মনুষ্যসুলভ সমস্ত কর্ম্মকে স্বধর্ম্মে পরিণত করিয়াছিলেন। মানুষের সমস্ত কর্ম্ম জড় ও জীবের সহিত তাহার যোগাযোগবিধানে পর্য্যবসিত। এই যোগাযোগকে ব্যবহার বলে। সমস্ত ব্যবহারে জড় ও জীবের সহিত যে আদানপ্রদান, তাহার আদান বা আদায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সর্ব্ব ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলে পাশ্চাত্যের স্বাধিকারভাব পাওয়া যায় এবং প্রদান বা দেয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবহারে প্রবৃত্ত থাকিলে প্রাচ্যের স্বধর্ম্মভাব (duty) পাওয়া যায়। ভারতীয় নেশনের নিয়ন্তৃগণ এই স্বধর্ম্মভাবকে সর্ব্ব ব্যবহারের মূলসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া নেশন গড়িয়াছিলেন, সেই জন্য প্রাচীন সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে স্বধর্ম্মের উল্লেখ বাহুল্য। যেমন আমার স্বাধিকার অর্থে 'আমার কি প্রাপ্য' বুঝায়, তেমনি আমার স্বধর্ম্ম অর্থে 'আমার কি দেয়' বুঝায়; একটী ভোগদৃষ্টি, অপরটী ত্যাগদৃষ্টি। যার যাহা স্বাধিকার যদি সে পায়, তবে পাশ্চাত্য নেশন নির্ব্বিবাদে উন্নতি করে, যার যাহা স্বধর্ম্ম যদি সে করে, তবে ভারতীয় নেশনও নির্ব্বিবাদে উন্নতি করে। ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞ নেতা

এই ত্যাগমূলক স্বধর্ম্মসূত্রকে প্রয়োগ ও অবলম্বন করিয়া সমাজ গড়িয়াছিলেন; ফলে, স্বধর্ম্মপালনে প্রতিপদে পরমার্থরূপ চরম লক্ষ্যের সাধনাও সাধিত হইত। স্বধর্ম্ম-পালনজনিত ত্যাগে চিত্তশুদ্ধি লাভ হইত, এবং লক্ষ্যসিদ্ধির অধিকার বা সামর্থ্য জন্মিত। ত্যাগ অর্থে হেয়াংশের বর্জ্জন ও উত্তমাংশের গ্রহণ; স্বধর্ম্ম পালনের দ্বারা প্রতিপদে অধম আমিত্বের বর্জ্জন ও উত্তম আমিত্বের গ্রহণ নিষ্পন্ন হইত, এবং ক্রমশঃ মহৎ হইতে মহত্তর আমিত্বের আরোপ মানুষকে ব্রহ্মভাবে পৌঁছাইয়া দিত। পাশ্চাত্যের অধিকারসামঞ্জস্যের মধ্যেও একভাবে আমিত্বের প্রসার হয় বটে, কিন্তু সে আমিত্বে ভোগবীজ বা বাসনা নিহিত থাকায় সোপানপরম্পরায় আমিত্ব বৃহৎ বা মহাশক্তিসম্পন্ন হয় বটে, কিন্তু মহৎ বা মহাসত্ত্বসম্পন্ন হয় না। আমাদের পুরাণে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেখানে তীব্রতপস্যাসম্পন্ন সকাম সাধক ত্রিলোকের উপরও ভোগাধিকার স্থাপন করিয়াছে; রজোভাবের এই প্রবল অথচ সূক্ষ্ম উৎকর্ষকে শাস্ত্র আসুরিক বলিয়াছেন, উহা মায়াপ্রবাহে বৃহৎ বুদ্বুদের মত একদিন অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া যায়। পাশ্চাত্য সভ্যতার বরপুত্র নেপোলিয়নের জীবনলীলা একদিন বুদ্বুদের মত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ত্যাগে যে মহৎ আমিত্বের সঞ্চার হয়, উহা সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত; সত্ত্ব ব্রহ্মপ্রকাশক।

পাশ্চাত্য ও ভারতীয় নেশন-নিয়ন্তৃগণ কিরূপ মূলসূত্রের প্রয়োগে সর্ব্বকর্ম্মের মধ্যে নেশন-লক্ষ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা দেখিলাম। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভারতীয় নেশন বলিতে কি বুঝায়, তাহাই আলোচ্য, সেইজন্য সংক্ষেপে লক্ষণত্রিতয়ের বিচার করা হইয়াছে; প্রাসঙ্গিকভাবে বক্তব্যবিষয় ও আপত্তি অনেক উঠিতে পারে; এ প্রবন্ধে সে সমস্ত আলোচনা করা হইল না, ভবিষ্যতে হইবে। উপসংহারে কেবল একটী আপত্তির বিচার করিব।

ভারতীয় নেশনের প্রথম লক্ষণ অর্থাৎ লক্ষ্যৈকনির্দ্দেশ সম্বন্ধে একটা আপত্তি হইতে পারে। আপত্তি এই যে বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মত ব্যক্তিগত সাধনারই লক্ষ্য হইতে পারে,—ঐ লক্ষ্যসাধনের জন্য একটা সমাজ বাঁধিবার আবশ্যকতা কিরূপে হয়? বৈদিক ঋষি ব্রহ্মলাভ করিবার পর একটা "নেশন" গড়িবার কার্য্যে কেন হস্তক্ষেপ করিলেন?

প্রশ্নের এককথায় উত্তর—জগদ্ধিতায়। বৈদিক ঋষি দেখিলেন, "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃনৎ স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্"। মানুষ স্বভাবতঃ

বহির্মুখ, ভোগান্বেষা; এই মানুষকে শ্রেয়'র প্রতি চালিত করিবার শুভ-সংকল্প আদিম ঋষি হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে ঋষি বিশ্বমানবের দিকে চাহিয়া নেশন-গঠনে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, বিশ্বের মঙ্গলই ভারতীয় নেশনের মূল অভিপ্রায়। শ্রেয়োকামনায় ঋষির কোনও গণ্ডী ছিলনা, শ্রেয়'র বিতরণেও ভারতীয় নেশনের কোনও গণ্ডী নাই। সেইজন্য বিশদভাবে বলিতে হইলে ভারতীয় নেশনের লক্ষ্য, পরমার্থের অর্জ্জন, অনুশীলন ও প্রচার। সমাজস্রষ্টা ঋষি ব্রহ্মরূপ যে মহারত্ন লাভ করিলেন, বিশ্বমানবের জন্য তৎসংরক্ষণের উপায়ও তিনি উদ্ভাবিত করিলেন, সেই উপায়ই ভারতীয় প্রাচীন সমাজ বা নেশন। এই নেশন বা সমাজের উদ্ভব আর্য ব্রহ্মজ্ঞান অথবা পরমার্থ হইতে, ইহার স্থিতি সেই পরমার্থ লইয়া, এবং ইহার লক্ষ্য সেই পরমার্থের সংরক্ষণ ও পোষণা। এমন একটী নেশন-নির্ম্মাণ ব্যতীত যুগপরম্পরায় ঋষিলব্ধ পরম জ্ঞানের অনুশীলন ও সংরক্ষণের আর কি উপায় হইতে পারে? এই নেশনরূপ যন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় যুগে যুগে ব্রহ্মজ্ঞের অভিব্যক্তি যেমন সম্ভাবিত, ঋষিলব্ধ পরমার্থরত্নের স্থায়িত্বও সেইরূপ সম্ভাবিত। এই সুমহৎ কৌশলের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা ভগবৎ-প্রতিশ্রুতি পাইয়াছি "সম্ভবামি যুগে যুগে।" যথাসম্ভব বিশদভাবে এই কৌশলের পরিচয় দেওয়াই "ভারতের সাধনা" শীর্ষক প্রবন্ধ গুলির উদ্দেশ্য; আশা করি এই পরিচয় লাভে আমাদের বর্ত্তমান সমস্যা-সমূহের মীমাংসায় আমরা সহজেই উপনীত হইব।

অদ্বৈত-প্রসঙ্গ।*

"রূপ ও অরূপ।"

অদ্বৈতের অখণ্ডৈকরস আধ্যাত্মিক সাধনার চরম উপভোগ্য। এই নিত্য রসসম্ভোগে যিনি অধিকারী, সৃষ্টির রসবৈচিত্র্যের মধ্যেও তিনি অদ্বৈতের অনন্তসম্ভোগে সমর্থ; কিন্তু যিনি সেরূপ অধিকারী নহেন, তাহার কথা স্বতন্ত্র। নামরূপের প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে তাহাকে পরমস্থিতির সন্ধান

* বর্ত্তমান সাহিত্যক্ষেত্র হইতে প্রসঙ্গ নির্ব্বাচন করিয়া অদ্বৈততত্ত্বভূমি হইতে উহার আলোচনা করা হইবে বলিয়া প্রবন্ধপর্য্যায়ের নাম "অদ্বৈত প্রসঙ্গ" হইল।

করিতে হইবে; তাহারই জন্য প্রতীকোপাসনা বিহিত। নামরূপবিশিষ্ট প্রতীকের অবলম্বনে, ভক্তির তাদাত্ম্যে হৃদয়মন নিবিষ্ট করিলে নামরূপের অতীত হওয়া যায়, ইহাই বেদবিধানের তাৎপর্য্য। এই বিধানানুসারে যিনি সাধনায় প্রবৃত্ত, পরম চিদৈশ্বর্য্যের জন্য প্রতীকবিশেষের অনন্যাশ্রয় তাহার পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য, কিন্তু যিনি সাধনায় সম্পূর্ণ সিদ্ধ, যিনি অদ্বৈতরস-সম্ভোগে অধিকারী, প্রতীকবিশেষে অনন্যাশ্রয়তা তাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক, তিনি নিখিল রূপের মধ্যে অরূপরস সম্ভোগ করেন। রূপ ছেঁচিয়া তিনি অরূপ পাইয়াছেন, তাঁহার অরূপ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অনিত্যরূপ ও নিত্য অরূপের মধ্যে একটা সাধনসেতু আছে বলিয়াই প্রতিমাপূজক হিন্দু প্রতীক লইয়া সাধন আরম্ভ করে। পাতঞ্জল দর্শন প্রাঞ্জল ও বিশদভাবে এই সাধন সেতুর লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কিন্তু গত পৌষের প্রবাসীতে "রূপ ও অরূপ" শীর্ষক প্রবন্ধলেখকের বিষম চিন্তাবিভ্রাট উপস্থিত। প্রবন্ধারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন যে তত্ত্বদৃষ্টিতে অনিত্য রূপপ্রবাহের মূলে নিত্য অরূপের সন্ধান পাওয়া যায়, ঐ সন্ধান পাওয়ার উদ্দেশ্যেই আধ্যাত্মিক সাধনার অবতারণা। বেশ কথা। তারপর লেখক মহাশয় শিল্প-সাহিত্যের সাধনাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন যে, সে ক্ষেত্রেও স্থূল রূপবৈচিত্র্যকে উপলক্ষ্য করিয়া সূক্ষ্মভাবকেই আমরা সম্ভোগ করি। কিন্তু এই যে দ্বিবিধ সাধনক্ষেত্রের কথা বলা হইল, ইহাদের মধ্যে কি কোনও প্রভেদ নাই? প্রবন্ধলেখক রবীন্দ্র বাবু সে প্রভেদের কথা উল্লেখ করেন নাই।

প্রভেদ এই যে আধ্যাত্মিক সাধনক্ষেত্রে আমরা তত্ত্বদৃষ্টিতে রূপবৈচিত্র্য দেখিয়া তাহার মূলে অরূপ সত্যকে উপলব্ধি করি, কিন্তু শিল্পসাহিত্যের সাধনাক্ষেত্রে আমরা কল্পনাদৃষ্টিতে রূপবৈচিত্র্য দেখিয়া তাহার মূলে বিবিধ সূক্ষ্মভাব বা রসের সম্ভোগ করি। একক্ষেত্রে তত্ত্বদৃষ্টির দ্বারা চরম সত্যের অনুভূতি, আর এক ক্ষেত্রে কল্পনার সাহায্যে সেই সত্যেরই তরঙ্গস্থানীয় নানা রসের অনুভূতি; এই পার্থক্যের মর্য্যাদা উল্লিখিত প্রবন্ধে প্রায়ই লঙ্ঘন করা হইয়াছে।

আর একটী কথা বিস্মৃতির অন্ধ আবরণে ঢাকিয়া প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে। তত্ত্বদৃষ্টি ও কল্পনাদৃষ্টি উভয়ই সাধনলভ্য; উভয়কেই লাভ করিবার জন্য একটা discipline বা সংযম স্বীকার করিতে হয়। সাহিত্য ও শিল্পের

সাধককে বিশেষ পরিশ্রমসহকারে একটা ভাষাশিক্ষা ও টেক্‌নিক্ আয়ত্ত করিতে হয়; সেই সংযমের সময় রূপবৈচিত্র্যে কল্পনার আনাগোনা দেখিতে না পাইলে রবীন্দ্র বাবুর অধীর হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। সেইরূপ সম্যকরূপে তত্ত্বদৃষ্টি লাভ করিবার জন্যও নির্দ্দিষ্ট discipline আছে এবং প্রতীকবিশেষের অবলম্বনে চিত্তৈকাগ্রতাসাধন একটা নির্দ্দিষ্ট discipline; এইরূপ সংযমের অবস্থায় সাধকের নিকট রূপবৈচিত্র্যের মধ্যে তত্ত্বদৃষ্টির প্রয়োগ প্রত্যাশা করা যায় না। তবে তত্ত্বদৃষ্টির প্রযোগ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লেখা তাহার পক্ষেও সব সময়ই সম্ভব। তত্ত্বদৃষ্টি থাকিলে জগৎকে কিভাবে দেখা যায়, তাহারই বিচারে প্রবন্ধ লেখা এক কথা, আর প্রকৃত ভাবে তত্ত্বদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া আর এক কথা। সেইজন্য ইষ্টমূর্ত্তির সেবক হিন্দুকে একটা discipline স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু ইষ্টমূর্ত্তিব্যতীত অন্যান্য দেব-মূর্ত্তিকে ভক্তি করিতে বা তৎসম্বন্ধীয় তত্ত্বালোচনা করিতে তাহার মানা নাই। বিদ্যালয়ের পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও, শিক্ষার্থী অন্যান্য সংগ্রহ পড়িতে পারে; কিন্তু স্কুলের পড়াটা করা চাই। এরূপ একটা ব্যবস্থা, একটা disciplineকে কি বন্ধন বলে?

নামরূপ যে অনিত্য তাহা হিন্দুকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না। যদি কেহ মনে করেন যে রূপের বন্ধনে চিরবন্দী করিবার জন্যই প্রতিমাপূজার ব্যবস্থা, তবে বলিব তিনি হিন্দুর সাধনতত্ত্বে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। রবীন্দ্র বাবুর গোড়ার ভুল এই যে হিন্দুসাধকের উপলক্ষ্যকে তিনি লক্ষ্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, তাই মুক্তির উপায়কে বন্ধন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। মুক্তির অনুমানই যদি মুক্তি পাওয়া হইত, তবে প্রতিমাপূজক হিন্দু, রবীন্দ্র বাবুর কল্যাণে, মূর্ত্তিপূজার বন্ধন পশ্চাতে ফেলিয়া বিচারপ্রবন্ধাদির দ্বারা কেবলই মুক্তির অনুমান করিতে ছুটিত। মুস্কিল এই যে প্রাচীনেরা বড়ই প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন, তাই কতকগুলো জবরদস্ত ডিসিপ্লিন্ সাধকের ঘাড়ে চাপাইয়া গিয়াছেন; সেইজন্য তত্ত্বদৃষ্টি না পাইয়াও তত্ত্বদৃষ্টির দোহাইএ প্রতীকাবলম্বনের বিরোধী হওয়ার পথ আমাদের নাই। দুর্দ্দৈব!!

আধ্যাত্মিক সাধনক্ষেত্রের তত্ত্বদৃষ্টি ও শিল্পসাহিত্যক্ষেত্রের কল্পনাদৃষ্টির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। "রূপ ও অরূপ" প্রবন্ধে এ দুইটীর অলক্ষ্যে আত্মবিনিময় বারম্বার ঘটিয়াছে। তা' ছাড়া সাহিত্যের কল্পনাদৃষ্টিকেও একটা উদ্ভট টানাটানি সহ্য করিতে হইয়াছে। পাঠক, তাহার প্রমাণ দেখুন।

প্রবন্ধের শেষাশেষি রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "বর্ত্তমান কালে আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যখন প্রতিমা পূজার সমর্থন করেন তখন তাঁহারা বলেন প্রতিমা জিনিষটা আর কিছুই নহে, উহা ভাবকে রূপ দেওয়া। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে বৃত্তি শিল্প সাহিত্যের সৃষ্টি করে ইহাও সেই বৃত্তির কাজ। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে কথাটা সত্য নহে। দেব মূর্ত্তিকে উপাসক কখনই সাহিত্য হিসাবে দেখেন না।"

তবে এ কথা কে বলিল যে, 'দেবমূর্ত্তিকে উপাসক সাহিত্য হিসাবে দেখে'? প্রবন্ধলেখক যাহাদের কৈফিয়ৎ লইয়াছেন, "প্রতিমা জিনিসটা" "ভাবকে রূপ দেওয়া"—তাহারাত এই পর্য্যন্ত বলিয়াই খালাস। তারপর "অর্থাৎ" এর জেরটা টানিলেন কে? তাহারাই, না লেখক মহাশয়? পূর্ণচ্ছেদ উল্লঙ্ঘন করিয়াও যদি তাহারাই জের টানিয়া থাকেন, তবে ভুল তাহাদের, নচেৎ বলিতে হয়, লেখক মহাশয় নিজের কথাই নিজে কাটিয়াছেন।

সাধকের যে সমাধির অবস্থায় অরূপের তন্ময়তায় সকল ভেদ ঘুচিয়া যায়, সে অবস্থা হইতে রূপরাজ্যসীমায় অবতরণ করিবার কালে ভাবঘন দেব মূর্ত্তির দর্শন হয়; সৃষ্টি-প্রবাহ যে হিসাবে নিত্য, ঐ সমস্ত রূপও সেই হিসাবে নিত্য,—সাহিত্যিকের মন-গড়া নহে। প্রতীকোপাসনাতত্ত্ব এই রূপ বলে, পরমহংসদেবের নিকটও এইরূপ শুনা গিয়াছে। যদি কোনও আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু বলিয়া থাকেন যে প্রতিমা জিনিসটা ভাবকে রূপ দেওয়া মাত্র, তিনি কি অর্থে ঐরূপ বলিয়াছেন আমরা জানিনা। ভাব শব্দের অর্থ সুনির্দ্দিষ্ট নাই, ভাব অর্থে যদি স্থুল সূক্ষ্মের অতীত অরূপকে বুঝায়, তবে বলা যায় বটে যে 'প্রতিমায়' ভাবকে রূপ দেওয়া হয়। কিন্তু যে কল্পনাবৃত্তি শিল্পসাহিত্যে সূক্ষ্মকে স্থুলরূপ দেয়, সে কল্পনাবৃত্তি প্রতিমালক্ষিত রূপের রচয়িত্রী নহেন।

অতএব প্রবন্ধলেখক রবীন্দ্রবাবু যে বলিয়াছেন, "দেবমূর্ত্তিকে উপাসক কখনই সাহিত্য হিসাবে দেখেন না," সে কথা সত্য। এখানে আমরা একমত। সুতরাং আমরা উভয়েই স্বীকার করিব যে, সাহিত্যে যে কল্পনার লীলা খেলা দেখিতে পাই, মূর্ত্তি পূজায় তাহা নাই, অর্থাৎ মূর্ত্তিপূজায় সে কল্পনার কথাই উত্থাপন করিব না। রবীন্দ্রবাবু কিন্তু ঠিক তাহাই করিয়াছেন; অর্থাৎ সাহিত্যক্ষেত্রের কল্পনাবৃত্তিকে হিন্দুর মূর্ত্তিপূজার ক্ষেত্রে

টানিয়া আনিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে মূর্ত্তিপূজার মস্ত দোষ এই যে, সে ক্ষেত্রে সাহিত্যের ঐ কল্পনাবৃত্তির ভয়ানক অপব্যবহার হয়! যথাঃ—

* * সাহিত্যে (তিনি লিখিতেছেন) "আমরা কল্পনাকে মুক্তি দিবার জন্যেই রূপের সৃষ্টি করি—দেবমূর্ত্তিতে আমরা কল্পনাকে বদ্ধ করিবার জন্যই চেষ্টা করিয়া থাকি। আমরা কল্পনাকে তখনই কল্পনা বলিয়া জানি যখন তাহার প্রবাহ থাকে, যখন তাহা এক হইতে আর একের দিকে চলে, যখন তাহার সীমা কঠিন থাকে না; তখনি কল্পনা আপনার সত্য কাজ করে। সে কাজটি কি? না সত্যের অনন্ত রূপকে নির্দ্দেশ করা। কল্পনা যখন থামিয়া গিয়া কেবলমাত্র একটী রূপের মধ্যে একান্ত ভাবে দেহ ধারণ করে তখন সে আপনার সেই রূপকেই দেখায়, রূপের অতীতকে অনন্ত সত্যকে আর দেখায় না।"

দেবমূর্ত্তিকে পূজা করিবার সময় হিন্দু সাধক কল্পনাকে আশ্রয় করে না, সে আশ্রয় করে বিশ্বাসকে। কল্পনায় ও বিশ্বাসে যে প্রভেদ আছে, তাহা সকলেই জানেন। কল্পনায় আমাদের মনে একটা "যেন" থাকিয়া যায়, বিশ্বাসে উহাকে সরাইয়া দেওয়া হয়। কল্পনায় একটা "যেন" থাকে বলিয়াই, সহজেই "তাহা এক হইতে আর-একের দিকে চলে", "তাহার সীমা কঠিন থাকে না" ইত্যাদি। সাহিত্যশিল্পে যে রসের সন্ধান পাই, কল্পনার দ্বারা আমরা সেখানে তাহাকে বৈচিত্র্যের মধ্যে সম্ভোগ করি। কল্পনার সার্থকতা কে অস্বীকার করিবে?

কিন্তু এই কল্পনাই মূর্ত্তিপূজার ক্ষেত্রে আসিয়া, "থামিয়া গিয়া কেবলমাত্র একটী রূপের মধ্যে একান্তভাবে দেহধারণ করে",—এ একটা নিতান্ত আজগুবি কল্পনা। বরঞ্চ বল যে হিন্দু সাধকের বিশ্বাস সাধনার সময় "একটী রূপের মধ্যে একান্ত ভাবে দেহ ধারণ করে"। প্রকৃত কথাই এই যে একটী মূর্ত্তিবিশেষের মধ্যে ইষ্টভাবনা করিয়া উহাকেই ভগবৎবিশ্বাসে পূজা করা হিন্দুর পক্ষে অনুষ্ঠেয়। এ অনুষ্ঠানের মূলে বিশ্বাস না থাকিয়া কল্পনাই যদি থাকিত, তবে প্রাণ মন ঢালিয়া ভক্তি করা কি সম্ভব হইত? বিশ্বাসকে এই ভাবে একটী রূপের মধ্যে 'আবদ্ধ' করার উদ্দেশ্য আমরা সর্ব্বাগ্রেই বলিয়াছি। মাটী থেকে জল বাহির করিয়া যে তৃষ্ণা দূর করিবে, তাহাকে এক স্থানেই খুঁড়িয়া যাইতে হয়; তেমনি বিরাটের উপাসনা ছাড়া আরও এক সাধনপথ আছে যেখানে সমগ্র চিত্তের একাগ্রতা ও ভালবাসা

ভগবদ্বুদ্ধেকে এক স্থানে চালিয়া দিয়া সর্ব্বব্যাপক ভগবৎ-সত্তায় উপনীত হওয়া যায়। এই সাধনপথের সূচনা, রূপবিশেষে সমগ্র চিত্তের কেন্দ্রীকরণে,—ইহার শেষ, প্রেমানন্দে রূপের লয় ও অরূপসমাধিতে। সূর্য্যালোকে পতঙ্গলীলার মত সাহিত্যের যে কল্পনালীলা, এ সাধনক্ষেত্রে তাঁহার স্থান নাই।

কিন্তু যিনি প্রতীকসাধনার দ্বারা অরূপসিদ্ধি পাইয়াছেন, তাহার কথা স্বতন্ত্র। তিনি আর প্রবর্ত্তক নহেন, তিনি সিদ্ধ; প্রবর্ত্তকের পক্ষে যে discipline বা সাধনপ্রণালীর আবশ্যকতা আছে, তাহার পক্ষে তাহা নাই। তিনি সেই সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত, যাহা লাভ করিবার জন্যই অপ্রতীকবাদী বা নিরাকারবাদী রবীন্দ্র বাবু প্রভৃতি আধ্যাত্মিক সাধনায় প্রবৃত্ত আছেন,—নিরাকার পূজা ও সাকার পূজা উভয়ই যাহার সাধনপথ—এবং মাঝে মাঝে যাহার ইঙ্গিতদানে "প্রবাসীর" উল্লিখিত প্রবন্ধটীতে রবীন্দ্র বাবুর অনন্যত্রদৃষ্ট লিপিকৌশল সার্থক হইয়াছে।

শ্রীমদ্বিবেকানন্দপঞ্চকম্।

অনিত্যদৃশ্যেষু বিবিচ্য নিত্যম্
তস্মিন্ সমাধত্ত ইহস্ম লীলয়া।
বিবেক-বৈরাগ্য-বিশুদ্ধচিত্তম্
যোঽসৌ বিবেকী তমহং নমামি ॥১॥
বিবেকজানন্দ-নিমগ্ন-চিত্তম্
বিবেকদানৈকবিনোদশীলম্।
বিবেকভাসা কমনীয়কান্তম্
বিবেকিনং তং সততং নমামি ॥২॥
ঋতঞ্চ বিজ্ঞানমধিশ্রয়ৎ যৎ
নিরন্তরং চাদিমধ্যান্তহীনম্।
সুখং সুরূপং প্রকরোতি যস্ত
আনন্দমূর্ত্তিং তমহং নমামি ॥৩॥
সূর্য্যো যথান্ধং তমো নিহন্তি
বিষ্ণুর্যথা দুষ্টজনান্ ছিনত্তি
তথৈব তস্যাখিলনেত্রলোভম্
রূপং ত্রিতাপং বিমুখীকরোতি ॥৪॥

তং দেশিকেন্দ্রং পরমং পবিত্রম্
বিশ্বস্য পালং মধুরং যতীন্দ্রম।
হিতায় নৃণাং নরমূর্ত্তিমন্তম্
"বিবেক- আনন্দ"মহং নমামি ॥৫॥
নমঃ শ্রীযতিরাজায়
বিবেকানন্দসূরয়ে।
সচ্চিৎসুখস্বরূপায়
স্বামিনে তাপহারিনে ॥

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ॥*)

পৌষ কৃষ্ণাসপ্তমী।

নমো পুণ্য পৌষমাস নমো পুণ্যময়ী তিথি
প্রণাম আমার!
হে সপ্তমি দাত্রীশ্রেষ্ঠা কি অমূল্য নিধি তুমি
ভারতেরে দিলে উপহার!
যে তমো তিমিররাশি পুণ্যভূমি ছিল গ্রাসি
ছিন্ন করি সেই আবরণ,
সপ্তমি, তোমারি ক্রোড়ে উদিল কি শুভক্ষণে
বৈরাগ্যের তরুণ তপন!
দীপ্ত সে রবির জ্যোতি নিমেষে ঘুচায়ে দিল
যুগব্যাপী মোহ অন্ধকার,
নমো পুণ্য পৌষমাস নমো পুণ্যময়ী তিথি
প্রণাম আমার!
"আর কেন নিদ্রাগত? জাগ বীর জাগ কর্ম্মী
কেন আর মোহে অচেতন?
উঠ তমঃ পরিহরি উঠ মৃত্যু পরিহরি
ভেঙ্গে দাও বাসনা স্বপন!
সূর্য্যালোকে কর সবে স্নান,
চল জীবনের পথে চল অমৃতের পথে,
আগুয়ান হও আগুয়ান!
মোহজাল কর দূর উঠ ত্যাগী, উঠ শূর,
বৈরাগ্য অমৃত করি পান—

---

* উনপঞ্চাশৎ জন্মতিথি-উপলক্ষে মান্দ্রাজে রচিত, ইহাই শ্রীমদাচার্য্য রামকৃষ্ণানন্দের শেষ রচনা।

গৈরিকের উত্তরীয় পতাকা উড়ায়ে চল—
সন্ন্যাসীর বিজয়-নিশান ;
উঠ বৎস, বিঘ্নজয়ী ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষা লই,
কোথা বাধা, কিসে ভয় আর—
চল রথী রণস্থলে, অর্জ্জুনসারথী তিনি
সারথী তোমার !"
কে দিল শ্রবণে আনি এই জীবনের বাণী
উত্তরিতে মৃত্যু পারাবার ?
নমো নমো পুণ্যভূমি জননী ভারত তুমি
বীরেশ্বর তোমারি কুমার !
নমো নমো পুণ্যভূমি জননী ভারত তুমি,
দীনা তোরে কে বলে মা আর ?
বীরেশ্বর তোমার কুমার !
সে যে মাগো তোর লাগি চিরদিন সর্ব্বত্যাগী
জপমন্ত্র "ভারত" তাহার।
মাতৃপদ ধ্যান জ্ঞান, চরণে অর্পিত প্রাণ,
মা বিনা সে জানে না যে আর।
তোর সে পাগল ছেলে গিরি লঙ্ঘে অবহেলে,
ফণি আর মণি সম জ্ঞান
তোমার চরণতরী কেবল ভরসা করি
সিন্ধু নায় গোষ্পদ সমান।
তোরি তরে দীনবেশে ফিরিয়াছে দেশে দেশে
সহি কত ক্লেশ অনাহার,
কভু মগ্ন মহাধ্যানে সমাধি অমৃত পানে
মাতৃসেবা তপস্যা তাহার।
"অভী." এই মন্ত্র পড়ি ভয় দিল দূর করি,
কোথা পড়ি রহিল সংশয়।
মা তোর দুলাল সেই সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ
দশদিক গাহে তার জয় !
"ভাই" বলে সমাদরে অস্পৃশ্যে সে বুকে ধরে
আতুরে দেবতা করি মানে,
দরিদ্র অভাগা জন, তার পূজ্য নারায়ণ,
ধনী দীনে ভেদ নাহি জানে।
যার, মা, এমন ছেলে তারে কে দুখিনী বলে ?
মৃত্যুঞ্জয়ী সে চির অমর,
বীরপুত্র তব বীরেশ্বর !

কি ফুলে অঞ্জলি দিব, কিবা অর্ঘ্য সাজাইব,
দীনা বীণা, বাঁধিব কি তান।
ভাষায় কি আছে ভাষা, যাহাতে মিটিবে আশা
গাহিয়া তোমার স্তুতি গান।
হে গুরু, কি শিখাইলে,— কি যে সঞ্জীবনী দিলে,
শবদেহ প্রাণ ফিরে পায়।
আজি তব সেনাদলে ভুবন ব্যাপিয়া চলে'
সেনাপতি তাদের কোথায়।

ঠাকুরের দুরন্ত তনয়!
তুমি যে চঞ্চল বড় বজ্র লয়ে খেলা কর!
তাই ধর, যাহা মনে লয়।
যোগীশ্রেষ্ঠ, কোন্ কাজে— মহাসমাধির মাঝে
অকস্মাৎ হইলে বিলয়।
জননী ভারতভূমি সত্য অভাগিনী তুমি,
হেন রত্ন আঁচলে পাইয়া
আদরে হৃদয়ে ধরি রাখিলে না যত্ন করি
অসময়ে গেল পলাইয়া!
হয়োনা, অবুঝ প্রাণ, আজি শোকে ম্রিয়মান,
গলি' পড়িওনা অশ্রুজলে,
গাও গান শোকজয়ী, গাও গান কালজয়ী,
ক্ষীণকণ্ঠে প্রাণপণ বলে।
যাঁর অগ্নিময়ী বাণী মৃতে প্রাণ দেয় আনি,
জড়ে করে চৈতন্য-সঞ্চার,
শিরায় অনল ফুটে, শোণিত উছলি উঠে,
বিশ্ব যেন আনন্দ-পাথার।
"অগ্রসর, অগ্রসর!" কি যে সে গম্ভীর স্বর,
যেন ক্ষুব্ধ সিন্ধু-গরজন!
সে ধ্বনি শ্রবণে পশে বন্দী ছুটে চলে আসে,
ভাঙ্গি দৃঢ় লৌহের বন্ধন।
"অগ্রসর, অগ্রসর! ভুলে যাও আত্ম পর,
আগে চল, আরো আগে চল!
প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা গৌরব রৌরব ঘোর,
অভিমান সুরা সে কেবল।
কি আনন্দ, মহানন্দ! টুটে যায় সব বন্ধ!
সম্মুখেতে কর্ম্মপারাবার,

সার্থক কি নিরর্থক নাহি তাহে দ্বিধা শোক
কে চায় আছে না আছে পার!
দেবব্রতে নিয়োজিত কর দেহ, বাক্য, চিত,
কি তায় আছে না আছে ফল,
অক্ষয় ভাণ্ডার তব দানে নাহি শূন্য হবে
হে সন্ন্যাসি কৌপীনসম্বল!"
গাও আজি গাও প্রাণ, সেই ত্যাগমন্ত্রে গান,
পূজ গুরু ত্যাগপুষ্প তুলি,
ত্যাগে কি আনন্দ আছে, জেনেছ যাঁহার কাছে—
দাও তাঁর চরণে অঞ্জলি!
ধনী দীন আত্ম পর সবারে হৃদয়ে ধর,
অখণ্ড জগত-পরিবার,
এক জলধির জলে উঠে উর্ম্মি দলে দলে,
মিশে যায় সলিলে তাহার!
গাও, আজি গাও প্রাণ, সেই অগ্নিমন্ত্রে গান,
প্রাণে প্রাণে জ্বাল হোমানল,
দুঃসাধ্যের ব্রত কর, দুর্ব্বহ মাথায় ধর
হে সন্ন্যাসি কৌপীনসম্বল!
কি আনন্দ কি আনন্দ, টুটে যায় সব বন্ধ!
হয়ে যায় সব একাকার।
এক ব্রহ্মমহাসিন্ধু, তাহে মিশে যায় বিন্দু,
এক সেই আনন্দপাথার!
নমো পুণ্য পৌষমাস, পুণ্যদা সপ্তমী তিথি,
কোটী কোটী প্রণাম আমার,
কি দিব তোমারে আজি আর!
তুলি ফুল সাজি ভরি তোমার অর্চ্চনা করি
অর্ঘ্যডালি দিই উপহার!
যে তমো তিমিররাশি পুণ্যভূমি ছিল গ্রাসি
ছিন্ন ক'রি সেই আবরণ,
সপ্তমি, তোমারি ক্রোড়ে উদিল কি শুভক্ষণে
বৈরাগ্যের তরুণ তপন!
সে দিন তোমার দ্বারে বাজিল যে শুভ শঙ্খ
হোক্ তাহা অনন্ত অক্ষয়,
সেই মঙ্গলের ধ্বনি যেন বিশ্ব ভরি শুনি
জয় তব চিরদিন জয়!

———

শ্রীমতি সর[illegible]া দাসী।

REGISTERED No. C 295.

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

সূচী।

কলিকাতা।

উদ্বোধন আফিস—১২, ১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন, বাগবাজার।
মাসিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য, সডাক ২৲ দুই টাকা।
প্রতি সংখ্যা ।০ আনা।

১৪শ বর্ষ—২য় সংখ্যা। ফাল্গুন, ১৩১৮ সাল

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

(স্বামী সারদানন্দ।)

সাধক ও সাধনা।

ঠাকুরের জীবনে সাধক ভাবের পরিচয় যথাযথ পাইতে হইলে আমাদিগকে সাধনা কাহাকে বলে তদ্বিষয় প্রথমে বুঝিতে হইবে। অনেকে হয়ত এককথায় বলিবেন, ভারত তো চিরকালই কোনও না কোন ভাবে ধর্ম্মসাধনে লাগিয়া রহিয়াছে তবে আবার ঐ কথা পাড়িয়া পুঁথি বাড়ান কেন? আবহমানকাল হইতে ভারত আধ্যাত্মিক রাজ্যের সত্যসকল সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে নিজ জাতীয় শক্তি যতদূর ব্যয় করিয়া আসিয়াছে এবং এখনও করিতেছে পৃথিবীর অপর কোন্ দেশের কোন্ জাতি এতদূর করিয়াছে? কোন্ দেশেই বা ব্রহ্মজ্ঞ অবতারপুরুষসকলের আবির্ভাব এত অধিক পরিমাণে হইয়াছে? অতএব সাধনার সহিত চিরপরিচিত আমাদিগকে ঐ বিষয়ের মূলসূত্রগুলি পুনরাবৃত্তি করিয়া বলা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন।

আমরা বলি, কথা সত্য হইলেও উহার প্রয়োজন আছে। কারণ, সাধনা সম্বন্ধে অনেক স্থলে জনসাধারণের একটা কিম্ভূতকিমাকার ধারণাই দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্দেশ্য বা গন্তব্যের প্রতি লক্ষ্য হারাইয়া তাহারা অনেক সময় কেবলমাত্র শারীরিক কঠোরতায়, দুষ্প্রাপ্য বস্তুসকলের একত্র সংযোগে, স্থানবিশেষে ক্রিয়াবিশেষের নিরর্থক অনুষ্ঠানে, শ্বাসপ্রশ্বাসরোধে এবং এমন কি অসম্বদ্ধ মনের বিসদৃশ চেষ্টাদিতেও সাধনার বিশিষ্ট পরিচয় পাইয়া থাকে। আবার এরূপও দেখা যায় যে কুসংস্কার এবং কুঅভ্যাসে বিকৃতপূর্ব্ব মনকে প্রকৃতিস্থ ও সহজভাবাপন্ন করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে চালিত করিতে মহাপুরুষগণ কখন কখন যে সকল ক্রিয়া বা উপায়াবলম্বন করিয়াছেন সেই সকলকেই সাধনা বলিয়া ধারণা করিয়া সকলের পক্ষেই ঐ সমূহের অনুষ্ঠান সমভাবে প্রয়োজন বলিয়া প্রচারিত হইতেছে। অথবা বৈরাগ্যবান্ না হইয়া—সংসারের ক্ষণস্থায়ী রূপরসাদি ভোগের জন্য সমভাবে লালায়িত থাকিয়াও মন্ত্র বা ক্রিয়াবিশেষের সহায়ে জগৎকারণ ঈশ্বরকে মন্ত্রৌষধিবশীভূত সর্পের ন্যায় নিজ কর্ত্তৃত্বাধীন করিতে পারা যায় এরূপ ভ্রম

ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াও অনেককে বৃথা চেষ্টায় কালক্ষেপ করিতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে! অতএব যুগযুগান্তরব্যাপী অধ্যবসায় ও চেষ্টার ফলে ভারতের ঋষিমহাপুরুষগণ সাধন সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন তাহার সংক্ষেপ আলোচনা এখানে বিষয়বিরুদ্ধ হইবে না।

ঠাকুর বলিতেন, "সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন বা ঈশ্বরদর্শন শেষকালের কথা"—সাধনার চরম উন্নতিতেই উহা মানবের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। হিন্দুর সর্ব্বোচ্চ প্রামাণ্য শাস্ত্র বেদোপনিষৎও ঐ কথাই বলিয়া থাকেন। বেদ বলেন জগতে স্থূল সূক্ষ্ম, চেতন অচেতন যাহা কিছু তুমি দেখিতে পাইতেছ—ইট্, কাট, মাটি পাথর, মানুষ পশু, গাছ পালা, জীব জানোয়ার, দেব উপদেব—সকলই এক অদ্বয় ব্রহ্মবস্তু। ঐ এক বস্তুকেই তুমি নানারূপে নানাভাবে দেখিতেছ, শুনিতেছ, স্পর্শ ঘ্রাণ ও আস্বাদ করিতেছ। তাঁহাকে লইয়া তোমার সকল প্রকার দৈনন্দিন ব্যবহার আজীবন নিষ্পন্ন হইলেও তুমি তাহা বুঝিতে না পারিয়া ভাবিতেছ ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ও ব্যক্তির সহিত তুমি ঐরূপ করিতেছ! কথাগুলি শুনিয়া আমাদের মনে যে সন্দেহপরম্পরার উদয় হইয়া থাকে এবং ঐ সকল নিরসনে শাস্ত্র যাহা বলিয়া থাকেন, প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তাহার মোটামুটি ভাবটি পাঠককে এখানে বলিলে উহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা।

প্র। ঐ কথা আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে না কেন?

উ। তোমরা ভ্রমে পড়িয়াছ। যতক্ষণ না ঐ ভ্রম দূরীভূত হয় ততক্ষণ, কেমন করিয়া ঐ ভ্রম ধরিতে পারিবে? যথার্থ বস্তু ও অবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই আমরা বাহিরের ও ভিতরের ভ্রম ধরিয়া থাকি। এ ভ্রম ধরিতে হইলেও তোমাদের ঐরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন।

প্র। আচ্ছা ঐরূপ ভ্রম হইবার কারণ কি, এবং কবে হইতেই বা আমাদের এই ভ্রম আসিয়া উপস্থিত হইল?

উ। ভ্রমের কারণ সর্ব্বত্র যাহা দেখিতে পাওয়া যায় এখানেও তাহাই—অজ্ঞান। ঐ অজ্ঞান কখন যে উপস্থিত হইল তাহা কিরূপে জানিবে বল? অজ্ঞানের ভিতর যতক্ষণ পড়িয়া রহিয়াছ ততক্ষণ উহা জানিবার চেষ্টা বৃথা। স্বপ্ন যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ সত্য বলিয়াই প্রতীতি হয়। নিদ্রাভঙ্গে জাগ্রদবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই উহাকে মিথ্যা বলিয়া ধারণা হয়। বলিতে পার—স্বপ্ন দেখিবার কালেও কখন কখন কোন কোন ব্যক্তির 'আমি স্বপ্ন

দেখিতেছি' এইরূপ ধারণা থাকিতে তো দেখা যায়। সেখানেও কিন্তু জাগ্রদবস্থায় স্মৃতি হইতেই তাহাদের মনে ঐ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। নানা নামরূপের সমষ্টি জগৎ প্রত্যক্ষ করিবার কালেও কাহারও কাহারও অন্য বস্তুর স্মৃতি হইতে ঐরূপ হইতে দেখা যায়।

প্র। তবে উপায় ?

উ। উপায়—ঐ অজ্ঞান দূর কর। ঐ ভ্রম বা অজ্ঞান যে দূর করা যায় তাহা তোমাদের নিশ্চিৎ বলিতে পারি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণ উহা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং কেমন করিয়া দূর করিতে হইবে তাহাও বলিয়া গিয়াছেন।

প্র। আচ্ছা; কিন্তু ঐ উপায় জানিবার পূর্ব্বে আরও দুই একটি প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আমরা এতলোকে যাহা দেখিতেছি প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহাকে তুমি ভ্রম বলিতেছ, আর অল্পসংখ্যক ঋষিরা যাহা বা যেরূপে জগৎটাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাই সত্য বলিতেছ—এটা কি সম্ভব হইতে পারে না যে, তাঁহারা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাই ভুল ?

উ। বহুসংখ্যক ব্যক্তি যাহা বিশ্বাস করিবে তাহাই যে সর্ব্বদা সত্য হইবে এমন কিছু নিয়ম নাই। ঋষিদিগের প্রত্যক্ষ সত্য বলিতেছি কারণ, ঐ প্রত্যক্ষসহায়ে তাঁহারা সর্ব্ববিধ দুঃখের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকারে ভয়শূন্য ও চিরশান্তির অধিকারী হইয়াছিলেন এবং নিশ্চিত-মৃত্যু মানবজীবনের সকল প্রকার ব্যবহারচেষ্টাদির একটা উদ্দেশ্যেরও সন্ধান পাইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন যথার্থজ্ঞান, মানবমনে সর্ব্বদা সহিষ্ণুতা, সন্তোষ, করুণা, দীনতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজির বিকাশ করিয়া উহাকে অদ্ভুত উদারতাসম্পন্ন করিয়া থাকে; ঋষিদিগের জীবনে ঐরূপ অসাধারণ গুণ ও শক্তির পরিচয় আমরা শাস্ত্রে পাইয়া থাকি, এবং তাঁহাদিগের পদানুসরণে চলিয়া যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করেন তাঁহাদিগের ভিতরে এখনও দেখিতে পাই।

প্র। আচ্ছা। কিন্তু আমাদের সকলেরই ভ্রম একরূপ একপ্রকারের হইল কিরূপে ? আমি যেটাকে পশু বলিয়া বুঝি তুমিও সেটাকে পশু ভিন্ন মানুষ বলিয়া বুঝ না; এইরূপ, সকল বিষয়েই। এত লোকের ঐরূপ সকল বিষয়ে একই কালে একই প্রকার ভুল হওয়া অল্প আশ্চর্য্যের কথা নহে। পাঁচ জনে একটা বিষয়ে ভুল ধারণা করিলেও অপর পাঁচ জনের ঐ বিষয়ে সত্যদৃষ্টি

থাকে, সর্ব্বত্র এইরূপই তো দেখা যায়। এখানে কিন্তু ঐ নিয়মের একেবারে ব্যতিক্রম হইতেছে। এজন্য তোমার কথা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

উ। অল্পসংখ্যক ঋষিদিগকে জনসাধারণের মধ্যে গণনা না করাতেই তুমি নিয়মের ব্যতিক্রম এখানে দেখিতে পাইতেছ। নতুবা পূর্ব্ব প্রশ্নেই এ বিষয়ের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। তবে যে জিজ্ঞাসা করিতেছ সকলের এক প্রকারের ভ্রম হইল কিরূপে?—তাহার উত্তরে শাস্ত্র বলেন—এক অসীম অনন্ত সমষ্টি-মনে জগৎরূপ কল্পনার উদয় হইয়াছে। তোমার আমার এবং জনসাধারণের ব্যষ্টি-মন ঐ বিরাট মনের অংশ ও অঙ্গীভূত হওয়ায় আমাদিগকে ঐ একই প্রকার কল্পনা অনুভব করিতে হইতেছে। ঐ জন্যই আমরা প্রত্যেকে পশুটাকে পশু ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া ইচ্ছামত দেখিতে বা কল্পনা করিতে পারি না। ঐজন্যই আবার যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া আমাদের মধ্যে একজন সর্ব্বপ্রকার ভ্রমের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিলেও অপর সকলে যেমন ভ্রমে পড়িয়া আছে সেইরূপই থাকে। আর এক কথা, বিরাট পুরুষের বিরাট মনে জগৎরূপ কল্পনার উদয় হইলেও তিনি আমাদিগের মত অজ্ঞানবন্ধনে জড়ীভূত হইয়া পড়েন না। কারণ সর্ব্বদর্শী তিনি অজ্ঞানপ্রসূত ঐ কল্পনার সীমার ভিতরে ও বাহিরে অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুকেও ওতঃপ্রোতঃ ভাবে বিদ্যমান দেখিতে পাইয়া থাকেন। উহা করিতে পারি না বলিয়াই আমাদের কথা স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে।

ঠাকুর যেমন বলিতেন—"সাপের মুখে বিষ রয়েছে, সাপ ঐ মুখ দিয়ে নিত্য আহারাদি করুচে; সাপের তাতে কিছু হচ্চেনা! কিন্তু সাপ যাকে কামড়ায় ঐ বিষে তার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু!"

অতএব শাস্ত্রদৃষ্টে দেখা গেল বিশ্ব-মনের কল্পনাসম্ভূত জগৎটা একভাবে আমাদেরও মনঃকল্পিত। কারণ, আমাদিগের ক্ষুদ্রব্যষ্টি-মন ঐ সমষ্টিভূত বিশ্ব-মনের সহিত শরীর ও অবয়বাদির ন্যায় অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে নিত্য অবস্থিত। আবার ঐ জগৎরূপ কল্পনা যে, এককালে বিশ্বমনে ছিল না পরে আরম্ভ হইল, এ কথাও বলিতে পারা যায় না। কারণ, নাম ও রূপ বা দেশ ও কালরূপ পদার্থদ্বয়,—যাহা না থাকিলে কোনরূপ বিচিত্রতার সৃষ্টিই হইতে পারেনা—ঐ জগৎরূপ কল্পনারই মধ্যগত অথবা উহার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে নিত্য বিদ্যমান। স্থিরভাবে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই পাঠক ঐ কথা বুঝিতে পারিবেন এবং বেদাদি শাস্ত্র যে কেন সৃজনীশক্তির মূলীভূত কারণ প্রকৃতি বা

মায়াকে অনাদি বা কালাতীত বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন তাহাও হৃদয়ঙ্গম হইবে। জগৎটা যদি মনঃকল্পিতই হয় এবং ঐ কল্পনার আরম্ভ যদি আমরা 'কাল' বলিতে যাহা বুঝি তাহার ভিতরে না হইয়া থাকে, তবে কথাটা দাঁড়াইল এই যে,অনাদি কালরূপ-কল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই জগৎরূপ কল্পনাটা তদাশ্রয় বিশ্ব-মনে বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং আমাদিগের ক্ষুদ্র ব্যষ্টি-মন বহুকাল ধরিয়া ঐ কল্পনা দেখিতে থাকিয়া জগতের অস্তিত্বেই দৃঢ়ধারণা করিয়া রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ঐ কল্পনাতীত অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাৎদর্শনে বহুকাল বঞ্চিত থাকিয়া জগৎটা যে মনঃকল্পিত বস্তুমাত্র এ কথাও এককালে ভুলিয়া গিয়াছে এবং আপনার ঐ ভ্রম আর এখন ধরিতেও পারিতেছে না। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি—যথার্থ বস্তু ও অবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই আমরা বাহিরের ও ভিতরের ভ্রম ধরিতে সক্ষম হই।

এখন বুঝা যাইতেছে যে, জগৎ সম্বন্ধে আমাদিগের ধারণা ও অনুভবাদি বহুকাল-সঞ্চিত অভ্যাসের ফলে বর্ত্তমানাকার ধারণ করিয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানে উপনীত হইতে হইলে আমাদিগকে এখন নাম রূপ, দেশ কাল, মন বুদ্ধি প্রভৃতি জগদন্তর্গত সকল বিষয়ের অতীত পদার্থের সহিত প্রথমে পরিচিত হইতে হইবে। ঐ পরিচয় পাইবার চেষ্টাকেই বেদপ্রমুখ শাস্ত্র 'সাধন' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং ঐ চেষ্টা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যে স্ত্রী বা পুরুষে বিদ্যমান তাঁহারাই ভারতে সাধক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে, জগদতীত বস্তু অনুসন্ধানের পূর্ব্বোক্ত চেষ্টা দুইটী প্রধান পথে এতকাল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। প্রথম, শাস্ত্র যাহাকে "নেতি নেতি" বা জ্ঞান-মার্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং দ্বিতীয়,যাহা "ইতি ইতি" বা ভক্তিমার্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞান-মার্গের সাধক চরম-লক্ষ্যের কথা প্রথম হইতে হৃদয়ে ধারণা ও সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া জ্ঞাতসারে তদভিমুখে দিন দিন অগ্রসর হইতে থাকেন। ভক্তি-পথের পথিকেরা চরমে কোথায় উপনীত হইবেন তদ্বিষয়ে অনেক স্থলে অজ্ঞ থাকেন এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর লক্ষ্যান্তর পরিগ্রহ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া চরমে জগদতীত অদ্বৈতবস্তুর সাক্ষাৎপরিচয় লাভ করিয়া থাকেন। নতুবা জগৎ সম্বন্ধে সাধারণ জনগণের যে ধারণা আছে তাহা উভয় পথের পথিকগণকেই ত্যাগ করিতে হয়। তবে জ্ঞানী উহা প্রথম

হইতেই এককালে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করেন ; এবং ভক্ত উহার কতক্ ছাড়িয়া কতক্ রাখিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেও পরিণামে জ্ঞানীর ন্যায়ই উহার সমস্ত ত্যাগ করিয়া 'একমেবাদ্বিতীয়ং'-তত্ত্বে উপস্থিত হন। জগৎ সম্বন্ধে স্বার্থপর, ভোগসুখৈকলক্ষ্য ঐ সাধারণ ধারণার পরিহারকেই শাস্ত্র বৈরাগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

নিত্যপরিবর্ত্তনশীল নিশ্চিত-মৃত্যু মানবজীবনে জগতের অনিত্যতাজ্ঞান সহজেই আসিয়া উপস্থিত হয়। তজ্জন্য জগৎসম্বন্ধীয় সাধারণ ধারণা ত্যাগ করিয়া 'নেতি নেতি'-মার্গে জগৎকারণের অনুসন্ধান করা মানবের প্রাচীন যুগে প্রথমেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সে জন্যই ভক্তিপথের সকল বিভাগের সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি হইবার পূর্ব্বেই উপনিষদে জ্ঞানমার্গের সম্যক্ পরিপুষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়।

আবার, 'নেতি নেতি'—নিত্যস্বরূপ জগৎ-কারণ ইহা নহে, উহা নহে করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইয়া মানব স্বল্পকালেই যে অন্তর্মুখী হইয়া পড়িয়াছিল উপনিষৎ এবিষয়েও সাক্ষ্য প্রদান করে। মানব বুঝিয়াছিল বাহিরের অন্য সকল বস্তু অপেক্ষা তাহার নিজ দেহ-মনই তাহাকে সর্ব্বাগ্রে জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। অতএব বাহিরের অপর সকল বস্তুর সহায়ে বা অবলম্বনে জগৎ-কারণের অন্বেষণে অগ্রসর হইলে যত শীঘ্র সে উহার সন্ধান পাইবে, নিজ দেহ-মনাবলম্বনে অগ্রসর হইলে তদপেক্ষা শীঘ্র ফললাভের সম্ভাবনা। আবার "হাঁড়ির একটা ভাত টিপিয়া দেখিয়াই যেমন বুঝিতে পারা যায়, ভাত-হাঁড়িটা সুসিদ্ধ হইয়াছে কি না", তদ্রূপ আপনার ভিতরে নিত্যকারণ-স্বরূপের অনুসন্ধান পাইলেই অপর সকল বস্তু ও ব্যক্তির কারণেরও অন্বেষণ পাওয়া যায়। এজন্য জ্ঞানপথের পথিকের নিকট "আমি কোন্ পদার্থ" ইহার অনুসন্ধানই একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জগৎসম্বন্ধীয় সাধারণ ধারণা জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়কেই ত্যাগ করিতে হয়। ঐ ধারণার একান্ত ত্যাগেই মানব-মন সর্ব্ববৃত্তিরহিত হইয়া সমাধির অধিকারী হয়। ঐরূপ সমাধিকেই শাস্ত্র নির্ব্বিকল্প-সমাধি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। জ্ঞান-পথের সাধক, 'আমি বাস্তবিক কোন্ পদার্থ' এই তত্ত্বের অনুসন্ধানে অগ্রসর হইয়া কিরূপে নির্ব্বিকল্প-সমাধিতে উপনীত হন এবং ঐ কালে তাঁহার কীদৃশ অনুভব হয় তাহা আমরা পাঠককে

অন্যত্র বলিয়াছি। * এখন ভক্তিপথের পথিক কিরূপে ঐ সমাধিলাভে ঐরূপ অনুভবে উপস্থিত হইয়া থাকেন তদ্বিষয়ে পাঠককে কিঞ্চিৎ বলা কর্ত্তব্য।

ভক্তিমার্গকে 'ইতি ইতি'-সাধনপথ বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি। কারণ, ঐ পথের পথিক জগতের অনিত্যতা প্রত্যক্ষ করিলেও জগৎ-কর্ত্তা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়া তৎকৃত জগৎরূপ কার্য্যও যে সত্য বর্ত্তমান একথা বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ভক্ত জগৎ ও তন্মধ্যগত সর্ব্ব বস্তু ও ব্যক্তিকে ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া লন। ঐ সম্বন্ধ দর্শন করিবার পথে যাহাই অন্তরায় বলিয়া তাঁহার প্রতীতি হয় তাহাই তিনি তৎক্ষণাৎ দূরে পরিহার করেন। তদ্ভিন্ন ঈশ্বরের কোন এক রূপের† প্রতি অনুরাগে ও ধ্যানে তন্ময় হওয়া এবং তাঁহারই প্রীতির নিমিত্ত সর্ব্বকার্য্যানুষ্ঠান করা ভক্তের আশু লক্ষ্য হইয়া থাকে।

রূপের ধ্যানে তন্ময় হইয়া কেমন করিয়া জগতের অস্তিত্ব ভুলিয়া নির্ব্বিকল্প অবস্থায় পৌঁছিতে পারা যায় এইবার আমরা তাহারই অনুশীলন করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভক্ত ঈশ্বরের কোন এক রূপকে নিজ ইষ্ট বলিয়া পরিগ্রহ করিয়া তাহারই চিন্তা ও ধ্যান করিতে থাকেন। প্রথম প্রথম, ধ্যান করিবার কালে, ভক্ত ঐ ইষ্টমূর্ত্তির সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণ ছবি মানস নয়নের সম্মুখে আনিতে পারেন না; কখন উহার হস্ত, কখন পদ এবং কখন বা মুখখানি সম্মুখে উপস্থিত হয়; উহাও আবার দর্শন মাত্রেই যেন লয় হইয়া যায়, সম্মুখে স্থির ভাবে অবস্থান করে না। অভ্যাসের ফলে ধ্যান গভীর হইলেই ঐ মূর্ত্তির সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণ ছবি, মানস-চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয়; এবং ক্রমে গভীরতর হইলে ঐ ছবি, যতক্ষণ না মন চঞ্চল হয় ততক্ষণ স্থির ভাবে সম্মুখে অবস্থান করে। পরে ধ্যানের গভীরতার তারতম্যে ঐ মূর্ত্তির চলা ফেরা, হাস্য, কথাকহা এবং চরমে উহার স্পর্শ পর্য্যন্তও উপলব্ধি হয়। তখন সর্ব্ব প্রকারেই ঐ মূর্ত্তিকে জীবন্ত বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় এবং ভক্ত, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বা খুলিয়াই থাকুন না কেন, ধ্যান করিলেই

* গুরুভাব পূর্ব্বার্দ্ধ ২য় অধ্যায় দেখ।

† ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনাকেও আমরা রূপের ধ্যানের মধ্যেই গণনা করিতেছি। কারণ, মানবের ন্যায় আকার-রহিত সর্ব্বগুণান্বিত ব্যক্তিত্বের ধ্যান করিতে যাইলে জল, বায়ু বা তেজ প্রভৃতি সূক্ষ্মাকার পদার্থের ন্যায় কোন পদার্থই মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে।

ঐ মূর্ত্তির ঐ প্রকার চেষ্টাদি সমভাবে প্রত্যক্ষ করেন। শুধু তাহাই নহে; "আমার ইষ্টই ইচ্ছামত নানারূপই ধারণ করিয়াছেন—এই বিশ্বাসের ফলে ভক্ত সাধক আপন ইষ্টমূর্ত্তি হইতে ঐ সকল নানারূপেরও কখন কখন সন্দর্শন লাভ করেন। ঠাকুর বলিতেন—"একটি রূপ যে [ঐ রূপ জীবন্ত ভাবে] দর্শন করেছে তার অন্য সব রূপের দর্শন সহজেই হয়।"

ইতিপূর্ব্বে যে সকল কথা বলা হইল তাহা হইতে একটি বিষয় আমরা বুঝিতে পারি। ঐরূপ জীবন্ত মূর্ত্তিসকলের দর্শনলাভ যাহার ভাগ্যে উপস্থিত হয় তাহার নিকট স্বল্পকালেই ধ্যানকাল ভিন্ন অন্য সময়ে জগতে দৃষ্ট রূপ-বিশিষ্ট পদার্থ সকলের ন্যায় ধ্যানকালে দৃষ্ট ভাবরাজ্যের ঐ সকল মূর্ত্তির সমান অস্তিত্ব অনুভব হইতে থাকে। আবার, জগৎ ও ভাবরাজ্যের সমানাস্তিত্ববোধ ঐরূপে যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে ততই তাহার মনে, জগৎটা মনঃ-কল্পিত এ বিষয়ের ধারণা হইতে থাকে। গভীর ধ্যানে ভাবরাজ্যের অনুভব ভক্তের মনে এত প্রবল হইয়া উঠে যে সে সময়ের জন্য তাঁহার আর জগতের অনুভবই হয় না। ভক্তের ঐ অবস্থাকেই শাস্ত্র সংকল্প-সমাধি নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ সমাধিতে মানসিক শক্তিপ্রবাহে জগতের বিলয় হইলেও ভাবরাজ্যের বিলয় হয় না। ভক্ত তখন, জগতে দৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিসকলের সহিত নিত্য ব্যবহার করিয়া যেরূপ সুখদুঃখাদির অনুভব এতকাল করিতেছেন ঠিক তদ্রূপ অনুভব, আপন ইষ্টমূর্ত্তির সহিত ব্যবহারে করিতে থাকেন। কিন্তু কেবলমাত্র ইষ্টমূর্ত্তিকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহার মনে তখন যত কিছু সংকল্প-বিকল্পের উদয় হইতে থাকে। এক বিষয় লইয়া মনের বৃত্তি-পরম্পরার উদয় হওয়ার জন্য শাস্ত্র ভক্তের ঐ অবস্থাকে সবিকল্পক বা বিকল্পসংযুক্ত বলিয়াছেন।

এইরূপে ভাবরাজ্যের প্রাবল্যে ভক্তের মনে জগতের এবং এক ভাবের প্রাবল্যে ক্রমে অন্য ভাবসকলেরও বিলয় সাধিত হয়। যে ভক্তসাধক এতদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহার নিকট নির্ব্বিকল্পভূমিলাভ অধিক দূরবর্ত্তী নহে। বহুকালাভ্যস্ত জগতের অস্তিত্ব-জ্ঞান যিনি ইচ্ছামাত্রেই এতদূর দূরীকরণে সক্ষম হইয়াছেন তাঁহার মন যে সমধিক শক্তিসম্পন্ন ও দৃঢ় সংকল্প হইয়াছে এ কথা বলিতে হইবে না। নির্ব্বিকল্পভূমিতে ঈশ্বর-সম্ভোগ অধিক-ভিন্ন অল্প হয় না, একথা একবার ধারণা হইলেই তাঁহার সমগ্র মন ঐদিকে সোৎসাহে ধাবিত হয় এবং শ্রীগুরু ও ঈশ্বরকৃপায় তিনি

অচিরে ভাবরাজ্যের ঐ ভূমিতে আরোহণ করিয়া চিরশান্তির অধিকারী হন। অথবা বলা যাইতে পারে, প্রগাঢ় ইষ্টপ্রেমই তখন তাঁহাকে ঐ ভূমি দেখাইয়া দেয় এবং ব্রজগোপিকাগণের ন্যায় উহার প্রেরণায় তিনি "না সো রমণ না হাম্ রমণী" জ্ঞানে উপনীত হইয়া তাঁহাদিগেরই ন্যায় আপন ইষ্টের সহিত একত্বানুভব করেন।

জ্ঞানী এবং ভক্ত সাধককুলের চরম লক্ষ্যে উপনীত হইবার ঐ রূপ ক্রম শাস্ত্রনির্দ্ধারিত। অবতারপুরুষসকলে কিন্তু দেব এবং মানব উভয় ভাবের একত্র সম্মিলন আজীবন থাকায় সাধনার কালেও কখন কখন তাঁহাদিগকে সিদ্ধের ন্যায় প্রকাশ ও শক্তিসম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। দেব এবং মানব উভয় ভূমিতেই ইচ্ছামত বিচরণ করিবার শক্তি থাকাতেই কি তাঁহাদের ঐরূপ হইয়া থাকে?—অথবা ভিতরের দেবভাবই তাঁহাদিগের সহজ স্বাভাবিক অবস্থা হওয়ায় উহা তাঁহাদিগের বাহিরের মানবভাবের সামান্যাবরণকে স্থলে স্থলে স্বতঃই ভেদ করিয়া ঐ রূপে প্রকাশিত হয়? মীমাংসা যাহাই হউক না কেন উহা কিন্তু অবতারপুরুষের জীবনালোচনাকে মানববুদ্ধির পক্ষে এক প্রকার দুর্ভেদ্য জটিলতাময় করিয়া রাখিয়াছে। ঐ জটিল রহস্য কখনও যে সম্পূর্ণ ভেদ হইবে, বোধ হয় না। তবে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উহার অনুশীলনে মানবের যে অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়, এ কথা ধ্রুব। প্রাচীন পৌরাণিক যুগে অবতার-চরিত্রের মানবভাবটি চাপিয়া ঢাকিয়া দেবভাবটির আলোচনাই করা হইয়াছিল—সন্দেহশীল বর্ত্তমান যুগে ঐ চরিত্রের দেবভাবটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়া মানবভাবটির আলোচনাই চলিয়াছে—বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমরা ঐ চরিত্রের আলোচনায় উহাতে তদুভয় ভাব যে একত্র একই কালে বিদ্যমান এ কথাই পাঠককে বুঝাইতে প্রয়াস পাইতেছি। বলা বাহুল্য দেব-মানব ঠাকুরের পুণ্যদর্শন জীবনে না ঘটিলে অবতারচরিত্র ঐ রূপে আমরা কখনই দেখিতে সমর্থ হইতাম না।

ক্রমশঃ।

———

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ।)

আজ তিন দিন হইল স্বামীজি বাগ্‌বাজারে ৺বলরাম বসুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যহ অসংখ্য লোকের ভিড়। স্বামী যোগানন্দও স্বামীজির সঙ্গে একত্র অবস্থান করিতেছেন। অদ্য "সিষ্টার" (ভগ্নী) নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজি আলিপুরের পশুশালা দেখিতে যাইবেন। শিষ্য উপস্থিত হইলে তাহাকে ও স্বামী যোগানন্দকে বলিলেন "তোরা আগে চ'লে যা—আমি নিবেদিতাকে নিয়ে গাড়ী করে একটু পরেই যাচ্ছি।"

স্বামী যোগানন্দ শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া ট্রামে করিয়া আড়াইটা আন্দাজ রওনা হইলেন। তখন ঘোড়ার ট্রাম। বেলা প্রায় ৪টার সময় পশুশালায় উপস্থিত হইয়া তিনি বাগানের তদানীন্তন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু রামব্রহ্ম সান্ন্যাল রায় বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। স্বামীজি আসিতেছেন শুনিয়া রামব্রহ্ম বাবু সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন এবং স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বাগানের দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। প্রায় সাড়ে চারটার সময় স্বামীজি নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। রামব্রহ্ম বাবুও পরম সমাদরে স্বামীজি ও নিবেদিতাকে অভ্যর্থনা করিয়া পশুশালার ভিতরে লইয়া যাইলেন এবং প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল তাঁহাদের অনুগমন করিয়া বাগানের নানা স্থান প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন। স্বামী যোগানন্দও শিষ্যসমভিব্যাহারে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

রামব্রহ্ম বাবু উদ্ভিদবিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন, উদ্যানস্থ নানা বৃক্ষ দেখাইতে দেখাইতে উদ্ভিদ-শাস্ত্রের মতে বৃক্ষাদির কালে কিরূপ ক্রম-পরিণতি হইয়াছে কখন কখন তদ্বিষয় আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নানা জীব জন্তু দেখিতে দেখিতে স্বামীজিও মধ্যে মধ্যে জীবের উত্তরোত্তর পরিণতি সম্বন্ধে ডারুইনের (Darwin) মতের আলোচনা করিতে লাগিলেন। শিষ্যের মনে আছে, সর্প-গৃহে যাইয়া তিনি চক্রাঙ্কিতগাত্র একটা প্রকাণ্ড সাপ দেখাইয়া বলিলেন, "ইহা হইতেই কালে tortoise (কচ্ছপ) উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সাপই বহুকাল ধরিয়া একস্থানে বসিয়া থাকিয়া ক্রমে কঠোরপৃষ্ঠ হইয়া গিয়াছে।" কথাগুলি বলিয়াই স্বামীজি শিষ্যকে তামাসা করিয়া বলিলেন, "তোরা না কচ্ছপ খাস্? ডারুইনের মতে এই সাপই কাল-পরিণমনে কচ্ছপ

হয়েছে ;—তাহলে তোরা সাপও খাস্!" শিষ্য শুনিয়া ঘৃণায় মুখ বাঁকাইয়া বলিল—

"মহাশয়, একটা পদার্থ ক্রমপরিণতির দ্বারা পদার্থান্তর হইয়া যাইলে যখন তাহার পূর্ব্বাকৃতি ও স্বভাব থাকেনা তখন কচ্ছপ খাইলেই যে সাপ খাওয়া হইল একথা কেমন করিয়া বলিতেছেন?" শিষ্যের কথা শুনিয়া স্বামীজি ও রামব্রহ্ম বাবু হাসিয়া উঠিলেন এবং সিষ্টার নিবেদিতাকে ঐ কথা বুঝাইয়া দেওয়াতে তিনিও হাসিতে লাগিলেন। ক্রমে সকলেই যেখানে সিংহ ব্যাঘ্রাদি রক্ষিত ছিল সেই ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রামব্রহ্ম বাবুর আদেশে রক্ষকেরা সিংহব্যাঘ্রের জন্য প্রচুর মাংস আনিয়া আমাদের সম্মুখেই উহাদিগকে আহার করাইতে লাগিল। উহাদের সাহ্লাদ-গর্জ্জন এবং সাগ্রহ ভোজন শুনিবার ও দেখিবার অল্পক্ষণ পরেই উদ্যানমধ্যস্থিত রামব্রহ্ম বাবুর বাসাবাড়ীতে আমরা সকলে উপস্থিত হইলাম। তথায় চা ও জলপানের উদ্যোগ হইয়াছিল। স্বামীজি অল্পমাত্র চা পান করিলেন। নিবেদিতাও চা পান করিলেন। এক টেবিলে বসিয়া সিষ্টার নিবেদিতাস্পৃষ্ট মিষ্টান্ন ও চা খাইতে সঙ্কুচিত হইতেছে দেখিয়া স্বামীজি শিষ্যকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া উহা খাওয়াইলেন এবং নিজে জলপান করিয়া তাহার অবশিষ্ট শিষ্যকে পান করিতে দিলেন। অতঃপর ডারুইনের ক্রমবিকাশবাদ লইয়া কিছুক্ষণ কথোপকথন চলিতে লাগিল।

রামব্রহ্ম বাবুঃ—ডারুইন ক্রমবিকাশবাদ ও তাহার কারণ যে ভাবে বুঝাইয়াছেন তৎসম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?

স্বামীজিঃ—ডারুইনের কথা সঙ্গত হইলেও evolutionর কারণ সম্বন্ধে উহা যে চূড়ান্ত মীমাংসা একথা আমি স্বীকার করিতে পারিনা।

রামব্রহ্ম বাবুঃ—এ বিষয়ে আমাদের দেশে প্রাচীন পণ্ডিতগণ কোনরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন কি?

স্বামীজিঃ—সাংখ্যদর্শনে ঐ বিষয় সুন্দর আলোচিত হইয়াছে। ভারতের প্রাচীন দার্শনিকদিগের সিদ্ধান্তই ক্রমবিকাশের কারণ সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা বলিয়া আমার ধারণা।

রামব্রহ্ম-বাবুঃ—সংক্ষেপে ঐ সিদ্ধান্ত বুঝাইয়া বলা চলিলে শুনিতে ইচ্ছা হয়।

স্বামীজিঃ—নিম্ন জাতিকে উচ্চ জাতিতে পরিণত করিতে পাশ্চাত্য

মতে struggle for existence (জীবন-সংগ্রাম), survival of the fittest (যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন), natural selection (প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন) প্রভৃতি যে সকল নিয়ম কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সে সকল আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে। পাতঞ্জল-দর্শনে কিন্তু উহাদের একটীও কারণ বলিয়া সমর্থিত হয় নাই। পাতঞ্জলির মত হচ্ছে, এক species (জাতি) থেকে আর এক speciesএ (জাতিতে) পরিণতি "প্রকৃতির পূর্ণতা" (প্রকৃত্যা পুরা) দ্বারা সংসাধিত হয়। আবরণ বা obstacles এর সঙ্গে দিন রাত struggle (লড়াই) করে যে উহা সাধিত হয় তাহা নহে। আমার বিবেচনায় struggle (লড়াই) এবং competition (প্রতিদ্বন্দ্বিতা) জীবের পূর্ণতা লাভের পক্ষে অনেক সময় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। হাজার জীব ধ্বংস করে যদি একটা জীবের ক্রমোন্নতি হয় (যাহা পাশ্চাত্য দর্শন সমর্থন করে) তা হলে ব'লতে হয় এই evolution দ্বারা সংসারের বিশেষ কোন উন্নতিই হচ্ছে না। সাংসারিক উন্নতির কথা স্বীকার করিয়া লইলেও আধ্যাত্মিক বিকাশকল্পে উহা যে বিষম প্রতিবন্ধক একথা স্বীকার করিতেই হয়। আমাদের দেশীয় দার্শনিকগণের অভিপ্রায়, জীবমাত্রই পূর্ণ আত্মা। আত্মার বিকাশের তারতম্যেই বিচিত্রভাবে প্রকৃতির অভিব্যক্তি এবং বিকাশের প্রতিবন্ধকগুলি সর্ব্বতোভাবে সরে দাঁড়াইলেই পূর্ণভাবে আত্ম-প্রকাশ। প্রকৃতির অভিব্যক্তির নিম্নস্তরসমূহে যাহাই হোক্ উচ্চস্তরসমূহে কিন্তু প্রতিবন্ধকগুলির সঙ্গে দিন রাত যুদ্ধ করেই যে উহাদিগকে অতিক্রম করা যায় তাহা নহে। দেখা যায়, সেখানে, শিক্ষা দীক্ষা, ধ্যান ধারণা এবং প্রধানতঃ ত্যাগের দ্বারাই প্রতিবন্ধকগুলি স'রে যায় বা অধিকতর আত্মপ্রকাশ উপস্থিত হয়। সুতরাং obstacles গুলিকে আত্মপ্রকাশের কার্য্য না বলিয়া কারণরূপে নির্দ্দেশ করা এবং প্রকৃতির এই বিচিত্র অভিব্যক্তির সহায়কারী বলা যুক্তিযুক্ত নহে। হাজার পাপীর প্রাণ সংহার ক'রে জগৎ থেকে পাপ দূর করবার চেষ্টা দ্বারা জগতে পাপের বৃদ্ধিই হয়। কিন্তু উপদেশ দিয়ে জীবকে পাপ থেকে নিবৃত্ত করতে পারলে জগতে আর পাপ থাকেনা। এখন দেখুন পাশ্চাত্য struggle theory জীবসকলের পরস্পর সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা উন্নতিলাভরূপ মত কেমন horrible (ভীষণ) হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

রামব্রহ্ম বাবু স্বামীজির কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, অবশেষে

বলিলেন—"আপনার ন্যায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শনে অভিজ্ঞ লোকের ভারতবর্ষে এখন বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। ঐরূপ লোকেই একদেশদর্শী শিক্ষিত জনগণের ভ্রমপ্রমাদ অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতে সমর্থ। আপনার evolution theoryর নূতন ব্যাখ্যা শুনিয়া আমি পরম আহ্লাদিত হইলাম।"

বিদায় কালে রামব্রহ্ম বাবু বাগানের ফটক পর্য্যন্ত আসিয়া স্বামীজিকে বিদায় দিলেন এবং স্বামীজির সঙ্গে সুবিধামত পুনরায় একদিন নিরিবিলি দেখা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। রামব্রহ্ম বাবু এ জীবনে স্বামীজির নিকট আসিবার ঐ অবসর পাইয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না কারণ ঐ ঘটনার অল্প দিন পরেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শিষ্য স্বামী যোগানন্দের সহিত ট্রামে করিয়া রাত্রি প্রায় ৮টার সময় বাগবাজারে ফিরিয়া আসিল। স্বামীজি ঐ সময়ের প্রায় পনর মিনিট পূর্ব্বে ফিরিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা বিশ্রামান্তে তিনি বৈঠকখানায় আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন সেখানে স্বামী যোগানন্দ, ৺শরচ্চন্দ্র সরকার, শশীভূষণ ঘোষ (ডাক্তার), বিপিনবিহারী ঘোষ (ডাক্তার) শান্তিরাম ঘোষ প্রভৃতি পরিচিত বন্ধুগণ এবং স্বামীজির দর্শনাভিলাষে আগত অপরিচিত পাঁচ ছয় জন লোকও উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজি অদ্য পশুশালা দেখিতে যাইয়া রামব্রহ্ম বাবুর নিকট ক্রমবিকাশবাদের (evolution theory) অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন শুনিয়া, ইঁহারা সকলেই ঐ প্রসঙ্গ বিশেষরূপে শুনিবার জন্য ইতিপূর্ব্বেই সমুৎসুক ছিলেন। অতএব তিনি আসিবামাত্র সকলের অভিপ্রায় বুঝিয়া শিষ্য ঐ কথাই পাড়িল।

শিষ্য :—মহাশয়, পশুশালার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছিলেন তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। অনুগ্রহ করিয়া সহজ কথায় তাহা পুনরায় বলিবেন কি?

স্বামীজি :—কেন কি বুঝিস্ নি?

শিষ্য :—এই আপনি অন্য অনেক সময় আমাদের বলিয়াছেন যে বাহিরের শক্তিসমূহের সহিত সংগ্রাম করিবার ক্ষমতাই জীবনচিহ্ন এবং উহাই উন্নতির সোপান: আজ আবার যেন উল্‌টো কথা বলিলেন।

স্বামীজি :—উল্‌টো বল্‌বো কেন? তুইই বুঝ্‌তে পারিস্‌নি। Animal kingdom বা প্রাণীজগতে আমরা সত্য সত্যই struggle for existence, survival of the fittest প্রভৃতি নিয়ম স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই। তাই ডারুইনের

theory (মত) কতকটা সত্য বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু Human kingdom বা মনুষ্য জগতে যেখানে rationalityর (জ্ঞান বুদ্ধির) বিকাশ,সেখানে ঐ নিয়মের উল্‌টোই দেখা যায়। মনে কর্ যাদের আমরা really greatmen(বাস্তবিক বড়লোক)বা ideal (আদর্শ) বলে জানি তাদের বাহ্যিক struggle একেবারেই দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। Animal kingdom বা মনুষ্যেতর প্রাণীজগতে Instinct বা স্বাভাবিক জ্ঞানের প্রাবল্য। মানুষ কিন্তু যত উন্নত হয় ততই তাতে rationalityর (জ্ঞান বুদ্ধির) বিকাশ। এই জন্য animal kingdomএর ন্যায় rational human kingdomএ পরের ধ্বংস সাধন করে, progress (উন্নতি) হ'তে পারে না! মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ evolution (পূর্ণ বিকাশ) এক মাত্র sacrifice (ত্যাগের) দ্বারা সাধিত হয়। যে পরের জন্য যত sacrifice (ত্যাগ) কর্‌তে পারে মানুষের মধ্যে সে তত বড়। আর নিম্নস্তরের প্রাণীজগতে যে যত ধ্বংস কর্ত্তে পারে সে তত বলবান্ জানোয়ার হয়। সুতরাং struggle theory—(জীবন সংগ্রাম মত) ঐ উভয় রাজ্যে equally applicable (সমভাবে উপযোগী) হতে পারে না। মানুষের struggle (সংগ্রাম) হচ্ছে মনে। মনকে যে যত control (আয়ত্ত) কর্ত্তে পেরেছে সে তত বড় হয়েছে। মনের সম্পূর্ণ বৃত্তিহীনতায় আত্মার বিকাশ হয়। Animal kingdomএ (মানবেতরপ্রাণীজগতে) স্থূল দেহের সংরক্ষণে যে struggle (সংগ্রাম) পরিলক্ষিত হয় Human plane of existenceএ (মানবজগতে) মনের উপর আধিপত্য লাভের জন্য সত্ত্ববৃত্তিসম্পন্ন হবার জন্য সেই struggle (সংগ্রাম) চলেছে। জীবন্ত বৃক্ষ ও পুকুরের জলে পতিত বৃক্ষচ্ছায়ার ন্যায় মনুষ্যেতর প্রাণী ও মনুষ্যজগতে struggle (সংগ্রাম) বিপরীত দেখা যায়।

শিষ্য :—তাহা হইলে আপনি আমাদের শারীরিক উন্নতি সাধনের জন্য এত করিয়া বলেন কেন?

স্বামীজি:—তোরা কি আর মানুষ? তবে একটু rationality (জ্ঞান বুদ্ধি) আছে,এই মাত্র। Physiqueটা (দেহটা) ভাল না হলে মনের সহিত struggle (সংগ্রাম) কর্‌বি কি করে? তোরা কি আর জগতের highest evolution (পূর্ণ বিকাশ স্থল) মানুষপদবাচ্য আছিস্? আহার নিদ্রা মৈথুন ভিন্ন তোদের আর আছে কি? এখনো যে চতুষ্পদ হযে যাস্‌নি এই ঢের। ঠাকুর বল্‌তেন "মান হুঁস্ আছে যার সেই মানুষ" তোরাত "জায়স্ব ম্রিয়স্ব" বাক্যের

সাক্ষী হয়ে স্বদেশবাসীর হিংসার স্থল ও বিদেশীগণের ঘৃণার আস্পদ হয়ে রয়েছিস্। তোরা animal (মানবেতর প্রাণীর মধ্যে), তাই sturggle (সংগ্রাম) কত্তে বলি। থিওরি মিওরী রেখে দে। নিজেদের দৈনন্দিন কার্য্য ও ব্যবহারের স্থিরভাবে আলোচনা করে ছাখ দেখি তোরা animal and human planesএর (মানব এবং মানবেতর ভূমির) মধ্যবর্ত্তী জীববিশেষ কি না। Physique টাকে (দেহটাকে) আগে গ'ড়ে তোল। তবেত মনের উপর ক্রমে আধিপত্য লাভ হবে। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" বুঝ্লি?

শিষ্য ঃ—মহাশয়, "বলহীনেন" অর্থে ভাষ্যকার কিন্তু "ব্রহ্মচর্য্যহীনেন" বলেছেন!

স্বামীজি ঃ—তা বলুন্ গে। আমি বল্ছি "The physically weak are unfit for the realisation of the Self" (দুর্ব্বল শরীরে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয় না)।

শিষ্য ঃ—কিন্তু সবল শরীর অনেক জড়বুদ্ধিরও তো দেখা যায়।

স্বামীজি ঃ—তাদের যদি তুই যত্ন করে ভাল idea (ভাব) একবার দিতে পারিস্ তা হলে তারা যত শীগ্গির তা work out (কার্য্যে পরিণত) কর্ত্তে পারবে, হীনবীর্য্য লোক তত শীগ্গির পারবে না। দেখ্ছিস্ না ক্ষীণশরীরে কাম ক্রোধের বেগধারণ হয় না। শুঁটকো লোকগুলো শীগ্গির রেগে যায়—শীগ্গির কামমোহিত হয়।

শিষ্য ঃ—কিন্তু ঐ নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়।

স্বামীজি ঃ—তা নাই কে বল্ছে? মনের উপর একবার control (আধিপত্য লাভ) হয়ে গেলে, দেহ সবল থাক বা শুকিয়েই যাক তাতে আর কিছু আসে যায় না। মোট কথা হচ্ছে physique (শরীর) ভাল না হলে সে আত্মজ্ঞানের অধিকারীই হতে পারে না। ঠাকুর বল্তেন শরীরে এতটুকু খুঁত থাক্লে জীব সিদ্ধ হ'তে পারে না। কথাগুলি বলিতে বলিতে স্বামীজি খুব উত্তেজিত হইয়াছেন দেখিয়া শিষ্য সাহস করিয়া আর কোন কথা বলিতে পারিল না। স্বামীজির সিদ্ধান্তই অবিসংবাদী বলিয়া গ্রহণ করিয়া স্থির হইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজি রহস্য করিয়া উপস্থিত সকলকে বলিতে লাগিলেন—আর এক কথা শুনেছেন, আজ এই ভট্‌চায বামুন নিবেদিতার এঁটো খেয়ে এসেছে। তার ছোঁয়া মিষ্টান্ন না হয়

খেয়েছিল, তাতে তত আসে যায় না, কিন্তু তার ছোঁয়া জলটা কি করে খেলে?

শিষ্য:—তা আপনিই ত আদেশ করেছিলেন। গুরুর আদেশে আমি সব করতে পারি। জলটা খাইতে কিন্তু আমি নারাজ ছিলাম। আপনি পান করিয়া দিলেন কাজেই প্রসাদ বলিয়া খাইতে হইল।

স্বামীজি:—তোর জাতের দফা রফা হয়ে গেছে। এখন আর তোকে কেউ ভট্‌চায্ বামুন বলে মানবে না।

শিষ্য:—না মানে নাই মানুক। আমি আপনার আদেশে চণ্ডালের ভাতও খাইতে পারি। কথা শুনিয়া স্বামীজি ও উপস্থিত সকলে হো হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

কথাবার্ত্তায় রাত্রি প্রায় ১২৷৷০ হইযা যাইল। শিষ্য ঐ রাত্রে বাসা-বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ডাকাডাকি করিয়া কাহাকেও জাগাইতে না পারিয়া তাহাকে অগত্যা বাসার রোয়াকে শুইয়া সে রাত্রি যাপন করিতে হইযাছিল।

কালচক্রের কঠোর পরিবর্ত্তনে স্বামীজি, স্বামী যোগানন্দ ও ভগ্নী নিবেদিতা আজ আর নবশরীরে নাই। তাঁহাদের জীবনের পবিত্র স্মৃতিমাত্রই কেবল পড়িয়া রহিয়াছে! এবং তাঁহাদের কথাবার্ত্তার যৎকিঞ্চিৎ মাত্র লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়া শিষ্য আপানাকে ধন্য মনে করিতেছে।

জাতীয় ভিত্তিতে হিন্দুধর্ম্মের পুনর্ব্বোধন।

(প্রবুদ্ধ ভারত, সেপ্টেম্বর ১৮৯৮)

সম্প্রতি 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র জনৈক প্রতিনিধি কতকগুলি বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মতামত জানিবার জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি সেই আচার্য্যশ্রেষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করেন,

"স্বামীজি, আপনার মতে আপনার ধর্ম্মপ্রচারের বিশেষত্ব কি?"

স্বামীজি প্রশ্ন শুনিবামাত্র উত্তর করিলেন, 'পরব্যূহভেদ (aggression), অবশ্য এই শব্দ কেবল আধ্যাত্মিক অর্থেই ব্যবহার

করিতেছি। অন্যান্য সমাজ ও সম্প্রদায় ভারতের সর্ব্বত্র ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধের পর আমরাই প্রথম ভারতের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছি এবং সমগ্র জগতে ধর্ম্মপ্রচারের তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে চেষ্টা করিতেছি।"

"আর ভারতের পক্ষে আপনার ধর্ম্মান্দোলন কোন্ উদ্দেশ্য সাধন করিবে বলি। আপনি মনে করেন?"

"হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ ভিত্তি সমূহ আবিষ্কার এবং ঐ গুলিকে জাতীয় দৃষ্টি-সমক্ষে জাগ্রত করিয়া দেওয়া। বর্ত্তমান কালে হিন্দু বলিতে ভারতের তিনটী সম্প্রদায় বুঝায়। ১ম গোঁড়া বা গতানুগতিক সম্প্রদায়; ২য় মুসলমান আমলের সংস্কারক সম্প্রদায় সমূহ এবং ৩য়, বর্ত্তমান কালের সংস্কারক সম্প্রদায়সমূহ। আজকাল দেখি উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত সকল হিন্দু কেবল একটী বিষয়ে একমত—গোমাংস ভোজনে সকল হিন্দুরই আপত্তি।"

"বেদবিশ্বাসে কি সকলেই একমত নহে?"

"মোটেই না। ঠিক এইটীই আমরা পুনরায় জাগাইতে চাই। ভারত এখনও বুদ্ধের ভাব আত্মসাৎ করিতে পারে নাই। বুদ্ধের বাণী শুনিয়া প্রাচীন ভারত মন্ত্রমুগ্ধবৎই হইয়াছে, নববলে সঞ্জীবিত হয় নাই।"

"বর্ত্তমান কালে ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের গৌরব আপনি কি বিষয়ে প্রতি-ভাত দেখিতেছেন?"

"বৌদ্ধধর্ম্মের গৌরব ত সর্ব্বত্র জাজ্জ্বল্যমান দেখা যায়। আপনি দেখিবেন, ভারত কখন কোন কিছু পাইয়া আবার হারায় না, কেবল উহাকে আয়ত্ত করিতে—নিজের রক্তমাংস করিয়া লইতে—সময়ের প্রয়োজন হয়। বুদ্ধ যজ্ঞে প্রাণিবধের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন—ভারত সেই ভাব আর ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে নাই। বুদ্ধ বলিলেন, 'গোবধ' করিও না, —এখন দেখ আমাদের পক্ষে গোবধ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

"স্বামীজি, আপনি পূর্ব্বে যে তিন সম্প্রদায়ের নাম করিলেন, তন্মধ্যে আপনি নিজেকে কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করেন?"

"স্বামীজি বলিলেন,—"আমি উক্ত সমুদয় সম্প্রদায়ভুক্ত। আমরাই ঠিক্ গোঁড়া হিন্দু।"

এই কথা বলিয়াই তিনি সহসা প্রবল আবেগভরে ও গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কিন্তু ছুঁৎমার্গের সহিত আমাদের কিছুমাত্র সংস্রব নাই। উহা

হিন্দুধর্ম্ম নহে, উহা আমাদের কোন শাস্ত্রে নাই। উহা প্রাচীন আচারের অননুমোদিত একটি কুসংস্কার—আর চিরদিনই উহা জাতীয় অভ্যুদয়ের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়াছে।"

"তাহা হইলে আপনি আসল চান এই জাতীয় অভ্যুদয়?"

"নিশ্চিত। ভারত কেন সমগ্র আর্য্যজাতির পশ্চাদ্দেশে পড়িয়া থাকিবে, তাহার কি কোন যুক্তি আপনি নির্দ্দেশ করিতে পারেন? ভারত কি বুদ্ধিবৃত্তিতে হীন? না কলা-কৌশলে? উহার শিল্প, উহার গণিত, উহার দর্শনের দিকে দেখিলে আপনি কি উহাকে কোন বিষয়ে হীন বলিতে পারেন? কেবল প্রয়োজন এইটুকু যে, তাহাকে মোহনিদ্রা হইতে—শত শত শতাব্দীব্যাপী দীর্ঘ নিদ্রা হইতে—জাগিতে হইবে এবং জগতের সমগ্র জাতির মধ্যে তাহার যে প্রকৃত কার্য্য, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে।"

"কিন্তু ভারত চিরদিনই গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। উহাকে কার্য্যকুশল করিবার চেষ্টা করিতে গেলে উহা নিজের একমাত্র সম্বল—ধর্ম্মরূপ পরম ধন হারাইতে পারে, আপনার এরূপ আশঙ্কা হয় না কি স্বামীজি?"

"কিছু মাত্র হয় না। অতীতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, এতদিন ধরিয়া ভারতে আধ্যাত্মিক বা অন্তর্জ্জীবন ও পাশ্চাত্যদেশের বাহ্য জীবন বা কর্ম্মকুশলতা বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে। এ পর্য্যন্ত উভয়েই বিপরীত পথে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছিল; এক্ষণে উভয়ের সম্মিলনের কাল উপস্থিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ পরমহংস গভীর অন্তর্দৃষ্টি পরায়ণ ছিলেন, কিন্তু বহির্জ্জগতেও তাহার মত কর্ম্মতৎপরতা আর কাহার আছে? ইহাই রহস্য। জীবন,—সমুদ্রের ন্যায় গভীর হইবে বটে, আবার আকাশের মত প্রশস্ত হওয়াও চাই।"

স্বামীজি বলিতে লাগিলেন:—

"আশ্চর্য্যের বিষয় অনেক সময় দেখা যায়, বাহিরের পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি সঙ্কীর্ণতার পরিপোষক ও উন্নতির প্রতিকূল হইলেও আধ্যাত্মিক জীবন খুব গভীরভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই দুই বিপরীত ভাবের পরস্পর একত্রাবস্থান আকস্মিক মাত্র, অপরিহার্য্য নহে। আর যদি আমরা ভারতে ঐ বিষয়টার প্রতীকার করিতে পারি, তবে সমগ্র জগৎও ঠিক পথে চলিবে। কারণ, মূলে আমরা কি সকলেই এক নহি?"

"স্বামীজি, আপনার শেষ মন্তব্যগুলি শুনিয়া আর একটী প্রশ্ন মনে উদয় হইতেছে। এই প্রবুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মে শ্রীরামকৃষ্ণের স্থান কোথায়?"

স্বামীজি বলিলেন,

"এ বিষয়ের মীমাংসার ভার আমার নহে। আমি কখন কোন ব্যক্তি-বিশেষকে প্রচার করি নাই। আমার নিজের জীবন এই মহাত্মার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাভক্তিবশে পরিচালিত, কিন্তু অপরে আমার এই ভাব কতদূর গ্রহণ করিবে, তাহা তাহারা নিজেরাই স্থির করিবে। যতই বড় হউক, কেবল একটী নির্দ্দিষ্ট জীবনখাত দিয়াই চিরকাল জগতে ঐশীশক্তিস্রোত প্রবাহিত হয় না। প্রত্যেক যুগকে নূতন করিয়া আবার ঐ শক্তি লাভ করিতে হইবে। কারণ আমরাও কি সকলে ব্রহ্মস্বরূপ নহি?"

"ধন্যবাদ। আমার আপনাকে আর একটীমাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার আছে। আপনি আপনার নিজ জাতির পক্ষে আপনার প্রচারকার্য্যের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা বর্ণন করিয়াছেন। এই ভাবে উহার প্রণালীটী এখন বর্ণনা করিবেন কি?"

স্বামীজি বলিলেন,

"আমাদের কার্য্যপ্রণালী অতি সহজেই বর্ণিত হইতে পারে। ঐ প্রণালী আর কিছুই নহে কেবল জাতীয় জীবনাদর্শকে পুনরায় স্থাপিত করা। বুদ্ধ ত্যাগ প্রচার করিলেন, ভারত শুনিল, কিন্তু ছয় শতাব্দী যাইতে না যাইতে সে তাহার সর্ব্বোচ্চ গৌরবশিখরে আরোহণ করিল। ইহাই রহস্য। ত্যাগ ও সেবাই ভারতের জাতীয় আদর্শ—ঐ দুইটী বিষয়ে উহাকে উন্নত করুন, তাহা হইলে অবশিষ্ট যা কিছু আপনা আপনিই উন্নত হইবে। এদেশে ধর্ম্মের নিশান যতই উচ্চ করা হউক, কিছুতেই পর্য্যাপ্ত হয় না। কেবল ইহার উপরেই ভারতের উদ্ধার নির্ভর করিতেছে।"

———

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

গ্রীক দর্শন

মেগারা সম্প্রদায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা গত প্রবন্ধে মেগারা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাতার মতামত মোটামুটী ভাবে ব্যক্ত করিয়াছি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে উক্ত সম্প্রদায়ের একটু বিশদ বিবরণ প্রদানপূর্ব্বক অন্য সম্প্রদায়ের কথা আরম্ভ করিব।

ইন্দ্রিয়লব্ধ বস্তুজ্ঞান ভ্রান্তিমাত্র, বস্তুর সূক্ষ্ম ভাবটীকে (concept) হৃদয়ঙ্গম করিলে তবেই বস্তুসম্ভাব যথার্থ জ্ঞানলাভ হয়,—সক্রেটীস-প্রচারিত এই তথ্যটী ইউক্লিড্‌স্ সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়, তাই দেখি তিনি ইন্দ্রিয়গোচর বাহ্যবস্তু বা জড়ের (matter) অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেন। ইন্দ্রিয়ানুভূতি দ্বারা যে বাহ্যবস্তুর প্রতীতি জন্মে তাহা মিথ্যা, কারণ বস্তুর অপরিবর্ত্তনীয়ভাব ইন্দ্রিয়গোচর নহে; সুতরাং স্থূল জড়জ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান। ইলিয়াটিকগণের ও সক্রেটীসের যুক্তি ছাড়া নিম্নলিখিত যুক্তিটীর সাহায্যেও জড়ের অস্তিত্ব অসিদ্ধ হইয়া পড়ে,—এই যুক্তি ইউক্লিড্‌স্ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত বলিয়া কথিত, যথা :—যে কোন জড় বস্তু লও না কেন তাহাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাগ করা সম্ভব, সেই ক্ষুদ্র অংশগুলি ক্ষুদ্রতর অংশে, এবং সেই ক্ষুদ্রতর অংশ আবার তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতম অংশে বিভাজ্য; এই বিভাগের অন্ত পাওয়া যায় না সুতরাং মূল পরমাণুর সত্তা সিদ্ধ হয় না। পরমাণুর অস্তিত্ব অসিদ্ধ হইলে জড়ের বাস্তবিক সত্তা আর কোথায় রহিল? ইন্দ্রিয়গোচর বাহ্য জগৎ জড়মাত্র সুতরাং বাহ্য জগতের অস্তিত্ব নাই। জড় প্রতীতিমাত্র (phenomena) সুতরাং বাহ্য জগতও তাহাই। এক হিসাবে জড়জগৎ পরিবর্ত্তনপরম্পরা মাত্র সুতরাং অসৎ; অন্য হিসাবে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতিমাত্র সুতরাং অসৎ। পাঠকবর্গ বুঝিবেন জড়ের অস্তিত্ব অসিদ্ধ করিবার প্রধান যুক্তি ইলিয়াটিক দর্শন হইতে গৃহীত; বিভিন্ন ভাবে দেখিলে দুইটী তর্কপ্রণালী ভিন্নরূপ বলিয়া বোধ হয় কিন্তু মূলে তাহারা এক, কারণ ইন্দ্রিয়ানুভূতি পরিবর্ত্তন-

পরম্পরা মাত্র অবধারণ করিতে সমর্থ; অপরিবর্ত্তনীয় বস্তুর সত্তা "ভাব (concept) লব্ধ" জ্ঞানের বিষয়। জড়বস্তুর সত্তাকে অসিদ্ধ প্রমাণ করিয়া ইউক্লিড্‌স্ প্রচার করেন যে অজড় সূক্ষ্ম ভাবসমূহই একমাত্র বাস্তবিক (not material things but immaterial groups of things admit of true being)। মেগারা সম্প্রদায় ইলিয়াটিক মতের অনুগামী, তাঁহাদের মতে ভাবপদার্থের বিশেষ বা ব্যষ্টিভাব (Individuality) অস্বীকার্য্য , সাধারণ বা সমষ্টি ভাবই (general ideas) একমাত্র প্রকৃত সত্তা। ইউক্লিডস্ শিষ্য ষ্টিল্‌পো (Stilpo) বলেন :—বিশেষ ভাব সাধারণ ভাব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ; সাধারণ ভাবটী বিশেষ পদার্থে প্রয়োগ করা অযৌক্তিক, মনুষ্য বলিতে কোন বিশেষ লোককে বুঝায় না, মনুষ্যের "ভাব" ও কোন ব্যক্তিবিশেষের 'ভাব' এক নয়,—মনুষ্য বলিতে একটী বিশ্বজনীন ভাব বুঝায়, সে বিশ্বজনীন ভাব (something universal) কোন ব্যক্তিবিশেষে লক্ষিত হয় না। প্লেটোর (Plato) দর্শন এই ভাবপদার্থের (general ideas) উপর প্রতিষ্টিত কিন্তু তাঁহার মতে এই ভাবপদার্থ চৈতন্য শক্তি-সমন্বিত, (living spiritual forces) কিন্তু ইউক্লিড্‌স্ মতে শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার্য্য নহে, কারণ তাহা হইলে পরিবর্ত্তনের সত্যতাও স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং (Euclides) ইউক্লিড্‌সের ভাব পদার্থকে শক্তিমান বলা চলে না।

কূটতর্ক প্রণালী অবলম্বনে প্রতিপক্ষকে বিধ্বস্ত করা ইউক্লিড্‌সের অভিপ্রায় ছিল না। সত্যনির্দ্ধারণে ঐ প্রণালী অবলম্বন করা কখনও কখনও তাঁহার পক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। তবুও উক্ত সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী কোন কোন দার্শনিককে সোফিষ্ট শ্রেণীভুক্ত করা হয়। পরন্তু তাহাদিগকে সোফিষ্ট শ্রেণীমধ্যে গণ্য করিলেও তাঁহাদের যুক্তিতর্ক একেবারে অগ্রাহ্যের বিষয় নয়—উপহাসের কথা নয়। আপতঃ দৃষ্টিতে দেখিলে তাঁহাদের উত্থাপিত প্রশ্নসকল অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সে প্রশ্নগুলি পাণ্ডিত্যাভিমান দূর করিয়া সত্য লাভের সহায় হইতে পারে, সুতরাং সুধী পাঠকবর্গের বিদিতার্থে আমরা কয়েকটী যুক্তিতর্ক লিপিবদ্ধ করিলাম। দর্শনশাস্ত্রে মিথ্যা জ্ঞানেরও স্থান আছে সুতরাং এই সকল যুক্তি তর্ক একেবারে উপেক্ষণীয় নয়, বিশেষতঃ ইহাদের মধ্যে ভাবিবার বিষয়ও যথেষ্ট আছে :—

(১) যদি কোন লোক মিথ্যা কথা বলিবার সময় সে কথা স্বীকার করে তাহা হইলে কি স্থির হইবে? সে মিথ্যাবাদী না সত্যবাদী?

এই প্রশ্নটী একটী উদাহরণদ্বারা অন্যরূপে ব্যক্ত করি—কোন দেশে নদী পার হইবার একটী সেতু ছিল এবং সে দেশে এই নিয়ম ছিল যে সেতু পার হইবার সময় যিনি মিথ্যা কথা বলিবেন তাহাকে নদীর অপর পারে স্থাপিত ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে; এবং যিনি সত্য কথা বলিবেন তাহাকে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলান হইবে না। এখন একটী লোক পার হইবার সময় যদি বলে সে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলিবার নিমিত্ত নদী পার হইতেছে তাহা হইলে তাহাকে কি করা যাইবে?

[সোফিষ্টগণ প্রচার করিয়াছিলেন, সত্য কি তাহা বলা যায় না, কিন্তু তাহাদেরই অস্ত্রে তাহাদের যুক্তি খণ্ডিত হয়—যথা, যাহা সত্য তাহা বলা যায় না, সুতরাং তুমি যখন বলিতেছ সত্য কি বলা যায় না, তোমার সে কথাই মিথ্যা।]

(২) কে গোপনে আছে তুমি কি জান ?

এখানকার যুক্তি এইরূপ

তুমি তোমার পিতাকে জান ?—নিশ্চয়ই।

এই পর্দ্দার ভিতরে কে আছে তুমি জান ?—না।

ইনিই তোমার পিতা।

সুতরাং তুমি তাঁহাকে জানও বটে জান নাও বটে।

(সোফিষ্টগণ প্রচার করিয়াছিলেন যাহা অজ্ঞাত তাহা জানা যায়—এই যুক্তি তাহারই অনুরূপ।)

(৩) তুমি কি সিং হারাইয়াছ ?

যদি বল না, তাহা হইলে বুঝায় তোমার সিং আছে কারণ যাহা তুমি হারাও নাই তাহা তোমার থাকিবারই কথা। কিন্তু আবার তুমি বলিতেও পার না যে হারাইয়াছি কারণ তাহা হইলে তোমার সিং থাকা প্রমাণ হইয়া পড়ে।

(৪) কতগুলি কণায় স্তূপ হয় বলিতে পার? ১টী? না,২টী? না,৩টী? না। তুমি এমন কোন সংখ্যা উল্লেখ করিতে পারিবেনা যাহা স্তূপ ও কণায় মধ্যে সীমা নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ। এমন কোন সংখ্যা নাই যাহার পরবর্ত্তী সংখ্যায় কণা স্তূপে পরিণত হয়,কারণ তাহা হইলে একটী কণার যোগে কণা-স্তূপ হওয়া সম্ভব হয়। সুতরাং কণা ও স্তূপের ভেদ বিজ্ঞানসম্মত নয়।

(৫) কতগুলি সংখ্যা মিলিয়া বহু হয়?

(৬) কতগুলি চুল না থাকিলে টাক পড়া মাথা বলা চলে?

এই সকল প্রশ্নগুলি সাধারণ কথায় (Fallacies of Eubulides) ইউবিউলাইডিসের প্রচারিত হেত্বাভাস বলিয়া কথিত (ইউবিউলাইডিস্ ইউক্লিডিসের পরবর্ত্তী দার্শনিক), কিন্তু এ সকল প্রশ্নের গূঢ়ার্থ চিন্তার বিষয়। বাস্তব জগতে আমরা বহু ও এক, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ইত্যাদির ভেদ না মানিয়া থাকিতে পারি না কিন্তু যুক্তিবলে সে ভেদ নির্দ্ধারণ করা দুরূহ ব্যাপার। ইন্দ্রিয়ানুভূতি যে ভ্রান্তি মাত্র—এ প্রশ্নগুলি মেগেরা সম্প্রদায়ের মতে ঐ সিদ্ধান্তের পরিপোষক।

এই সম্প্রদায়ের অন্যতম দার্শনিক Diodorus ডায়োডোরসএর কয়েকটি যুক্তি এইবার আমরা আলোচনা করিব তন্মধ্যে "গতির" বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তির প্রয়োগ হইয়াছে তাহাই প্রথমে আলোচ্য :—

(ক) যদি বল কোন বস্তু গতিশীল তাহা হইলে ইহা যে দেশ অধিকার করিয়া আছে সেইখানে ইহার গতি উৎপন্ন হউক, কিম্বা তদ্ভিন্ন অন্য দেশে হউক। কিন্তু যে দেশ ইহা অধিকার করিয়া রহিয়াছে সেখানে তাহার স্থিতিই সম্ভব, সেখানে গতি উৎপন্ন হওয়ার কোন অর্থই নাই। এবং যে দেশে ইহা অবস্থিত নহে সেখানে ইহা দ্বারা বা ইহার প্রতি কোন ক্রিয়াই সম্ভব নয়। সুতরাং গতি অসম্ভব।

(খ) গতিশীল বস্তু অবশ্য দেশেই অবস্থান করিতেছে যাহা এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে দেশে অবস্থান করিতেছে তাহার স্থিতিই রহিয়াছে সুতরাং গতিশীল বস্তু প্রতি বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে স্থিরই রহিয়াছে প্রতিপন্ন হয়। তবে আর গতি কোথায়?

(গ) [এই যুক্তিতে বস্তুর ও দেশের অণুত্ব ও অসংখ্যকত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে] কোন পরমাণু যখন (ক) দেশবিন্দুকে অধিকার করিয়া আছে ততক্ষণ তাহার গতি নাই। এখন মনে কর পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তে ইহা (খ) দেশবিন্দুতে গমন করিল। কিন্তু (খ) দেশবিন্দুতে গমন বলিতে সেই পরমাণুর (খ) বিন্দুকে অধিকার করাই বুঝায়, সুতরাং তখনও (খ) বিন্দুতে পরমাণুর স্থিতিই বোধগম্য। (ক) বিন্দু হইতে (খ) বিন্দুতে গতির এ ভাব বুদ্ধির অতীত।

(ঘ) [এই যুক্তিতে গতির মধ্যে অংশগত ও সর্ব্বগত ভেদ স্বীকার করা হইয়াছে।]

কোন বস্তুর গতি উৎপন্ন হইলে তাহার পরমাণুপুঞ্জের মধ্যে অধিক সংখ্যক পরমাণুগুলি (majority) প্রথমে গতিসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। সেই-গুলির মধ্যে আবার অধিক সংখ্যক কতকগুলি (majority) তাহার পূর্ব্বে গতিসম্পন্ন হওয়া চাই। এখন মনে করুন কোন একটী বস্তুর ১০০০ পরমাণু আছে তাহাদের মধ্যে ৫০১টী পরমাণু প্রথমে গতিসম্পন্ন হইলে তবেই সেই বস্তুটী গতিশীল হইতে পারে। এবং সেই ৫০১টী পরমাণুর মধ্যে আবার ২৫৬টী তাহার পূর্ব্বে গতিসম্পন্ন হওয়া চাই। এইরূপে দেখিব অবশেষে ২টী পরমাণু প্রথমে গতিসম্পন্ন হওয়া দরকার। কিন্তু আবার ২টী গতিসম্পন্ন পরমাণু ৯৯৮টী পরমাণুর স্থিতি নষ্ট করিতে অক্ষম। সুতরাং গতির উৎপত্তি অসম্ভব। সুধী পাঠকবর্গ বুঝিবেন জেনোর (Zeno) যুক্তিই ডায়োডোরাসের প্রধান অবলম্বন। তবে মেগারা সম্প্রদায়ের প্রভাবে তাঁহার (জেনোর) যুক্তিগুলি সামান্যভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

এখানকার বক্তব্য এই যে গতি বলিতে কেবলমাত্র বর্ত্তমান কালকে বুঝায় না। তাই ডায়োডোরাস, একটী বস্তু এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিয়াছে, একথা অস্বীকার করিতেন না কিন্তু সেই সঙ্গে বলিতেন যে, যে কোন মুহূর্ত্ত লওনা কেন গতিশীল বস্তুটীর সেই মুহূর্ত্তে স্থিতি ভিন্ন কিছুই বোধগম্য হয় না।

অনুরূপ যুক্তিবলে ডায়োডোরাস ধ্বংসের অসম্ভাবনা (Impossibility of destruction) প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যথা—

একটী দেয়াল বলিতে কি বুঝায়? কতকগুলি ইষ্টক বা প্রস্তরের একত্র সমাবেশ। যতক্ষণ প্রস্তর বা ইষ্টকগুলি উক্তরূপে সন্নিবিষ্ট থাকে ততক্ষণ দেয়ালের অস্তিত্ব বর্ত্তমান। প্রস্তর বা ইষ্টকগুলিকে পৃথক করিয়া ফেলিলে আর দেয়ালই থাকে না, সুতরাং তখন দেয়ালের ধ্বংস হইল একথার অর্থ নাই, যাহা নাই তাহার আবার ধ্বংস কি?

ডায়োডোরাস্ বলিতেন—একটী বস্তু এ মুহূর্ত্তে এখানে ছিল পর মুহূর্ত্তে ওখানে আছে, একটী বস্তু এখন এক ছিল পর মুহূর্ত্তে সে বস্তু নাই—এ সকল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ঘটনা, কিন্তু তৎসত্ত্বেও গতির ভাব বা ধ্বংসের ভাব ধারণার অগম্য; বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবলে ধ্বংস বা গতির সদ্ভাব প্রতিপন্ন হয় না।

আর এক কথা গতিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে একথা ডায়োডোরাস্ অস্বীকার করিতেন না। তিনি বলিতেন কোন ঘটনা অতীত কালে সম্ভব হইতে

পারে কিন্তু বর্ত্তমানে সেটী অসম্ভব হওয়া আশ্চর্য্য নয়। মনে করুন একটী গোলককে ঊর্দ্ধে ছুড়িয়া দেওয়া হইল; যখন উহা ঊর্দ্ধে উঠিয়া ছাদে আঘাত করিল, সেই মুহূর্ত্তে বলা চলেনা যে বলটী ঊর্দ্ধে উঠিতেছে অথচ বাস্তবিকই অতীতকালে ঊর্দ্ধে গমন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে ছাদ স্পর্শ করাটাই সত্য, গতিটা অসত্য।

এইরূপ যুক্তি তর্কের একটী গূঢ়ার্থ জনৈক দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসলেখক (Relter) বেশ সুন্দররূপে আবিষ্কার করিযাছেন, তিনি বলেন (The good) কল্যাণই একমাত্র চরমবস্তু—সক্রেটীসপ্রচারিত এই তত্ত্ব মেগারা সম্প্রদায় সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত যুক্তিতর্কের উদ্দেশ্য এই যে "কল্যাণ" যে উপায়ে সাধিত হইতে পারে তাহা মিথ্যা হইলেও "কল্যাণ"টী বাস্তবিক সত্য, কারণ উপায় অতীত কালের অপেক্ষা রাখে।

এইবার আমরা ডায়োডোরাসের তৃতীয় যুক্তি আলোচনা করিব, মূল কথা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এখানে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত একটু বলা আবশ্যক নচেৎ এই যুক্তিটী বোধগম্য হওয়া দুরূহ।

ইউক্লিডস্ প্রচার করিয়াছিলেন (Capacity does not exist beyond the time of its exercise) যাহা হইবার সম্ভাবনা আছে তাহার অস্তিত্ব নাই, যাহা বর্ত্তমান কালে বাস্তবিক আছে তাহাই সৎ। যদি বলা যায় কোন বস্তুর পরিবর্ত্তন হইবার সামর্থ্য আছে বা শক্তি আছে তবে বল দেখি সেই বস্তুর পরিবর্ত্তন হইল কখন? যখন সেই বস্তুটী নিজ সত্তায় বিদ্যমান তখন তাহার পরিবর্ত্তন হয় নাই, আর যখন সেই বস্তুটী সেই বস্তু নহে তখন সেই বস্তুর পরিবর্ত্তনের কোন অর্থই নাই, কারণ যাহা নাই তাহার আবার পরিবর্ত্তন কি? সুতরাং বস্তুটীর শক্তি যাহা আছে তাহা বর্ত্তমানেই আছে, সেই শক্তিবলে বস্তুটী তাহাই হইয়া আছে। ইউক্লিড্স "শক্তি" স্বীকার করিতেন না।

ডায়োডোরাসও ইউক্লিড্সের এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেন তবে তিনি একটু অন্যরূপ বুঝিতেন। তাঁহার কথা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্য আমরা একটী উদাহরণ লই।

একটী চিত্রকর কোন একখানি চিত্র অঙ্কন করিতেছেন। এখানে ডায়োডোরাস বলিবেন যে মুহূর্ত্তে সে সেই চিত্রটী অঙ্কন করিতেছে সেই মুহূর্ত্তেই শুধু তাহার সেই চিত্র অঙ্কন করিবার ক্ষমতা আছে। তাহার শিল্প বিদ্যার

জ্ঞান থাকা চাই এটী বলা নিষ্প্রয়োজন এবং সেই জ্ঞানই একজন সাধারণ মনুষ্য হইতে তাহার বিশেষত্বের পরিচয় প্রদান করে। কিন্তু তাই বলিয়া শুধু শিল্প-জ্ঞান থাকিলেই চিত্র অঙ্কন হয় না, মালমসলা ও সাজসরঞ্জাম এবং তাহার উপর প্রধানতঃ তাহার ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োজন। এই সকল বিভিন্ন কারণের সমবায় হইলেই তাহার চিত্রাঙ্কনকার্য্য সিদ্ধ হয়। চিত্রাঙ্কন ক্রিয়ার শক্তি বলিতে কেবলমাত্র শিল্পীর জ্ঞানকে বুঝায় না বা তাহার ইচ্ছাকে বুঝায় না মালমসলা ব্যতীত তাহার সে জ্ঞান পঙ্গু বিশেষ। যে মুহূর্ত্তে সমস্ত কারণ একত্রিত হয় সেই মুহূর্ত্তেই চিত্রাঙ্কনকার্য্য সম্পন্ন হয়। অন্য কথায়, যে মুহূর্ত্তে শিল্পী চিত্রাঙ্কন করে সেই মুহূর্ত্তেই শুধু চিত্রাঙ্কন সামর্থ্য বর্ত্তমান।

একই সিদ্ধান্ত বিভিন্ন যুক্তিবলে প্রতিপন্ন হওয়ায় ইউক্লিডস ও ডায়োডো-রাসের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। যাহা সম্ভব (possible) তাহাব অস্তিত্ব ইউক্লিডস্ অস্বীকার করিয়াছিলেন,ডায়োডোরাস তাহার সত্তা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, যখন দেখিতেছি কারণগুলির একত্র সমাবেশের উপর বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করে, তখন যে মুহূর্ত্তে সে সকলের সমাবেশ হইতে পারে নাই সে মুহূর্ত্তে বস্তুর বর্ত্তমান অস্তিত্ব না থাকিলেও বস্তুর সম্ভাবনা রহিয়াছে, এবং সেই সম্ভাবনা কারণসমূহের সমাবেশের উপর নির্ভর করে। এমন যদি হয় যে সকল কারণ কোন দিনই একত্রিত হইবে না তবে সে বস্তুটী অসম্ভব। যাহা অসম্ভব তাহার অস্তিত্ব নাই।

অতীতকালের ঘটনা আমাদের দৃষ্ট না হইলেও যেমন আমরা না দেখিয়া বলিয়া থাকি যে সে ঘটনা হইতেও পারে অর্থাৎ সে ঘটনার অস্তিত্ব স্বীকার করি, সেইরূপ ভবিষ্যৎ কালের ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান না থাকিলেও আমরা তাহার অস্তিত্ব সম্ভব একথা বলিতে পারি। যাহা অসম্ভব তাহার অস্তিত্বের কোন অর্থই নাই। * ডায়োডোরাসের মূল কথা এই যে যাহা অবশ্য সম্ভাব্য অর্থাৎ যাহা ঘটে বা ঘটিবেই, তাহাকেই শুধু সম্ভব বলা যায়; নচেৎ যাহা ঘটেও নাই ঘটিবেও না, অর্থাৎ যাহা অসম্ভব,

* পাঠকবর্গ বুঝিবেন এই স্থলে Uniformity of Nature তত্ত্বটির আভাস পাওয়া যাইতেছে। অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া নৈসর্গিক নিয়মের নিরবচ্ছিন্নতা সূচিত হইয়াছে। কালভেদে ঘটনার নিয়মের একবারে বিপর্য্যয় বা ব্যতিক্রম হইতে পারে না ; এ কালের ঘটনা অন্য কালের অঘটনা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না।

তাহার কোনরূপ অস্তিত্বই নাই। অস্তিত্ব মানে কোন না কোন কাজে সংঘটন।

পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য আমরা মূল বাক্য উদ্ধৃত করিলাম, কারণ এই যুক্তিতর্ক অতি প্রয়োজনীয় মনে হয়।

Possible is either what is actual or what will be actual.

From anything possible nothing impossible can result; but it is impossible that the past can be different to what it is, for had it been possible at a past moment, something impossible would have resulted from something possible. It was therefore never possible and generally speaking it is impossible that anything should happen differently to what has happened

(Zeller)

এই সম্প্রদায়ের (Stilpo) ষ্টিলপোর নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তিনি ইউক্লিডসের মতের অনুগামী ছিলেন একণে শুধু আমরা তাহার মতের বিশেষত্বটুকু প্রকাশ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। স্থানাভাববশতঃ আগামী বারে অন্য সম্প্রদায়ের কথা আরম্ভ করিতে হইবে।

Stilpo (ষ্টিল্‌পো) বলিতেন কর্ত্তৃপদ বা উদ্দেশ্যপদ (Subject) বিধেয় পদের (Predicate) সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারে না যদি উদ্দেশ্য ও বিধেয় অভিন্ন না হয়। "ক হয় ক" এরূপ প্রতিজ্ঞাই একমাত্র সত্য, "ক হয় খ" বা মানুষ হয় সৎ এরূপ প্রতিজ্ঞা অসৎ। কোনও বস্তুর "ভাব" (concept) অপর কোন বস্তুর "ভাব" হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন সুতরাং তাহাদিগকে এক করা যায় না।

আমাদের মনে হয় এই তর্কের মূলে ইলিয়াটিক দর্শনের মূল সিদ্ধান্ত নিহিত রহিয়াছে। সত্তা এক অপরিবর্ত্তনীয় হইলে ((Identical proposition) ক হয় ক এরূপ বাক্য or A is A (বা অভেদাত্মক প্রতিজ্ঞা) ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না।

ইউক্লিডস্ উদাহরণ প্রমাণ অগ্রাহ্য করিতেন, ষ্টিল্‌পো তাহাকে অনুসরণ করিতেন। অগ্রাহ্যের হেতু এই :—যে বস্তুটীর সহিত তুলনা দিতেছে সেই

বস্তুটী যদি তুলনার বস্তুর সহিত অভিন্ন হয় তবে সে তুলনা নিরর্থক ; আর যদি বিভিন্ন হয় তবে সে তুলনা অযৌক্তিক।

"কল্যাণ" ই একমাত্র সৎবস্তু এই কথা ইউক্লিডস্ প্রচার করেন। সুতরাং কল্যাণ ভিন্ন অন্য পদার্থের প্রতি মানুষের আকিঞ্চন থাকিতে পারে না। এইরূপ যুক্তি বলে ষ্টিল্‌পো প্রতিপন্ন করিয়াছেন বৈরাগ্যই একমাত্র লক্ষ্য, জ্ঞানীলোক অপর কোন কিছুর এমন কি বন্ধু বান্ধবেরও অপেক্ষা রাখে না সে আপনাতে আপনি তুষ্ট। শুনা যায় মেগারা নগর লুঠ হওয়ার পর এক জন লোক তাহার ক্ষতি সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দেন "তাঁহার জ্ঞান-ভাণ্ডার কেহত অপহরণ করিতে সমর্থ হয় নাই।" তাহার নৈতিক মত আলোচনা করিলে তিনি Cynic সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া মনে হয়। আগামী বারে এই সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করিব।

নর্ম্মদার পথে শঙ্কর।

(শ্রীমতী—)

মাতৃসকাশে সন্ন্যাসের অনুমতি পাইয়া বালক শঙ্কর আজ গৃহত্যাগী। উদ্দেশ্য যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিবেন, এবং সেই জন্য যোগীশ্বর গোবিন্দপাদের শরণ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু কোথায় সেই গোবিন্দপাদ? শুনিয়াছেন নর্ম্মদাতীরে মহাযোগী গোবিন্দপাদ গুহা মধ্যে অবস্থান করেন। তাই শঙ্কর গৃহত্যাগ করিয়া উত্তরাভিমুখে নর্ম্মদার পথে চলিয়াছেন।

শঙ্করের জন্মভূমি কালৃতিগ্রাম হইতে নর্ম্মদাতীর প্রায় দুইশত ক্রোশ দূর। এই দুইশত ক্রোশ অতিক্রম করিতে হইলে নানা রাজ্যের রাজপথ দিয়া এবং গিরিসঙ্কট, নদীতীর, অধিত্যকা, উপত্যকা, অরণ্যানী, গ্রাম, নগর প্রভৃতি নানা-স্থানের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। এই পথের পশ্চিম দিকে বিশাল অন্তগিরি সমুদ্রের ভীষণ তাড়না হইতে ভারতভূমিকে রক্ষা করিবার জন্যই যেন শতাধিক ক্রোশ ব্যাপিয়া বিরাট দেহে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান ; এবং অন্য দিকে বিদর্ভ, কিষ্কিন্ধ্যা প্রভৃতি ভারতের সমৃদ্ধিশালী জনপদসমূহ। এসময়

ভারতের কোনও একছত্র নরপতি ছিলেন না। পল্লব, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট প্রভৃতি রাজবংশীয়গণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া ভারতের এই ভূভাগ শাসন করিতেছেন। তাঁহারা সকলে শৈব, বৈষ্ণব, জৈন বা বৌদ্ধ প্রভৃতি নিজ নিজ ধর্ম্মমতের শ্রীবৃদ্ধির জন্য, অথবা নিজ আত্মীয় স্বজনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই যেন রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন; জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রজাবৃন্দের সুখসমৃদ্ধির প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি নাই, এজন্য প্রায়ই পরস্পরে তাঁহারা কলহরত এবং তাহার ফলে এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশসমূহ প্রায়ই অরণ্যে পরিণত। পথিপার্শ্বে কোথাও বা প্রাচীন যুগের কীর্ত্তিস্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ, কোথাও বা কতকালের ভগ্ন দেবমন্দির, বৌদ্ধস্তূপ, ভিক্ষুজনপরিত্যক্ত সুরম্য গিরিগুহা, আবার কোথাও বা নব সাজে সজ্জিত, নবোৎসাহে অনুপ্রাণিত নূতন নূতন দেবমন্দির, নবনির্ম্মিত বাসভবন, বিশাল দুর্গপ্রাচীর যেন দর্শকের নয়নযুগল আকৃষ্ট করিতেছে। কিন্তু বালক শঙ্করের দৃষ্টি কিছুতেই আকৃষ্ট হইতেছে না; নানা চিন্তায় তাঁহার হৃদয় নিমগ্ন থাকায় প্রবীণোচিত গাম্ভীর্য্যে বিমণ্ডিত হইয়া বালক আপন মনে পথ চলিতেছেন।

তিনি কখন ভাবিতেছেন, কিরূপে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিব —গুরুগৃহে বাস কালে সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ বেদান্ত সকলই অধ্যয়ন করিলাম, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস সবইত দেখিলাম,কিন্তু কই পরমাত্মসাক্ষাৎকার ত হইল না? এখনও ত সংশয় সমূলে উচ্ছিন্ন হইল না? সর্ব্বকারণের কারণ ভগবানকে যদি না পাইলাম, আত্মমধ্যে যদি তাঁহাকে অনুভব না করিলাম, যিনি আমার নিয়ন্তা ও অন্তর্য্যামী তাঁহার সহিত পূর্ণযোগ যদি আমার না ঘটিল তবে কেবল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কি লাভ হইল? এখনও ত আমি ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করিতে সক্ষম হইলাম না, এখনও ত আমার দেহাত্মবোধ অপনীত হইল না, এখনও ত আমার নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভ ঘটিল না? হায়! এ জীবনে কি গুরুর কৃপায় যোগসাধন করিয়া সমাধিলাভ ঘটিবে? হায়! এ জীবনে সমাধিসহায়ে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার কি হইবে? চিন্মাত্র স্বস্বরূপে অবস্থিতি করিয়া জীবনের চরম অভীষ্টলাভ কি করিতে পারিব? ইহা যদি না হয় তবে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া কি ফল হইল?

কখনও বা ভাবিতেছেন, এই ত আমি মৃত্যুমুখ হইতে সে দিন রক্ষা পাইয়াছি। জ্যোতির্ব্বিদগণ যে বলিয়াছিলেন আমার অষ্টম বর্ষে জীবন সং-

শয় হইবে, তাহা অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়াছে, এইত আমি কুন্তীর ক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছি কিন্তু ষোড়শবর্ষ কি অতিক্রম করিতে পারিব? আর তাহা পারিলে কি জীবনের যথার্থ চরিতার্থতা লাভ করিতে পারিব? তাঁহাদের মতে যদি বিশেষ গুরুকৃপা লাভ হয় তবেই ৩৩।৩৪ বৎসর বাঁচিতে পারি। আর যদিই তাই হয় তাহা হইলেও এই অল্প জীবনে কি আর করিতে পারিব? কতলোকে অতি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত যোগ অভ্যাস করিয়াও সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, আর আমি কি এই অল্প দিনে তাহা লাভ করিতে পারিব? আহা, ভগবান্ যদি আমায় দীর্ঘায়ু করিতেন।

কখন ভাবিতেছেন—না দীর্ঘায়ুর কি প্রয়োজন। ভগবান্ যদি সদয় হন, সদ্‌গুরু যদি কৃপা করেন, তাহা হইলে নিমেষমধ্যেই সব সিদ্ধ হইতে পারে। এই অনিত্য জগতে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিয়াই বা কি লাভ হইবে? না আমার দীর্ঘায়ুতে প্রয়োজন নাই; কামনা, তুমি দূর হও। মনুষ্যজীবনে যদি কিছু কামনা করিতে হয়, তাহা হইলে ভগবৎ কৃপালাভই এক মাত্র কামনার বিষয়। অনিত্য জগতে এক ব্রহ্ম ভিন্ন নিত্য বস্তু কোথায়? ব্রহ্মচিন্তা না করিয়া মায়ামোহে মুগ্ধ হইয়া জীব অনিত্য বস্তুর নিমিত্ত লালায়িত। এজগতে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কেহই ত কাহারও নয়। কর্ম্মক্ষয় হইলে কেহত কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। জগতে ভগবান্ ভিন্ন নিত্য সুখ কোথায়? আজ যাহা সুখের আকর কল্য তাহাই দুঃখের কারণ। আজ যাহাকে মিত্র বলিয়া গণ্য করি, দুইদিন পরে সেই ব্যক্তিই শত্রুবৎ আচরণ করে। আজ যাহাকে আশ্রয় করি, কল্য সে আমায় পরিত্যাগ করে। যে বস্তু আমার আনন্দ উৎপাদন করে, অপর ব্যক্তির তাহাই দুঃখের হেতু। আমি যাহাতে সন্তুষ্ট, অপরে তাহাতে বিরক্ত। সুতরাং প্রকৃত সুখ কোথায়? যথার্থ নিত্য বস্তু কোথায়? না,—কামনা, তুমি দূর হও। এ দেহ ত কিছু নয়। আমি ত এই দেহকে লইয়া। দুই দিন বাদে এই দেহ ত পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে। দেহ মধ্যস্থ আত্মাই পরমাত্মরূপে সমুদায় বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন, তিনিই নিত্য, তিনিই অবলম্বনীয়, তিনিই কামনীয়। যদি কেহ যথার্থ বাঁচিতে চাহে, তাহা হইলে তাঁহাকেই আশ্রয় করা আবশ্যক। তাঁহাকে জানিলেই জীব অমর হয়, তাঁহাকে না জানিলে জীবের জন্ম মরণের নিবৃত্তি কোথায়? জীবের শ্রেষ্ঠ জন্ম মানবজন্ম লাভ করিয়া কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি অনিত্য ভোগসুখে লিপ্ত থাকিতে পারে। কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রতিনিয়ত জন্ম

মৃত্যুর আবর্ত্তমে ঘুরিতে চাহে। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভই জীবের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাহার সাধনেই জীবের সার্থকতা। ইহা যদি না হইল তবে করিলাম কি?

এখন মনে করিতেছেন হায়! আমি কি জন্মিয়া, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ঘুরিয়া বেড়াইব; নিজের মুক্তিলাভ হইলেই কি আমার কর্ত্তব্য শেষ হইল? এই যে বেদ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায়, এই যে জগতের নরনারী ধর্ম্ম ভাবিয়া নানা অধর্ম্মে লিপ্ত, এই যে ভীষণ কাপালিককুলের বীভৎস ব্যবহারে শিষ্ট সমাজ আজ ভীত ও সন্ত্রস্ত; এই যে সকলে প্রলোভনে পড়িয়া, অথবা প্রবলের তাড়নায় শাস্ত্রবহির্ভূত আচরণে ব্যাপৃত, এই যে সকলে সেই এক পরমতত্ত্বকে ভুলিয়া নানা দেবদেবীর পূজায় আজ নিযুক্ত, এই যে কত জনে ভগবানকে ছাড়িয়া কেবলমাত্র যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্ম লইয়া উন্মত্ত, আহা! ইহাদের কি উপায় হইবে? আহা! আজ নাস্তিক ও বিভিন্ন মতবাদীর বিভিন্ন মত প্রচারে বৈদিক ধর্ম্ম দূষিত, অত্যাচার উৎপীড়ন ভয়ে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকুল বক্ষঃস্থিত রত্নের ন্যায় বেদচতুষ্টয় লইয়া গহন বনে লুক্কায়িত। ধর্ম্মের নামে অত্যাচার অনাচার এবং ব্যভিচারে দেশ ছারখার হইতেছে। আহা! কতলোক আজ ধর্ম্ম পিপাসায়, শান্তি কামনায়, সত্য জ্ঞান লাভের আশায়, ব্যাকুল, কিন্তু হায়, কেহই তাহা লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না। জ্ঞানান্ধ মানব নিয়তই যেন ভ্রমকূপে পতিত রহিয়াছে। হায়, জগতের এই হাহাকার নিবারণের কি কোনও উপায় নাই? এই মহা দুঃখ দূর করিবার কি কোনও পথ নাই? আহা, ইহাদের জন্য কি এ জীবনে কিছুই করিতে পারিব না? মানবের এই দুঃখের কোন প্রতীকার না করিয়া যদি মরিতে হয় তাহা হইলে এ জীবন লইয়া কি লাভ হইল?

তাহার পর ধর্ম্মই যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। পরোপকারই ত পরম ধর্ম্ম, পরোপকার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কি হইতে পারে? সত্য বটে অর্থ দানেও পরোপকার হয়, সেবা করিলেও পরোপকার সাধন হয়। কিন্তু জ্ঞানদান বা বিদ্যা দানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরোপকার। আবার সে জ্ঞান বা বিদ্যা যদি ব্রহ্মবিদ্যা হয়, ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তাহা হইলে তাহার আর তুলনাই হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানের অধিক জগতে কি আছে? আমি ত এই জন্যই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াছি। হায়, আমা দ্বারা কি এ কার্য্য কিছুই হইবে না?

আবার কখন বা বালকের হৃদয়ে বৃদ্ধা জননীর পবিত্র স্মৃতি উদিত হইল এবং সেই স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গেই জননীর চরণে সেই শেষ প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি যখনই ভাবেন য তিনি তাঁহার জননীকে তাঁহার অভীষ্ট দর্শন করাইবেন বলিয়া জননী তাঁহাকে সন্ন্যাসে অনুমতি দিয়াছেন, তখনই তাঁহার হৃদয় যেন বিকল হইয়া উঠিতেছিল; কারণ কতদিনে তাঁহার নিজের সিদ্ধিলাভ হইবে, তাহার পর তিনি তাঁহার জননীকে অভীষ্ট প্রদর্শন করাইবেন, তাহার ত কিছুই স্থিরতা নাই। যদি জননী ততদিন জীবিত না থাকেন অথবা যদি জননীর অন্তিম কালে তিনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে না পারেন তাহা হইলে ত জননীর নিকট তাঁহার সত্যরক্ষা হইবে না।

কখন বা ভাবিতে লাগিলেন কেনই বা আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না? যত্ন করিলে কি না সিদ্ধ হয়। চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? যদি ভগবান গোবিন্দপাদের কৃপালাভ করিতে পারি, তাহা হইলে এসব কিছুই দুর্লভ নহে। গুরু কৃপায় হয় না এমন কি আছে? বাস্তবিক ভগবান গোবিন্দপাদের ন্যায় যোগপ্রভাবসম্পন্ন মহাপুরুষ জগতে আর কে আছেন। তিনি সমাধি প্রভাবে কত সহস্র বৎসর জীবিত রহিয়াছেন। কি যোগশাস্ত্র, কি চিকিৎসাশাস্ত্র, কি শব্দশাস্ত্র, কি বেদ,বেদান্তশাস্ত্র তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই, তিনি যথার্থই সর্ব্বজ্ঞ। লোকে তাঁহাকে অনন্তের অবতার পতঞ্জলি-দেব বলিয়া থাকে। তাঁহার নিকট যোগশিক্ষা করিয়া সমাধি সাধন করিতে পারিলে আমার কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না ইহা নিশ্চিত। শরীর পতন কি মন্ত্রের সাধন। যখন জীবন পাইয়াছি তখন যথার্থ জীবন লাভ করিতেই হইবে। জয় গুরু গোবিন্দপাদের জয়, জয় ভগবান ভবানীপতির জয়,বৃথা চিন্তা করি কেন?

কখন বা মনে মনে নিজ কুলদেবতা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া বলিতেছেন হে ভগবান্, তোমার কৃপা হইলে জীবের কি না হইতে পারে! তুমি ত কল্প-তরু, জীবকে অভীষ্ট প্রদানের জন্য তুমিত সদাই প্রস্তুত, সদাই উদ্যত। জীব তোমার নিকট চাহিতে জানেনা তাই তাহার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়না। জীব মোহে মুগ্ধ হইয়া আজ যাহা চায় কল্য আর তাহা চায়না, আজ একরূপ চাহে পরদিন অন্যরূপ চাহিয়া বসে। মোহান্ধ জীবের মতি স্থির হয়না, তাই প্রভু, তাহাদের কামনাও সিদ্ধ হয়না। দোষদর্শী জীব তাহা বুঝেনা এজন্য

তোমাকেই দোষ দিয়া থাকে,—তোমার কল্পতরু নামে কলঙ্ক প্রদান করে। হে ভগবান্, তোমার কৃপায় যেন আমার জন্ম সার্থক হয়। তোমার কৃপায় এ দাস যেন জীবের দুঃখ মোচন করিতে সমর্থ হয়। তোমার আশীর্ব্বাদে যেন তোমারই বর্ণিত বেদবেদান্তের পুনঃ প্রসার করিতে পারি। জয় ভগবান্ বিশ্বপতির জয়, জয় ভগবান্ শ্রীহরির জয়।

একবার বা বালকের মনে যেন সংশয়ের উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, "আচ্ছা, ভগবান্ যদি সর্ব্বকর্ত্তা হন, তবে এ দোষ জীবেরই বা কেন? এ দোষ ত তাঁহারই হওয়া উচিত; আর যদি জীবের দোষ হয় তাহা হইলে তিনি সর্ব্বকর্ত্তা হইতে পারেন না। অথচ শাস্ত্রের উপদেশ ভগবানই সর্ব্বকর্ত্তা। তবে কি জীবের চেষ্টার ফল নাই? ভগবানের নিকট প্রার্থনার ফল নাই? তবে কি ভগবান্ যাহা করিবেন, তাহাই জীবকে করাইয়া থাকেন; অথচ জীব মনে করে "আমি করিতেছি" "ভগবান্ আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেছেন"? না-না-তাহা নহে ব্রহ্মই জীব ও জীবই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম জীবরূপে নিয়ম্য ও ঈশ্বররূপে নিয়ন্তা সাজিয়া এই লীলা করিতেছেন। শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে এই মতই অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ। তাহা হইলে আমার এই ইচ্ছাও যখন তাঁহার ইচ্ছা, ইহার সিদ্ধিও তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছা। হতাশা বা উৎকণ্ঠার ত কোন কারণ নাই, সিদ্ধিও তিনি অসিদ্ধিও তিনি, মন, বল "চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম শিবোঽহম"।

বালক শঙ্কর এইপ্রকার নানা চিন্তায় কখন আকুল কখন উৎসাহপূর্ণ, কখন মন্থরগতি কখন বা দ্রুতগতি। যখন হতাশের ভাব আসিতেছে তখন শঙ্করের পা আর চলে না, আবার যখন উৎসাহ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব আসিতেছে তখন শঙ্কর দ্রুতগতি। এইরূপে শঙ্কর আজ গুরু গোবিন্দপাদের উদ্দেশ্যে নর্ম্মদার পথে চলিয়াছেন; দিন নাই রাত নাই চলিয়াছেন, যেখানে নিতান্ত পথভ্রম হইবার সম্ভাবনা, সেখানে কেবল অপর পথিকের সঙ্গ লইতেছেন, যেখানে শরীর নিতান্ত শ্রান্ত ক্লান্ত, সেখানেই কেবল বিশ্রাম করিতেছেন। আর যেখানে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকাল হইতেছে, সেইখানেই কেবল সন্ধ্যাবন্দনার জন্য কিছুক্ষণ পথ চলা বন্ধ করিতেছেন।

এইভাবে শঙ্কর পথে যাইতে যাইতে কত সন্ন্যাসী, কত যোগীবরের কথা শুনিতেছেন, কত মহাত্মার দর্শন পাইতেছেন, কত মহাপুরুষের আশ্রম সন্নিকট দিয়া গমন করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার কোন দিকে দৃষ্টি নাই, কাহারও মনোমুগ্ধকর চরিত্রকথা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে পারিতেছে

না। বয়সে বালক হইলেও বুদ্ধিতে শঙ্কর বৃদ্ধ, কাজেই একবারও তাঁহার মনে হইল না যে নিকটে এত সাধু মহাত্মা পাইতেছি, তবে কেন গোবিন্দ-পাদের উদ্দেশ্যে যাইব। তিনি একবারও ভাবিলেন না যে, গোবিন্দপাদ সহস্র বৎসরাবধি সমাধিস্থ রহিয়াছেন, যদি তিনি তাঁহাকে পরমতত্ত্ব না দেন? তিনি স্থির ধীর চিত্তে ভগবান গোবিন্দপাদের উদ্দেশ্যে নর্ম্মদা অভিমুখে চলিয়াছেন।

বালক শঙ্কর কখনও বা তীর্থযাত্রী সাধুসম্প্রদায়ের সহিত, কখনও বা ব্যবসায়ী বণিকসমাজের সহিত, কখন বা একাকী এই সুদীর্ঘ পথের পথিক। কিন্তু শঙ্করের নিকট এ পথ ত দেশ হইতে দেশান্তরে যাইবার পথ নহে, এ প - কবল পুণ্যোপার্জ্জনের জন্য তীর্থ যাত্রীর পথ নহে। ইহা যে তাঁহার গুরুদর্শনের পথ। যে পথে যাইলে লাভালাভ কিছুই জ্ঞান থাকে না, যে পথে চলিলে সুখ দুঃখ কিছুই থাকে না, যে পথে দাঁড়াইলে মায়া মোহ কিছুই আসিতে পারে না, সেই পরম পথের পথিক হইবার জন্য শঙ্কর আজ এই নশ্বর পথ অতিক্রম করিতেছেন। তাই এ পথে তিনি আজ ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত নহেন, তাই তিনি এই দুর্গম পথে নির্ভীক নিরুদ্বিগ্নভাবে অবিশ্রান্ত চলিয়াছেন।

তিনি পথিমধ্যে কখনও উপবাস কখনও বা সুখাদ্য ভক্ষণ, কখন বা ফলমূলাশন দ্বারা জীবন ধারণ, কখন বা শুষ্ক রুক্ষ ভিক্ষান্ন দ্বারা ক্ষুন্নিবারণ করিয়া চলিয়াছেন। নিশাকালে দেবমন্দিরপ্রান্তে, কখনও বা ধর্ম্মশালার অভ্যন্তরে,কখনও বা বৃক্ষমূলে নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার শরীরে ক্লান্তি নাই ব্যাধি নাই, অন্তরে বিরক্তি নাই, হৃদয়ে নৈরাশ্য নাই। তিনি যতই নর্ম্মদার নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, ততই তাঁহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছে। ততই তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধিত হইতেছে। তিনি মহোৎসাহে সবেগে পথ চলিতেছেন।

আহা এ সময় বালক শঙ্করের রূপ কি অপরূপ। তাঁহার পরিধানে মলিন বস্ত্র, গাত্রে ছিন্ন গাত্রাবরণ, আবরণের ছিন্নাংশ হইতে যজ্ঞোপবীত দৃষ্ট হইতেছে। মস্তকের ঘনকৃষ্ণ কেশরাজি আজ পথধূলিতে তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়া স্কন্ধদেশে বিলম্বিত হইয়াছে। বর্দ্ধিতগঠন সুদৃঢ়কায় শঙ্কর অষ্টম বৎসর বয়সেও যেন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে একটী যষ্টি, বাম হস্তে কমণ্ডলু। তাঁহার গৌরবর্ণ, প্রতিভাপূর্ণ নয়ন, এবং

বিজ্ঞতাপূর্ণ আনন দেখিয়া পথিক মাত্রেই তাঁহার প্রতি যেন আকৃষ্ট হইতেছেন। তিনি যখন যাহাদের পশ্চাৎ গমন করিতেছেন, তাহারাই তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অগ্রবর্ত্তী করিয়া লইতেছে। কত লোকের অন্তরে তাঁহার সম্বন্ধে কত প্রশ্নের উদয় হইতেছে, কিন্তু এই বালকের এমনি গাম্ভীর্য্য, এমনি প্রবীণভাব, এমনি গমনভঙ্গী যে, কেহই তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছে না। যে যখন কিছু জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাঁহার দিকে চাহে, তাঁহার মুখ দেখিয়াই সে ইচ্ছা তাহাদের অন্তরেই বিলীন হয় সুতরাং বালক আপনার ভাবে আপনিই চলিয়াছেন। কাহারও সহিত আলাপ পরিচয় বা কথাবার্ত্তা বড় হইতেছে না।

এইরূপে মাসাধিক কাল গত হইল। একদিন অপরাহ্নে শঙ্কর নর্ম্মদার নিকটস্থ গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নর্ম্মদা নিকটে জানিয়া আশা ও আনন্দ তাঁহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিল। তিনি সেই দিনই নর্ম্মদাদেবীকে দর্শন করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু পথেই রাত্রি অধিক হইয়া পড়িল সুতরাং সে দিন তিনি একাকী এক বৃক্ষমূলে রাত্রি যাপন করিবার সংকল্প করিলেন। উদ্দেশ্য, পরদিন প্রাতেই নর্ম্মদামাতার পূতবারি স্পর্শে দেহ পবিত্র করিবেন।

প্রভাত হইল। রক্তিম-বরণ তরুণ-তপন শৈলশ্রেণীর অন্তরাল হইতে উদিত হইয়া ধীরে কাঞ্চন কিরণ বিকিরণ করিতেছেন। অংশুমালীর অংশু স্পর্শে নর্ম্মদাসলিল গলিত সুবর্ণ-স্রোতে পরিণত হইয়াছে। চারিদিকে নীরব নিস্তব্ধভাব, মধ্যে কেবলমাত্র নর্ম্মদাদেবীর জলকল্লোল। প্রভাতসমীরে পুলকিততনু বিহগকুলের সুমধুর কাকলী নির্জ্জনপ্রিয়া প্রকৃতিদেবীকে যেন সদ্য জাগরিতা করিয়াছে। এমন সময় বালক শঙ্কর আজ দীর্ঘ কালের পর সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হইলেন।

নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হইবামাত্র প্রকৃতিদেবীর সঙ্গে সঙ্গে যেন শঙ্করের কুণ্ডলিনী শক্তিও জাগরিতা হইয়াছেন। বহুদিনের আকাঙ্খিত নর্ম্মদামাতাকে দেখিয়া শঙ্করের হৃদয় আজ এক অপূর্ব্ব দিব্য ভাবে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি আনন্দে আত্মহারা হইলেন। তাঁহার হৃদয়ের কবাট যেন খুলিয়া গেল। শঙ্কর তখন তাড়াতাড়ি নর্ম্মদাগর্ভে আসিয়া মন্ত্রপূত করিয়া বারি স্পর্শ করিলেন এবং জননীর মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। আহা! জননীর নিকট কি সন্তানের কামনা অপূর্ণ থাকে!

জাহ্নবী স্বরূপা নর্ম্মদাদেবী তখন নিজ সন্তানের ত্রিবিধ শরীরপাপ বিমুক্ত করিয়া হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিলেন, এবং শঙ্করের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতেই যেন সরস্বতীদেবীকে সন্তানের কণ্ঠে অধিষ্ঠিতা হইবার জন্য প্রেরণ করিলেন। শঙ্করের শ্রীমুখপঙ্কজ হইতে সেই সময় এই সুন্দর স্তোত্রটী নির্গত হইল।

সবিন্দুসিন্ধুসুস্খলত্তরঙ্গভঙ্গরঞ্জিতং
দ্বিষৎসু পাপজাত জাতকারিবারিসংযুতম্।
কৃতান্তদূতকালভূত ভীতিহারি শর্ম্মদে
ত্বদীয় পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ১

ত্বদম্বুলীন দীনমীন দিব্য সম্প্রদায়কং
কলৌ মলৌঘভারহারি সর্ব্বতীর্থ নায়কম্
সুমৎস্যকচ্ছনক্রচক্রবাক-শর্ম্মদে
ত্বদীয় পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে।

মহাগভীর নীরপূর পাপধূত ভূতলং
ধ্বনৎসমস্তপাতকারি দারিতা পদাচলং
জগল্লয়ে মহাভয়ে মৃকণ্ডুসূনুহর্ম্মদে
ত্বদীয় পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ৩

গতং তদৈব মে ভয়ং ত্বদম্বু বীক্ষিতং যদা
মৃকণ্ডুসূনুশৌনকাসুরারিসেবি সর্ব্বদা।
পুনর্ভবাব্ধি জন্মজং ভবাব্ধি দুঃখ বর্ম্মদে
ত্বদীয় পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ৪

অলক্ষলক্ষকিন্নরামরাসুরাদিপূজিতং
সুলক্ষ নীরতীরধীর পক্ষিলক্ষ কূজিতম্।
বশিষ্ঠশিষ্টপিপ্পলাদিকর্দ্দমাদি শর্ম্মদে
ত্বদীয় পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে। ৫

সনৎকুমারনাচিকেতকশ্যপাত্রিষট্পদৈ
র্ধৃতং স্বকীয় মানসেষু নারদাদিষট্পদৈঃ
রবীন্দুরন্তিদেব-দেবরাজ কর্ম্ম শর্ম্মদে
ত্বদীয় পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ৬

অলক্ষলক্ষলক্ষপাপলক্ষসারসায়ুধং
ততস্তু জীবজন্তুতন্তুভুক্তিমুক্তিদায়কম্ ।
বিরিঞ্চি-বিষ্ণু-শঙ্কর-স্বকীয়ধাম বর্ম্মদে
ত্বদীয় পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ৭

অহোঽমৃতং স্বনং শ্রুতং মহেশকেশজাতটে
কিরাতসূতবাড়বেষু পণ্ডিতে শঠে নটে ।
দুরন্ত পাপতাপ হারি সর্ব্বজন্তু শর্ম্মদে
ত্বদীয় পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ৮

শ্রীরামানুজ দর্শন ।

(শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ ।)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বেদ যে শাব্দ প্রমাণের মধ্যে পরিগণিত তাহা বুঝা গিয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য বেদের কি সবটাই প্রমাণ, অথবা ইহার অংশবিশেষ প্রমাণ। কারণ বেদমধ্যে দেখা যায় যে, ইহার কতক অংশে কেবল কর্ম্ম করিবার বিধি প্রদান করা হইয়াছে, এবং কতক অংশে সিদ্ধ বস্তু বিষয়ক পরিচয়মাত্র প্রদান করা হইয়াছে। 'যজ্ঞ করিবে" "সন্ধ্যাবন্দনা করিবে" এই প্রকার বিধি-গুলি প্রথম শ্রেণীর দৃষ্টান্ত এবং "ব্রহ্মসত্য জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ," "তুমি তাই" ইত্যাদি বাক্যগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর দৃষ্টান্ত হইতে পারে। যে অংশে বিধি প্রদান করা হইয়াছে, সে অংশে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা যায়, কারণ ইহা কেবল বেদেই দেখা যায়, এবং বেদ না বলিলে মনুষ্যের পক্ষে এরূপ উপদেশ দিবার কোন সম্ভাবনা আছে তাহা বোধ হয় না। সুতরাং বেদবাক্যের প্রামাণ্য যদি স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে তাহার বিধিবোধক অংশেই স্বীকার্য্য। আর যে অংশে সিদ্ধবস্তু-বিষয়ক পরিচয় মাত্র আছে সে অংশে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিবার কোন হেতু দেখা যায় না। কারণ ব্রহ্ম অনন্ত ইত্যাদি সত্যগুলি যখনই লোক লাভ করিবে তখনই বুঝিবে সুতরাং এইগুলি বুঝিবার পক্ষে বুদ্ধিই প্রমাণপদবাচ্য হইতে পারে, বেদ কি জন্য এবিষয়ে প্রমাণ হইবে? যে জিনিস স্বয়ং যে রকম, বেদ বলিয়াছেন বলিয়াই সেত সে রকম নহে, বেদ বলার দরুণ যদি তাহা সে রকম হইত তাহা হইলে এ বিষয়ে

বেদকে একদিন প্রমাণ বলা চলিত। সুতরাং বেদে যে অংশে ব্রহ্ম বা জীব সম্বন্ধীয় পরিচয়মাত্র দেখা যাইবে; তাহা কি করিয়া প্রমাণপদবাচ্য হইতে পারে?

বেদ সম্বন্ধে এরকম প্রশ্ন আমরা মীমাংসকগণের গ্রন্থ মধ্যে দেখিতে পাই। কারণ মীমাংসকগণ কর্ম্মবাদী অর্থাৎ কর্ম্মই তাঁহাদের কর্ম্মফলদাতা, কর্ম্মই তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব, কর্ম্মই তাঁহাদের ঈশ্বরস্থানীয়। অগত্যা বেদমধ্যে তাঁহারা কেবল কর্ম্মেরই বিধি দেখিতে পান, অন্য কিছু যাহা আছে তাহা অপ্রমাণ ও নিরর্থক। যাহাহউক বৈদান্তিকগণ মীমাংসকগণের এ আপত্তির সদুত্তর দিয়া নিজমত সমর্থন করিয়া থাকেন। বৈদান্তিক বলেন সিদ্ধবস্তু হইলেও তৎসম্বন্ধে পরিচয়সূচক উপদেশ অপ্রমাণ হইতে পারে না। মনে কর একটি বোবা ব্যক্তি একজনকে ইঙ্গিত করিয়া কিছু বলিল এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি উক্ত বোবা ব্যক্তির ইঙ্গিতের অর্থ অপরকে বলিল তাহা হইলে দ্বিতীয় ব্যক্তির বাক্যকে কি তৃতীয় ব্যক্তি অপ্রমাণ বলিতে পারে? কখনই নহে। পিতামাতা বালক বালিকাকে একটা গরু দেখাইয়া যখন বলেন "এই গরু," এবং উক্ত বালক বালিকা যখন পরে সেই গরুটাকে গরু বলিয়া বুঝে তখন পিতামাতার গোবিষয়ক উপদেশ কি অপ্রমাণ বা নিরর্থক হইতে পারে? কখনই নহে। সুতরাং সিদ্ধবস্তুবিষয়ক পরিচয় হইলেই যে উহা অপ্রমাণ হইবে তাহার কোন কথা নাই। তাহার পর বেদ সম্বন্ধে এ বিষয়টী কিন্তু একটু অন্যরূপ। ইহা যে ঠিক সিদ্ধবস্তুবিষয়ক পরিচয়বাক্য তাহা নহে। বেদে যে ব্রহ্মস্বরূপের কথা বলা হইয়াছে, তাহা যে কেবল ব্রহ্মস্বরূপ বুঝাইবার জন্য তাহা নহে, পরন্তু ঐরূপ ব্রহ্মের উপাসনার জন্য। সুতরাং বেদের সিদ্ধ বস্তু বিষয়ক পরিচয় বাক্যগুলি, একদিকে যেমন সিদ্ধবস্তুবিষয়ক পরিচয় বাক্য অপর দিকে তদ্রূপ কর্ম্মের সহিত অন্বিত বা কর্ম্ম বিধিরই এক প্রকার অঙ্গ স্বরূপ। সুতরাং বেদের সকল অংশই প্রমাণ, কোন অংশই অপ্রমাণ নহে।

উপরে মীমাংসকগণের আপত্তির যে উত্তর দেওয়া হইল তাহা বৈদান্তিকদিগের মধ্যে বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায়ের উত্তর। বৈদান্তিকদিগের মধ্যে অদ্বৈত সম্প্রদায়কে মীমাংসকগণের এ আপত্তির উত্তর প্রথম দিতে হয়:—কারণ মীমাংসকগণ, জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতি অবৈদিক মত গুলির উপর বিজয় লাভ করিয়া বৈদিক মত প্রচার করিলে প্রথমেই অদ্বৈত বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের

অভ্যুদয় হয়। অদ্বৈত সম্প্রদায়ের আচার্য্য শঙ্কর, উক্ত আপত্তির যে উত্তর দেন, তাহা এস্থলে একটু বলিলে বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রচারক রামানুজাচার্য্যের পূর্ব্বোক্ত উত্তরটীর গভীরতা ভাল করিয়া বুঝা যাইবে। শঙ্কর বলিয়াছিলেন, বস্তু সিদ্ধ হইলেও তদ্বিষয়ক অজ্ঞান থাকা সর্ব্বজনপ্রত্যক্ষ ব্যাপার। "ব্রহ্ম-অনন্ত," ইহা সত্য হইলেও লোকে তদ্বিষয়ে ভ্রান্ত। আমরা কাণে কলম রাখিয়াও কলম খুঁজিয়া বেড়াই, মৃগ নিজ নাভিস্থিত মৃগনাভির গন্ধে ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া বেড়ায় সুতরাং সিদ্ধবস্তু সম্বন্ধে ভ্রম অপনোদনই বেদের পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় অংশের তাৎপর্য্য। বস্তুতঃ "ব্রহ্ম অনন্ত" "তুমি তাই" এই সব বেদ-বাক্য হইতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, ব্রহ্ম অনন্ত ছিলেন না, বেদবাক্য বলেই অনন্ত হইলেন,—জীব ব্রহ্ম নহে, পরন্তু "তুমি তাই" এই বেদবাক্য বলে জীবে ব্রহ্ম হইয়া যায়। সুতরাং বেদের যে অংশে কর্ম্মবিধি আছে তাহাও যেমন প্রমাণ, যে অংশে সিদ্ধবস্তুবিষয়ক পরিচয়বাক্য আছে সে অংশও সেইরূপ প্রমাণ। আচার্য্য শঙ্কর এই জাতীয় উত্তর দিয়া তাঁহার সমকালীন মীমাংসগণকে পরাজিত করিয়া নিজ বেদান্তমত সাধারণে প্রচার করিয়াছিলেন। পরন্তু রামানুজাচার্য্য শঙ্করের পরে আবির্ভূত হইয়া শঙ্করের এই উত্তরটীকে একটু অন্যরূপ করিয়া লইলেন. তিনি সিদ্ধবস্তু অর্থাৎ ব্রহ্ম সম্বন্ধে ভ্রম স্বীকার করিলেন না, পরন্তু ব্রহ্মকে উপাসনারূপ কর্ম্মের অঙ্গ করিয়া অদ্বৈত বৈদান্তিক সম্প্রদায় ও মীমাংসক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি মধ্যপথ অবলম্বন করিলেন। যাহা হউক সকলের মতেই বেদের সমগ্র ভাগই প্রমাণ। বেদের কোন অংশ বিশেষ প্রমাণ এবং কোন অংশ বিশেষ প্রমাণ নহে এমতটী ভ্রান্ত। অবশ্য এস্থলে একটা কথা বলা আবশ্যক যে মীমাংসকগণও বেদের সিদ্ধবস্তুপরিচায়ক অংশটী একেবারে অপ্রমাণ বলেন না, তাঁহারা ইহাকে যজ্ঞাদির অঙ্গরূপে প্রমাণ বলিতে সম্মত আছেন. পরন্তু সিদ্ধবস্তুর পরিচায়করূপে ইহাকে প্রমাণ বলেন না।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বেদের অংশবিশেষের অপ্রামাণ্যাশঙ্কা দূর হইলেও অন্য-প্রকারে আবার সেই সংশয় উঠিতে পারে। দেখা যায় বেদমধ্যে মারণ উচ্চাটন প্রভৃতি অতি ক্রূরকর্ম্মেরও বিধি আছে। এখন বেদ যদি লোকহিতার্থে ভগবানের উপদেশরাশি হয়, তাহা হইলে ইহাতে এরূপ ঘোর কর্ম্মের বিধি কি করিয়া থাকিতে পারে? অগত্যা বেদ মধ্যে এ জাতীয় অংশগুলিকে প্রমাণ মধ্যে গণ্য করা উচিত নহে। ইহার আচার্য্যরামানুজসম্মত উত্তর

এই যে, অভিচারাদি কর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ দেখিয়া লোকে বেদোক্ত স্বর্গলাভ-রূপ অদৃষ্টফলের প্রতি বিশ্বাস করিতে শিখিবে এজন্য অভিচারাদি কর্ম্মের উপদেশ থাকায় বেদের উক্ত অংশ অপ্রমাণ হইতে পারে না। পরন্তু আমাদের বোধ হয় গ্রন্থকারের এ উত্তরটী খুব সদুত্তর নহে। কারণ অপ-রাপর প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায় অভিচারাদির উদ্দেশ্য দুরন্ত যজ্ঞবিঘ্নকারিগণের দমন ভিন্ন আর কিছু নহে, ইহা পরের অপকার করিয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে উপদিষ্ট হয় নাই। কেহ কেহ কিন্তু বলিয়াছেন যে, বেদে এ সকল থাকায়, বেদের অপ্রামাণ্যের আশঙ্কা সূচনা করে না; কারণ বেদে যখন সর্ব্ববিধ জ্ঞানোপদেশ থাকিবার কথা তখন ক্রূর কর্ম্ম থাকাই ইহার অপ্রামাণ্যের পরিচায়ক হইতে পারে না।

আমাদের অবলম্বিত গ্রন্থের যে অংশ অবলম্বন করিয়া উপরের কথাগুলি লিখিলাম তাহার অবিকল অনুবাদ এই ;—

"আচ্ছা, মীমাংসকগণ বেদবাক্যসমূহের কার্য্যপরতামাত্র স্বীকার করায়, এবং সিদ্ধব্রহ্মপর বাক্যসমূহের ব্যুৎপত্তি না হওয়ায় কি করিয়া তাহাদের প্রামাণ্য হইবে, এ কথা যদি বল তাহা হইতে পারে না। কারণ সিদ্ধ ব্রহ্মপর বাক্যসমূহকে উপাসনার অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করা হয়। তোমার পিতা সুখে আছেন এই লোকসিদ্ধপর বাক্যেও বোধকত্ব দেখিয়া, বালক-গণের, লোকে মাতৃ পিতৃ প্রভৃতির দ্বারা অম্বা তাত মাতুলচন্দ্রাদিতে অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া তাহার অভিধায়ী শব্দসমূহকে প্রয়োগ করিতে দেখিয়া ক্রমে ভূয়ঃ শিক্ষিত হইয়া সেই সেই অর্থবুদ্ধির উৎপত্তি দেখা যায় বলিয়া, বেদেও পরিনিষ্পন্ন অর্থে শব্দের বোধকত্ব সম্ভব হয়, এজন্য অপ্রামাণ্যের শঙ্কার অবকাশ নাই। তাহা হইলে অভিচারাদি প্রতিপাদক বেদাংশের কি করিয়া প্রামাণ্য ইহাও শঙ্কা করা যায় না। কারণ তাহার দৃষ্টফলদর্শন করিয়া অদৃষ্ট স্বর্গাদি ফল সাধনাদিতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করিবে। যূপাদিত্য বাক্য কিন্তু আদিত্যের ন্যায় যূপ প্রকাশনপর। এজন্য সমগ্র বেদের প্রামাণ্য।"

——

কে তুমি?

কে তুমি দয়ার অবতার?
দেখি নাই এ নয়নে, লোক মুখে নাম শু'নে
পরাণ শ্রীপদে কেন ধায় অনিবার?
নামে আছে কি সুধা তোমার!

কে তুমি নিখিলগুণাধার?
সরল-বালক-মতি, মায়ামুক্ত মহা যতি—
কামারপুকুরে দেহ ধরিয়ে আবার
নরলীলা করিলে বিস্তার॥

কে তুমি হে সাধনের ধন?
শ্রীদক্ষিণেশ্বরে বসি, ভূমানন্দ রসে রসি,
ভাসালে প্রেমের স্রোতে আব্রহ্মভুবন;
কে তুমি হে পরশরতন?

কে তুমি হে সাধক প্রবর?
পূজক ব্রাহ্মণ বেশে, ভবতারিণী আবেশে,
অমানুষী লীলাখেলা করিলে বিস্তর;
দীনবেশে—রাজরাজেশ্বর!

কে তুমি হে জনমসন্ন্যাসী?
স্ত্রীমাত্রে জননী জ্ঞান, ধাতুস্পর্শে মূহ্যমান্,
জীবদুঃখে ঝরে আঁখি কেন অহর্নিশি?
কে তুমি হে অকলঙ্ক শশী?

কে তুমি পুরুষ পুরাতন?
যুগে যুগে অবতীর্ণ, ধরমস্থাপন জন্ম,
নর দেহে আবরিয়ে স্বরূপ আপন,
"জাত-ইব" হও প্রকটন?

কে তুমি করুণাঘনকায়?
কটাক্ষে জীবের মন, পদে কর আকর্ষণ,
সাধনভজনহীন তোমার কৃপায়
ভক্তিমুক্তি করতলে পায়।

কে তুমি হে জ্ঞানভক্তিময়?
যোগ-কর্ম্ম-সমুচ্চয়, মহাধর্ম্মসমন্বয়,
করিবারে ধরাধামে হইলে উদয়।
দশদিশি ঘোষে তব জয়॥

কে তুমি হে জীবে দিতে জ্ঞান
জন্ম লভি ধরাতলে, জপমালা কেড়ে নিলে
আশ্রিতের অহেতুকী কৃপামূর্ত্তিমান!
সন্দেহ তথাপি বিদ্যমান!

কে তুমি হে ভবে প্রচারিলে,—
সবধর্ম্মে সত্য আছে, একেশ্বর ধরামাঝে
সর্ব্বজীবে দেখা দেন একান্তে ডাকিলে।
অনুরাগ—উপলব্ধিমূলে॥

কে তুমি হে প্রেমিক উদাসী
শৈব-শাক্ত-গাণপত্য, সৌরী কিম্বা বিষ্ণুভক্ত,
না জানি খৃষ্টান বৌদ্ধ কিবা দরবেশী;
বহুরূপী কে তুমি সন্ন্যাসী।

কে তুমি হে সমাধি বিলীন?
ভাবমুখে মধুভাবি, জ্ঞান ভক্তি পরকাশি,
কলি-নিশা-অবসানে তপন নবীন,
উদিলে হে ঘুচা'য়ে দুর্দ্দিন!

দেহধারী কে তুমি চিন্ময়?
সর্ব্ব-ধর্ম্ম-ময়-বপু, নির্জ্জিত অজেয় রিপু,
"কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগে ইষ্টলাভ হয়"—
এ তত্ত্ব ঘোষিলে ধরাময়।

কে তুমি হে দর্পখর্ব্বকারী,
না চিনিয়া বর্ণমালা,　　　　ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশিলা,
পণ্ডিতের লাগে ধন্দ—অন্ধে যায় তরি!
তব তত্ত্ব বুঝিতে না পারি।

কে তুমি ত্রিকালদর্শী নর?
দেখা মাত্র নিলে চিনে,　　　　স্বীয় সঙ্গোপাঙ্গগণে,
—লীলার সহায়, বিশ্বনরের নির্ভর
তব লীলা বুঝিতে বিস্তর।

সাঙ্গোপাঙ্গে কে তুমি বলিলে
যেই "রাম" সেই "কৃষ্ণ"　　　　সে অধুনা "রামকৃষ্ণ",
সম্রাট—ফকীর বেশে জগতে ভ্রমিলে।
ভাগ্যবান তোমারে চিনিলে॥

কেবা চিনে ধরা নাহি দিলে?
করুণ কটাক্ষ বলে,　　　　যার দৃষ্টি দিলে খু'লে,
অতিগুপ্ত লীলা ব্যক্ত তার মর্ম্মস্থলে।
যুক্তিতর্কে—দ্বার নাহি খোলে॥

কেন তব নামে ধীরে ধীরে,
উঠিয়াছে মহারোল,　　　　যেন সিন্ধু সকল্লোল,
দিগঙ্গনা মুখরিতা—সমুদ্রের পারে
তব মূর্ত্তি কেন পূজা করে?

তব নামে কেন একমন
ভেদাভেদ ভাব ভুলি,　　　　হইয়াছে সিংহবলী,
মান্দ্রাজী পারসী ম্লেচ্ছ যবন ব্রাহ্মণ,
সবে প্রেমে করে আলিঙ্গন।

হেন লীলা কোথা কোন্ কালে?
দেশ কাল ব্যবধান　　　　হ'য়ে গেছে অন্তর্দ্ধান?
মধুময় রামকৃষ্ণ নামের হিল্লোলে—
সাগরান্ত ধরাপৃষ্ঠ টলে।

দেহধারী মুক্তক দেবতা
গুপ্তবেশে ধরাধামে, ভ্রমিতেছে তব নামে ;—
যুগে যুগে বাখানিতে তোমার বারতা
তুমি অবতারপ্রেরয়িত'।

তব পুণ্য লীলার দোসর
অখণ্ডে আসন যাঁর, বীরেশ্বর অবতার,—
শ্রীবিবেকানন্দ পদে বিক্রীত কিঙ্কর
কৃপা মাগে জুড়ি দুই কর॥

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ভারতের সাধনা।

(২) ভারতীয় জাতীয়তার বিশেষত্ব।

(The Type of Indian Nationalism)

"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নানা জাতির মধ্যে আমাকে বেড়াইতে হইয়াছে, তাই জগতের কতকটা আমি দেখিয়াছি। সব জায়গায় আমি দেখিয়াছি যে প্রত্যেক নেশনের মধ্যে তার মেরুদণ্ডস্বরূপ একটা চরম আদর্শ রহিয়াছে। কাহারও মধ্যে রাজনীতিই এই চরম আদর্শ, কাহারও মধ্যে বা সামাজিক উৎকর্ষ, আবার কাহারও মধ্যে বা মানসিক উৎকর্ষ; এইরূপে জাতীয় প্রতিষ্ঠার জন্য ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ প্রত্যেকেই অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু আমাদের জন্মভূমি আশ্রয় করিয়াছেন পরমার্থকে, যে পরমার্থই তাহার আধার, যে পরমার্থই তাহার মেরুদণ্ড, যে পরমার্থরূপ পাষাণ-ভিত্তির উপরই তাহার বিশাল জীবনপ্রাসাদ স্থাপিত হইয়াছে। * * আমি এখন বিচার করিতেছি না, কিরূপ আদর্শের মধ্যে একটা নেশন বা জাতির প্রাণশক্তি নিহিত থাকা ভাল—পারমার্থিক আদর্শের মধ্যে কি রাজনৈতিক

আদর্শের মধ্যে; কিন্তু একথা পরিষ্কাররূপে স্বীকার্য্য যে ভালর জন্যই বল বা মন্দর জন্যই বল, আমাদের প্রাণশক্তি আমাদের ধর্ম্মের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে। তুমি ইহাকে আর পরিবর্ত্তন করিতে পার না, ইহার পরিবর্ত্তে, ইহাকে নষ্ট করিয়া, প্রাণশক্তির জন্য অপর আশ্রয় স্বীকার করিতে পার না। * * ভালই হউক বা মন্দই হউক, হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতের অভ্যন্তরে পারমার্থিক আদর্শই প্রবিষ্ট হইয়াছে; শতাব্দীর পর শতাব্দীর দীপ্তস্রোতপ্রবাহ বহিয়া যাইতেছে, দেখিতেছি ভারতাকাশ ধর্ম্মতত্ত্বের সাধনায় পরিব্যাপ্ত; ভালর জন্যই বল আর মন্দর জন্যই বল, আমাদের জীবনের আরম্ভ ও পরিণতি ঐ সমস্ত ধর্ম্মাদর্শেরই সাধনক্ষেত্রে, ফলে ঐ সাধনা আমাদের রক্তে প্রবেশ করিয়াছে, উহার প্রত্যেক বিন্দুর সহিত ধমনীতে ধমনীতে স্পন্দিত হইতেছে, এবং আমাদের ধাতের সঙ্গে, জীবনী শক্তির সঙ্গে একীভূত হইয়া গিয়াছে। এই অন্তর্নিহিত বিপুল ধর্ম্মশক্তিকে স্থানচ্যুত করিতে হইলে প্রতিক্রিয়ায় কি গভীর শক্তি তোমাকে প্রয়োগ করিতে হইবে ভাবিয়া দেখ, হাজার হাজার বৎসরে যে খাত ঐ প্রবাহের দ্বারা কর্ত্তিত হইয়াছে, ভাবিয়া দেখ তোমাকে উহা আবার পূর্ণ করিতে হইবে। তুমি কি বল, হিমতুষারগর্ভে আবার ভাগীরথী ফিরিয়া যাইবে এবং পুনর্ব্বার নূতন পথে প্রবাহিত হইবে? তাও যদিই বা সম্ভব হয়, তবুও জানিও, আমাদের দেশের পক্ষে পরমার্থসাধন রূপ বিশেষ জীবনধাতটী পরিহার করা অসম্ভব এবং রাজনৈতিক বা অন্য ভাবে আবার জীবনপ্রবাহের সূত্রপাত করাও অসম্ভব।" *

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা নেশনের স্বরূপলক্ষণ নির্ণয় করিয়াছি এবং ভারতবর্ষে কিরূপ নেশনের পত্তন অতীতে হইয়া গিয়াছে তাহাও দেখিয়াছি। সেই নেশনগঠনে লক্ষ্য ছিল পরমার্থের উপলব্ধি অনুশীলন ও প্রচার, নিয়ন্তা ছিলেন লক্ষ্যবিৎ ব্রহ্মজ্ঞ এবং কর্ম্মজালরচনায় মূলসূত্র ছিল স্বধর্ম্মভাব।

ভারতীয় নেশনের এই অনন্যসাধারণ গঠনপ্রণালী প্রথমেই সম্যকরূপে বুঝা আবশ্যক। ভারতীয় জাতীয়তার বিশেষত্ব ভারতীয় শিক্ষিতসম্প্রদায় এখনও যদি প্রকৃত ভাবে হৃদয়ঙ্গম না করেন, তবে উন্নতির পথে এক পদও

---

* "বেদান্তের" সাধ্যনির্দ্দেশ নামক কুম্ভকোনমে প্রদত্ত স্বামীজির বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত।

আমরা অগ্রসর হইব না। ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ যে নেশনচক্র প্রাচীনতম যুগে একবার চালাইয়া দিয়াছিলেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে সে চক্রের গতি একেবারে রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইলেই নব নব ভগবৎবিধানে উহা রক্ষা পাইয়াছিল। কিন্তু ভারতে ইংরাজ আসিবার পূর্ব্বে ঐ চক্রের বেগ একেবারে নিঃশেষিত হইতেছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। একটা সমষ্টিবদ্ধ জীবন যে এদেশে রচিত হইয়া রহিয়াছে, সে ধারণাই তখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাই পাশ্চাত্যের অনুকরণে সমষ্টিবদ্ধ হইবার আশা স্বভাবতঃই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। এই দুরাশার পশ্চাতে পশ্চাতেই তাহারা রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা যখন প্রথম আমাদের গৃহদ্বারে প্রবেশার্থী হইল, তখন প্রথমেই কিন্তু আমাদের হৃদয়ে কোনও রাজনৈতিক আশা উদ্রিক্ত হয় নাই, তখন আমাদের ধাতে যাহা ছিল, তাহারই প্রকাশ দেখা গিয়াছিল। পাশ্চাত্য আদর্শের সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালীর মেধা সর্ব্বাগ্রেই ধর্ম্মসমন্বয়ের সমস্যায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। এইখানেই প্রাচীন নেশনের ধমনীস্পন্দন স্পষ্ট লক্ষিত হয়। কারণ ধর্ম্মসমন্বয়ই আমাদের নেশন-সৌধের ভিত্তিস্বরূপ। জগতের সমস্ত নেশনই এক এক রকম সমন্বয়কে সর্ব্বাবয়বগঠনে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন "ইউরোপে রাজনৈতিক আদর্শের দ্বারা নেশনসংহতি গঠিত হয়, প্রাচ্যে ধর্ম্মের আদর্শ নেশনসংহতি গঠন করে। অতএব সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মাদর্শের সমন্বয়ের উপর ভারতের ভাবী কল্যাণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।" (ভারতের ভবিষ্যৎ শীর্ষক বক্তৃতা) স্বামিজী বলিয়াছেন যে "this is the first step" অর্থাৎ পা বাড়াইতে প্রথমেই এই ধর্ম্মসমন্বয়ের কাজ। আমাদের প্রাচীন নেশনের ভিত্তি এখনও মজবুত আছে কি না তাহা এই কাজটীতেই প্রমাণিত হইবার কথা।

সর্ব্বকালে ধর্ম্মসমন্বয়ের সামর্থ্যই আমাদের নেশনের প্রথম বিশেষত্ব। যে দিন এই সামর্থ্য লোপ পাইবে, সে দিন উহার মৃত্যু অবধারিত।

ভারতের ইতিহাস বুঝিতে হইলে, এই ধর্ম্মসমন্বয়ই দিগ্দর্শনযন্ত্রস্বরূপ এবং ছোট বড় এক একটা সমন্বয়ের যুগ যেন এক একটা ষ্টেশন বা বিরাম কেন্দ্র। নানা ঘটনার মধ্য দিয়া একটা ভাব বা তত্ত্ব কিরূপে প্রকটিত হইয়া সমন্বয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহা বিচার করাই ভারতে ঐতিহাসিকের আসল কাজ। সমন্বয়ের পৌর্ব্বাপর্য্য দ্বারা ইতিহাসের সমগ্র পথটী

কালসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ঐ পৌর্ব্বাপর্য্য বিশদভাবে নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর নহে। তবে মোটামুটি এইরূপ ইঙ্গিত করা যায় যে বেদের "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" হইতে আরম্ভ করিয়া কুরুক্ষেত্রের গীতাসমন্বয় পর্য্যন্ত প্রাচীন যুগ; কলির প্রারম্ভে বিপুল ভাবসংমিশ্রণ হইতে বৌদ্ধ সমন্বয় পর্য্যন্ত মধ্যযুগের প্রথম পর্ব্ব, শঙ্করাচার্য্যের প্রাচীন ভিত্তি অবলম্বন পর্য্যন্ত ঐ যুগের দ্বিতীয় পর্ব্ব ও মুসলমানাধিকার হইতে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম সংঘর্ষ পর্য্যন্ত ঐ যুগের তৃতীয় পর্ব্ব। এই তৃতীয় যুগপর্ব্বে ধর্ম্মের মতবৈচিত্র্য খুবই প্রসারতা লাভ করিয়াছিল এবং সমন্বয়ের অভাবও অত্যন্ত তীব্র হইয়াছিল। তারই উপর ভারতে আবার খ্রীষ্ট ধর্ম্মের আবির্ভাব হইল

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া প্রথমেই বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে সমন্বয়চেষ্টার উন্মেষ হয়। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনে ঐ চেষ্টাই সর্ব্ব প্রধান অনুষ্ঠান। কিন্তু অলোকসামান্য মেধার সাহায্যে তিনি প্রকৃত সমন্বয়ে উপনীত না হইয়া এক অপূর্ব্ব সমীকরণে উপনীত হইলেন। সমীকরণকে ইংরাজিতে equation বলে, সমীকরণের দ্বারা নানা ধর্ম্মমতের অবান্তর তত্ত্বসমূহ বাদ দিয়া এমন একটী তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়, যাহার সম্বন্ধে মতবিরোধ বা আপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। সমন্বয়কে ইংরাজীতে synthesis বলে; সমন্বয়ের দ্বারা নানা ধর্ম্মমতের অন্তর্বর্ত্তী তত্ত্বসমূহকে স্বীকার করিয়া তদতিরিক্ত এমন এক তত্ত্বভূমিতে উপনীত হওয়া যায়, যাহার অধিষ্ঠানে সমস্ত বৈচিত্র্যের সার্থকতা সম্পাদিত হয়। সমীকরণ বৈচিত্র্যের প্রতি উদাসীন, সমন্বয়ের নিকট বৈচিত্র্য উপাদেয়। সমীকরণ ত্যাজ্য ও গ্রাহ্য বিচার করিয়া বিশ্লেষণের দ্বারা সাধারণ লক্ষণ আবিষ্কার করে, সমন্বয়ের কাছে ত্যাজ্য ও গ্রাহ্য নাই, সমন্বয় সর্ব্বাঙ্গ স্বীকার করিয়া তন্মধ্যেই এক তুরীয় তত্ত্বের অধিষ্ঠান উপলব্ধি করে। চরম মেধাশক্তি প্রয়োগে সমীকরণ সুসিদ্ধ হয়, চরম অধ্যাত্মসাধনা দ্বারা সমন্বয় সুসিদ্ধ হয়।

পঞ্চদশী ও মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের সগুণ ব্রহ্মবাদকেই রাজা রামমোহন রায় সমীকরণের দ্বারা ধর্ম্মমতসমূহের মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলে তিনি এমন একটী সাধকসম্প্রদায়ের সূচনা করিয়াছেন, যাহাদের দ্বারা আশা করা যায়, আমাদের প্রাচীন সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গ-বিশেষ সম্যক পুষ্টিলাভ করিবে। সাধকের প্রকৃতি ও সুবিধা ভেদে সনাতন ধর্ম্মে সাকার ও নিরাকার, প্রতীকের বহুলতা ও বিরলতা, স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা, সকল প্রণালীই

বিহিত হইয়াছে। কিন্তু সমন্বয়ের ভিত্তি এ সমস্ত ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। প্রাচীন ও মধ্য যুগে ঐ ভিত্তি অভিব্যক্ত হইয়াছিল, বর্ত্তমান যুগে আবার ব্যক্ত হইয়াছে। সে কথা পরে আলোচনা করিব।

সর্ব্বকালেই বহুল বৈচিত্র্যের মধ্যেও, ধর্ম্মসমন্বয়ের অক্ষয় সামর্থ্য আমাদের জাতীয়তার প্রধান বিশেষত্ব। ভারতীয় নেশন অনন্ত ধর্ম্মমতের জন্য দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছে। মার্কিণ নেশন যেমন যথাসম্ভব জাতিবৈচিত্র্যের মধ্যেও সামাজিক সমন্বয়গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে, ইংরাজ নেশন যেমন যথাসম্ভব বৃত্তিবৈচিত্র্যের মধ্যেও অর্থাধিকারমূলক সমন্বয় বজায় রাখিতে পারে, ভারতীয় নেশন তেমনি যথাসম্ভব মতবৈচিত্র্যের মধ্যেও ধর্ম্মসমন্বয়কে অখণ্ডিত ভাবে রক্ষা করিতে পারে। এক একটা নেশন এক এক রকম সমন্বয়কে গৃহ নির্ম্মাণে প্রধান খুঁটিরূপে ব্যবহার করিয়াছে।

ভারতীয় জাতীয়তার আর একটি বিশেষত্ব তাহার রাজনীতিনিরপেক্ষতা। শাস্ত্রে দেখিতে পাই প্রাচীন কালে রাজনীতি সম্যকরূপে নিরূপিত হইয়াছিল। ব্রহ্মজ্ঞ সমাজস্রষ্ঠা ভিন্ন ভিন্ন সমাজবক্ষে অবস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির স্বধর্ম্ম যখন নির্দ্দিষ্ট করিলেন, তখন সকলের স্বধর্ম্মপালনে অভিভাবক ও রক্ষকরূপে রাজার স্বধর্ম্মও নির্ণীত হইল সর্ব্ব সম্প্রদায়ের স্বধর্ম্মপালনে বিঘ্নাপসারণ ও সুবিধাবিধানই রাজার স্বধর্ম্মরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। রাজার চিরসাথী রাজবৈভব এই নির্দ্দিষ্ট স্বধর্ম্মপালনে নিয়োজিত হইত এবং ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্বের মাদকতা হইতে যথাসম্ভব রক্ষা পাইবার জন্য রাজা আশৈশব সুশিক্ষার্থী হইতেন। কিন্তু প্রাচীন ইতিহাস প্রমাণ করিতেছে যে ক্ষাত্রশক্তি বারম্বার ঋষিনির্দ্দিষ্ট স্বধর্ম্মসীমা অতিক্রম করিয়া সম্পদমদমত্ত ও দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিত, এবং যে হেতু ক্ষাত্রশক্তির প্রাধান্য ভারতীয় নেশননীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থি, সেই জন্য দেখিতে পাই বারম্বার ঐ উচ্ছিৃত শক্তিকে বিধ্বস্ত করিতে হইয়াছে। অজ্ঞ ঐতিহাসিক বলেন যে প্রাচীন যুগে ক্ষাত্রবলের বিনাশসাধন ব্রাহ্মণের ঈর্ষাসম্ভূত। ইহারা ভারতীয় নেশনতত্ত্ব বুঝিতেই পারেন নাই। মহাভারত পড়িলে বুঝা যায় যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞাতসারেই ভারতের ক্ষত্রিয়শক্তির বিলোপসাধন করাইলেন. ভাগবত স্পষ্টই বলিতেছেন যে রাজশক্তির দমন কৃষ্ণাবতারের একটী প্রধান লীলা। কুরুক্ষেত্রে সমাকৃষ্ট বিপুল রাজশক্তি আধুনিক জগতের নিকট কি অপূর্ব্ব ও লোভনীয়! কুরুক্ষেত্রে এই রাজশক্তি একেবারে ভস্মসাৎ হইল, গাণ্ডীবপর্য্যন্ত

অন্তর্দ্ধান করিল। স্বতঃই প্রশ্ন উঠে নেশন-সারথী শ্রীভগবানের এ কি অদ্ভুত লীলা! কিন্তু এই রহস্য ভেদ করা এখন আর কঠিন নহে। মহাভারতনায়ক যদি সেই সন্ধিযুগে ক্ষাত্রশক্তিকে উন্মূলিত না করিতেন, তবে রজোমত্ত রাজ-শক্তির হাতে ভারতের ভাগ্য চিরকালের জন্য সমর্পিত হইত। তার পর জগতের অন্যান্য প্রাচীন দেশের রাজসিক অভ্যুদয় যেমন কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, ভারতেও সেইরূপ হইত।

সেইজন্য আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের গভীর শিক্ষা আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। ভারতীয় নেশনকে স্বধর্ম্মপালনে যদি রাজ-শক্তির মুখাপেক্ষী হইতে হয়, তবে নির্ব্বিঘ্নে নেশন-লক্ষ্য সাধিত হইবার পক্ষে কোনও নিশ্চয়তা নাই। হিন্দুকে, ভারতীয় নেশনকে, যথাসম্ভব রাজনীতিনিরপেক্ষ করিবার জন্যই, ভারতের ভাগ্যবিধাতা প্রাচীন যুগে রাজশক্তিকে বারম্বার খর্ব্ব করিয়াছেন, এবং পরবর্ত্তী কালে সাধারণ ভারতবাসীর জীবনকে রাজনীতি হইতে বার বার আড়ালে সরাইয়া আনিয়াছেন। নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে ইতিহাসের এই সমস্ত ইঙ্গিত ও শিক্ষা আমরা বিশদভাবে আলোচনা করিব। এখন কেবল এই টুকু মনে রাখিলেই যথেষ্ট যে ভারতে স্বধর্ম্মপালনসম্বন্ধীয় ব্যবস্থার ভার রাজশক্তির হস্তে সংন্যস্ত নয় বলিয়া পাশ্চাত্যে যেমন উন্নতিপথে নেশনের প্রতিপদক্ষেপ রাজনীতিসাপেক্ষ, ভারতে মোটেই সেরূপ নহে।

ভারতীয় নেশনের তৃতীয় বিশেষত্ব সর্ব্বক্ষেত্রে স্বধর্ম্মসূত্রপ্রয়োগ। পাশ্চাত্য নীতিবিৎগণ যেখানে কাহার কি স্বাধিকার বা প্রাপ্য (right) তাহার বিচার দ্বারা মানুষে মানুষে সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন, ভারতীয় নীতিজ্ঞ সে স্থলে কাহার কি স্বধর্ম্ম বা দেয় (duty) তাহাই বিচার করিয়া মানুষের সামাজিক ও গার্হস্থ্য সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন। ইহার ফলে পাশ্চাত্যে সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলে প্রথমতঃ স্বাধিকারভাবের উৎকর্ষ আবশ্যক, ভারতে সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলে স্বধর্ম্মভাবের উৎকর্ষ বাঞ্ছনীয়। পাশ্চাত্যে লোকশিক্ষার উদ্দেশ্য স্বাধিকারবিষয়ক জ্ঞানের সম্যক পরিপুষ্টি ভারতে লোকশিক্ষার উদ্দেশ্য স্বধর্ম্মসম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ। পাশ্চাত্য ও ভারত শিক্ষাদ্বারা পৃথগ্বিধ ফলের প্রত্যাশা করেন। এই পার্থক্য যদি আমরা ভুলিয়া যাই, তবে শিক্ষাপ্রচারের দ্বারা সুফললাভের কোনও স্থিরতা

নাই, বরং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচারে কুফল যথেষ্ট ফলিবে। স্বধর্ম্মভাবের উপর আমাদিগের সামাজিক ও পারিবারিক কল্যাণ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। স্বাধিকারভাব স্বধর্ম্মভাবের পরিপন্থী। যদ স্বাধিকারভাবের দ্বারা পরিপুষ্ট হইলে স্বধর্ম্মভাব শিথিল হইয়া যায়, অন্তর্দৃষ্টি ম্লান হয় এবং বহির্মুখতা স্বার্থপরতা সমাজের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবিষ্ট হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধিকারভাবকে স্বধর্ম্মভাবের আসনে বসাইলে যেমন কুফল ফলে, সংস্কার কার্য্যেও সেইরূপ। এ ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্যের সহিত ভারতের প্রণালীগত ভেদ বিদ্যমান। উভয়ত্রই সংস্কারকার্য্যের প্রবৃত্তি শিক্ষার উপর নির্ভর করে; শিক্ষার যত প্রচার হয়, সকল ক্ষেত্রেই সংস্কার তত অনায়াসে, সহজেই, সম্পন্ন হয়। কিন্তু পাশ্চাত্যে সংস্কারের সূচনা স্বাধিকার ভাবের বৃদ্ধি বা পরিপুষ্টি হইতে, অর্থাৎ যাহারা স্বাধিকার হইতে আপনাদিগকে বঞ্চিত বলিয়া বুঝে তাহারাই প্রথমে স্বাধিকার পাইবার জন্য আন্দোলন বা বিরোধের সৃষ্টি করে। ভারতে সংস্কারের সূচনা স্বধর্ম্মভাবের বৃদ্ধি হইতে, অর্থাৎ যাহারা স্বধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত তাহারাই অপরের সম্বন্ধে নিজেদের ব্যবহারে যে ত্রুটি লক্ষিত, তাহার সংশোধন করে। পাশ্চাত্যে আন্দোলনের মূলে বিরোধকে আশ্রয় করিতে হয়, ভারতে আন্দোলনের মূলে ত্রুটিস্বীকারকে সর্ব্বসম্মত করা চাই।

সমাজদেহশোনিতে স্বধর্ম্মভাবই আমাদের প্রধান উপকরণ। যদি এই উপকরণের অভাব ঘটে তবে সমস্ত সংস্কারচেষ্টাই নিষ্ফল, কারণ মূল রক্তে বিকার থাকিলে কোনও রোগের প্রতীকার হওয়া অসম্ভব। এই সঙ্কট অবস্থাকে ধর্ম্মের গ্লানি বলা হইয়াছে; ধর্ম্মে যখন সর্ব্বত্রই গ্লানি দেখা দেয়, তখন কেহবা সমাজ বা পরিবারের সংস্কার করে, কেহ বা সেই সংস্কারোদ্দেশে প্রকৃত শিক্ষার প্রচার করে, কেহ বা পথ নির্ণয় করে; সমস্ত নেশন বা সমাজই গ্লানিসঙ্কুল হইয়া উঠে ধর্ম্মের এই গ্লানি উপস্থিত হইলে, গীতায় ভগবান বাসুদেব আশ্বাস দিতেছেন যে স্বয়ং তিনি নেতা ও নিয়ন্তারূপে অবতীর্ণ হন। তাঁর আবির্ভাবে সমাজদেহে নব শোনিতের সঞ্চার হয়, এবং ধর্ম্মভাব পুষ্টিলাভ করে। শাস্ত্রের এই অবতারবাদ ভারতীয় নেশননীতির একটী প্রধান অঙ্গ; যথাস্থলে ইহার আলোচনা করা যাইবে।

ভারতীয় নেশন স্বধর্ম্মসূত্র অবলম্বন করিয়া আর একটী ক্ষেত্রে

বিশেষত্বের পরিচয় দিয়াছে। মানুষ জীবিকার জন্য বৃত্তি বা profession আশ্রয় করে। পাশ্চাত্যে competition বা প্রতিযোগিতাসূত্রে সমস্ত বৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়। বর্ত্তমানে সকল ক্ষেত্রেই ঐ প্রতিযোগিতা কিরূপ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অনেকেই জানেন। ভোগই যে সমাজের আদরণীয় ও শ্রেষ্ঠতাবিধায়ক সে সমাজে ত একটা ছুটাছুটি কাড়াকাড়ি সর্ব্বত্রই থাকিবে, তার উপর ভোগার্জ্জন উন্মুক্তদ্বার ও স্বকৃতচেষ্টাসাপেক্ষ হওয়ায়, প্রতিযোগিতা তুমুল সংগ্রামে পরিণত হইয়াছে। পাশ্চাত্যের স্বাধিকারসূত্র মানুষের স্বাভাবিক স্থূল ভোগান্বেষণকে সমাজখাতে প্রবাহিত করিয়া সুস্পষ্টতর ও বলবত্তর করিয়া দিয়াছে। ভারতে ধর্ম্মই আদরণীয় ও শ্রেষ্ঠতাবিধায়ক, সেই জন্য সমাজ স্বাভাবিক ভোগান্বেষণকে অযথা প্রশ্রয় দেয় না, ধর্ম্মার্জ্জনের উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত করে। ভোগার্জ্জনে প্রতিযোগিতার যে তীব্রতা উপস্থিত হয়, স্বভাবতঃ ধর্ম্মার্জ্জনব্যাপদেশে সেরূপ হওয়া সম্ভবপর নহে। তা' ছাড়া অতীত ভারতে পেশা বা বৃত্তি অনেকটা প্রাঙ্নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিত, সেই জন্য প্রতিযোগিতার মন্থনে অশান্তির গরল উত্থিত হয় নাই। বৌদ্ধযুগে একটা বিশাল জাতিসংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল এবং সকল বৃত্তি ও সাধনাতেই অনেকটা অবাধ-প্রতিযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল। সেই যুগে ভারতবাসীর স্বাভাবিক ভোগবৃত্তি যদি প্রবলশক্তিতে ত্যাগ ও নির্ব্বাণের দিকে আকৃষ্ট না হইত, তবে ভারতীয় নেশনের সর্ব্বাঙ্গে পাশ্চাত্য ভোগার্জ্জনের ভাব অনিবার্য্যরূপে সঞ্চারিত হইয়া যাইত। সেই নানা জাতির সংমিশ্রণ ও ভাববিপ্লবের মধ্যে প্রাচীন যুগের স্বধর্ম্মনির্দ্দেশ তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল, এবং ভারত নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া অবাধ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্ররূপে গণ্য হইয়াছিল। এমন সময় ভগবান বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়া যেন ঘোষণা করিলেন, "নির্ব্বাণই পরম লক্ষ্য, এই একমাত্র লক্ষ্য-সাধনে প্রতিযোগিতা কর।" এই ঘোষণার ফলে প্রতিযোগিতার অদম্য প্রবাহ ভোগার্জ্জনের প্রতি স্বাভাবিক নিয়মে চালিত না হইয়া ভারতীয় নেশনলক্ষ্যের প্রতিই প্রত্যাবৃত্ত হইল। প্রাচীন যুগের অবসানে, পৌরাণিক কলিযুগের পূর্ব্বাহ্ণে কলির প্রথম ধাক্কা ভারতীয় নেশন এইরূপে সামলাইয়া গেল, নচেৎ সেই জাতিবিপ্লবে নিশ্চয়ই ডুবিতে হইত। কিন্তু অবাধ প্রতিযোগিতার কুফল ভারত এড়াইতে পারে নাই, তাই যদি সে যুগে সকলেই বুদ্ধের নির্ব্বাণের

অধিকারী হইতে ছুটিয়াছে। এই কুফল যে কিরূপ সুদূরস্পর্শী তাহা "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে" আচার্য্য বিবেকানন্দ ইঙ্গিত করিয়াছেন।

কিন্তু ভগবান শাক্যসিংহের যুগে যে ভারতব্যাপী প্রতিযোগিতার স্রোতকে রুদ্ধ করা একেবারেই অসাধ্য ছিল, বর্ত্তমান যুগে নানা সূত্রে ভারতের অখণ্ডতা প্রতিষ্ঠা লাভ করায় সেই স্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করার সম্ভাবনা আছে। ইহা ভবিষ্যতে বর্ত্তমান প্রবন্ধপর্য্যায়েই বিচার্য্য।

ভারতীয় নেশন কর্ম্মজালরচনায় স্বধর্ম্মভাবকে মূলসূত্ররূপে অবলম্বন করিয়াছিল বলিয়া, প্রায় সমস্ত ব্যক্তিগত ও সমবায়ী অনুষ্ঠানেই ইহার একটা বিশেষত্ব রহিয়াছে। স্বাধিকারসূত্রপ্রয়োগে সংগঠিত পাশ্চাত্য নেশন সমূহের সহিত তুলনা করিয়া, পাঠক সেই বিশেষত্ব সর্ব্বক্ষেত্রেই দেখিতে পাইবেন। প্রবন্ধ ইতিমধ্যেই দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, এবার আর একটী বিশেষত্বের উল্লেখ করিয়াই আমরা বিদায় লইব।

পাশ্চাত্য শিক্ষা দ্বারা সম্প্রতি আমাদের দেশে এক রকম patriotism বা স্বদেশপ্রেম সংক্রামিত হইয়াছে। এই স্বদেশপ্রেমের মূল উপাদান একদেশবর্ত্তিতার ভাব। পাশ্চাত্য ইতিহাস পাঠে দেখিতে পাই যে এক-দেশবর্ত্তিতা হইতেই প্রত্যেক নেশনের উদ্ভব; যা কিছু লইয়া তাহাদের গৌরব ও নেশনত্ব, সাক্ষাৎ ভাবে হউক বা না হউক, তাহারা মাটি থেকেই তাহা আদায় করিয়াছে। ভোগের মূলে যে স্বত্বস্বামিত্বের ভাব, জমির অধিকারসূত্রেই উহার অভিব্যক্তি, আবার নেশনত্বের মূলে যে সমষ্টিবদ্ধতার ভাব বিদ্যমান, উহা একই ভূখণ্ডে আবাসস্থাপনার সূত্রে অভিব্যক্ত। এইজন্য পাশ্চাত্যে সর্ব্বাঙ্গীন নেশন-গঠনের মূলে একদেশবর্ত্তিতার ভাবই বিদ্যমান। এই ভাবটীই পাশ্চাত্য জাতীয়তার পরম শ্রেষ্ঠ উপাদান এবং এই ভাবের প্রতি হৃদয়ের যে অর্ঘ্য বা অর্চ্চনা তাহার নামই পাশ্চাত্য স্বদেশপ্রেম।

কিন্তু একদেশবর্ত্তিতার ভাব ভারতীয় জাতীয়তার শ্রেষ্ঠ উপাদান নহে। অবশ্য স্বীকার করি যে নেশনগঠনে একদেশবর্ত্তিতার ভাব অপরিহার্য্য, এবং আমরাও নেশন গড়িবার পূর্ব্বে মা বসুন্ধরার শরণাপন্ন হইয়াছিলাম, কিন্তু পাশ্চাত্য জাতিদের মত লক্ষ্যহীন ভাবে, রিক্তহস্তে নহে। আমাদের মূল উপাদান আমরা সর্ব্বাগ্রেই আহরণ করিয়াছিলাম, স্থূল মাটির কাছে আমরা ভোগভিখারী হই নাই। একদেশবর্ত্তিতা আমাদের সমষ্টিবদ্ধতার সহায়ক

বিধায়ক নহে। বেদের প্রকাশ বা সনাতন ধর্ম্মই আমাদের জাতীয়তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান, ঐকদেশিকতা নিমিত্তমাত্র।

স্থূল মাটি পার্থিব ভোগের চরম উৎস, পাশ্চাত্যের সকল সম্পদই স্থূল মাটির দান, সেইজন্য পাশ্চাত্য স্বদেশপ্রেমে স্থূল মাটির আসন সর্ব্বোচ্চে প্রতিষ্ঠিত। ঠিক এই ধাঁজের স্বদেশপ্রেম আমাদের দেশে প্রচলিত করা সঙ্গত নহে। পাশ্চাত্যে স্থূলমাটি নিজ গৌরবের জন্য আর কাহারও কাছে ঋণী নহে, আমাদের দেশে স্থূল মাটির গৌরব, ধার-করা গৌরব। আমাদের দেশে ধর্ম্মই মাটির তীর্থত্ব সম্পাদন করে। পাশ্চাত্যেরা স্বাধিকৃত মাটিতে বাস করে, আমরা ধর্ম্মাধিকৃত তীর্থে বাস করি।

সনাতন ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ আমাদের দেশের মুখ্য ভাব, স্বদেশরূপ তীর্থের প্রতি অনুরাগ তদন্তর্গত একটী গৌণ ভাব মাত্র। আমাদের যা কিছু ছিল, যা কিছু আছে বা হইবে, সবই যে সনাতন ধর্ম্মের দান, সেইজন্য সনাতন ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগই আমাদের patriotism। এই অনুরাগই ভারতকে তীর্থে পরিণত করিবে, তখন স্বদেশতীর্থের হিতসাধন অর্থে কি বুঝায় তাহা প্রকৃতভাবে উপলব্ধ হইবে। এখন পাশ্চাত্যের অনুকরণে স্থূল মাটি লইয়া কাড়াকাড়ির ভাবই স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা সূত্রে আমাদের দেশে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে।

অথচ সনাতন ধর্ম্মের প্রতি যে গভীর অনুরাগ ও আনুগত্য শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের হৃদয়ে উদ্রিক্ত না হইলে, ভারতীয় নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা একেবারেই অসম্ভব, সে অনুরাগ ও আনুগত্য আজ কোথায়? হে দেশের যুবক বৃন্দ! তোমরা মা কে আজও চিনিলে না, পাশ্চাত্য শিক্ষা মোহে কেবল অন্ধকারেই কর সঞ্চালন করিলে। তাই যে জড়সত্তা বিজেতৃখণ্ডের স্পর্দ্ধা-হীন সেই সত্তাকেই পাশ্চাত্যের অনুকরণে রূপকছলে মা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছ, কিন্তু অনুভব কর নাই কি, হৃদয় রূপকের গণ্ডী মানিতে চাহে নাই? তোমাদের হৃদয়ের অন্তরালেই যে সনাতন-ধর্ম্মরূপিণী মা অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। তোমাদের ব্যাকুল পূজা তাঁহারই যে প্রাপ্য; তাঁহার জন্যই তোমাদের জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে; তোমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান বিদ্যা-বুদ্ধি যা কিছু সমস্তই তাঁরই চরণে ডালি দিতে হইবে। আমাদের বেদাদি-শাস্ত্রের মধ্যে, ভারতীয় জ্ঞানভক্তিকর্ম্মের সাধনপ্রবাহে যিনি বিশ্বমানবের জন্য মোক্ষদায়িনী রূপে আবির্ভূতা, তিনিই তোমাদের জননী, তাঁহার প্রতি

প্রাণপণ অনুরাগ, তাঁহার প্রতি আজীবন মরণান্ত ভ্রান্তিহীন আনুগত্যই তোমাদের পক্ষে একমাত্র patriotism। পাশ্চাত্যেরা যেমন শৈশব হইতে স্কুল মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে শিখে, তোমরা তেমন আশৈশব এই সনাতন ধর্ম্মকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকিতে শিক্ষা কর, দেখিবে ভারতীয় নেশন আবার জাগিয়া উঠিয়া মর্য্যাদায় জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিবে।

আগামী বারে ভারতীয় নেশনে সনাতন ধর্ম্মের আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

মহাসমাধি।

অশেষ-গুণালঙ্কৃত, বিশ্বাস-ভক্তির জলন্ত মূর্ত্তি, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তাগ্রণী মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গত ২৫শে মাঘ, ইংরাজী ৮ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবারে রাত্রি একটা তিন মিনিটের সময় নশ্বর পার্থিব দেহ ত্যাগ করিয়া দিব্যদেহে শ্রীগুরুর পদপ্রান্তে চির শান্তিময় আশ্রয় লাভ করিয়াছেন।

গত ছয় মাস ধরিয়া গিরিশ বাবু হাঁপরোগে কখন অল্প কখন অধিক পরিমাণে কষ্ট পাইতেছিলেন; কিন্তু শরীর কৃশ হইলেও রোগের গতি দেখিয়া ডাক্তার বৈদ্য সকলেই অনুমান করিয়াছিলেন শীতের অন্তে গরম পড়িলেই তিনি পুনরায় সুস্থ হইবেন। কিন্তু সে আশা বিফল হইল। গত ১৯শে মাঘ শুক্রবার রাত্রে সহসা তাঁহার জ্বর হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে হাঁপও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। গিরিশ বাবুর হৃদ্‌যন্ত্র ইতিপূর্ব্বেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, রোগের এই নূতন প্রতাপের বেগ ধারণে আর সমর্থ হইল না। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর যখন যন্ত্রণায় কাতর হইয়া তাঁহার কখন কখন সংজ্ঞালোপ হইতেছিল, এক সময়ে তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন—'যদি এসেছ, তবে নেশা কাটিয়ে দাও!' 'জয় রামকৃষ্ণ, চল'—ইহাই তাঁহার শেষ সুব্যক্ত কথা।

৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

বাহ্যজগতে নানা বিপরীত বর্ণের একত্র সমাবেশে বস্তুবিশেষের অদ্ভুত সৌন্দর্য্য বিস্তার যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, অন্তর্জগতেও তদ্রূপ কখন কখন প্রবল, বিপরীত ভাব ও গুণসমষ্টির একত্র সমাবেশে কোন কোন মনকে বড়ই মধুর ও শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলে। গিরিশ বাবুর মনও ঠিক ঐরূপ ছিল। কোন ভাবটিই উহাতে কখনও ক্ষীণধারায় প্রবাহিত ছিল না। অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন গিরিশ বাবুর মন, ভাবের দুর্ব্বলতা কাহাকে বলে আজীবন তাহা কখনও অনুভব করে নাই। যখনই যে ভাব উহাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে তখনই তাহার তীব্র প্রেরণায় উহা নানা অসম্ভাবিত উপায়াবিষ্কার করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ফলও আশু হস্তগত করিয়াছে। বিগত ৬৮ বৎসর ধরিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম, কার্য্যাকার্য্য, পুণ্য পাপ, যে রাজ্যের ভিতর দিয়া যখনই ঐ মনের গতি হইয়াছে তখনই সে রাজ্যে উহার সবল পাদবিক্ষেপের দৃঢ় গভীর চিহ্ন সুস্পষ্ট রাখিয়া গিয়া লোকনয়ন উহার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে।

নিজ দুর্ব্বলতা লুক্কায়িত রাখাই জীবের সাধারণ স্বভাব। অপরের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য উহাই তাহার প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট পথ। সেজন্য যেখানে সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশে বিপদের আশঙ্কা নাই সেখানে বা সে ব্যক্তির নিকট ভিন্ন আমরা নিজ কৃতাকৃতের আবরণ কখনও পূর্ণভাবে উন্মোচিত করি না। গিরিশ বাবুর ভাবসবল, কর্ম্মতৎপর মন কিন্তু নিজ সামর্থ্যে সর্ব্বদা বিশ্বাসী হইয়া অনেক সময় ঐ পথে চলিতে ভুলিয়াছে। ফলে, সংসারী মানব নিজ স্বভাবের সহিত তুলনায় তাঁহার চরিত্রানুশীলন করিতে যাইয়া অনেক স্থলে তাঁহাকে বিকট দানব বলিয়াই ভাবিয়া বসিয়াছে। গিরিশ বাবুও আজীবন তাহাদের ভাল মন্দ ধারণা সর্ব্বথা উপেক্ষা করিয়া নিজ গন্তব্যপথে ছুটিয়াছিলেন। এইরূপে সংসার ও গিরিশ বাবুর মধ্যে অনেক কাল দ্বন্দ্বই চলিয়াছিল। সংসার, মনে এক প্রকার মুখে অন্যপ্রকার ভাবরাশি লইয়া নিজ কাট ছাঁটা 'কেতা-দোরস্ত' রীতি পদ্ধতি সম্মুখে ধরিয়া নিন্দা স্তুতিরূপ অস্ত্র ধারণ করিয়া ঈর্ষাকষায়িত নয়নে প্রতিনিয়ত তাঁহাকে অন্য সাধারণের সহিত এক পথে যাইতে আহ্বান ও ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল;

গিরিশ বাবুর ভাব-প্রবল মনও স্বীয় গতি প্রতিরোধে অসহিষ্ণু হইয়া সকল ভয় প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া সংসারেরই চাতুরিতে তাঁহাকে অধিকতর চতুর হইতে হইয়াছে বলিয়া উহারই দোষ দেখাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে অন্যপথে চলিয়াছিলেন। শ্রীগুরুর অহেতুকৃপায় ঐ বিপরীত তাণ্ডবের ভ্রম না দেখিতে পাইলে গিরিশ বাবুর প্রবল মন যে, কোথায় যাইয়া দাঁড়াইত তাহা কে বলিতে পারে! কে বলিতে পারে—এ অসামান্য বিপরীত গুণশালী মনের এতকাল প্রচ্ছন্ন যথার্থ স্বরূপ কেহ কখন জানিতে পারিত কি না!

প্রতিরোধে অসহিষ্ণু হইয়া প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিয়া এ মন যে বিপরীত পথগামী হইয়া থাকে, এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভে উচ্চ ভিন্ন নীচ লক্ষ্য কখন বাছিয়া লইয়া তৎপ্রতি ধাবিত হয় না, গিরিশ বাবুর ধর্ম্মনিষ্ঠ পরদুঃখকাতর পিতা তাহা বিশেষ বুঝিয়াছিলেন। আবার, স্বগত শক্তিসহায়ে নিজের পথ নিজে আবিষ্কার করিয়া লইয়া পুত্র যে কালে সর্ব্বপ্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সর্ব্বসমক্ষে নিজ মহত্ব স্থাপিত করিবেন একথাও পিতা নীলকমল ঘোষ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন। এজন্যই দেখিতে পাই বাল্য হইতেই পুত্রের প্রতি পিতার অসাধারণ ব্যবহার—পুত্রের কোন কার্য্যে বাধা না দিয়া যাহা করিত তাহাতেই অনুমোদন! পুত্র বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'মাষ্টার অন্যায় করিয়া মারিয়াছে; আর ও বিদ্যালয়ে যাব না'—পিতাও বুঝিলেন দুরন্ত শক্তিমান বালকের বাহিরের উদ্ধত ভাবই কেবল শিক্ষক দেখিতে পাইয়াছেন, ভিতরের প্রচ্ছন্ন, অসাধারণ গুণগ্রামের পরিচয় এখনও কিছুমাত্র পান নাই, অতএব ওস্থলে পুত্রের শিক্ষালাভ অসম্ভব, বুঝিয়া বলিলেন, 'তাহাই করিও!' পুত্র অপর বালকের সহিত বিবাদ করিয়া আসিয়া পিতাকে বলিল—এইরূপ অন্যায় করিয়াছে বলিয়া বিবাদ করিয়াছি। পিতাও তাহাই বুঝিলেন—অপরে শত কথা বিরুদ্ধে বলিলেও তাহা অগ্রাহ্য করিলেন! এ অসাধারণ বালকও কখন পিতাকে কোন কথা লুকাইয়া ছাপাইয়া বলিতে প্রয়াসী হয় নাই, অথবা নিজ দুর্ব্বলতা গোপন করিয়া পিতাকে অপরের নিকট উপহাসভাজন করে নাই। হায়, কে বলিবে, এ স্নেহময় অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন পিতা কিছুকাল বাঁচিয়া দুরন্ত বালককে পরিচালিত করিতে পারিলে তাহার জীবন কলুষভারপঙ্কে কখনও নিমগ্ন হইত কি না! কিন্তু তাহা হইবার নহে—কৈশোর অতিক্রম করিতে না করিতেই বালক পিতৃহীন হইল।

"বাল্যে মাতৃহীন, কৈশোরে পিতৃহীন এবং যৌবনে স্ত্রীহীন হওয়া যে কত ক্লেশদায়ক তাহা যে না ভুগিয়াছে সে কখনও যথার্থরূপে অনুভব করিতে পারে না—আমার ভাগ্যে ঐ তিনটিই পর পর হইয়াছিল বলিয়া আমি উহা বিলক্ষণ জানি—"গিরিশ বাবু ঐ কথা আমাদিগকে অনেক সময় বলিয়াছেন।

উচ্চশিক্ষার নামে পাশ্চাত্যের জড়বাদ ও নাস্তিকতা যে হিন্দু শিক্ষিতাভিমানীদিগের ভিতর গিরিশ বাবুর বাল্যকালে কতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা তিনি তাঁহার 'পরমহংসদেবের শিষ্যস্নেহ' শীর্ষক প্রবন্ধে নিম্নোদ্ধৃতভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"সে সময়ে জড়বাদ প্রবল, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা এক-প্রকার মূর্খতা ও হৃদয় দৌর্ব্বল্যের পরিচয়, সুতরাং সমবয়স্কের নিকট এক-জন কৃষ্ণ বিষ্ণু বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া ঈশ্বর নাই—এই কথাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইত। আস্তিককে উপহাস করিতাম এবং এপাত ওপাত বিজ্ঞান উল্টাইয়া স্থির করা হইল যে, ধর্ম্ম কেবল সংসার রক্ষার্থ কল্পনা, সাধারণকে ভয় দেখাইয়া কুকার্য্য হইতে বিরত রাখিবার উপায় দুষ্কর্ম ধরা পড়িলেই দুষ্কর্ম, গোপনে করিতে পারা বুদ্ধিমানের কার্য্য; কৌশলে স্বার্থ সাধন করাই পাণ্ডিত্য।"

ঐ সময়ে পুরোহিত ব্রাহ্মণদিগের ভিতরেও ধর্ম্মহীনতার পরিচয় বালকের তীব্রদৃষ্টির অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিতে পারে নাই। গিরিশ বাবু বলিয়াছেন —"স্বচক্ষে দেখিয়াছি, শৌচ হইতে ফিরিয়াই দেয়ালের মৃত্তিকা গাড়ুর জলে গুলিয়া ফোঁটা কাটিয়া ভট্টাচার্য্য পুরোহিত গঙ্গাস্নানের ভাণ করিয়া যজমান-বাড়িতে শালগ্রামের পূজা করিতে গিয়াছেন। দেবতার উপর তখন এতদূর বিশ্বাস ভক্তি!"

শিক্ষা দীক্ষা তো তৎকালের ঐরূপ, তাহার উপর মিথ্যা কহিয়া কোন একটি বিষয় হস্তগত করিতে পশ্চাৎপদ হওয়ায় দুরন্ত প্রতিভাশালী যুবক পাড়ার মান্য গণ্য ব্যক্তিদিগের নিকট নির্ব্বোধ বলিয়া উপহাস ও করুণার পাত্র হইলেন। বহুকাল অভিভাবক শূন্য যুবকের আত্মাভিমান প্রতিহত হইয়া বলিল—ইহাকেই বুদ্ধি বলে? ঐরূপে মিথ্যা কহিলে বুদ্ধিমান ও বড় লোক হওয়া যায়?—আচ্ছা দেখা যাইবে! সবল ইন্দ্রিয়গ্রাম, ও অসাধারণ মেধা এবং কর্ম্মতৎপরতা লইয়া যুবক সংসারের শিক্ষা সংসারের উপরে সর্ব্বদা

প্রয়োগ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। সংসারী মানবও তাঁহার নিকট পরাস্ত হইয়া এখন হইতে গুণগ্রাম উপেক্ষা করিয়া তাঁহার দোষই কেবল দেখিতে লাগিল।

যাহার ভিতর ভাল সহস্র চেষ্টাতেও সে সম্পূর্ণ মন্দ হইতে পারে না। গিরিশ বাবুকে ভগবান একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে যে সংসারের নানা অবস্থার ভিতর দিয়া বাল্য ও যৌবনে ঘুরাইয়াছেন ফিরাইয়াছেন এ কথা আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি, যুবক গিরিশ কিন্তু তাহা তখন কেমনে বুঝিবেন? স্বার্থান্বেষী সংসারী মানবই বা তাহা কেমনে বুঝিবে? অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কোন মানব কিন্তু ঐ সময়েও যদি তাঁহার চরিত্র ও কার্য্যকলাপের আলোচনা করিতেন তো দেখিতে পাইতেন যুবকের চপলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতায় একটা গণ্ডি আছে এবং উহা হইতেই তাহার ভিতরের সদ্ভাবের পরিচয় পাইতেন। বাহিরে নানা স্থানে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতায় মাতিলেও গিরিশ নিজ পল্লীতে সর্ব্বদা শিষ্ট, পরোপকারী, রহস্যপরায়ণ, নির্ভীক্ যুবক। বিসূচিকাদি সংক্রামক রোগে পল্লীর ভিতর ক্রন্দন উঠিয়াছে—গিরিশ তাঁহার দলবল লইয়া রোগীর পার্শ্বে রাত্রি জাগিতে চলিলেন, অসহায় মুমূর্ষুর হৃদয়ের সাধ, গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করিবে—গিরিশ সঙ্গীদের লইয়া তাহাকে বহন করিয়া তাহার অন্তিমকাল পর্য্যন্ত গঙ্গাতীরে তাহার সহিত কাটাইয়া আসিলেন; মৃতের সৎকারের জন্য লোক নাই—গিরিশ গিয়া বুক দিয়া সাহায্য করিলেন; গঙ্গাস্নানে যাইবার পথে রমণীদিগকে কোন দুষ্ট বিদ্রূপ করিয়াছে—গিরিশ সর্ব্বাগ্রে যাইয়া তাহাকে দণ্ড দিয়া আসিলেন—গিরিশের জীবনের এইরূপ অনেক ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আবার পল্লীতে যেমন, নিজ বাটীর পরিবারগণের সহিত গিরিশের ব্যবহারও তদ্রূপ উপযোগী—সর্ব্বদা শ্রদ্ধা ভক্তি ত্যাগ ও ভালবাসা পূর্ণ। এইরূপে দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল এবং দুর্দ্দমনীয় প্রতিভাশালী যুবকের নামে বাহিরে নানা দুর্নাম রটিতে থাকিলেও নিজ বাটি এবং পল্লীতে তিনি ভদ্রেতর সকলেরই সমভাবে আদরের পাত্র ও আশা ভরসার স্থল হইয়া রহিলেন।

অবস্থায় পড়িয়া যুবকের প্রতিভা এখন হইতে শতমুখে খুলিতে লাগিল। তিনি সেবাপরায়ণ শিষ্য হইয়া পল্লীর এক বৃদ্ধের নিকট হইতে ইংরাজী ধরণে খাতা পত্র লিখিবার ধারা (Book keeping) শিখিয়া লইলেন,

কোন সওদাগরি আফিসে বেতনভোগী হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন এবং নিজ সঙ্গীদের লইয়া হাফ্ আকড়া, যাত্রা এবং থিয়েটার করিতে লাগিলেন। আবার শেষোক্ত কর্ম্মের অনুরোধে রাত্ জাগিয়া পুস্তকাদি অধ্যয়ন ও রচনা হইতে লাগিল। কারণ, পালা বাঁধিয়া দিবার লোকাভাব। ক্রমে ইংরাজী অনুকরণে থিয়েটার প্রতিষ্ঠার দিকে ঝোঁক পড়িল এবং যুবকও দেখিলেন চাকুরী ছাড়িয়া সমগ্র মনের উদ্যম ঐ ব্যাপারে না দিতে পারিলে উহার সফলতা অসম্ভব। কত লোকেই যে তাঁহাকে ঐ বিষয়ে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল তাহা বেশ অনুমিত হয়। কিন্তু সকল অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করিয়া যুবক স্বীয় ভাবের প্রেরণায় এক অনিশ্চিৎ অনির্দ্দেশ্য লক্ষ্য সফল করিতে অন্ধকারে ঝম্ফ প্রদান করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—ষোল আনা মন দিয়া যে যেকার্য্য করে তাহা হইতেই সে পূর্ণত্বলাভ করে—"যে ঠিক ঠিক চোর হয় সেও ঐ কার্য্য সহায়ে ভগবান লাভ করে।" গিরিশ বাবুর জীবন ঠাকুরের ঐ উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করে। থিয়েটার হইতেই তাঁহার প্রতিভার পূর্ণবিকাশ, উহা হইতেই তাঁহার মহাকবি হওয়া এবং উহা হইতেই তাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপালাভ করিয়া ঈশ্বরে মহাবিশ্বাস ও ভক্তি লাভ করা! গিরিশ বাবুর থিয়েটার জীবনের বিস্তৃত ইতিহাস তাঁহার ঐ বিষয়ের সঙ্গী-দিগের নিকট আমরা পাইয়া থাকি। অতএব কেমন করিয়া তিনি নানা বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া, অদ্ভুত বুদ্ধিচাতুর্য্যে নানা বিপজ্জাল সরাইয়া, দলের পর দল বাঁধিয়া, যখনি যাহা প্রয়োজন তাহা সম্পন্ন করিবার লোকা-ভাবে স্বয়ং তৎস্থান বারম্বার পূর্ণ করিয়া, পুস্তকের পর পুস্তক প্রণয়ন করিয়া* বঙ্গ নাট্যশালা সমূহের জন্ম ও কর্ম্মের আদি, মধ্য, অন্ত সুগঠিত ও স্থায়ী করিয়াছিলেন—তদ্বিষয়ে এখানে আর আলোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই। অতএব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় গিরিশ বাবুর জীবনের কি মধুময় উপসংহার হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কিছু বলিয়া আমাদের কথা সাঙ্গ করিব।

ঐ কথা বুঝিতে হইলে প্রবল ভাবপ্রবণ গিরিশ বাবুর মন শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের পুণ্যদর্শন লাভের কিছুকাল পূর্ব্বে কি অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল তাহা আমাদের প্রথম বুঝা আবশ্যক। নাস্তিক্যের করাল

* শুনিয়াছি গিরিশ বাবু এই সময়ে ২।০ দিনেই একখানি পুস্তক লিখিয়া ফেলিতেন এবং 'সীতার বনবাস' নামক পুস্তকখানি এক রাত্রের মধ্যেই লিখিয়া সাঙ্গ করিয়াছিলেন

ছায়া ঘনীভূত হইয়া হৃদয় মন সম্যক্‌রূপে গ্রাস করিবার পূর্ব্বে যুবক গিরিশের সূক্ষ্মদর্শী হৃদয় একবার চমকিত হইয়াছিল; এক-বার প্রবল উদ্যমে উহাকে প্রাণ হইতে তাড়াইয়া দূরে পলায়ন করিয়া উহার হস্ত হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল। হিন্দুসমাজের তাৎকালিক ধর্ম্মবিশ্বাসের অবনতি প্রত্যক্ষ করিয়া যুবক নবীন ব্রাহ্মসম্প্রদায়ে আশ্রয় লইতে গমন করিয়াছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ তখন প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বা হইবার উপক্রম হইতেছে তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারিলাম না। যুবক গিরিশ ঐ সমাজের নেতাদিগের নিকট গমনাগমন ও উপাসনা প্রভৃতিতে তাঁহাদের সহিত কিছুকাল যোগদান করিলেন। কিন্তু এখানেও পাছে ঠকিতে হয় বলিয়া যুবকের বিচার বুদ্ধি সতর্কভাবে তাঁহাদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতে লাগিল। দোষ দর্শনে এক সমাজ পরিত্যাগ করিয়া তদ্রূপ অপর এক সদোষ সমাজকে না আলিঙ্গন করিয়া ফেলে—ইহাই প্রাণের আশঙ্কা। অল্পকাল মধ্যেই এখানে এমন একটি ঘটনা তাঁহার চক্ষে পড়িল যাহাতে এখানেও 'মন মুখ এক' নাই, 'ভাবের ঘরে চুরি' হইতেছে—এ বিশ্বাস তাঁহার প্রাণে দৃঢ়ীভূত হইল। ঘটনাটি তাঁহার মুখে আমরা যেমন শুনিয়াছি পাঠককে বলিলে উহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে।

সমাজের জনৈক প্রসিদ্ধ বক্তা এক দিন কোন বিশেষ বক্তৃতান্তে নেপথ্যে নিজ অন্তরঙ্গগণের নিকট সেদিনকার বক্তা সকলের বক্তৃতার দোষ গুণ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। ঘটনাক্রমে গিরিশ তথায় উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, বক্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"কেমন, আজ বক্তৃতা কেমন হইল?" উপস্থিত সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—'চমৎকার হই-য়াছে; আপনার বক্তৃতা কবে মন্দ হয়!' বক্তা পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন—'আর ঐ বাঙ্গালটা কেমন বলিল?' সকলেই তদুত্তরে বাঙ্গালের অজস্র নিন্দাবাদ করিতে লাগিল। শুনিয়াই গিরিশ ভাবিলেন—হরি, হরি, এই ইহাদের এত স্পর্দ্ধার সর্ব্বজনে ভ্রাতৃভাব, (universal brotherhood) যাহা লইয়া নিত্য এত বাগাড়ম্বর! যুবক প্রাণে বিষম আঘাত পাইলেন এবং সংসারের সকলেরই সাধুতা, অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত একটা 'লোক-দেখানো' ভাণ মাত্র জ্ঞান করিয়া গৃহে ফিরিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন—অতঃপর আর কাহাকেও বিশ্বাস করিবেন না। নাস্তিকতা ও অবিশ্বাসের তরঙ্গে আত্ম-হারা যুবক ঐহিক ভোগসুখ লাভকেই জীবনে সার ভাবিয়া বসিলেন।

গিরিশ বাবু তাহার এখনকার অবস্থার কথা আমাদিগকে অনেক সময় বলিয়াছেন এবং মোটামুটি লিপিবদ্ধও করিয়া গিয়াছেন। উহারই কিয়দংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

"কিন্তু ভগবানের রাজ্যে এ (ঈশ্বরবিশ্বাসবিরহিত ভালমন্দবিচার-রহিত স্বার্থসুখৈকলক্ষ্য) পাণ্ডিত্য বহুদিন চলে না; দুর্দ্দিন অতি কঠিন শিক্ষক, সেই কঠিন শিক্ষকের তাড়নায় শিখিলাম যে কুকার্য্য গোপন রাখিবার কোনও উপায় নাই, ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে। শিখিলাম বটে, কিন্তু কার্য্যজনিত ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে। নিরাশাব্যঞ্জক পরিণাম মানসপটে উদয় হইতেছে, শাস্তি আরম্ভ হইয়াছে মাত্র, কিন্তু শাস্তি এড়াইবার কোনও উপায় দেখিতেছি না। বন্ধুবান্ধবহীন, চতুর্দ্দিকে বিপজ্জাল, দুড়পণ শত্রু সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছে এবং আমারই কার্য্য তাহাদের সম্পূর্ণ সুযোগ প্রদান করিয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া ভাবিলাম, ঈশ্বর কি আছেন? তাঁহাকে ডাকিলে কি উপায় হয়? মনে মনে প্রার্থনা করিলাম যে, হে ঈশ্বর যদি থাকো, এ অকূলে কূল দাও। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, "কেহ কেহ আর্ত্ত হইয়া আমাকে ডাকে, তাহাকেও আমি আশ্রয় দিই।" দেখিলাম গীতার কথা সম্পূর্ণ সত্য; সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যেরূপ দূর হয়, অচিরে আশা-সূর্য্য উদয় হইয়া হৃদয়ান্ধকার দূর করিল, বিপৎ-সাগরে কূল পাইলাম।

"কিন্তু এতদিন সন্দেহ গোপন করিয়া আসিতেছি; ঈশ্বর নাই, অনেক তর্ক করিয়াছি, তাহার সংস্কার কোথায় যাইবে? কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ বিচার করিতে লাগিলাম, দেখিলাম, এই কারণ হইতে এই কার্য্য উপস্থিত হইয়া, আমাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিয়াছে। সন্দেহ হয়, কিন্তু একেবারে ঈশ্বর নাই, তাহা আর জোর করিয়া বলিতে সাহস হয় না। অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি জন্মিল,ঘটনাস্রোতে কখন বিশ্বাস আনে,কখন সন্দেহ আনে, এ বিষয়ে যাঁহাদের সহিত আলোচনা করি, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিলেন যে, গুরু-উপদেশ ব্যতীত কিছুই হইবে না। কিন্তু মানুষকে গুরু বলিতে তর্ক-বুদ্ধি সম্মত হইল না; বিশেষতঃ গুরুকে "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ" বলিয়া প্রণাম করিতে হয়, এ প্রণাম মানুষকে কিরূপে করিব? এতো চাতুরী। কিন্তু সন্দেহের বিষম তাড়না—হৃদয়ে ঘোর দ্বন্দ্ব উপস্থিত সে অবস্থা বর্ণনাতীত; সহসা চক্ষুবন্ধন করিয়া লইয়া গিয়া জনশূন্য অন্ধকার

গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে যেরূপ অবস্থা হয় আমার তৎকালিক অবস্থার সহিত সে অবস্থার কতক তুলনা হইতে পারে। চিন্তার তাড়নায় কখন কখন শ্বাসরোধ হইয়া যায়। দুষ্কর্ম্মের স্মৃতি মুহুর্মুহুঃ জ্বলিয়া উঠে ও হৃদয়ান্ধকার আরও গাঢ় করিয়া তোলে।" *

ইতিপূর্ব্বে গিরিশ, পল্লীর দীননাথ বসু মহাশয়ের বাটীতে একবার পরমহংসদেবের দর্শন লাভও করিয়াছিলেন। কিন্তু কাল পূর্ণ না হওয়ায় সে দর্শনে বিপরীত ফলেরই উৎপত্তি হইয়াছিল। গিরিশ ঠাকুরের অলোকসামান্য ব্যবহারের অর্থ নির্দ্ধারণে অক্ষম হইয়া তাঁহাকে জুয়াচোর বুজরুক ভাবিয়া বাটী ফিরিয়াছিলেন। ঘটনাটি এইপ্রকার হইয়াছিল—

বসুজ মহাশয় ঠাকুরকে বহুকাল হইতেই ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহাকে বাটীতেও নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তখন অনেককাল ভাবে বেহুঁস হইয়াই থাকিতেন এবং সাধারণ ভাবভূমিতে নামিবার কালে তাঁহার কথা ও চেষ্টাদি মাতালের ন্যায় পরিলক্ষিত হইত। ভাগিনেয় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া ঠাকুর একদিন অপরাহ্নে দীন বাবুর বাটীতে আসিয়াছেন। গিরিশ সংবাদ পাইয়া দেখিতে যাইলেন। দেখিলেন, ঠাকুর ইতিপূর্ব্বে ভাবে বেহুঁস হইয়া গিয়াছিলেন, এখন ক্রমশঃ সংজ্ঞা লাভ করিতেছেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, ভৃত্য কাচের বাতিদানে দুইটি বাতি জ্বালিয়া গৃহমধ্যে তাঁহারই সম্মুখে রাখিয়া গেল। ঠাকুর উচ্চভাবভূমি হইতে নামিবার কালে সর্ব্বদা যেমন করিতেন, সম্মুখস্থ পদার্থ সকলের নাম চেষ্টা করিয়া স্মরণ ও অস্পষ্ট জড়িত ভাষায় নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। সম্মুখে আলোক দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—'আলো আলো' হৃদয় বলিল—হাঁ, সন্ধ্যা হয়েচে দেখ্‌চো না? ঠাকুর বলিলেন—সন্ধ্যা হয়েচে? সন্ধ্যা হয়েচে? গিরিশ ইতিপূর্ব্বে এরূপ কখন দেখেন নাই, অথবা কখন কাহাকেও ঐরূপ করিতে দেখিলেও সে যে মিথ্যা ভাণ করিয়া ঐরূপ করে তাহার প্রমাণ পাইয়াছিলেন। সুতরাং কেমন করিয়া বুঝিবেন, ঠাকুর উচ্চ ভাবভূমিতে উঠিয়া বাস্তবিকই দেশ কালের জ্ঞান এককালে হারাইয়াছেন। গিরিশ ভাবিলেন—ঢং দেখ,

* শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র ঘোষ লিখিত "পরমহংসদেবের শিষ্যস্নেহ" নামক প্রবন্ধ—১লা বৈশাখ ১৩১২ সালের উদ্বোধন দেখ।

সামনে বাতি জলছে আর উনি সন্ধ্যা হয়েছে এ কথা বুঝতে পাচ্ছেন না; ভাবিয়াই স্নান ত্যাগ করিলেন।

ঈশ্বর ও ধর্ম্মলাভ কবে হইবে, জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর আমাদিগকে অনেক সময় বলিতেন—কালে হবে রে কালে হবে। অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া গিরিশের সেই কাল এতদিনে পূর্ণ হইল। নাস্তিক হইয়াও গিরিশ বাবু শিবচরিত্রের দিকে সর্ব্বদাই আকৃষ্ট হইতেন। ঈশ্বর বলিয়া মানিতে ও পূজা করিতে হইলে এইরূপ একটা চরিত্রকে মানিতে পারা যায়—এরূপ একটা ভাব তাঁহার প্রাণে মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি মারিত। সুতরাং অনুতাপদগ্ধ সন্দেহাকুলিত চিত্তে এখন ঐ চরিত্র বাস্তবাকার ধারণ করিল। তাই দেখিতে পাই, তিনি এখন শিবারাধনা, শিবরাত্রি ব্রতপালন, নিয়ম উপবাসাদি করিয়া পদব্রজে ৺তারকেশ্বরকে পূজা করিতে গমন প্রভৃতিতে নিযুক্ত হইয়া নিরন্তর প্রার্থনা করিতেছেন, 'হে জগদ্গুরো, তুমি যদি শরীরী হইয়া আসিয়া আমায় দীক্ষা দান কর, উদ্ধার কর, তবেই আমার গতি হয়, মুক্তি হয়, শান্তিলাভে সমর্থ হই; হে অহেতুক-কৃপা সিন্ধো কৃপা কর, নতুবা দাসের আর নিস্তার নাই।'

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

> অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
> সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগব্যবসিতো হি সঃ॥
> ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
> কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ গীতা—৯।৩০।৩১

ব্যাকুল প্রার্থনা ভগবান শ্রবণ করিলেন, অচিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দ্বারে যাচিয়া আসিয়া গিরিশ বাবুর অনুতাপদগ্ধ জীবনে শান্তি বারি সেচন করিলেন, চিরদিনের মত নিজ বালককে নিজ অমৃতময় ক্রোড়ে ধারণ করিলেন।—এবং চন্দ্রকরস্পর্শে জলধিক্ষেপের ন্যায় গিরিশ বাবুর ভাব সাগর স্ফীত পরিবর্ত্তিত শতধারে উচ্ছলিত হইয়া বাস্তবিকই সুধাসমুদ্রে পরিণত হইল। গিরিশহৃদয়ের যে করুণা ও সহানুভূতি এতকাল নিজ বাটী, পল্লি ও নাট্যশালায় জনগণের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, শ্রীগুরুর অহেতুক কৃপা পাইয়া তাহা এখন সংসারের সকল লোকের উপরে বিস্তৃত হইয়া তাহাদিগকে স্নিগ্ধ ও আপ্যায়িত করিল। ভাবমুখে শ্রীগুরু একদিন জোর করিয়া বলিয়া-

ছিলেন—"গিরিশ ঘোষ এর পর তোকে দেখে লোকে অবাক হবে" সে বাণী দিনের পর দিন বর্ণে বর্ণে সার্থক হইল।

হে পাঠক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বকলমা গ্রহণ ও গুরুলাভে কৃতার্থ গিরিশের উল্লাস মত্ততার কথার আমরা এখানে আর পুনরুল্লেখ করিব না। শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে 'গুরুভাব' পর্ব্বের প্রথমাধ্যায়ে এবং গিরিশের স্বহস্তলিখিত পূর্ব্বোক্ত 'পরমহংসদেবের 'শিষ্যস্নেহ' শীর্ষক প্রবন্ধে উহার পরিচয় আমরা তোমাকে ইতিপূর্ব্বেই দিয়াছি। অনুতাপ-দগ্ধ গিরিশহৃদয় ঐ ঘটনায় পুনরুজ্জীবিত হইয়া উহাতে যে কি পুণ্যপ্রবাহের অনন্ত উৎস খুলিয়া গিয়াছিল তাহার পরিচয়ও তুমি তাঁহার 'বিল্বমঙ্গল' হইতে আরম্ভ করিয়া 'তপোবল' পর্য্যন্ত গ্রন্থে গত ছাব্বিশ বৎসর কাল ধরিয়া পাইয়া আসিয়াছ। অতএব এ কথা তোমার সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে শ্রীগুরুর পুণ্য দর্শন লাভের পরেও ভাবপ্রবণ গিরিশের মনের গতি উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবান্তর অবলম্বনেই হইয়াছিল, কিন্তু ঐ ভাব-প্রবাহ হৃদয়ের ন্যায় তাঁহার মস্তিষ্ককেও এত পরিস্ফুট করিয়াছিল যে, তিনি ভক্তি বা জ্ঞান-কোন পথাবলম্বনে সাধনায় উন্নত হইয়াছিলেন তাহা বুঝা কঠিন হইত—এবং পরিশেষে তোমাকে ইহাও বলিতে চাহি যে এমন বিশ্বাস ভক্তি ও উদারতা, এমন অহমিকাশূণ্যতা, এমন সহোদর-স্নেহ ও আশ্রিত জনের ভরসাস্থল, গুরুভ্রাতাদিগের প্রতি এমন আপনার বলিয়া বোধ, এমন স্বদেশের যথার্থ উন্নতাকাঙ্ক্ষা এবং ভালবাসার অনুরোধে জীবনপাতি পরিশ্রম—সংসারে বিরল; বহুভাগ্যফলে এ উজ্জ্বল মানব-রত্নের সংস্পর্শে আমরা ধন্য হইয়াছি এবং যতকাল পূর্ণত্বে নিজ ক্ষুদ্রত্ব এককালে মিলিত না হয় ততদিন করাল কালও শতচেষ্টায় হৃদয় হইতে তাঁহার দেব-সদৃশী মূর্ত্তির অপলাপ করিতে পারিবে না। হে ভারত তুমি আজ কি রত্ন হারাইয়াছ তাহা এখনও বুঝিতে পার নাই, কিন্তু এমন এক দিন আসিবে যখন বুঝিয়া তুমি আমাদেরই ন্যায় এ দিব্যমূর্ত্তিকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি উপহার দিয়াও যথোচিৎ দান হইল না ভাবিয়া ক্ষুণ্ণ হইবে।

———

সংবাদ।

আগামী ১৩ই ফাল্গুন, ২৫ শে ফেব্রুয়ারি রবিবার বেলুড় মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একোনাশীতিতম জন্মোৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইবে। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

———

REGISTERED No. C 295

উদ্বোধন।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

সূচী।

কলিকাতা।

উদ্বোধন আফিস—১২, ১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন, বাগবাজার।

মাসিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য, সডাক ২৲ দুই টাকা।

প্রতি সংখ্যা ।• আনা।

১৪শ বর্ষ—৩য় সংখ্যা। চৈত্র, ১৩১৮ সাল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

(স্বামী সারদানন্দ)

অবতার জীবনে সাধক ভাব।

পুণ্য-দর্শন ঠাকুরের দিব্যসঙ্গলাভে কৃতার্থ হইয়া আমরা তাঁহার জীবন ও চরিত্রের যতই অনুধ্যান করিয়াছি ততই তাঁহাতে দেব ও মানব উভয়বিধ ভাবের বিচিত্র সম্মিলন দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। মধুর সামঞ্জস্যে ঐরূপ বিপরীত ভাবসমষ্টির একত্র একাধারে বর্ত্তমান যে সম্ভবপর একথা তাঁহাকে না দেখিলে আমাদের কখনই ধারণা হইত না। দেখিয়াছি বলিয়াই আমাদের ধারণা, তিনি দেব-মানব,—পূর্ণ দেবত্বের গুণ, ভাব ও শক্তিসমূহ মানবীয় দেহ ও ভাবাবরণে প্রকাশিত হইলে যাহা হয়, তিনি তাহাই। দেখিয়াছি বলিয়াই বুঝিয়াছি যে, ঐ উভয় ভাবের কোনটিই তিনি বৃথা ভান করেন নাই; লোকহিতায় মানব ভাব তিনি যথার্থই স্বীকার করিয়া উহা হইতে দেবত্বে উঠিবার পথ আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন। আবার দেখিয়াছি বলিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের সকল অবতারপুরুষের জীবনেই ঐ উভয় ভাবের ঐরূপ বিচিত্র প্রকাশ উপস্থিত হইয়াছিল।

বাস্তবিক, অবতারপ্রথিত পুরুষসকলের কাহারও জীবনালোচনা করিতে যাইলেই আমরা ঐরূপ দেখিতে পাই। দেখিতে পাই, কি এক অদ্ভুত,অজ্ঞাত, শক্তিবলে তাঁহারা কখন আমাদের ন্যায় সাধারণ ভাব-ভূমিতে থাকিয়া জগতস্থ যাবতীয় বস্তু ও ব্যক্তির সহিত আমাদেরই ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন—আবার, কখন বা উচ্চ দিব্য ভাব-ভূমিতে বিচরণ করিয়া আমাদের অজ্ঞাত, অপরিচিত ভাব ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া এক নূতন রাজ্যের সংবাদ আমাদিগকে আনিয়া দিতেছেন।—তাঁহাদের ইচ্ছা না থাকিলেও কে যেন সকল বিষয়ের যোগাযোগ করিয়া তাঁহাদিগকে ঐরূপ করাইতেছে! আশৈশবই ঐরূপ। তবে,শৈশবে সময়ে সময়ে ঐ শক্তির পরিচয় পাইলেও উহা যে তাঁহাদের নিজস্ব এবং অন্তরেই অবস্থিত একথা তাঁহারা অনেক সময়ে ধরিতে বুঝিতে পারেন না; অথবা ইচ্ছামাত্রেই ঐ শক্তিপ্রয়োগে ঐ উচ্চভাব-ভূমিতে আরোহণ করিয়া ঐরূপ দিব্যভাবে জগদন্তর্গত সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে দেখিতে ও তাহাদিগের সহিত ব্যবহার করিতে পারেন না। কিন্তু যতই দিন যাইতে থাকে,

যতই ঐ শক্তির পরিচয় তাঁহারা জীবনে বারম্বার প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন ততই উহার সহিত সম্যক পরিচিত হইতে তাঁহাদের মনোমধ্যে প্রবল বাসনা জাগিয়া উঠে এবং ঐ বাসনাই তাঁহাদিগকে অলৌকিক অনুরাগে সাধনে নিযুক্ত করে।

কিন্তু ঐ বাসনায় স্বার্থপরতার নাম গন্ধ থাকে না। নিজের জন্য কোন প্রকার ভোগসুখ লাভ তো দূরের কথা, "পৃথিবীস্থ অপর সকল ব্যক্তির যাহা হইবার হউক আমি নিজে মুক্তিলাভ করিয়া ভূমানন্দে থাকি"—এ প্রকারের ভাবও তাঁহাদের ঐ বাসনায় দেখা যায় না। কিন্তু যে অজ্ঞাত দিব্যশক্তির নিয়োগে তাঁহারা জন্মাবধি অসাধারণ দিব্যভাব সকল অনুভব করিতেছেন এবং স্থূল জগতে দৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তি সকলের ন্যায় ভাবরাজ্যের সকল বিষয়ের সমসমান অস্তিত্ব সময়ে সময়ে প্রত্যক্ষ করিতেছেন তাহা কি বাস্তবিকই জগতের অন্তরালে অবস্থিত অথবা স্বকপোলকল্পনাবিজৃম্ভিত তদ্বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানই ঐ বাসনার মূলে পরিলক্ষিত হয়। কারণ অপর সাধারণের প্রত্যক্ষ ও অনুভবাদির সহিত আপনাদিগের ঐ বিষয়ের তুলনা করিয়া একথা তাঁহাদের স্বল্পকালেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, তাঁহারা আজীবন জগতস্থ বস্তু ও ব্যক্তিসকলকে যে ভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছেন অপরে তদ্রূপ করিতেছে না—ভাবরাজ্যের উচ্চভূমি হইতে জগৎটা দেখিবার সামর্থ্য তাহাদের এক প্রকার নাই বলিলেই হয়।

শুধু তাহাই নহে। ঐরূপ তুলনায় তাঁহাদের আর একটি কথাও সঙ্গে সঙ্গে ধারণা হইয়া পড়ে। তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, যে রূপেই হউক ঐ দুই ভূমি হইতে জগতটাকে দুই ভাবে দেখিতে পান বলিয়াই প্রতি মুহূর্ত্ত পরিবর্ত্তনশীল এই দুইদিনের জীবনে আপাতঃমনোরম রূপরসাদি তাঁহাদিগকে আমাদিগের ন্যায় প্রলোভিত করিতে পারে না, অথবা অনিত্য সংসারের নানা অবস্থাবিপর্য্যয় অশান্তি ও নৈরাশ্যের নিবিড় ছায়ায় তাঁহাদের মনকে আবৃত করিতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত শক্তিকে সম্যক-প্রকারে আপনার করিয়া লইয়া কেমন করিয়া ইচ্ছামাত্র উচ্চ উচ্চতর ভাব-ভূমি সকলে স্বয়ং আরোহণ এবং যতকাল ইচ্ছা তথায় অবস্থান করিতে পারিবেন এবং আপামর সাধারণকে ঐরূপ করিতে শিখাইয়া শান্তির অধিকারী করিবেন, এই চিন্তাতেই তাঁহাদের করুণাপূর্ণ মন এককালে নিমগ্ন হইয়া পড়ে। এজন্যই দেখা যায়, তাঁহাদের জীবনে সাধনা ও করুণার দুইটি

প্রবল প্রবাহ যেন নিরন্তর পাশাপাশি প্রবাহিত হইতেছে। বলিতে পার, ঐরূপ তুলনায় তাঁহাদের অন্তরের করুণা শতধারে বর্দ্ধিত হইতে পারে, কিন্তু ঐরূপ অসাধারণ করুণার উৎপত্তি কোথায় তাহা তো নির্দ্দিষ্ট হইল না? উত্তরে বলিতে হয়, উহা সঙ্গে লইয়াই তাঁহারা সংসারে জন্মিয়া থাকেন—ইহা ভিন্ন অন্য কিছু আর বলা যায় না। ঠাকুরের একটি দৃষ্টান্ত স্মরণ কর।

"(পূর্ব্বাপরিচিত অসীম) মাঠের মাঝে তিন্ বন্ধুতে বেড়াতে গিয়েছিল। বেড়াতে বেড়াতে মাঠের মাঝখানে উপস্থিত হয়ে দেখ্‌লে উঁচু পাঁচিলে ঘেরা একটা জায়গা—তার ভিতর থেকে গান বাজনার মধুর আওয়াজ আস্‌ছে! শুনে মোহিত হয়ে ইচ্ছা হোলো, ভিতরে কি হচ্চে দেখ্‌বে। চারিদিকে ঘুরে দেখ্‌লে, ভিতরে ঢোক্‌বার একটিও দরজা নাই। কি করে?—একজন কোন রকমে একটা মৈ জোগাড় করে নিয়ে এসে পাঁচিলের উপর উঠ্‌তে লাগ্‌লো ও অপর দুই জন নিচে দাঁড়িয়ে রইলো। প্রথম লোকটি পাঁচিলের উপরে উঠে ভিতরের ব্যাপার দেখে আনন্দে অধীর হয়ে হাঃ হাঃ করে হাস্‌তে হাস্‌তে ভিতরে লাফিয়ে প'ড়্‌লো—কি যে ভিতরে দেখ্‌লে তা নীচের দুজনকে বল্‌বার জন্য একটুও অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌লে না। তারা ভাব্‌লে বাঃ বন্ধু তো বেশ্, একবার বল্‌লেও না—কি দেখ্‌লে। —যা হোক্ দেখ্‌তে হোলো। ভেবে—আর একজন ঐ মৈ বেয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। উপরে উঠে সেও কিন্তু প্রথম লোকটির মত হাঃ হাঃ করে হেসে ভিতরে লাফিয়ে পড়্‌লো। তৃতীয় লোকটি তখন কি করে—মৈ বেয়ে উপরে উঠ্‌লো ও ভিতরের আনন্দের মেলা দেখ্‌তে পেলে। দেখে প্রথমে তার মনে খুব ইচ্ছা হোলো সেও উহাতে যোগ দেয়। পরেই ভাবলে—কিন্তু আমি যদি এখানে লাফিয়ে পড়ি তা হোলে বাহিরের অপর দশজনে তো জান্‌তে পার্‌বে না, এখানে এমন আনন্দ উপভোগের জায়গা আছে, একলা এই আনন্দটা ভোগ ক'র্‌বো? ঐ ভেবে, সে জোর ক'রে নিজের মনকে ফিরিয়ে নেবে এলো ও দুচোকে যাকেই দেখ্‌তে পেলে তাকেই হেঁকে ডেকে বল্‌তে লাগ্‌লো—ওহে এখানে এমন আনন্দের স্থান রয়েছে, চল চল সকলে মিলে ভোগ করি! এইরূপে সকলকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে সেও ঐ স্থানে যোগ দিলে।' এখন বুঝ, তৃতীয় ব্যক্তির মনে ঐরূপ দশজনকে সঙ্গে লইয়া একত্র আনন্দোপভোগের ইচ্ছার কারণ যেমন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অবতার পুরুষেরও তদ্রূপ

লোককল্যাণসাধনের ইচ্ছা কেন যে আশৈশব বিদ্যমান থাকে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না।

পূর্ব্বোক্ত কথায় কেহ কেহ হয়ত স্থির করিবেন যে, তবে বুঝি অবতার পুরুষসকলকে আমাদিগের ন্যায় দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় সকলের সহিত কখনও সংগ্রাম করিতে হয় না; শিষ্ট শান্ত বালকের ন্যায় উহারা বুঝি আজন্ম তাঁহাদিগের বশে নিরন্তর উঠিতে বসিতে থাকে এবং সেজন্যই সংসারের রূপরসাদি হইতে মনকে ফিরাইয়া তাঁহারা সহজেই উচ্চ লক্ষ্যে চালিত করিতে পারেন। উত্তরে আমরা বলি, তাহা নহে গো তাহা নহে, এ বিষয়েও নরবৎ নরলীলা হইয়া থাকে; এখানেও তাঁহাদিগকে সংগ্রামে জয়ী হইয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হয়।

মানব মনের গঠন ও স্বরূপ সম্বন্ধে যিনি কিছুমাত্রও জানিতে চেষ্টা করিয়াছেন তিনিই দেখিতে পাইয়াছেন স্থুল হইতে আরম্ভ হইয়া সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম, কি অনন্ত বাসনাস্তরসমূহই না উহার ভিতর বিদ্যমান রহিয়াছে! একটিকে যদি কোনরূপে অতিক্রম করিতে তুমি সমর্থ হইয়াছ তবে আর একটি আসিয়া তোমার পথরোধ করিল—সেটিকে পরাজিত করিলে তো আর একটি আসিল—স্থূলকে পরাজিত করিলে তো সূক্ষ্ম আসিল—তাহাকে পশ্চাৎপদ করিলে তো সূক্ষ্মতর বাসনাশ্রেণী তোমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দণ্ডায়মান হইল! দেখনা—যদি কাম ছাড়িলে তো কাঞ্চন আসিল, স্থূল ভাবে কাম-কাঞ্চন গ্রহণে বিরত হইলে তো বাহিক সৌন্দর্য্যানুরাগ, লোকৈষণা মান-যশাদি সম্মুখে উপস্থিত হইল, অথবা মাধিক সম্বন্ধ যত্নপূর্ব্বক পরিহার করিলেও আলস্য বা করুণাকারে মায়ামোহ আসিয়া তোমার হৃদয় অধিকার করিল।

মনের ঐরূপ স্বভাবের উল্লেখ করিয়া কতরূপেই না ঠাকুর আমাদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক করিতেন! নিজের জীবনের ঘটনাবলী * ও চিন্তাপর্য্যন্ত সময়ে সময়ে দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করিয়া ঐ বিষয় আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেন। পুরুষভক্তদিগেরতো কথাই নাই, স্ত্রীভক্তদিগকেও তিনি ঐ কথা বারম্বার বলিয়া তাঁহাদিগের অন্তরে ঈশ্বরানুরাগ উদ্দীপিত করিতেন। তাঁহার একদিনের ঐরূপ ব্যবহার এখানে বলিলেই পাঠক ঐ কথা সম্যক বুঝিতে পারিবেন।

* "গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ" ১ম অধ্যায় ২৬ পৃষ্ঠা এবং ২য় অধ্যায় ৫৫ ও ৫৮ পৃষ্ঠা দেখ।

স্ত্রী বা পুরুষ ঠাকুরের নিকট যে কেহই যাইতেন সকলেই তাঁহার অমায়িকতা, সদ্ব্যবহার, ও অদ্ভুত কামগন্ধরহিত ভালবাসার আকর্ষণ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন এবং সুবিধা হইলেই পুনরায় তাঁহার পুণ্যদর্শন ও সঙ্গসুখলাভের জন্য ব্যস্ত হইতেন। আবার শুধু যে তাঁহারা নিজেই তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন তাহা নহে, নিজের পরিচিত সকলকে ঠাকুরের নিকট লইয়া যাইয়া তাহারাও যাহাতে তাঁহার দর্শনে বিমলানন্দ উপভোগ করিতে পারে তজ্জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেন। আমাদের পরিচিতা জনৈকা ঐরূপে একদিন তাঁহার বৈমাত্রেয়া ভগ্নী ও তাহার স্বামীর সহোদরাকে সঙ্গে লইয়া অপরাহ্নে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। আগন্তুকেরা প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে ঠাকুর তাঁহাদের পরিচয় ও কুশল প্রশ্নাদি করিয়া, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগবান্ হওয়াই মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিৎ এই বিষয়ে কথা পাড়িয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—

ঠাকুর—ভগবানের শরণাপন্ন কি সহজে হওয়া যায় গা? মহামায়ার এমনি কাণ্ড—হতে কি দেয়? যার তিনকুলে কেউ নেই তাকে দিয়ে একটা বিড়াল পুষিয়ে সংসার করাবে।—(সেও) বিড়ালের মাছ, দুধ, ঘুরে ঘুরে জোগাড় করবে; আর বল্‌বে, 'মাছ, দুধ না হলে বিড়ালটা খায় না, কি করি?

হয়ত, বড় বনেদি ঘর। পতি পুত্র সব মরে গেল—কেউ নেই—রইল কেবল গোটাকতক রাঁড়ি!—তাদের মরণ নাই! বাড়ির এখানটা পড়ে গেছে, ওখানটা ধসে গেছে, ছাদের উপর অশ্বত্থ গাছ জন্মেছে—তার সঙ্গে দুচার গাছা ডেঙ্গো ডাঁটাও জন্মেছে, রাঁড়িরা তাই তুলে চচ্চড়ি রাঁধ্‌চে ও সংসার কর্‌চে! কেন? ভগবানকে ডাকুক না কেন? তাঁর শরণাপন্ন হোক্ না—তার তো সময় হয়েচে। তা হবে না!

হয়ত বা কারুর বিয়ের পরে স্বামী মরে গেল—কড়ে রাঁড়ি। ভগবানকে ডাকুক্ না কেন? তা নয়—ভাইয়ের ঘরে গিন্নি হোলো! মাথায় কাগা খোঁপা আঁচলে চাবির থোলো বেঁধে, হাত্ নেড়ে গিন্নিপনা কচ্চেন—সর্ব্বনাশীকে দেখ্‌লে পাড়া শুদ্ধ লোক ডরায়!—আর বলে বেড়াচ্চেন্—"আমি না হলে দাদার খাওয়াই হয় না।"—মর মাগি, তোর কি হোলো তা দ্যাখ—তা, না!

এক রহস্যের কথা, আমাদের পরিচিতার ভগ্নীর ঠাকুরঝিও—যিনি অদ্য প্রথমবার ঠাকুরের দর্শন লাভ করিলেন—ঐরূপ ভ্রাতার ঘরে গিন্নি ভগ্নিদিগের শ্রেণীভুক্তা ছিলেন! ঠাকুরকে কেহই সেকথা ইতিপূর্ব্বে বলে নাই। কিন্তু কথায় কথায় ঠাকুর ঐ দৃষ্টান্ত আনিয়া বাসনার প্রবল প্রতাপ ও মানব মনের অনন্ত বাসনা স্তরের কথা বুঝাইতে লাগিলেন! বলা বাহুল্য কথাগুলি ঐ স্ত্রীলোকটির অন্তরের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। দৃষ্টান্তগুলি শুনিয়া আমাদিগের পরিচিতার ভগ্নী তাঁহার গা ঠেলিয়া চুপি চুপি বলিলেন—"ও ভাই,—আজই কি ঠাকুরের মুখ দিয়ে এই কথা বেরুতে হয়!—ঠাকুরঝি কি মনে ক'র্‌বে!" পরিচিতা বলিলেন—'তা কি কোর্‌বো; ওঁর ইচ্ছা—ওঁকে আরতো কেউ শিখিয়ে দেয় নি?'

আবার, যাহার মন যত উচ্চে উঠে সূক্ষ্ম বাসনা রাজি তাহাকে তত তীব্র যাতনা অনুভব করায়। চুরি, মিথ্যা বা লাম্পট্য যে অসংখ্যবার করিয়াছে, তাহার ঐরূপ কার্য্যের পুনরনুষ্ঠান তত কষ্টকর হয় না, কিন্তু উদার উচ্চ অন্তঃকরণ ঐ সকলের চিন্তামাত্রেই আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া বিষম যন্ত্রণায় মুহ্যমান হয়। অবতার পুরুষ সকলকে বিশেষতঃ যুগাবতার ঠাকুরকে স্থূলভাবে বিষয় ·ˈ অনেকস্থলে বিরত থাকিতে দেখিলেও অন্তরের সূক্ষ্ম বাসনা শ্রেণীর সহিত ।ম যে তাঁহারা আমাদের ন্যায় সমভাবেই করিয়াছেন এবং মনের ভিতর উহাদিগের মূর্ত্তি দেখিয়া আমাদিগের অপেক্ষা শত সহস্রগুণ অধিক যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছেন—এ কথা তাঁহারা স্বয়ংই স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অতএব রূপরসাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে ফিরাইতে তাঁহারা যে সংগ্রাম করিয়াছেন তাহাকে ভান কিরূপে বলিব।

শাস্ত্রদর্শী কোন পাঠক হয়ত এখনও বলিবেন—"কিন্তু তোমার কথা মানি কিরূপে? এই দেখ অদ্বৈতবাদীর শিরোমণি আচার্য্য শঙ্করও তাঁহার গীতা ভাষ্যের প্রারম্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও নরদেহ ধারণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'নিত্যশুদ্ধ মুক্তস্বভাব, সকল জীবের নিয়ামক, জন্মাদিরহিত ঈশ্বর, লোকানুগ্রহ করিবেন বলিয়া নিজ মায়াশক্তি দ্বারা যেন দেহবান হইয়াছেন, যেন জন্মিয়াছেন—এইরূপে পরিলক্ষিত হয়েন।'* স্বয়ং আচার্য্যই যখন ঐ কথা বলিতেছেন

* স চ ভগবান্‌......অজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽপি সন্‌ স্বমায়য়া দেহবানিব জাতইব লোকানুগ্রহং কুর্ব্বন্‌ লক্ষ্যতে।

গীতা—শাঙ্করভাষ্যের উপক্রমণিকা।

তখন তোমাদের পূর্ব্বোক্ত কথা দাঁড়ায় কিরূপে ?" আমরা বলি—আচার্য্য ঐরূপ বলিয়াও আমাদের দাঁড়াইবার একটু স্থল রাখিয়াছেন। তাঁহাকে অবজ্ঞা করিব এরূপ বুদ্ধি যেন আমাদের কখন না হয়, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে প্রার্থনা। কিন্তু আচার্য্যের ঐকথা বুঝিতে হইলে আমাদের একথাটিও সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি ঈশ্বরের দেহ ধারণ বা নামরূপবিশিষ্ট হওয়াটাকে যেমন ভান বলিতেছেন তেমনি আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমার, আমার এবং জগতের সকল বস্তু ও ব্যক্তিরই নাম-রূপ-বিশিষ্ট হওয়াটাকে ভান বলিতেছেন—সমগ্র জগৎটাকেই ব্রহ্মবস্তুর সহিত তুলনায় মিথ্যাভান বলিতেছেন বা উহার বাস্তব সত্তা স্বীকার করিতেছেন না।* অতএব তাঁহার ঐ উভয় কথা একত্রে গ্রহণ করিলে তবেই তৎকৃত মীমাংসা বুঝা যাইবে। অবতারের দেহ ধারণ ও সুখদুঃখাদি অনুভব গুলিকে মিথ্যা ভান বলিয়া ধরিব এবং আমাদিগের ঐ বিষয় গুলিকে সত্য বলিব—এরূপ তাঁহার অভিপ্রায় নহে। আমাদিগের অনুভব ও প্রত্যক্ষকে সত্য বলিলে তাঁহাদের প্রত্যক্ষাদিকেও সত্য বলিয়া ধরিতে হইবে। সুতরাং শাস্ত্রদৃষ্টিতেও আমরা ঐ কথায় অন্যায় কিছু বলি নাই।

কথাটির আর এক ভাবে আলোচনা করিলে পরিষ্কার বুঝা যাইবে। অদ্বৈত-ভাব-ভূমি ও সাধারণ বা দ্বৈত-ভাব-ভূমি হইতে দৃষ্টি করিয়া জগৎ সম্বন্ধে দুই প্রকার ধারণা আমাদিগের উপস্থিত হইয়া—শাস্ত্র এই কথাই বলেন। প্রথমটিতে আরোহণ করিয়া জগৎরূপ পদার্থটা কতদূর সত্য বুঝিতে যাইলে প্রত্যক্ষ বোধ হয় উহা নাই, বা কোনও কালে ছিলও না—একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম-বস্তু ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই নাই; আর দ্বিতীয় বা দ্বৈত-ভাব-ভূমিতে থাকিয়া জগৎটাকে দেখিলে নানা নাম-রূপের সমষ্টি উহাকে সত্য ও নিত্য বর্ত্তমান বলিয়া বোধ হয়—যেমন আমাদিগের ন্যায় মানবসাধারণের হইতেছে। আর, দেহস্থ থাকিয়াও বিদেহভাবসম্পন্ন অবতার ও জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের অদ্বৈত-ভূমিতে অবস্থান জীবনের অনেক সময় হওয়ায় নিম্নের দ্বৈত-ভূমিতে অবস্থানকালে জগৎটাকে স্বপ্নতুল্য মিথ্যা বলিয়া ধারণা হইয়া থাকে।

সমগ্র জগৎরূপ পদার্থটাকে যেমন পূর্ব্বোক্ত দুইভূমি হইতে দুই ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় তেমনি আবার, উহার অন্তর্গত কোন ব্যক্তি

* শারীরক ভাষ্যে অধ্যাসনিরূপণ দেখ।

বিশেষকেও ঐরূপে, দুই ভাবভূমি হইতে দুই প্রকার দেখা গিয়া থাকে। দ্বৈত-ভাবভূমি হইতে দেখিলে ঐ ব্যক্তিকে বদ্ধমানব এবং পূর্ণ অদ্বৈত-ভূমি হইতে দেখিলে উহাকে নিত্যশুদ্ধ মুক্তস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া বোধ হয়। পূর্ণ অদ্বৈত-ভূমি ভাবরাজ্যের সর্ব্বোচ্চ প্রদেশ। উহাতে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে মানব মন উচ্চ উচ্চতর নানা ভাব-ভূমির ভিতর দিয়া উঠিয়া পরিশেষে গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হয়। ঐ সকল উচ্চ উচ্চতর ভাব-ভূমিতে উঠিবার কালে সমগ্র জগৎ বা তদন্তর্গত ব্যক্তিবিশেষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাধারণের নিকট প্রতীয়মান হইতে থাকিয়া উহাদের সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্ব ধারণা নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। যথা—জগৎটাকে ভাবময় বলিয়া বোধ হয়; অথবা ব্যক্তিবিশেষকে শরীর হইতে পৃথক, অদৃষ্টপূর্ব্ব শক্তিশালী, মনোময় বা দিব্য জ্যোতির্ম্ময় ইত্যাদি বলিয়া বোধ হইতে থাকে।

অবতার পুরুষদিগের নিকট শ্রদ্ধা ও ভক্তি সম্পন্ন হইয়া উপস্থিত হইলে সাধারণ মানব অজ্ঞাতসারে পূর্ব্বোক্ত উচ্চ উচ্চতর ভাব-ভূমিতে আরূঢ় হইয়া থাকে। অবশ্য তাঁহাদিগের বিচিত্র শক্তিপ্রভাবেই তাহাদিগের ঐ প্রকার আরোহণ সামর্থ্য উপস্থিত হয়। তাঁহাদিগকে ঐরূপ বিচিত্রভাবে দেখিতে পাইয়াই ভক্ত সাধক তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এই ধারণা করিয়া বসেন যে ঐরূপ বিচিত্র শক্তিসম্পন্ন দিব্যভাবই তাঁহাদিগের যথার্থ স্বরূপ এবং ইতরসাধারণদৃষ্ট মানব ভাবটা তাঁহারা মিথ্যাভান করিয়া অপরকে দেখাইতেছেন মাত্র। ভক্তির গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ঈশ্বরের ভক্ত সকলের সম্বন্ধে প্রথমে এবং ঈশ্বরের জগৎ সম্বন্ধেও পরে, ঐরূপ ধারণা হইতে দেখা গিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মনের উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিয়া ভাব-রাজ্যে দৃষ্ট বিষয় সকলে, জগতে প্রতি নিয়ত পরিদৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিসকলের ন্যায় দৃঢ় অস্তিত্বানুভব, অবতার পুরুষ সকলের জীবনে শৈশব কালেই সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। পরে দিনের পর যতই দিন যাইতে থাকে এবং ঐরূপ দর্শন তাঁহাদের যতই বারম্বার উপস্থিত হইতে থাকে তত তাঁহারা জগতের অপেক্ষা ঐ রাজ্যের অস্তিত্বেই সমধিক বিশ্বাসবান হইয়া পড়েন। ক্রমে সর্ব্বোচ্চ অদ্বৈতভাব-ভূমিতে উঠিয়া যে একমেবাদ্বিতীয়ং বস্তু হইতে নানা নাম-রূপময় জগতের বিকাশ হইয়াছে তাহার সন্ধান পাইয়া তাঁহারা সিদ্ধকাম হন। অবতার ভিন্ন জীবন্মুক্ত পুরুষদিগেরও ঐরূপ হইয়া থাকে। তবে

অবতার পুরুষেরা অতি স্বল্পকালেই যে সত্যে উপনীত হন তাহাই উপলব্ধি করিতে তাঁহাদিগের আজীবন চেষ্টার আবশ্যক হয়, অথবা—নিজে স্বল্পকালে অদ্বৈত-ভূমিতে আরোহণ করিতে পারিলেও অপরকে ঐ ভূমিতে আরোহণ করাইয়া দিবার শক্তি তাঁহাদিগের ভিতর, অবতার পুরুষদিগের সহিত তুলনায় অতি অল্পমাত্রই প্রকাশিত হয়। ঠাকুরের ঐ বিষয়ক শিক্ষা স্মরণ কর—"জীব ও অবতারে শক্তির প্রকাশ লইয়াই প্রভেদ।"

অদ্বৈত-ভূমিতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া জগৎ-কারণের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষে পরিতৃপ্ত হইয়া অবতার পুরুষেরা যখন পুনরায় মনের নিম্ন নিম্নতর ভূমিতে অবরোহণ করেন তখন সাধারণ দৃষ্টিতে মানব মাত্র থাকিলেও তাঁহারা যথার্থই অমানব বা দেবমানব পদবীবাচ্য হন। তখনই তাঁহারা জগৎ ও তৎকারণ উভয় পদার্থকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া তুলনায় জগৎটার্হ ছায়ার ন্যায় অস্তিত্ব সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অনুভব করিতে থাকেন। তখনই তাঁহাদের ভিতর দিয়া মনের অসাধারণ উচ্চশক্তিসমূহ স্বতঃ লোকহিতায় প্রকাশিত হইতে থাকে—এবং তখনই তাঁহারা জগতে পরিদৃষ্ট সকল পদার্থের আদি,মধ্য ও অন্ত সম্যক্ অবগত হইয়া সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করেন। আর,ক্ষুদ্র মানব আমরা তখনই তাঁহাদের অলৌকিক চরিত্র ও চেষ্টাদি প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাদেরই অমৃতময়ী বাণীতে আশান্বিত হইয়া অল্প স্বল্প আভাস পাই যে—বহির্মুখী বৃত্তি লইয়া বাহিরে দৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তি সকলের অবলম্বনে যথার্থ সত্যলাভ, জগৎ-কারণের অনুসন্ধান ও শান্তিলাভ কখনই সফল হইবার নহে।

পাশ্চাত্যবিদ্যা-পারদর্শী পাঠক বলিবেন—এইবারেই মাটি; এইবারেই কূপমণ্ডূকের মত কথাটা বলিয়া আপনার পক্ষটা দুর্ব্বল করিলে, আর কি: বাহিরে দৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তি সকলকে অবলম্বন করিয়া অনুসন্ধানে আজ কাল মানব জ্ঞানের যে কতদূর উন্নতি হইয়াছে ও প্রতিদিন হইতেছে তাহা যে দেখিয়াছে সে ঐরূপ কথা কখনই বলিতে পারিত না। উত্তরে আমরা বলি—জড়বিজ্ঞানের উন্নতি সম্বন্ধে যাহা বলিতেছ তাহা সত্য হইলেও উহা দ্বারা পূর্ণ-সত্য লাভ তোমাদের কখনই সাধিত হইবে না। কারণ, জগৎ-কারণকে তোমরা জড় অথবা তোমাদের অপেক্ষাও অধম, নিকৃষ্ট দরের বস্তু, বলিয়া ধারণা করিয়া বসিয়া আছ এবং বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বারা তোমরা অধিকতর রূপরসাদি ভোগলাভই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিয়াছ। অতএব একমাত্র জড় বস্তু হইতে জগতের অন্যান্য নানা জড় ও চৈতন্যময়

বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে একথা যন্ত্রসহায়ে কোনকালে প্রমাণ করিতে পারিলেও অন্য নানা বিষয় চিরকালই তোমাদিগের নিকট অপ্রমাণিত থাকিবে। ভোগবাসনাত্যাগ, ও অন্তর্মুখীবৃত্তিসম্পন্ন হওয়ার ভিতর দিয়াই পথ, একথা যতদিন না হৃদয়ঙ্গম হইবে ততদিন তোমাদিগের সত্যলাভও হইবে না, শান্তিলাভও হইবে না।

ভাবরাজ্যের বিষয় লইয়া আশৈশব সময়ে সময়ে তন্ময় হইয়া যাইবার কথা সকল অবতার পুরুষের জীবনেই শুনিতে পাওয়া যায়। দেখনা—শ্রীকৃষ্ণ, বাল্যকালেই সময়ে সময়ে স্বীয় দেবত্বের পরিচয় নানাভাবে নিজ পিতা মাতা ও বন্ধু বান্ধবদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেছেন; বুদ্ধ, বাল্যেই, উদ্যানে বেড়াইতে যাইয়া বোধিদ্রুমতলে সমাধিস্থ হইয়া দেবতা ও মানবের নয়নাকর্ষণ করিতেছেন, ঈশা, প্রেমে বন্য পক্ষীদিগকে আকর্ষণ করিয়া বাল্যে, নিজ হস্তে খাওয়াইতেছেন; শঙ্কর, স্বীয় মাতাকে দিব্যশক্তি প্রভাবে মুগ্ধ ও আশ্বস্ত করিয়া বাল্যেই সংসার ত্যাগ করিতেছেন; এবং চৈতন্য, বাল্যেই, ঈশ্বর প্রেমিক অর্পিত-সর্ব্বস্ব হেয় উপাদেয় সকল বস্তুর ভিতরেই ঈশ্বর প্রকাশ দেখিতে পান একথার আভাষ দিতেছেন। ঠাকুরের জীবনেও ঐ বিষয়ের অভাব নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপে তাঁহার শৈশবকালের কয়েকটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক উহা বুঝিতে পারিবেন। ঘটনাগুলি ঠাকুরের নিজ মুখেই আমরা শুনিয়াছিলাম, এবং বুঝিয়াছিলাম, ভাবরাজ্যে প্রথম তন্ময় হওয়া তাঁহার অতি অল্প বয়সেই হইয়াছিল। ঠাকুর বলিতেন—

"ওদেশে (কামারপুকুরে) ছেলেদের ছোট ছোট টেকোয় করে মুড়ি খেতে দেয়। যাদের ঘরে টেকো নাই তারা কাপড়েই মুড়ি নিয়ে খায়। আবার কেউ টেকোয়, কেউ কাপড়ে মুড়ি নিয়ে খেতে খেতে ছেলেরা পথে মাঠে ঘাটে বেড়িয়ে বেড়ায়। তখন পাঁচ কি ছয় বছর বয়স হবে; একদিন মাঠের আলপথ দিয়ে টেকোয় মুড়ি নিয়ে খেতে খেতে যাচ্চি। সেটা জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাস হবে—আকাশে একটা দিকে কাল সুন্দর একখানা জলভরা মেঘ উঠেছে। তাই দেখ্‌চি ও খাচ্চি। দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেঘখানা আকাশ ছেয়ে ফেল্‌লে এমন সময় এক ঝাঁক সাদা দুধের মত বক ঐ মেঘের কোল দিয়ে উড়ে যেতে লাগলো। সে এমন এক বাহার হোলো!—তাই দেখ্‌তে দেখ্‌তে কি একটা অপূর্ব্বভাবে তন্ময় হযে এমন একটা অবস্থা হোলো যে, আর হঁস্ রইলো না! পড়ে গেলুম্—মুড়িগুলি আলের ধারে ছড়িয়ে গেল। লোকে দেখ্‌তে

পেয়ে ধরাধরি ক'রে বাড়ি নিয়ে এসেছিল। সেই প্রথম ভাবে বেহুঁস্ হয়ে যাই।"

ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুরের এক ক্রোশ আন্দাজ উত্তরে আনুড় নামে গ্রাম। আনুড়ের বিষলক্ষ্মী* প্রসিদ্ধ জাগ্রত দেবী। চতুঃপার্শ্বস্থ দূর দূরান্তরের গ্রাম হইতে গ্রামবাসীগণ নানা প্রকার কামনা পূরণের জন্য দেবীর উদ্দেশে পূজা মানত করিত এবং অভীষ্টসিদ্ধি হইলে যথাকালে আসিয়া পূজা বলি প্রভৃতি দিয়া যাইত। অবশ্য, আগন্তুক যাত্রীদিগের ভিতর স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক ছিল, এবং রোগশান্তির কামনাই অন্যান্য কামনা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোককে এখানে আকৃষ্ট করিত। দেবীর প্রথমাবির্ভাব ও আত্ম-প্রকাশ সম্বন্ধীয় গল্প ও গান করিতে করিতে সদ্বংশজাত গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা দলবদ্ধ হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে প্রান্তর পার হইয়া দেবীদর্শনে আগমন করিতেছেন—এ দৃশ্য এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তবে ঠাকুরের বাল্যকালে কামারপুকুর প্রভৃতি গ্রাম যে বহুলোকপূর্ণ এবং এখন অপেক্ষা অনেক অধিক সমৃদ্ধিশালী ছিল তাহার নিদর্শন জনশূন্য জঙ্গলপূর্ণ ভগ্ন ইষ্টকালয়, জীর্ণ পতিত দেবমন্দির ও রাস-মঞ্চ প্রভৃতি দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। সেজন্য আমাদের অনুমান আনুড়ের দেবীর নিকট তখন যাত্রীসংখ্যাও অনেক অধিক ছিল।

প্রান্তর মধ্যে শূন্য অম্বরতলেই দেবী রহিয়াছেন বর্ষাতপাদি হইতে রক্ষার জন্য কৃষকেরা সামান্য পর্ণাচ্ছাদন মাত্র বৎসর বৎসর করিয়া দেয়। ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দির যে এককালে বর্ত্তমান ছিল তাহার পরিচয় পার্শ্বের ভগ্নস্তূপেই পাওয়া যায়। গ্রামবাসিদিগকে ঐ মন্দিরের কথা জিজ্ঞাসা

* উক্ত দেবীর নাম বিষ-লক্ষ্মী বা বিশালাক্ষী তাহা স্থির করা কঠিন। প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থে মনসা দেবীর অন্য নাম বিষ-হরি দেখিতে পাওয়া যায়। বিষহরি শব্দটী বিষ-লক্ষ্মীতে পরিণত সহজেই হইতে পারে। আবার মনসা-মঙ্গলাদি গ্রন্থে মনসা দেবীর রূপ বর্ণনায় বিশালাক্ষী শব্দের ও প্রয়োগ আছে। অতএব মনসা দেবীই সম্ভবতঃ বিষলক্ষ্মী বা বিশালাক্ষী নামে অভিহিত হইয়া এখানে লোকের পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিষ-লক্ষ্মী বা বিশালাক্ষী দেবীর পূজা রাঢ়ের অন্যত্র অনেক স্থলে ও দেখিতে পাওয়া যায়। কামার-পুকুর হইতে ঘাটাল আসিবার পথে একস্থলে আমরা উক্ত দেবীর নামাঙ্কিত একটি সুন্দর মন্দির দেখিয়াছিলাম। মন্দির সংলগ্ন নাট্য মন্দির পুষ্করিণী বাগিচা প্রভৃতি দেখিয়া ধারণা হইয়াছিল, এখানে পূজার সুবন্দোবস্ত আছে।

করিলে বলে—দেবী আপনিই স্বেচ্ছায় মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন! বলে—

গ্রামের রাখাল বালকগণ দেবীর প্রিয় সঙ্গী; প্রাতঃকাল হইতে তাহারা এখানে আসিয়া যে যাহার গোরু ছাড়িয়া দিয়া বসিবে, গল্প গান করিবে, খেলা করিবে, বনফুল তুলিয়া তাঁহাকে সাজাইবে এবং দেবীর উদ্দেশে যাত্রী বা পথিকপ্রদত্ত মিষ্টান্ন ও পয়সা নিজেরা গ্রহণ করিয়া আনন্দ করিবে—এ সকল মিষ্ট-উপদ্রব না হইলে তিনি থাকিতে পারেন না! এক সময়ে কোন গ্রামের এক ধনী ব্যক্তির অভীষ্ট পূরণ হওয়ায় সে ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেয় এবং দেবীকে উহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে। পুরোহিত সকাল সন্ধ্যা, নিত্য যেমন আসে, আসিয়া পূজা করিয়া মন্দির দ্বার রুদ্ধ করিয়া যাইতে লাগিল এবং পূজার সময় ভিন্ন অন্য সময়ে যে সকল দর্শনাভিলাষী আসিতে লাগিল তাহারা, দ্বারের জাফ্‌রির রন্ধ্র‌ মধ্য দিয়া দর্শনী প্রণামী মন্দিরের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যাইতে থাকিল। কাজেই কৃষাণ বালকদিগের আর পূর্ব্বের ন্যায় ঐ সকল পয়সা আত্মসাৎ করা ও মিষ্টান্নাদি ক্রয় করিয়া দেবীকে একবার দেখাইয়া ভোজন ও আনন্দ করার সুবিধা রহিল না। তাহারা ক্ষুণ্ণমনে মাকে জানাইল—মা মন্দিরে ঢুকিয়া আমাদের খাওয়া বন্ধ করিলি? তোর দৌলতে নিত্য লাড্ডু মোয়া খাইতাম, এখন আমাদের আর ঐ সকল কে খাইতে দিবে?

গ্রামবাসীরা বলে—সরল কৃষাণ বালকদিগের ঐ অভিযোগ দেবী শুনিলেন এবং ঐ রাত্রেই ঐ মন্দির এমন ফাটিয়া গেল যে পরদিন ঠাকুর চাপা পড়িবার ভয়ে পুরোহিত সসব্যস্তে দেবীকে পুনরায় বাহিরে অম্বরতলে আনিয়া রাখিল! তদবধি যে কেহ পুনরায় মন্দির নির্ম্মাণের জন্য চেষ্টা করিয়াছে তাহাদিগকেই দেবী স্বপ্ন বা অন্য নানা উপায়ে জানাইয়াছেন ঐ কর্ম্ম তাঁহার অভিমত নয়। গ্রামবাসীরা বলে—তাহাদের কাহাকেও কাহাকেও মা ভয় দেখাইয়াও নিরস্ত করিয়াছেন!—স্বপ্নে বলিয়াছেন, "আমি রাখাল বালকদের সঙ্গে মাঠের মাঝে বেশ আছি; মন্দির মধ্যে আমায় আবদ্ধ করলে তোর সর্ব্বনাশ কোর্‌বো—বংশে কাহাকেও জীবিত রাখ্‌বো না।"

ঠাকুরের তখন সাত আট বৎসর বয়স—এখনও উপনয়ন হয় নাই। গ্রামের ভদ্রঘরের অনেকগুলি স্ত্রীলোক একদিন দলবদ্ধ হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে

৺বিশালাক্ষী দেবীর মানত্ শোধ করিতে মাঠ ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিলেন। ঠাকুরের নিজ পরিবারের দুই এক জন স্ত্রীলোক এবং গ্রামের জমিদার ধর্ম্ম দাস লাহার বিধবা ভগ্নী প্রসন্ন ও ইহঁাদের সঙ্গে ছিলেন। প্রসন্নের সরলতা, ধর্ম্মপ্রাণতা, পবিত্রতা ও অমায়িকতা সম্বন্ধে ঠাকুরের উচ্চধারণা ছিল। সকল বিষয় প্রসন্নকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার পরামর্শ মত চলিতে ঠাকুর, মাতা-ঠাকুরাণীকে অনেকবার বলিয়াছিলেন এবং প্রসন্নের কথা সময়ে সময়ে নিজ স্ত্রীভক্তদিগকেও বলিতেন। প্রসন্নও ঠাকুরকে বালককাল হইতে অকৃত্রিম স্নেহ করিতেন এবং অনেক সময় তাঁহাকে যথার্থ গদাধর বলিয়াই জ্ঞান করিতেন। সরলা স্ত্রীলোক গদাধরের মুখে ঠাকুর দেবতার পুণ্য কথা এবং ভক্তি-পূর্ণ সঙ্গীত শুনিয়া মোহিত হইয়া অনেকবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন—হাঁ গদাই তোকে (অনেক সময়) ঠাকুর বলে মনে হয় কেন বল্ দেখি? হাঁরে সত্যি সত্যিই ঠাকুর মনে হয়!" গদাই শুনিয়া মধুর হাসি হাসিতেন কিন্তু কিছুই বলিতেন না, অথবা অন্য পাঁচ কথা পাড়িয়া তাঁহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেন। প্রসন্ন সে সকল কথায় না ভুলিয়া গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিতেন—"তুই যাই বলিস্ তুই কিন্তু মানুষ নোস্"। প্রসন্ন ৺রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করিয়া নিজ হস্তে নিত্য সেবার আয়োজন করিয়া দিতেন। পাল পার্ব্বনে ঐ মন্দিরে যাত্রা গানও অনেক হইত। প্রসন্ন কিন্তু উহার অল্পই শুনিতেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন —"গদাইয়ের গান শুনে আর কোন গান মিঠে (মিষ্ট) লাগেনি—গদাই কান্ খারাপ করে দিয়ে গিয়েছে" —অবশ্য এ সকল অনেক পরের কথা।

স্ত্রীলোকেরা যাইতেছেন দেখিয়া বালক গদাইও বলিয়া বসিলেন আমিও যাইব। বালকের কষ্ট হইবে ভাবিয়া স্ত্রীলোকেরা নানারূপে নিষেধ করিলেও কোন কথা না শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। স্ত্রীলোকদিগের ও তাহাতে আনন্দ বৈ বেজার বোধ হইল না। কারণ, সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত রঙ্গরসপ্রিয় বালক কাহার না মন হরণ করে? তাহার উপর গদাইয়ের এই অল্প বয়সেই ঠাকুর দেবতার গান ছড়া সব কণ্ঠস্থ। পথে চলিতে চলিতে তাঁহাদের অনু-রোধে তাহার দুই চারিটা অবশ্য বলিবেই বলিবে। আর ফিরিবার সময় তাহার ক্ষুধা পাইলেও ক্ষতি নাই, দেবীর প্রসাদী নৈবেদ্য দুগ্ধাদি তো তাঁহাদের সঙ্গেই থাকিবে; তবে আর কি? গদাইয়ের সঙ্গে যাওয়ায় বিরক্ত হইবার কি আছে বল? রমণীগণ ঐ প্রকার নানা কথা ভাবিয়া গদাইকে সঙ্গে লইয়া

নিঃশঙ্কচিত্তে পথ বাহিয়া চলিলেন এবং গদাইও তাঁহারা যেরূপ ভাবিয়াছিলেন, ঠাকুর দেবতার গল্প গান করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে চলিতে লাগিলেন।

কিন্তু বিশালাক্ষী দেবীর মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রান্তর পার হইবার পূর্ব্বেই এক অভাবনীয় ঘটনা উপস্থিত হইল। বালক গান করিতে করিতে সহসা থামিয়া গেল, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি অবশ আড়ষ্ট হইয়া গেল, চক্ষে অবিরল জলধারা বহিতে লাগিল এবং 'কি অসুখ করিতেছে' বলিয়া তাঁহাদের বারম্বার সস্নেহ আহ্বানেও সাড়া পর্য্যন্ত দিল না! পথ চলিতে অনভ্যস্ত, কোমল বালকের রৌদ্র লাগিয়া সর্দ্দি-গর্ম্মি হইয়াছে ভাবিয়া রমণীগণ বিশেষ শঙ্কিত হইলেন এবং সন্নিহিত পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া বালকের মস্তকে ও চক্ষে প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও বালকের কোনরূপ সংজ্ঞার উদয় না হওয়ায় তাঁহারা এইবার মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং ভাবিলেন, এখন উপায়?—দেবীর মানত্ পূজাই বা কেমন করিয়া দেওয়া হয় এবং পরের বাছা গদাইকেই বা ভালয় ভালয় কিরূপে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়; প্রান্তরে জনমানবও নাই যে সাহায্য করে—এখন উপায়? স্ত্রীলোকেরা বিশেষ বিপন্ন হইলেন এবং ঠাকুর দেবতার কথা ভুলিয়া বালককে ঘিরিয়া বসিয়া কখন ব্যজন, কখন জলসেক এবং কখন বা তাহার নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল এইরূপে গত হইলে প্রসন্নের প্রাণে সহসা উদয় হইল—বিশ্বাসী সরল বালকের উপর দেবীর ভর হয় নাই ত?—এইরূপ সরলপ্রাণ পবিত্র দেবভক্ত স্ত্রী ও পুরুষদের উপরেই তো দেব দেবীর ভর হয়, শুনিয়াছি! প্রসন্ন সঙ্গী রমণীগণকে ঐকথা বলিলেন এবং এখন হইতে গদাইকে না ডাকিয়া একমনে ৺বিশালাক্ষীরই নাম করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রসন্নের পুণ্যচারিত্র্যে তাঁহার উপর শ্রদ্ধা রমণীগণের পূর্ব্ব হইতেই ছিল, সুতরাং সহজেই ঐ কথায় বিশ্বাসী হইয়া দেবীজ্ঞানে বালককেই সম্বোধন করিয়া বারম্বার বলিতে লাগিলেন—'মা বিশালাক্ষী প্রসন্না হও, মা রক্ষা কর, মা বিশালাক্ষী মুখ তুলে চাও, মা অকূলে কূল দাও!'

আশ্চর্য্য! রমণীগণ কয়েকবার ঐরূপে দেবীর নাম গ্রহণ করিতে না করিতেই গদাইয়ের মুখ মণ্ডল মধুর হাস্যে সুরঞ্জিত হইয়া উঠিল এবং অল্প অল্প সংজ্ঞার লক্ষণ দেখা গেল! আশ্বাসিতা হইয়া তাঁহারা বালক শরীরে

বাস্তবিকই দেবীর ভর হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও মাতৃসম্বোধনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।*

ক্রমে সংজ্ঞালাভ করিয়া বালক প্রকৃতিস্থ হইল এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, পূর্ব্বের ঐ অবস্থার জন্য তাহার শরীরে কোনরূপ অবসাদ বা দুর্ব্বলতা লক্ষিত হইল না। রমণীগণ তখন তাহাকে লইয়া ভক্তি গদগদচিত্তে ৺দেবীস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং যথাবিধি পূজা দিয়া গৃহে ফিরিয়া ঠাকুরের মাতার নিকট সকল কথা আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। তিনিও ভীতা হইয়া গদাইয়ের কল্যাণে সেদিন কুলদেবতা ৺রঘুবীরের বিশেষ পূজা দিলেন এবং ৺বিশালাক্ষীর উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া তাঁহারও বিশেষ পূজা অঙ্গীকার করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের আর একটি ঘটনা, তাঁহার আবাল্য মধ্যে মধ্যে উচ্চ ভাব-ভূমিতে উঠিবার বিষয়ে বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করে। ঘটনাটি এইরূপ হইয়াছিল—

কামারপুকুরে ঠাকুরের পিত্রালয় হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে কিয়দ্দূরে একঘর সুবর্ণ বণিক বাস করিত। পাইনরা যে তখন বিশেষ শ্রীমান ছিল তৎপরিচয় তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত ইষ্টক নির্ম্মিত শিবমন্দিরে এখনও পাওয়া যায়। এখন ঐ পরিবারে দুই একজন মাত্র বাঁচিয়া আছে এবং ঘর দ্বার সব অনেকাংশে ভগ্ন ও ভূমিসাৎ হইয়াছে। গ্রামের লোকের নিকট শুনিতে পাওয়া যায় ঐ পাইনদের তখন কত শ্রীবৃদ্ধি ছিল, বাটীতে লোক ধরিত না এবং জমী জারাৎ চাস্ বাস্ গোরু লাঙ্গলও যেমন ছিল নিজেদের ব্যবসায়েও তেমনি বেশ দুপয়সা আয় ছিল। তবে পাইনরা গ্রামের জমিদার-দের মত ধনাঢ্য ছিল না, মধ্যবিৎ গৃহস্থ শ্রেণী ভুক্তই ছিল।

পাইনদের কর্ত্তা বিশেষ ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। সমর্থ হইলেও নিজের বসত বাটীটি ইষ্টক নির্ম্মিত করিতে প্রয়াস পান নাই, বরাবর মাট-কোটাতেই† বাস করিতেন; দেবালয়টি কিন্তু ইষ্টক পোড়াইয়া বিশিষ্ট শিল্পী নিযুক্ত করিয়া সুন্দর ভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কর্ত্তার নাম রসিক লাল ছিল তাঁহার পুত্র

* কেহ কেহ বলেন, এই সময়ে ভক্তির আতিশয্যে স্ত্রীলোকেরা বিশালাক্ষীর নিমিত্ত আনীত নৈবেদ্যাদিও বালককে ভোজন করিতে দিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের ঐ কথা সম্ভবপর মনে হয় না।

† বাঁশ, কাঠ, খড়, ও মৃত্তিকা সহায়ে নির্ম্মিত দ্বিতল বাটীকে পল্লীগ্রামে "মাঠ-কোঠা" বলে। ইহাতে ইষ্টকের নাম গন্ধও থাকে না।

সন্তান ছিল না। কন্যা অনেকগুলি ছিল এবং বিবাহিতা হইলেও সকলগুলিই কি কারণে বলিতে পারি না, সর্ব্বদা পিত্রালয়েই বাস করিত। শুনিয়াছি, ঠাকুরের যখন দশ বার বৎসর বয়স তখন উহাদের সর্ব্ব কনিষ্ঠা যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। কন্যাগুলি সকলেই রূপবতী ও দেবদ্বিজ পরায়ণা ছিল এবং প্রতিবেশী বালক গদাইকে বিশেষ স্নেহভক্তি করিত। ঠাকুর বাল্যকালে অনেক সময় এই ধর্ম্মনিষ্ঠ পরিবারের ভিতর কাটাইতেন এবং পাইনদের বাটিতে তাঁহার উচ্চ ভাব-ভূমিতে উঠিয়া অনেক লীলার কথা এখনও গ্রামে শুনিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান ঘটনাটি কিন্তু আমরা ঠাকুরের নিকটেই শুনিয়াছিলাম।

কামারপুকুরে, বিষ্ণুভক্তি ও শিবভক্তি, পরস্পর দ্বেষাদ্বেষি না করিয়া বেশ পাশাপাশি চলিত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। শিবের গাজনের ন্যায় বৎসর বৎসর, বিষ্ণুর চব্বিশ প্রহরী নাম-সংকীর্ত্তনও বেশ সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। তবে শিবমন্দির ও শিবস্থানের সংখ্যা বিষ্ণু মন্দিরাপেক্ষা কিছু অধিক সুবর্ণ বণিকদিগের ভিতর অনেকেই গোঁড়া বৈষ্ণব হইয়া থাকে, নিত্যানন্দ প্রভুর উদ্ধরণ দত্তকে দীক্ষা দিয়া উদ্ধার করিবার পর হইতেই ঐ জাতির ভিতর ঐ ধর্ম্মই বিশেষ প্রচলিত। কামারপুকুরের পাইনরা কিন্তু শিব ও বিষ্ণু উভয়েরই ভক্ত ছিল। বৃদ্ধ কর্ত্তা পাইন একদিকে নিত্য ত্রিসন্ধ্যা হরিনাম যেমন করিতেন তেমনি আবার অন্যদিকে শিব প্রতিষ্ঠা এবং শিবরাত্রি ব্রত পালন করিতেন। রাত্রি জাগরণে সহায়ক হইবে বলিয়া ঐ ব্রতকালে পাইনদের বাটীতে যাত্রা গানের বন্দোবস্তও হইত।

একবার ঐরূপে শিবরাত্রি ব্রতকালে পাইনদের বাটীতে যাত্রার বন্দোবস্ত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী গ্রামেরই দল, শিবমহিমাসূচক পালা গাহিবে, রাত্রি একদণ্ড পরে যাত্রা বসিবে। সন্ধ্যার সময় সংবাদ পাওয়া গেল যাত্রার দলে যে বালক শিব সাজিয়া থাকে তাহার সহসা কঠিন পীড়া হইয়াছে, শিব সাজিবার লোক বহু সন্ধানেও পাওয়া যাইতেছে না, অধিকারী হতাশ হইয়া অদ্যকার নিমিত্ত যাত্রা বন্ধ রাখিতে মিনতি করিয়া পাঠাইয়াছেন। এখন উপায়? শিবরাত্রিতে রাত্রি জাগরণ কেমন করিয়া হয়? বৃদ্ধেরা পরামর্শ করিতে বসিলেন এবং অধিকারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, শিব সাজিবার লোক দিলে তিনি অদ্য রাত্রে যাত্রা করিতে পারিবেন কি না। যথাকালে উত্তর আসিল, শিব সাজিবার লোক পাইলে পারিব। গ্রাম্য

পঞ্চায়েৎ আবার পরামর্শ জুড়িল, এখন শিব সাজিতে কাহাকে অনুরোধ করা যায়। স্থির হইল, গদাইয়ের বয়স অল্প হইলেও সে অনেক শিবের গান জানে এবং শিব সাজিলে তাহাকে দেখাইবে ও ভাল, তাহাকেই বলা যাক্। তবে শিব সাজিয়া একটু আধটু কথাবার্ত্তা কহা, তাহা অধিকারী নিজেই কৌশলে চালাইয়া লইবে। গদাইকে বলা হইল, গদাইও সকলের আগ্রহ দেখিয়া ঐ কার্য্যে সম্মত হইলেন। পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত কথামত রাত্রি একদণ্ড পরে যাত্রা বসিল।

গ্রামের জমীদার ধর্ম্মদাস লাহার ঠাকুরের পিতার সহিত বিশেষ সৌহার্দ্দ থাকায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গয়াবিষ্ণু লাহা ও ঠাকুর উভয়ে 'স্যাঙাৎ' পাতাইয়াছিলেন। 'স্যাঙাৎ' শিব সাজিবেন জানিয়া গয়াবিষ্ণু ও তাঁহার দলবল সকলে ঠাকুরের অনুরূপ বেশ ভূষা করিয়া দিতে লাগিলেন। ঠাকুর শিব সাজিয়া সাজঘরে বসিয়া শিবের কথাই ভাবিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার আসরে ডাক পড়িল এবং তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যে জনৈক পথ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে আসরের দিকে লইয়া যাইতে উপস্থিত হইল। বন্ধুর আহ্বানে ঠাকুর উঠিলেন এবং কেমন উন্মনাভাবে কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া ধীর মন্থর গতিতে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন।...সে জটা-জটিল বিভূতিমণ্ডিত বেশ, সে ধীর স্থির পাদক্ষেপ ও পরে অচল অটল স্থিতি এবং বিশেষতঃ সে অপার্থিব অন্তর্মুখী নির্নিমেষ দৃষ্টি ও অধরকোণে ঈষৎ হাস্যরেখা দেখিয়াই লোকে কি এক অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় দিব্য ভাব উপলব্ধি করিয়া আনন্দে বিস্ময়ে পল্লীগ্রামের প্রথামত উচ্চরবে হরি ধ্বনি করিয়া উঠিল এবং রমণীগণের কেহ কেহ উলুধ্বনি এবং কেহ কেহ শঙ্খধ্বনি ও করিতে লাগিল। অনন্তর সকলকে স্থির করিবার জন্য অধিকারী ঐ গোলযোগের ভিতরেই যাত্রার পালায় যেমন ছিল, শিবস্তুতি আরম্ভ করিলেন। তাহাতে শ্রোতারা কথঞ্চিৎ স্থির হইল বটে কিন্তু পরস্পরে ইসারা ও গা ঠেলিয়া, বাহবা বাহবা গদাইকে কি সুন্দর দেখাইতেছে, ছোঁড়া শিবের পালাটা এত সুন্দর কর্‌তে পার্‌বে তা কিন্তু ভাবিনি, ছোঁড়াকে বাগিয়ে নিয়ে আমাদেরই একটা যাত্রার দল কর্‌লে হয়, ইত্যাদি—নানা কথা অনুচ্চস্বরে চলিতে লাগিল। গদাই কিন্তু তখনও সেই একই ভাবে দণ্ডায়মান, অধিকন্তু তাঁহার বক্ষ বহিয়া অবিরত নয়নাশ্রু পতিত হইতেছে! এইরূপে কিছুক্ষণ অতীত হইলে গদাই তখনও স্থান পরিবর্ত্তন বা বলা কহা কিছুই করিতেছেন না দেখিয়া অধিকারী

ও পল্লীর বৃদ্ধ দুই এক জন বালকের নিকটে গিয়া দেখেন তাহার হস্ত পদ অসাড়—বালক সম্পূর্ণ সংজ্ঞাশূন্য! তখন গোলমাল দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। কেহ বলিল—জল, জল, চোখে মুখে জল দাও; কেহ বলিল, বাতাস কর; কেহ বলিল—শিবের ভর হয়েচে, নাম কর; আবার কেহ বলিল—ছোঁড়াটা রস ভঙ্গ কর্‌লে, যাত্রাটা আর শোনা হোলো না দেখ্‌চি! যাহা হউক, বালকের কিছুতেই সংজ্ঞা হইতেছেনা দেখিয়া যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল এবং গদাইকে কাঁধে লইয়া কয়েক জন কোনরূপে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিল। শুনিয়াছি, সে রাত্রে গদাইয়ের সে ভাব বহু প্রযত্নেও ভঙ্গ হয় নাই এবং বাড়িতে কান্নাকাটি উঠিয়াছিল। পরে সূর্যোদয় হইলে তিনি আবার প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন।*

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ।)

আলমবাজার হইতে বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাগানে যখন মঠ উঠিয়া যায় তাহার অল্পদিন পরে স্বামীজি তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের নিকট প্রস্তাব করেন যে ঠাকুরের ভাব জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকল্পে বাঙ্‌লা ভাষায় একখানি সংবাদ পত্র বাহির করিতে হইবে। স্বামীজি প্রথমতঃ একখানি দৈনিক সংবাদ পত্রের প্রস্তাব করেন। কিন্তু উহা বিস্তর অর্থ সাপেক্ষ হওয়ায় পাক্ষিক পত্র বাহির করিবার প্রস্তাবই সকলের অভিমত হইল এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতের উপর উহার পরিচালনের ভার অর্পিত হইল। স্বামীজির নিজের নিকটে এক সহস্র টাকা ছিল, ঠাকুরের একজন গৃহস্থভক্ত † আর এক সহস্র ধার দিলেন—ঐ টাকায় কার্য্যারম্ভ হইল। একটী প্রেস্ § খরিদ করা হইল এবং শ্যামবাজার রামচন্দ্রমৈত্রের গলিতে ঐ প্রেস্ স্থাপিত হইল। স্বামী ত্রিগুণাতীত এইরূপে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া ১৩০৫ সালের ১লা মাঘ ঐ পত্রিকা প্রথম প্রকাশ করিলেন। পত্রিকার স্বামীজি "উদ্বোধন" নাম মনোনীত

---

* কেহ কেহ বলেন তিনি তিন দিন সমভাবে ঐ অবস্থায় ছিলেন। আমরা কিন্তু তাহা শুনি নাই।

† হরমোহন মিত্র। § প্রেসটি স্বামীজির জীবনকালেই নানা কারণে বিক্রয় করা হয়।

করিলেন এবং উহার উন্নতিকল্পে ত্রিগুণাতীতকে বহু আশীর্ব্বাদ করিলেন। অক্লিষ্টকর্ম্মা স্বামী ত্রিগুণাতীত, স্বামীজির আদেশে উহার মুদ্রন ও প্রচারকল্পে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া ভার। কখনো ভক্ত গৃহস্থের ভিক্ষান্নে,কখনো অনশনে,কখনো পায়ে হাঁটিয়া ৫ ক্রোশ পথ চলিয়া পত্রিকার উন্নতি ও প্রচারের জন্য তিনি এইরূপে সহরে বাস ও সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেন। কারণ, পয়সা দিয়া এজেণ্ট রাখিবার তখন সংস্থান ছিল না। স্বামীজিরও আদেশ ছিল, পত্রিকার জন্য গচ্ছিত টাকার একটী পয়সাও পত্রিকার ব্যয় ভিন্ন অন্য কোনরূপে খরচ করিতে পারিবে না। স্বামী ত্রিগুণাতীতও ভিক্ষাশিক্ষা করিয়া নিজের গ্রাসাচ্ছাদন চালাইয়া ঐ আদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিয়াছিলেন।

পত্রিকার মুখবন্ধ স্বামীজি নিজে লিখিয়া দেন। এবং কথা হয় যে ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহিভক্তগণই এই পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিবেন। কোনরূপ অশ্লীলতা ব্যঞ্জক বিজ্ঞাপনাদি ইহাতে প্রকাশ না হয় এ বিষয়ও স্বামীজি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। সঙ্ঘরূপে পরিণত রামকৃষ্ণমিশনের মেম্বরগণকে স্বামীজি এই পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিতে এবং ঠাকুরের মত পত্রিকা সহায়ে জনসাধারণে প্রচার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। পত্রিকার ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইলে শিষ্য একদিন মঠে উপস্থিত হইয়াছে। স্বামীজিকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে তিনি তাহার সহিত "উদ্বোধন" পত্রিকা সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন—

স্বামীজি:—(পত্রিকার নামটি বিকৃত করিয়া পরিহাসচ্ছলে। "উদ্বন্ধন" দেখেছিস্?

শিষ্য:—আজ্ঞে হ্যাঁ; সুন্দর হয়েছে।

স্বামীজি:—এই পত্রিকার ভাব, ভাষা সব নূতন ছাঁচে গড়্‌তে হবে।

শিষ্য:—কি রূপ?

স্বামীজি:—ঠাকুরের ভাব ত সাব্বাইকে দিতে হবেই। অধিকন্তু বাঙ্গালা ভাষায় নূতন ওজস্বীতা আন্‌তে হবে। এই যেমন—কেবল ঘন ঘন verb use (ক্রিয়াপদের ব্যবহার) করলে, ভাষার দম্ কমে যায়। বিশেষণ দিয়ে verb (ক্রিয়াপদের) ব্যবহারগুলি কমিয়ে দিতে হবে। তুই ঐরূপে প্রবন্ধ লিখ্‌তে আরম্ভ কর। আমায় আগে দেখিয়ে তবে উদ্বোধনে ছাপ্‌তে দিবি।

শিষ্য :—মহাশয়, স্বামী ত্রিগুণাতীত এই পত্রিকার জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন—তাহা অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

স্বামীজি :—তুই বুঝি মনে কচ্ছিস্ ঠাকুরের—এই সব সন্ন্যাসি সন্তানেরা কেবল গাছতলায় ধূনী জ্বালিয়ে ব'সে থাক্‌তে জন্মেছে? এরা যে যখন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে তখন তার উদ্যম দেখে লোকে অবাক হবে। এদের কাছে কাজ কি কোরে কত্তে হয় তা শেখ্। এই দেখ্ আমার আদেশ পালন কত্তে ত্রিগুণাতীত সাধন ভজন ধ্যান ধারণা পর্য্যন্ত ছেড়ে দিয়ে কার্য্যে নেবেছে। একি কম sacrificeর (ত্যাগস্বীকারের) কথা—আমার প্রতি কতটা ভালবাসা থেকে এ কর্ম্মপ্রবৃত্তি এসেছে বল দেখি? success (কাজ হাসিল্) করে তবে ছাড়্‌বে!! তোদের কি এমন রোক্ আছে?

শিষ্য :—কিন্তু মহাশয়, গেরুয়া পরা সন্ন্যাসীর গৃহীদের দ্বারে দ্বারে ঐরূপে ঘোরা আমাদের চক্ষে কেমন কেমন ঠেকে।

স্বামীজি :—কেন? পত্রিকার প্রচার তো গৃহীদেরই কল্যাণের জন্য। দেশে নবভাব প্রচারের দ্বারা জনসাধারণের কল্যাণ সাধিত হবে। এই ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম্ম বুঝি তুই সাধন ভজনের চেয়ে কম মনে কচ্ছিস্? আমাদের উদ্দেশ্য জীবের হিতসাধন। এই পত্রিকার আয় দ্বারা টাকা জমাবার মতলব আমাদের নাই। আমরা সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী—মাগছেলে নাই যে তাদের জন্য কিছু রেখে যেতে হবে। success (কাজ হাসিল ও আয় বৃদ্ধি) হয় তো এর income (আয়টা) সমস্তই জীবসেবাকল্পে ব্যয়িত হবে। স্থানে স্থানে সঙ্ঘগঠন, সেবাশ্রম স্থাপন আরো কত কি হিতকর কার্য্যে এর উদ্বর্ত্ত অর্থের সৎব্যয় হ'তে পারবে। আমরাতো গৃহীদের মত নিজেদের রোজগারের মতলব এঁটে একাজ কর্‌ছিনি। শুদ্ধ পরহিতেই আমাদের সকল movement (কার্য্য) এটা জেনে রাখ্‌বি।

শিষ্য :—তাহা হইলেও সকলে এভাব লইতে পারিবেনা।

স্বামীজি :—নাই বা পাল্লে। তাতে আমাদের এলো গেলো কি? আমরা criticism (নিন্দা সুখ্যাতি) গণ্য করে কার্য্যে অগ্রসর হই না।

শিষ্য :—মহাশয় এই পত্রিকা ১৫ দিন অন্তর বাহির হইবে; আমাদের ইচ্ছা সপ্তাহিক হয়।

স্বামীজি :—তা তো বটে, কিন্তু funds (টাকা) কোথায়? ঠাকুরের

ইচ্ছায় টাকার যোগাড় হলে একে পরে দৈনিকও করা যেতে পারে। রোজ লক্ষ কপি ছেপে কলিকাতার গলিতে গলিতে free distribution (বিনামূল্যে বিতরণ) করা যেতে পারে।

শিষ্য :—আপনার এ সঙ্কল্প বড়ই উত্তম।

স্বামীজি :—আমার ইচ্ছে হয়, কাগজটাকে পায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তোকে editor (সম্পাদক) করে দিব। প্রথমটা পায়ে দাঁড়করাবার শক্তি তোদের এখনও হয় নাই। সেটা করতে এই সব সর্ব্বত্যাগী সাধুরাই সক্ষম। এরা কাজ ক'রে ক'রে মরে যাবে তবু হটবার ছেলে নয়। তোরা একটু বাধা পেলে, একটু criticism (নিন্দা) শুন্‌লেই দুনিয়া আঁধার দেখিস্।

শিষ্য :—সে দিন দেখিলাম স্বামী ত্রিগুণাতীত ঠাকুরের ছবি প্রেসে পূজা করিয়া তবে কাজ আরম্ভ করিলেন এবং কার্য্যের সফলতার জন্ম আপনার কৃপা প্রার্থনা করিলেন।

স্বামীজি :—আমাদের centre (কেন্দ্র) তো ঠাকুরই। আমরা এক এক-জন সেই জ্যোতিকেন্দ্রের এক একটী ray (কিরণধারা)। ঠাকুরকে পূজা করে কাজটা আরম্ভ করেছে? বেশ করেছে। কৈ আমায় তো পূজার কথা কিছু বল্লেনা।

শিষ্য :—মহাশয়,তিনি আপনাকে ভয় করেন। ত্রিগুণাতীত স্বামী আমায় কল্য বলিলেন—"তুই আগে স্বামীজির কাছে গিয়ে জেনে আয় পত্রিকার ১ম খণ্ড বিষয়ে তিনি কি অভিমত প্রকাশ করেছেন, তারপর আমি তাঁর সঙ্গে দেখা কোর্‌বো।"

স্বামীজি :—তুই গিয়ে বলিস্, আমি তার কার্য্যে খুব খুসী হয়েছি। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাবি। আর তোরা প্রত্যেকে যতটা পারবি তাকে সাহায্য করিস। উহাতে ঠাকুরের কাজই করা হবে। বুঝ্‌লি?

কথাগুলি বলিয়াই স্বামীজি ব্রহ্মানন্দ স্বামীজিকে নিকটে আহ্বান করি-লেন এবং আবশ্যক হইলে ভবিষ্যতে উদ্বোধনের জন্ম ত্রিগুণাতীত স্বামীকে আরও টাকা দিতে আদেশ করিলেন। ঐ দিন রাত্রে আহারান্তে স্বামীজি পুনরায় শিষ্যের সহিত উদ্বোধন পত্রিকা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে উহাও আমরা এখানে পাঠককে বলিতেছি।

স্বামীজি :—উদ্বোধনে সাধারণকে কেবল positive ideals (সকল বিষয় গড়িয়া তুলিবার আদর্শ) দিতে হবে। negative thought

(সেই সেই ভাবে) মানুষকে weak (নির্জ্জীব) করে দেয়। দেখ্ছিস্ না, যে সকল মা বাপ ছেলেদের দিন রাত লেখাপড়ার জন্য তাড়া দেয়—বলে এটার কিছু হবে না, বোকা গাধা—তাদের ছেলেগুলি অনেকস্থলে তাই হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেদের ভাল বল্লে—উৎসাহ দিলে সময়ে ভাল নিশ্চয় হয়। ছেলেদের পক্ষে যা নিয়ম children in the region of higher thoughts—(উচ্চ ভাব রাজ্যের অধিকার তুলনায় যারা ঐরূপ শিশুদের মত তাদের) সম্বন্ধেও তাই। positive idea (জীবন গড়ার ভাবগুলি) দিতে পার্‌লে সাধারণে মানুষ হয়ে উঠ্‌বে ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখ্‌বে। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, শিল্প সকল বিষয়ে যা চিন্তা ও চেষ্টা মানুষ কর্‌চে তাতে ভুল না দেখিয়ে ঐ সব বিষয়ে কেমন করে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হতে হবে তাই বলে দিতে হবে। ভ্রমপ্রমাদ দেখালে মানুষের feeling wounded (মনে আঘাত দেওয়া) হয়। ঠাকুরকে দেখেছি—যাদের আমরা হেয় মনে কর্‌তুম—তাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে জীবনের মতি গতি ফিরিয়ে দিতেন। তাঁর শিক্ষা দেওয়ার রকমই একটা অদ্ভুত ব্যাপার! কথাগুলি বলিয়া স্বামীজি একটু স্থির হইলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার বলিতে লাগিলেন—ধর্ম্ম প্রচারটা কেবল যাতে তাতে, যার তার উপর নাক সিট্‌কানো ব্যাপার ব'লে যেন বুঝিস্ নে। physical, mental, spiritual (শরীর, মন ও আত্মা-সম্বন্ধীয়) সকল ব্যাপারেই মানুষকে positive idea (গড়িবার ভাব সকল) দিতে হবে। কিন্তু ঘেন্না করে নয়। পরস্পরকে ঘেন্না ক'রে ক'রেই তোদের অধঃপতন হয়েছে। এখন কেবল positive thought (সবল হইবার ও জীবন গড়িবার ভাব ছড়িয়ে লোককে তুল্‌তে হবে। প্রথম ঐরূপে সমস্ত হিঁদুজাতটাকে তুল্‌তে হবে। তারপর জগৎটাকে তুল্‌তে হবে। ঠাকুরের অবতীর্ণ হওয়ার কারণই উহা। তিনি জগতে কারো ভাব নষ্ট করেন নাই। মহা অধঃপতিত মানুষকেও তিনি অভয় দিয়ে উৎসাহ দিয়ে তুলে নিয়েছেন। আমাদেরও তাঁর পদানুসরণে সকলকে তুল্‌তে হবে— জাগাতে হবে—বুঝ্‌লি ?

তোদের History, literature, Mythology (ইতিহাস,সাহিত্য, পুরাণ), সকল শাস্ত্র মানুষকে কেবল ভয়ই দেখাচ্চে! মানুষকে কেবল বল্‌ছে তুই নরকে যাবি, তোর আর উপায় নাই! তাই এই অবসন্নতা ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। সেই জন্য বেদ বেদান্তের উচ্চ উচ্চ ভাবগুলি

সাদা কথায় মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে। সদাচার, সদ্ব্যবহার ও বিদ্যা-শিক্ষা দিয়ে ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে এক ভূমিতে দাঁড় করাতে হবে। উদ্বোধন কাগজে এই সব লিখে আবালবৃদ্ধবনিতাকে তোল দেখি। তবে জানবো তোর বেদ বেদান্ত পড়া সার্থক হয়েছে। কি বলিস—পারবি ?

শিষ্য :—আপনার আশীর্ব্বাদ ও আদেশ হইলে সকল বিষয়েই সিদ্ধকাম হইব বলিয়া মনে হয়।

স্বামীজি :—আর একটা কথা শরীরটাকে খুব মজবুত করতে তোকে শিখতে হবে ও সকলকে শিখাতে হবে। দেখছিস্‌নে এখনো রোজ আমি ডাম্বেল কসি। রোজ রোজ সকাল সন্ধ্যায় বেড়াবি। শারীরিক পরিশ্রম করবি। body and mind must run parallel (দেহ ও মন সমান ভাবে উন্নত হওয়া চাই।)

সব বিষয়ে পরের উপর নির্ভর করে চলবে কেন ? ঐ বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা বোধ হ'লে নিজেরাই তখন ঐ বিষয়ে যত্ন করবে। সেই প্রয়োজনীয়তা বোধের জন্যই এখন education (শিক্ষার) দরকার। কথায় কথায় রাত্রি অধিক হওয়ায় স্বামীজি এইবার বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। শিষ্যও স্বামীজির কাছেই একপার্শ্বে শয়ন করিল।

হিন্দুধর্ম্মের সীমানা।

(প্রবুদ্ধ ভারত, এপ্রিল, ১৮৯৯)

আমাদের প্রতিনিধি লিখিতেছেন,—

অন্যধর্ম্মাবলম্বীকে হিন্দুধর্ম্মে আনয়ন সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের মতামত জানিতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক আমি আদিষ্ট হইয়াছিলাম। একদিন সায়ংকালে গঙ্গাবক্ষে নৌকার ছাদে বসিয়া তাঁহার সহিত এইরূপ কথোপকথনের সুযোগ মিলিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে—আমরা বেলুড়স্থ রামকৃষ্ণমঠের পোস্তার নিকট নৌকা লাগাইয়াছি—স্বামীজি মঠ হইতে নৌকায় নামিয়া আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে আসিলেন।

স্থান ও কাল উভয়ই পরম রমণীয় ছিল। মস্তকের উপর নক্ষত্রমালা

শুভ্র কিরণ বিস্তার করিতেছিল—চারিদিকে কুলুকুলুনাদিনী জাহ্নবী, আর একদিকে ক্ষীণালোকিত মঠভবন পশ্চাতে তালবৃক্ষ ও ছায়াদানসমর্থ প্রকাণ্ড মহীরুহ সমন্বিত হইয়া বিরাজ করিতেছিল।

আমিই প্রথমে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলাম, বলিলাম,—"স্বামীজি, যাহারা হিন্দুধর্ম্ম ছাড়িয়া অন্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে হিন্দুধর্ম্মে পুনগ্রহণ বিষয়ে আপনার মতামত কি জানিবার জন্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। আপনার কি মত, তাহাদিগকে পুনগ্রহণ করা যাইতে পারে?"

স্বামীজি বলিলেন,—

"নিশ্চিত। তাহাদের অনায়াসে পুনগ্রহণ করা যাইতে পারে, করাও উচিত।"

তিনি মুহূর্ত্তকাল গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তারপর আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন।

তিনি বলিলেন —

"আর এক কথা, তাহাদিগকে পুনগ্রহণ না করিলে আমাদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যাইবে। যখন মুসলমানেরা প্রথম এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন প্রাচীনতম মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে ভারতে ৬০ কোটি হিন্দু ছিল, এখন আমরা বিশ কোটিতে পরিণত হইয়াছি। আর, কোন লোক হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিলে ঐ সমাজের শুধু যে একটী লোক কম পড়ে মাত্র, তাহা নয়, কিন্তু তাহার একটী করিয়া শক্রবৃদ্ধি হয়।

"তার পর আবার এইরূপ হিন্দুধর্ম্মত্যাগী মুসলমান বা খ্রীষ্টিয়ানের মধ্যে অধিকাংশই তরবারিবলে ধর্ম্মান্তর গ্রহণে বাধ্য হইয়াছে অথবা তাহাদেরই বংশধর। ইহাদিগের হিন্দুধর্ম্মে ফিরিয়া আসিবার পক্ষে নানারূপ আপত্তি উত্থাপন করা বা প্রতিবন্ধকতাচরণ করা স্পষ্টতঃই অন্যায়। আর যাহারা কোনকালে হিন্দুসমাজভুক্ত ছিল না, তাহাদের সম্বন্ধেও কি আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন?—কেন—দেখনা, অতীতকালে এইরূপ লক্ষ লক্ষ বিধর্ম্মিগণকে হিন্দুধর্ম্মে আনয়ন করা হইয়াছে আর এখনও সেরূপ চলিতেছে।

"আমার নিজের মতে এই কথা যে ভারতের আদিমনিবাসীজাতি, ভারতবহির্ভূতস্থাননিবাসী জাতি এবং মুসলমানাধিকারের পূর্ব্ববর্ত্তী আমাদের প্রায় সকল বিজেতৃবর্গের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে, শুধু তাহাই নহে

পুরাণসমূহে যে সকল জাতিবিশেষের উৎপত্তির বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধেও একথা খাটে। আমার মতে তাহারা বিধর্ম্মী ছিল—তাহাদিগকে এই ভাবে হিন্দু করিয়া লওয়া হইয়াছে।

"যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিয়াছিল, এক্ষণে আবার হিন্দুসমাজে ফিরিয়া আসিতে চাহে, তাহাদের পক্ষে প্রায়শ্চিত্তক্রিয়া আবশ্যক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহাদিগকে বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল—যেমন কাশ্মীর ও নেপালে অনেক লোক দেখা যায়—অথবা যাহারা কখন হিন্দু ছিল না, এক্ষণে হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিতে চায়, তাহাদের পক্ষে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করা উচিত নহে।"

আমি সাহসপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম—

"স্বামীজি, কিন্তু ইহারা কোন্ জাতি হইবে? তাহাদের কোন না কোনরূপ জাতি থাকা আবশ্যক—নতুবা তাহারা কখন বিশাল হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া মিশিতে পারিবে না। হিন্দুসমাজে তাহাদের যথার্থ স্থান কোথায়?"

স্বামীজি ধীরভাবে বলিলেন—

"যাহারা পূর্ব্বে হিন্দু ছিল, তাহারা অবশ্য তাহাদের জাতি ফিরিয়া পাইবে। আর নূতন যাহারা, তাহারা নিজের জাতি নিজেরাই করিয়া লইবে।"

তিনি আরো বলিতে লাগিলেন,—

"আপনার স্মরণ রাখা উচিত, বৈষ্ণব সমাজে ইতিপূর্ব্বে এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন জাতি হইতে যাহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল এবং অহিন্দু—সকলেই বৈষ্ণবসমাজের আশ্রয় লাভ করিয়া নিজেদেরই একটা জাতি গঠন করিয়া লইয়াছিল—আর সে জাতি বড় হীন জাতি নহে, বেশ ভদ্র জাতি। রামানুজ হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালাদেশে চৈতন্য পর্য্যন্ত সকল বড় বড় বৈষ্ণব আচার্য্যই ইহা করিয়াছেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"এই নূতন যাহারা আসিবে, তাহাদের বিবাহ কোথায় হইবে?"

স্বামীজি স্থিরভাবে বলিলেন,—

"এখন যেমন চলিতেছে, নিজেদের মধ্যেই।"

আমি বলিলাম,—

"তার পর নামের কথা। আমার বোধ হয়, অহিন্দু এবং যে সব স্বধর্ম্ম-ত্যাগী, অহিন্দু নাম লইয়াছিল, তাহাদের নূতন নামকরণ করা উচিত। তাহাদিগকে কি জাতিসূচক নাম বা আর কোন প্রকার নাম দেওয়া যাইবে?"

স্বামীজি চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন,—

"অবশ্য নামের অনেকটা *শক্তি আছে বটে।"*

কিন্তু তিনি এই বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিলেন না।

কিন্তু তারপর আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাতে তাঁহার আগ্রহ যেন উদ্দীপ্ত হইল। প্রশ্ন করিলাম,—

"স্বামীজি, এই নবাগন্তুকগণ কি হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন প্রকার শাখা হইতে নিজেদের ধর্ম্মপ্রণালী নিজেরাই নির্ব্বাচন করিয়া লইবে অথবা আপনি তাহাদের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মপ্রণালী নির্ব্বাচন করিয়া দিবেন?"

স্বামীজি বলিলেন,—

"একথা কি আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়? তাহারা আপনাপন পথ আপনারাই বাছিয়া লইবে। কারণ, নিজে নির্ব্বাচন করিয়া না লইলে হিন্দুধর্ম্মের মূলভাবটীই নষ্ট করা হয়। আমাদের ধর্ম্মের সার এইটুকু যে, প্রত্যেকের নিজ নিজ ইষ্ট নির্ব্বাচনের অধিকার আছে।"

আমি এই কথাটী বিশেষ মূল্যবান্ বলিয়া মনে করিলাম। কারণ, আমার বোধ হয়, আমার সম্মুখস্থ এই ব্যক্তিটী জগতের বর্ত্তমান অন্য সকল ব্যক্তি অপেক্ষা বৈজ্ঞানিকভাবে ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ *ভিত্তিসমূহের আলোচনায় অধিক বর্ষ কাটাইয়াছেন আর ইষ্টনির্ব্বাচনের* স্বাধীনতারূপ তত্ত্বটী এত উদার যে, সমগ্র জগৎ ইহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

তারপর কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে কথাবার্ত্তা উঠিল। অবশেষে আমার নিকট সহৃদয়ভাবে বিদায় গ্রহণ করিয়া এই মহান্ ধর্ম্মাচার্য্য নিজের লণ্ঠন তুলিয়া মঠে ফিরিয়া গেলেন আর আমি গঙ্গার পথশূন্য পথ দিয়া, তদুপরিস্থ নানাবিধ আকারের নৌকাসমূহের মধ্য দিয়া যত শীঘ্র সম্ভব আমার কলিকাতার বাটীতে ফিরিলাম।

বেদান্ত কি?

(শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ।)

বেদান্ত কি জানিতে হইলে বেদান্ত শব্দের অর্থ কি জানা আবশ্যক। সুতরাং বেদান্ত শব্দের অর্থ কি অগ্রে তাহাই দেখা যাউক। "বেদ" ও "অন্ত" এই দুইটী শব্দ একত্র হইয়া "বেদান্ত" শব্দটী গঠিত হইয়াছে। এই দুইটী শব্দ একত্র হওয়ায় ইহার অর্থ হইল বেদের যাহা অন্ত তাহাই বেদান্ত। এখন "বেদ"ও "অন্ত" শব্দের যাহা প্রকৃত অর্থ তাহা যদি জানা যায়, তাহা হইলেই বেদের অন্ত বলিতে যাহা বুঝা উচিত তাহা বুঝা যাইবে। অভিধানে দেখা যায় "বেদ" শব্দে "বেদ গ্রন্থ" "ব্রহ্ম" ও "জ্ঞান" এবং "অন্ত" শব্দে "শেষ" ও "নির্ণয়" বুঝায়। কিন্তু তথাপি "বেদ" শব্দের মুখ্য অর্থ "বেদগ্রন্থ" এবং "অন্ত" শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ "শেষ"—ইহা সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং এই দুইটী শব্দের মুখ্য ও প্রসিদ্ধ অর্থদ্বয় একত্র করিলে "বেদান্ত" শব্দে বেদের শেষ ভাগ বুঝায়।

বেদান্ত বলিতে যদি বেদের শেষ ভাগ বুঝাইল তাহা হইলে, এখন "বেদ" বলিতে আমাদের কি বুঝা উচিত, তাহা একবার আলোচনা করা আবশ্যক। আজকাল বেদ বলিতে সাধারণতঃ কতকগুলি গ্রন্থ বুঝায়। ইহার ভাষা "সংস্কৃত" হইলেও তাহা বর্ত্তমান সংস্কৃত ভাষার মত নহে। বর্ত্তমান ভাষার ব্যাকরণ ও ইহার ব্যাকরণ পৃথক্। পূর্ব্বে এই বেদ গ্রন্থাকারে ছিল না, তখন ইহার শব্দরাশি লোকে মুখস্থ করিয়া রাখিত। ইহা শিক্ষা করিতে হইলে গুরুর মুখ হইতে শুনিয়া শিখিতে হইত, আর এই জন্যই ইহার একটী নাম হইয়াছিল "শ্রুতি"।

মনুষ্যজাতিকে ইহ পারলৌকিক সর্ব্ববিধ জ্ঞানে জ্ঞানী করিবার জন্য ভগবদিচ্ছায় ইহার আবির্ভাব হয়। আদিম মানবজাতি ইহারই উপদেশ অনুসারে সর্ব্ববিধ ব্যবহার সম্পন্ন করিতেন এবং লৌকিক বা অলৌকিক সকল প্রকার জ্ঞাতব্য অবগত হইতেন। তাঁহারা ইহারই সাহায্যে একদিকে রোগীর রোগ আরোগ্যের জন্য চিকিৎসা বিদ্যা, পুত্রলাভার্থ আহার বিহার সংক্রান্ত বিজ্ঞান, এবং শস্যাদি উপাদান মানসে কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি লৌকিক উপায়সমূহ যেমন শিক্ষা করিতেন, অপরদিকে আবার এই বেদ হইতেই

হোম যাগ যজ্ঞাদিস্বরূপ অলৌকিক উপায়সমূহও তদ্রূপ অবগত হইতেন। ফলতঃ বেদ লৌকিক ও অলৌকিক অভীষ্ট সাধনের জন্য লৌকিক ও অলৌকিক উভয়বিধ বিদ্যাই আদিম মানবজাতিকে শিক্ষা দিতেন। ইহা এককালে সমগ্র মানবজাতির জ্ঞান-প্রদীপ ও উন্নতির সোপান ছিল। এমন বিদ্যা নাই যাহা বেদে ছিল না, এমন জ্ঞান নাই যাহা বেদে কথিত হয় নাই।

কিন্তু শিশু যেমন জননীর অঙ্গুলি ধরিয়া হাঁটিতে শিখিয়া পরে স্বাধীন ভাবে চলিতে সক্ষম হয়, তদ্রূপ বেদরূপ জ্ঞানপ্রদীপের সাহায্যে যখন মানবকুল নিজ নিজ জ্ঞানপ্রদীপ প্রজ্জ্বালিত করিয়া লইতে সক্ষম হইল, তখন তাহারা লৌকিক বিদ্যার জন্য আর বেদের মুখাপেক্ষী রহিল না, তাহারা তখন কেবল অলৌকিক উপায়ে লৌকিক ও অলৌকিক জ্ঞানরত্নলাভের জন্য বেদের শরণ গ্রহণ করিত। এইরূপে লোকে ক্রমে ক্রমে বেদের লৌকিক বিদ্যার অংশ বিস্মৃত হইয়া যাইতে লাগিল এবং কালে বেদ বলিতে তাহারা অলৌকিক বিদ্যাপ্রতিপাদক শাস্ত্র বলিয়া বুঝিল।

লৌকিক বিদ্যায় মানবকুল যেমন স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইল অলৌকিক বিদ্যাতে তাহারা তদ্রূপ স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইল না, তাহারা লৌকিক ব্যবহারে যেমন চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে প্রমাণ বলিয়া বিবেচনা করিত তদ্রূপ সর্ব্ববিধ অলৌকিক বিষয়ে বেদকেই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিত। অদ্যাবধি প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী সকলেই বেদকে এই দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন।

বেদের এই প্রকার প্রামাণ্যের প্রতিহেতু কি—বেদের প্রতি এতাদৃশ সম্মানের কারণ কি বুঝিতে হইলে আমাদের বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করা আবশ্যক। সুতরাং দেখা যাউক বেদের উৎপত্তি কি করিয়া হইয়াছে।

বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রসমূহ আলোচনা করিলে দেখা যায়, আমরা যেমন সাধারণতঃ বুদ্ধিপূর্ব্বক গ্রন্থাদি রচনা করি এ বেদ সেভাবে রচিত হয় নাই আমাদের মত ইহার রচনাকর্ত্তা কেহ নাই। ইহা প্রতিসৃষ্টির প্রারম্ভে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানের নিকট হইতে প্রথমে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা, তৎপরে ব্রহ্মার নিকট হইতে দেবতা ও ঋষিগণ এবং তৎপরে দেবতা ও ঋষিগণের নিকট হইতে আদিম মানবজাতির কতিপয় মানবপুঙ্গব লাভ করেন। এই সকল মানবপুঙ্গব হইতে ক্রমে বেদ জনসমাজে প্রচারিত

হয় এবং পরে এই মানবপুঙ্গবগণই ঋষি নামে অভিহিত হন। প্রতিসৃষ্টিতে ব্রহ্মা একই বেদ লাভ করেন, এবং পৃথিবীতে সেই একই বেদ প্রচারিত হয় বলিয়া একদিকে বেদকে যেমন অপৌরুষেয় বলা হয়, অন্যদিকে ইহা উক্ত ব্রহ্মা ও দেবতা এবং ঋষিগণের নিকট হইতে মানবঋষিগণ প্রাপ্ত হন বলিয়া ইহাকে অশরীরিণী বাণী বলা হয়। অপৌরুষেয়—কারণ ইহা ব্রহ্মা, ভগবানের নিকট হইতে প্রতিসৃষ্টিতে একইরূপে প্রাপ্ত হন, স্বয়ং রচনা করেন না এবং অশরীরিণী বাণী, কারণ এই ব্রহ্মা, দেবতা ও ঋষিগণ আমাদের ন্যায় শরীরধারী নহেন। বেদের এই প্রকার উৎপত্তিই বেদের পূর্ব্বোক্ত অসাধারণ সম্মানের হেতু এবং অবিসম্বাদী প্রামাণ্যের কারণ।

প্রাচীন আচার্য্যগণের গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে আরও দেখা যায়, বেদের এই প্রকার উৎপত্তিই বেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণ্যের অন্যতম হেতু। কারণ ইহা যদি ব্রহ্মাদি দেবর্ষিগণের মধ্য দিয়া না আসিয়া মানবঋষিগণের তপঃসিদ্ধির ফলে তাঁহাদের অবুদ্ধিপূর্ব্বক রচনাও হইত, যদি বেদ বড় সম্মানাস্পদ মানবপুঙ্গবগণের দীর্ঘকাল তপস্যার পর সত্যদর্শনরূপ হৃদয়ের অনর্গল ও অকপট উচ্ছ্বাস হইত তাহা হইলেও তাহা দেবর্ষিগণলব্ধ বেদের সমকক্ষ হইতে পারিত না। কারণ দেবর্ষিগণ ও মানবঋষিগণের যদি জাতি ও প্রকৃতি বিচার করা যায় তাহা হইলে সত্যলাভের সামর্থ্য সম্বন্ধে প্রকৃতিগত একটা তারতম্য উপলব্ধি হইয়া থাকে। বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রসমূহের প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলেই জানা যায় যে দেবর্ষিগণের শরীরও আমাদের শরীরে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, জ্ঞানলাভের প্রতিবন্ধক আমাদের যত অধিক তাঁহাদের তাহা অপেক্ষা অনেক কম। আমাদের দৃষ্টি প্রতিহত, তাঁহাদের দৃষ্টি প্রায় অপ্রতিহত, এক কথায় আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তি অপেক্ষা তাঁহাদের ইন্দ্রিয় অনেকগুণে স্বভাবতঃই অধিক। সুতরাং তাঁহাদের সাধ্যমত তপস্যার ফল ও আমাদের সাধ্যানুযায়ী তপস্যার ফলে প্রকৃতিগত বিস্তর ভেদ থাকিতে বাধ্য। এই জন্য রাম, শ্রীকৃষ্ণ, কপিল, ব্যাস ও বুদ্ধ প্রভৃতি অবতারগণের বাক্য পর্য্যন্তও বেদের আসন পায় নাই এবং এই জন্যই বেদের প্রামাণ্য এত অধিক ও এত শ্রেষ্ঠ।

ব্রহ্মাদি দেবর্ষিগণের মধ্য দিয়া প্রাপ্ত বলিয়া যদি বেদের প্রামাণ্যের এতাদৃশ শ্রেষ্ঠতা সিদ্ধ হয় তাহা হইলে এখন সহজেই মনে হইতে পারে, এই ব্রহ্মাদি দেবর্ষিগণ কে ? এবং ব্রহ্মা কি করিয়া সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগ-

বানের নিকট হইতে আমাদের উচ্চারিত শব্দরাশির ন্যায় বেদের শব্দরাশি লাভ করিলেন, আর তাঁহার নিকট হইতেই বা কি করিয়া উক্ত মানবঋষিগণ লাভ করিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর যতক্ষণ না পাওয়া যায় ততক্ষণ, বেদের প্রামাণ্যের পূর্ব্বোক্ত হেতু আমাদের হৃদয় অধিকার করিতে পারে না। এতদুদ্দেশ্যে প্রথমে দেখা যাউক ব্রহ্মাদি দেবর্ষিগণকে? তৎপরে তাঁহাদের বেদলাভ এবং তাঁহাদের নিকট মানবঋষিগণের বেদলাভ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত এই পৃথিবীতে যেমন গো, মনুষ্য প্রভৃতি নানা জাতীয় প্রাণী বাস করে তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত অন্যান্যলোকে ব্রহ্মাদি দেবর্ষিগণ নামক আর এক জাতীয় প্রাণী বাস করেন। আমাদের শরীরের উপাদান যেমন পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত হইলেও ক্ষিতি ও জল প্রধান, তদ্রূপ তাঁহাদের শরীরের উপাদান পঞ্চভূতনির্ম্মিত হইলেও আকাশ বায়ু ও তেজঃ প্রধান। আমরা যেমন আমাদের শরীরকে সঙ্কোচ বা বিস্তার করিতে পারি না, তাঁহারা কিন্তু তাহা করিতে পারেন। আমরা যেমন কঠিন ও ঘন পদার্থের ভিতর দিয়া গমনাগমন করিতে পারি না, তাঁহারা কিন্তু তাহা পারেন। আমরা যেমন শতবর্ষপরিমিতআয়ু তাঁহারা তদ্রূপ নহেন, আমরা যেমন এই দেহান্তে মরিয়া যাই, তাঁহারা তদ্রূপ এই বর্ত্তমান সৃষ্টির বিনাশে বিনষ্ট হন। আমরা যেমন আমাদের দেহেই আবদ্ধ তাঁহারা তদ্রূপ তাঁহাদের দেহেই আবদ্ধ নহেন, তাঁহারা তাঁহাদের দেহে থাকিযাও অন্যত্র বিরাজমান থাকিতে পারেন। আমরা যেমন আমাদের ন্যায় জড়শরীরধারীদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারি, তাঁহারা তদ্রূপ তাঁহাদের পরস্পরের উপর এবং আমাদের উপরও আধিপত্য করিতে পারেন। তাঁহারা আমাদের মত জীব হইলেও আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক ক্ষমতাশালী।

ব্রহ্মা এই দেবর্ষিগণের মধ্যে আদি পুরুষ ও সর্ব্বপ্রধান বলিয়া রাজাস্থানীয় এবং দেবতা ও ঋষিবৃন্দ যেন তাঁহার কর্ম্মচারীস্থানীয়। রাজা যেমন তাঁহার কর্ম্মচারীবৃন্দের দ্বারা রাজ্যশাসন করিয়া থাকেন, লোকপিতামহ ব্রহ্মাও উক্ত দেবতাবৃন্দ দ্বারা তাঁহার রাজ্যশাসন করেন। তবে প্রভেদ এই যে ব্রহ্মার রাজকার্য্যের মধ্যে জীবের ভাগ্যে জীবের কর্ম্মফল নিয়োগই প্রধান। জীবের অনন্ত কর্ম্মফলের মধ্যে কখন কোন্‌টী ভোগ্য, কখন কোন্‌টী ভোগ্য নহে এই সব নির্ণয় ও তাহার নিয়োগই ব্রহ্মার প্রধান কার্য্য। আর এই কর্ম্মের জন্য ব্রহ্মা জীবের বুদ্ধির উপর, ইন্দ্র মেঘ ও হস্তের

উপর, চন্দ্রদেবতা চন্দ্রালোক ও জীবের মনের উপর, সূর্য্যদেবতা সূর্য্যালোক ও জীবের চক্ষুর উপর, বরুণদেবতা জল ও জীবের রক্তের উপর, অগ্নিদেবতা অগ্নি বিদ্যুৎ এবং জীবের পিত্তধাতুর উপর অধিষ্ঠান করেন। এইপ্রকার অন্যান্য দেবতা, জীবও জগতের উপর আধিপত্য করিতেছেন।

এই ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রারম্ভে সত্যজ্ঞান লাভের জন্য যখন তপস্যা করেন তখন ভগবান্ ইঁহার হৃদয়ে যে জ্ঞানরাশি উদ্ভাসিত করেন তাহাই বেদ আখ্যা প্রাপ্ত হইল। অবশ্য জ্ঞান মাত্রেরই তৎপ্রকাশক শব্দ থাকে এ জন্য ব্রহ্মার মনে উক্ত জ্ঞানরূপবেদের সঙ্গে সঙ্গে শব্দরাশির আবির্ভাব হয়। অথচ এই আবির্ভাবকে ব্রহ্মার রচনা বলা যায় না, কারণ রচনামাত্রেই কল্পনা-প্রসূত ও রচনাকর্ত্তার সংস্কার দ্বারা কলুষিত হইয়া থাকে। পরন্তু ব্রহ্মার এই বেদলাভ এভাবের রচনা নহে; ইহা স্বপ্নে যেমন আমরা কখন কখন নূতন নূতন হিতোপদেশ শ্রবণ করিয়া থাকি ব্রহ্মাও ভগবানের নিকট কতকটা সেইভাবে বেদবাণী শ্রবণ করিয়া থাকেন। অনন্তর ব্রহ্মার নিকট হইতে ইন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণ এবং সনকাদি ঋষিগণ এই বেদ শ্রবণ করেন। মানবঋষিগণ তপঃপ্রভাবে উক্ত বেদ এই সকল দেবতা-ঋষিগণের নিকট হইতে পুনরায় শ্রবণ করেন, এবং এই ভাবে ভূমণ্ডলে বেদের প্রচার হইয়াছে। ফল কথা বেদ, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ভগবানের নিকট শ্রুত, তাঁহার নিজের ভাষায় তাঁহার দ্বারা দৃষ্ট-সত্যের পরিচায়ক তাঁহার রচিত কোন কিছু নহে।

আজ কাল পাশ্চাত্য বিজ্ঞালোকে দেবতা ও অশরীরিণীবাণীর সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমরা প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর সন্দিহান হইয়াছি। যাঁহারা বিশ্বাস করেন তাঁহারাও অনেক স্থলে হয়ত আপ্তবিশ্বাসী বলিয়া উপেক্ষিত বা বিদ্রূপের বিষয় হইয়া থাকেন। পরন্তু বিচারশীল সত্যানুসন্ধিৎসুর ইহাতে দেবতাতত্ত্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। প্রাচীনকালের জনসাধারণের ন্যায় আমরা সদাসর্ব্বদা দেবতা প্রত্যক্ষ করি না বলিয়া, অথবা পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথা অনুসারে যাহা দেবতার কার্য্য বলিয়া প্রথিত, আজ তাহার কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সিদ্ধ হইতেছে বলিয়া দেবতাতত্ত্ব সর্ব্বৈব মিথ্যা ইহা কোন যুক্তিশাস্ত্রই বলিয়া দিতে সাহসী হইবে না। একজনের দশটী

কথার তিনটী কথা যদি মিথ্যা হয় তাহা হইলে যে তাহার অবশিষ্ট সাতটি কথা মিথ্যা হইবে—একথা বলাও যেরূপ যুক্তিসঙ্গত "আমাদের বেদ বেদান্তোক্ত দেবতাতত্ত্ব মিথ্যা" একথা বলাও তদ্রূপ যুক্তিসঙ্গত। ফলতঃ এখনও মধ্যে মধ্যে এমন মহাত্মা দৃষ্টিপথের পথিক হন যাঁহারা দেবতাতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না এবং এতদ্বারা অপরকে লাভবান্ করিতেও পশ্চাৎপদ নহেন। অধিকন্তু যে বেদোপদিষ্ট তত্ত্বালোক লাভার্থ ইদানীন্তন বিজ্ঞানালোকে আলোকিত বিদ্বদ্বৃন্দ লালায়িত, সেই বেদেই যখন বেদোৎপত্তি ও দেবতাতত্ত্ব সম্বন্ধে এই সকল কথা দৃষ্টিগোচর হয়, তখন ইহাতে সন্দিহান হইয়া ইহার অংশবিশেষ গ্রাহ্য ও অংশবিশেষ পরিত্যাজ্য একথা বলা শোভা পায় না। আজই যে কেবল প্রত্যক্ষপ্রমাণপ্রিয়মনীষিবৃন্দের নিকট বেদ একটু আধটু উপেক্ষিত হইতেছেন তাহা নহে পরন্তু প্রাচীনকালেও এজাতীয় বহু ব্যক্তি বেদ সম্বন্ধে নানা পরীক্ষা এবং নানা কুৎসা করিয়াছিল, কিন্তু তথাপি বেদ সে সব বিপৎপাত অতিক্রম করিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান। বেদের মত বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অনাদিকালসিদ্ধ সম্পত্তি জগতে কোথাও এ পর্য্যন্ত পাওয়া যাইল না। যাহা হউক বেদোৎপত্তিতে এই দেবতাবৃন্দের মধ্যস্থতা আছে বলিয়া আজ স্মরণাতীত কাল ইহাতে বেদসেবক সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার প্রামাণ্য অবিসম্বাদিতভাবে অবিচলিত রহিয়াছে।

ঋষিগণ এই বেদ শিষ্য ও বংশপরম্পরায় জনসমাজে প্রচারিত করিতে থাকেন। কিন্তু কালবশে ইহা কখন বিস্তৃত, কখন সঙ্কুচিত এবং কখন বা বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল এবং ভগবদিচ্ছায় আবার ইহার পুনরাবির্ভাব হইয়াছিল। বেদের এই প্রকার সঙ্কোচ বিস্তার ও বিলোপ যে কতবার হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। শাস্ত্রে দেখা যায় যে ইহা অক্ষয় নিত্য, ইহা মধ্যে মধ্যে লুক্কায়িত মাত্র হইতে পারে কিন্তু ইহার একেবারে বিলোপ অসম্ভব।

আজ হইতে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে কলির প্রারম্ভে এই বেদের একবার বড়ই দুরবস্থা হয়। এ সময় বেদের লৌকিকবিদ্যাপ্রতিপাদক নানা অংশ বিলুপ্ত, ও অলৌকিকবিদ্যাপ্রতিপাদক অংশ বিকৃত হইয়া যায়। আবার অনেক বেদবহির্ভূত বিষয় বেদ বলিয়া পরিগণিত হয়। এই সময় আবার অনেক মুনি ঋষি বেদের তাৎপর্য্য নাম দিয়া নানা প্রকার দর্শন

শাস্ত্রের রচনা করিতে লাগিলেন ইহার ফলে বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় অনেকের পক্ষে দুষ্কর কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইল। পরন্তু দয়াময় ভগবান জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য এই সময় পরাশর তনয় কৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপে জগতীতলে অবতীর্ণ হয়েন ও বেদের সংস্কার সাধন করেন। এজন্য তাঁহাকে বিকৃত অংশের সংস্কার, প্রক্ষিপ্ত অংশের বহিষ্কার, যাগযজ্ঞাদি বিভিন্ন কর্ম্মের নিমিত্ত বেদের বিভাগ এবং একমাত্র বেদ অবলম্বনে এক দর্শন গ্রন্থ রচনা করেন। এইরূপে ভগবানের সম্পত্তি ভগবানই স্বয়ং রক্ষা করেন। কেবল তাহাই নহে বেদের যে সমস্ত অংশ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল তাহার কথঞ্চিৎ অভাব মোচন করিবার জন্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি নানা শাস্ত্র রচনা করিলেন। এই বেদ বিভাগ করিবার পর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সংক্ষেপে ব্যাস নামে জনসমাজে পরিচিত হইলেন।

ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া উহাদিগকে ঋক্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব্ব নামে অভিহিত করেন। অনন্তর তিনি এই বিভাগ চিরস্থায়ী করিবার জন্য তাঁহার চারিজন প্রিয়শিষ্যকে উক্ত চারিবেদ শিক্ষা দেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যাহাকে ঋক্ বেদ দেন তাঁহার নাম পৌল, যাঁহাকে যজুঃ প্রদান করেন তাঁহার নাম বৈশম্পায়ন, যাঁহাকে সাম বেদ দান করেন তাঁহার নাম জৈমিনি এবং যাঁহাকে অথর্ব্ব বেদ অর্পণ করেন তাহার নাম সুমন্তু। এই সকল শিষ্য দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে বিবিধ বৈদিক কর্ম্মের সুবিধার জন্য আবার বহু শিষ্য করেন এবং নিজ নিজ বেদকে নানা শাখায় বিভক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করেন। ইঁহারা পুনরায় বহু শিষ্য করিয়া নিজ নিজ বেদশাখাকে নানা প্রশাখাতে বিভক্ত করিলেন এবং নিজ নিজ শিষ্যদিগকে বেদশাস্ত্রে পারদর্শী করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আবির্ভাবে বেদবৃক্ষ পুনরায় বহু শাখা প্রশাখায় সুশোভিত হইয়া বৈদিকজ্ঞানের সুবিমল ছায়া বিস্তার করিয়া বেদানুগব্যক্তিবৃন্দকে অপার সুখে সুখী করিয়া তুলিল।

ব্যাস শিষ্য প্রশিষ্যগণ বেদকে শাখা প্রশাখায় বিভক্ত করিয়া বেদবৃক্ষের বিস্তৃতি সাধন করিয়াই কেবল ক্ষান্ত থাকিলেন না, তাঁহারা বেদার্থ উপলব্ধি এবং বেদোক্ত ক্রিয়া প্রভৃতির সুবিধার জন্য স্বয়ং নানা গ্রন্থাদি রচনা করিতে লাগিলেন এবং এই সকল গ্রন্থ বেদের অঙ্গ এবং উপাঙ্গ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইল। বেদাঙ্গ যথা;—শিক্ষা কল্প,

ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, এবং জ্যোতিষ, উপাঙ্গ যথা ; :—আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ ইত্যাদি।

যে সময় ব্যাস শিষ্য প্রশিষ্যগণ স্বয়ং নানাবিধ বৈদিক গ্রন্থাদি রচনা করিতেছিলেন, তাহার কিছু পরে লোকমধ্যে কোন্‌টী বেদশাস্ত্র এবং কোন্‌গুলি বৈদিক শাস্ত্র এই লইয়া একটু গোল উপস্থিত হইল। শিষ্যগণ গুরুভক্তির আতিশয্য বশতঃ অনেক সময় নিজ নিজ গুরুদেবরচিত গ্রন্থও বেদশাস্ত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেন এজন্য গুরুগণ গ্রন্থ রচনা করিয়া বেদ ও বৈদিকশাস্ত্রের লক্ষণ নির্ণয় করিলেন। এতদনুসারে বেদের মন্ত্র বা সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ অংশ মাত্র বুঝিতে হইবে। সুতরাং উক্ত ঋক্‌, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব্ব এই চারিবেদেরই মন্ত্র বা সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ অংশই আসল বেদ।

বেদচতুষ্টয়ের এই প্রকার বিভাগ যে ঠিক আকৃতিগত ভেদ তাহা বলা যায় না। ইহা যে ইহাদের প্রতিপাদ্য বিষয়গত ভেদ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মন্ত্র বা সংহিতাভাগে দেবতাগণের স্তব স্তুতি, ক্রিয়ার বিধি নিষেধ, এবং তাহার ফল ও প্রশংসা প্রভৃতি বর্ণিত আছে, এবং ব্রাহ্মণ অংশে সংহিতোক্ত বিষয়ের বিস্তার বা ব্যাখ্যামুখে নানা রহস্য কথিত হইয়াছে। ইহাতে আখ্যায়িকা ইতিহাস, পুরাণ, যাগযজ্ঞাদির বিধি ইত্যাদি বহু বিষয়ের সমাবেশ দেখা যায়। কোন কোন ব্রাহ্মণের কিয়দংশ বনবাসের ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ। তবে বনবাসের ব্যবস্থা যে ব্রাহ্মণে আছে তাহা নিয়ত গ্রন্থের শেষ ভাগেই দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত প্রতিপাদ্য বিষয়ানুসারে মন্ত্রে অথবা ব্রাহ্মণে কোন বেদের কোন অংশেই অধ্যায়াদিগত বিভাগ এবং পূর্ব্বাপর্য্য ভাব নাই।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের প্রতিপাদ্য বিষয়গত বিভাগ না থাকিলেও জ্ঞানকাণ্ড ও ক্রিয়াকাণ্ডরূপ প্রতিপাদ্য বিষয়গত একটী বিভাগ দেখা যায়। কি মন্ত্র কি ব্রাহ্মণ উভয় অংশেই যেখানে জ্ঞান কাণ্ডের কথা অবতারিত হইয়াছে, সর্ব্বত্রই দেখা যাইবে জ্ঞান কাণ্ডের কথাগুলি উহাদের শেষভাগেই বিন্যস্ত।

তাহার পর যদি এই জ্ঞান ও কর্ম্ম কাণ্ডের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে যাহা দেখা যাইবে, তাহাতে উভয়ের পার্থক্য যে সুস্পষ্ট তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জ্ঞানকাণ্ডে যে সকল বিষয় কথিত

হইয়াছে তাহাতে জগতের মূল কারণ কি? জগৎজগতের স্বরূপ কি? কি উপায়ে অনন্ত মুক্তি লাভ করা যায় ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত, পক্ষান্তরে ক্রিয়াকাণ্ডে যে সকল বিষয় কথিত হইয়াছে তাহাতে কি করিয়া স্বর্গ হয়, কি করিয়া ঐশ্বর্য্য লাভ ঘটে, কি উপায়ে শত্রু দমন করা যায় ইত্যাদি বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। অধিক কি এমন স্থলও দেখা যায় যে একই ব্যক্তির একই কালে উভয় মার্গানুসরণ অসম্ভব।

যাহা হউক বেদের এই প্রকার বিভাগে দেখা যায় যে সকল বেদের শেষভাগেই জ্ঞানকাণ্ডের কথা আলোচিত এবং পূর্ব্বভাগে ক্রিয়াকাণ্ডের কথা উপদিষ্ট এবং উক্ত শেষভাগের নাম উপনিষৎ।

বেদান্ত শব্দের অর্থ বুঝিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা 'বেদ কি' তাহা বুঝিলাম। এক্ষণে বেদান্ত বলিলে কি বুঝিতে হইবে তাহা দেখা যাউক।

ইতিপূর্ব্বে "বেদাংশ" প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে বেদের উপনিষৎ অংশটী বেদের কি সংহিতা, কি ব্রাহ্মণ, উভয় অংশের অন্তে অবস্থিত, কোথাও মধ্যে কথিত হয় নাই। তাহার পর এই উপনিষৎ অংশেই বেদোপদিষ্ট অলৌকিক জ্ঞানের কথা আলোচিত হইয়াছে; অধিক কি এই জ্ঞানের কথাপ্রসঙ্গে জ্ঞান ফলের নিত্যত্ব ও প্রশংসা বেদোক্ত ক্রিয়াকাণ্ডের বিনশ্বরত্ব এমন কি নিন্দা পর্য্যন্ত কথিত হইয়াছে; কিন্তু পক্ষান্তরে ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে কোথাও উক্ত জ্ঞানের বিনশ্বরত্ব বা নিন্দার কথা কথিত হয় নাই। সুতরাং বেদান্ত শব্দে বেদের অন্ত অর্থাৎ শেষ বা নির্ণয় এই উভয় অবলম্বন করিয়া বেদের উপনিষৎ অংশকেই বুঝিতে হইবে। অভিধানেও দেখা যায়, বেদান্ত শব্দের অর্থ উপনিষৎ। উপনিষৎ বেদের শেষে আছে বলিয়া উপনিষদই বেদান্তপদবাচ্য এবং উপনিষদে বেদের যাহা নির্ণয় তাহা আছে বলিয়া বেদান্ত মানে উপনিষৎ।

যাহা হউক বেদান্ত শব্দের অর্থ যদি উপনিষৎ হইল, তাহা হইলে উপনিষদে কি আছে তাহা যতক্ষণ না বিশেষরূপে জানা হয় ততক্ষণ কেবল উপনিষৎ শব্দের অর্থ বুঝিয়া উপনিষৎ প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে যদি কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করা যায় তাহা হইলে লাভ বই ক্ষতি নাই।

উপনিষৎ শব্দের ব্যাকরণ সাহায্যে যে অর্থ পাওয়া যায় তাহাতে একটী অর্থ এই যে যাহা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অবিদ্যা ও তজ্জন্য সংসার বিধ্বংস হয় সেই বিদ্যাই উপনিষৎ এবং সেই বিদ্যা যাহাতে উপদিষ্ট তাহাও সুতরাং

উপনিষদ্‌পদবাচ্য। এবং দ্বিতীয় অর্থ এই যে বিদ্যা দ্বারা জীব ব্রহ্মের নিকটে অবস্থিতি করিতে পারে সেই বিদ্যা এবং সেই বিদ্যা যে শাস্ত্রে কথিত হয় তাহাও সুতরাং উপনিষদ্‌ শব্দে বাচ্য।

অভিধানে উপনিষৎ শব্দে বেদান্ত শাস্ত্র এবং রহস্য বুঝায়।

তাহার পর উপনিষদ্‌ গ্রন্থমধ্যে যেখানে উপনিষৎ শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার প্রতি যদি দৃষ্টি করা যায় তাহা হইলে বোধ হইবে ইহার অর্থ বেদ-রহস্য বা ব্রহ্ম বিদ্যা।

ফল কথা বেদান্ত কি এই প্রসঙ্গে আমরা দেখিলাম বেদান্ত বলিতে বেদের অন্তভাগে যে সকল ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশক উপনিষৎ শাস্ত্র আছে তাহাই বেদান্ত।

বেদান্ত শব্দের এই প্রকার অর্থ ব্যতীত আর একটী অর্থ আছে সে অর্থে বেদান্ত বলিতে ষড়্‌দর্শনের অন্তর্গত বেদান্তদর্শন বা ব্যাসকৃত ব্রহ্ম-সূত্র গ্রন্থ বুঝায়, বেদান্ত শব্দের এই অর্থটীর হেতু এই যে—বেদমধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের জন্য নানাপ্রকারে সেই সার সত্যের কথা কথিত হওয়ায় বেদের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় ঋষিগণ বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন লোকের হিতার্থে উক্ত বেদ অবলম্বনে বিভিন্ন প্রকারে সেই সার সত্যের পরিচয় দিবার চেষ্টা করেন। এই চেষ্টার ফলে, কালে নানা দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি হয়, এবং সম্প্রদায়ক্রমে ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকে। কিন্তু কালমাহাত্ম্যে যেমন সকল জিনিষেরই পরি-বর্ত্তন ঘটে, তদ্রূপ উক্ত দার্শনিক সম্প্রদায়মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘটিল। ঋষি-গণের উদ্দেশ্য ও উপদেশ উভয়ই অন্যথাভাব ধারণ করিল। সম্প্রদায়ভুক্ত মনীষিগণ তখন ঋষিগণের দোহাই দিয়া, বেদের তাৎপর্য্যের অন্যথা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে মতভেদের সূত্রপাত হইল। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে সেই বেদবিভাগকর্ত্তা ভগবদবতার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিরবচ্ছিন্ন বেদাবলম্বনে যে দর্শনশাস্ত্রের প্রচার করিলেন তাহাও পরে বেদান্তপদবাচ্য হইল। ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্র বেদান্তশব্দের দ্বিতীয় অর্থ।

ব্যাসের দর্শন যে ভাবে বেদান্ত নামে পরিচিত হইল ঠিক সেইভাবে ব্যাসরচিত ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতি ব্যাসের স্মৃতিলব্ধ শাস্ত্রগুলি এবং ব্যাসের

ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থ অবলম্বনে পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ যে সকল প্রকরণ গ্রন্থ রচনা করিলেন, সে সকলও ক্রমে বেদান্ত শব্দের অর্থমধ্যে গৃহীত হইল। এইরূপে বেদান্ত অর্থে একাধারে ব্রহ্মবিদ্যা, এবং ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদক উপনিষৎ, তদবলম্বিত ব্যাসকৃত বেদান্ত দর্শন, ইতিহাস পুরাণাদি এবং পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ রচিত তদর্থ প্রকাশক শাস্ত্রসমূহ বুঝায়।

এই তিন শ্রেণীর গ্রন্থের নাম বেদান্তের প্রস্থানত্রয়। অর্থাৎ উপনিষৎ শ্রুতিপ্রস্থান। ব্যাসের ব্রহ্মসূত্র ন্যায়প্রস্থান এবং পুরাণাদি স্মৃতিপ্রস্থান। প্রস্থান শব্দের অর্থ পথ, অর্থাৎ উক্ত তিন পথ দিয়া উপনিষৎ প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ঘটে এজন্য বেদান্ত বলিতে উক্ত তিনটী পথের যাবৎ গ্রন্থগুলিই বুঝায়। হিন্দুর দৃষ্টিতে বেদান্ত বলিতে যাহা বুঝা যায়,—বেদান্তের সেবকসম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে বেদান্ত বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহাই উপরে উক্ত হইল, অহিন্দুর দৃষ্টিতে বা অভিব্যক্তিবাদী কিম্বা ক্রমোন্নতিবাদীদিগের দৃষ্টিতে বেদান্ত বলিতে কি বুঝায় তাহা এস্থলে আলোচিত হয় নাই।

ভারতের সাধনা।

"আমাদের মূল সিদ্ধান্ত এই যে মানুষের পক্ষে পরম পদ ও মুক্তি লাভ করিবার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা বেদে রহিয়াছে। কেহ নূতন আর কিছু উদ্ভাবন করিতে পারে না। সকল তত্ত্বের সীমায় যে অখণ্ডৈকত্ব বিদ্যমান, কেহ তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, বেদ এই শেষসীমায় উপনীত হইয়াছেন, ইহার পারে যাওয়া অসম্ভব। যখন 'তত্ত্বমসি' আবিষ্কৃত হইল, অধ্যাত্মতত্ত্ব তখন সম্পূর্ণতা লাভ করিল; এই পূর্ণতাই বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে। এখন কেবল বাকি রহিল মানুষকে যুগে যুগে, দেশকালভেদে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনার তারতম্যে, বেদব্যক্ত লক্ষ্যের প্রতি নিয়ন্ত্রিত করা, সেই সনাতন পথে পরিচালিত করা; এবং এই উদ্দেশ্যেই মহান নেতৃদিগের, মহিমান্বিত মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে এই সত্যটী যেমন পরিষ্কার ভাবে প্রকটিত হইয়াছে, এমন আর কোথাও হয় নাই :—

'যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥'

এই অবতারবাদরূপ ধারণা ভারতের অস্থিমজ্জাগত।" 'The sages of India' শীর্ষক স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত।

(৩) ভারতীয় নেশনে বেদমহিমা ও অবতারবাদ।

গত বারের প্রবন্ধে আমরা ভারতীয় নেশনের কতকগুলি অবশ্যম্ভাবি বিশেষত্বের পরিচয় পাইয়াছি। অবশ্যম্ভাবি কেন, না ভারতে যেরূপ লক্ষ্যকে আশ্রয় করিয়া নেশন স্বরূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে ঐ সব বিশেষত্ব স্ফুরিত হইবেই হইবে। বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম যে নেশনের লক্ষ্যস্থানীয়, অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মে ব্রহ্মবিৎই সে নেশনের নিয়ন্তৃপদ পাইবেন এবং সর্ব্ববিধ ব্যবহারে গৌণ ও মুখ্য হিসাবে স্বধর্ম্মপালন ও ব্রহ্মপ্রতিপাদনই উদ্দেশ্যসূত্ররূপে অবলম্বিত হইবে।

এখন প্রথম কথা এই যে ভারতে নেশন-লক্ষ্য যে বেদ কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইল, সেই বেদ কি বা কিংস্বরূপ? বেদের স্বরূপ-সম্বন্ধে পৌরাণিক ব্যাখ্যা-বাহুল্য এখানে বিবৃত করা অসম্ভব,—সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার সমক্ষে বেদ কিরূপে প্রকাশিত হইল, এবং সেই বেদই কিরূপে স্ফুটিত হইয়া সৃষ্টিরূপে পরিণত হইল,—ইত্যাদি ব্যাখ্যা করা এখানে প্রাসঙ্গিক হইবে না। এইজন্য সংক্ষেপে অথচ সারসঙ্কলনে বেদের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

"সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি",

ব্রহ্মই সেই পরমপদ, প্রণব তাঁহার প্রতীক। ব্রহ্মনিরূপণ ব্রহ্মেই সম্ভব,—ব্রহ্মবস্তু "কখনও উচ্ছিষ্ট হয় নাই।" অতএব বেদ বলিতে স্বরূপতঃ ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে, অন্য উপায় নাই। ব্রহ্ম বা ব্রহ্মজ্ঞান, বা পরম জ্ঞানই, বেদ শব্দের মুখ্য অর্থ। এই অর্থে বেদ অপৌরুষেয়, দেশ ও কালের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন। বস্তুতঃই ব্রহ্মনিরূপণ ও ব্রহ্ম একার্থসংজ্ঞক, ব্রহ্মই বেদরূপ পরম জ্ঞান।

বেদের শব্দশরীর আবার বেদ শব্দের গৌণ অর্থ। শরীরীকে অর্থাৎ তাহার বাক্-শক্তি ও মন্ত্রদ্রষ্টৃত্বকে আশ্রয় করিয়া যখন অপৌরুষেয়, অশরীরী

বেদ আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, তখন উহা গৌণার্থসূচিত শব্দ-রাশিতে ব্যক্ত হইলেন। ব্রহ্ম স্বয়ংই মুখ্য বেদ, সেইজন্য বেদের শব্দশরীর বা গৌণ বেদকে ও তাহারই সার ও প্রতীকরূপে উদ্গীথ বা প্রণবকে শব্দব্রহ্ম বলা হয়।

এই শব্দব্রহ্ম বেদও এক অর্থে অপৌরুষেয়, কারণ পুরুষের বাক্‌শক্তি ও মন্ত্রদ্রষ্টৃত্বকে অবলম্বন করিয়া পরমবেদ আপনার শব্দশরীর আপনি রচনা করিয়াছেন। লোকে সচরাচর যে বাক্য রচনা করে, তাহাতে তাহার বুদ্ধির প্রেরণাই আমরা স্বীকার করি, এবং অহংবুদ্ধি সকল বুদ্ধিরই আশ্রয় বলিয়া সেই রচনার রচয়িতাও আমরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। কিন্তু মন্ত্রদ্রষ্টাকে বুদ্ধির অতীতে যাইতে হয়, যে প্রেরণায় তাঁহার বাক্‌শক্তি কাজ করে, তাহা তাঁহার স্থূল ও সূক্ষ্মসত্তার অতীত,—তাহার মধ্যে অহং বুদ্ধির স্থান নাই, ততদূর অহং বুদ্ধির দৌড়ই নাই। পরমহংসদেব যেমন বলিতেন, সেখানে "মাই রাশ ঠেলে দন।"

এই মন্ত্রদ্রষ্টৃত্ব ঋষিত্বের প্রধান অঙ্গ; অতএব সাধারণ ভাবে বলা যায় যে যিনি এই মন্ত্রদ্রষ্টৃত্ব লাভ করিয়াছেন, তিনিই ঋষি। এই অর্থে ঋষি শব্দটী ব্যবহার করিলে, দেশ ও কালের একটা গণ্ডী দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে।

কিন্তু আমাদের ইতিহাসে এক সময় ঋষি শব্দটীকে একটা বিশেষ অর্থে আবদ্ধ করা হইয়াছিল। সত্যযুগ হইতে দ্বাপরের শেষ পর্য্যন্ত বেদের শব্দশরীর বর্ত্তমানাকারে সুনির্দ্দিষ্ট ছিল না। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে নব নব মন্ত্রদ্রষ্টার মন্ত্র সেই শরীরে অঙ্গীভূত হইয়াছে, আবার অনেক মন্ত্র একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেই প্রাচীন যুগে মন্ত্রদ্রষ্টৃত্বের একটা সর্ব্ববাদিসম্মত পরিচয় ছিল এবং মন্ত্র আবিস্কৃত হইলে, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি শিষ্যপরম্পরায় সেই মন্ত্রবিদ্যার শিক্ষা দিতেন। এইভাবে প্রধানতঃ ভিন্ন ভিন্ন ঋষিসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া বেদ প্রাচীন যুগে প্রচলিত ছিল। তারপর কলিযুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদসঙ্কলন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি তৎকালে প্রচলিত বেদের সংগ্রহ করিয়া, উহাকে সংহিতা ব্রাহ্মণসমন্বিত চারটী ভাগে অর্থাৎ ঋক, যজু, সাম, ও অথর্ব্ব ভাগে বিভক্ত করিলেন এবং চারটী শিষ্যের উপর চতুর্ব্বেদ সংরক্ষণ ও প্রচলনের ভার অর্পণ করিলেন। প্রাচীন যুগে যজ্ঞাদিতে পুরাণ-কথকতার নিয়ম ছিল। তখন নানা পুরাণকথাও নানাস্থানে নানা সম্প্রদায়ে বিক্ষিপ্তভাবে প্রচলিত ছিল। উহাদের সঙ্কলনে মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন অষ্টাদশ পুরাণ ও ইতিহাস নূতন ভাবে

প্রচার করেন, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পুরাণেতিহাস মহর্ষি ব্যাসের নিকট হইতে ভিন্ন ভিন্ন ঋষি গ্রহণ করেন ও শিষ্যপরম্পরায় বা বংশপরম্পরায় প্রচলিত রাখেন।

এই শাস্ত্রসংকলনরূপ সুমহৎ-অনুষ্ঠানের প্রভাব যে কি গভীর ও সুদূর-স্পর্শী তাহা অনেকে ভাবিয়া দেখেন নাই। কলিযুগের প্রারম্ভে কৃষ্ণনামা দুইটী নেতৃপুরুষের আবির্ভাব সকলেই স্বীকার করেন, একজন ঋষিকুলসম্ভূত, আর একজন রাজকুলসম্ভূত, একজন ঋষিসমাজের অতীতার্জ্জিত সর্ব্বসম্পদের অধিকারী, আর একজন সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন আর্য্যসমাজের অতীতার্জ্জিত সর্ব্ব-সম্পদের অধিকারী। যিনি তত্ত্ব-দৃষ্টিসম্পন্ন, তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন যে একই কালাধিষ্ঠিত অখণ্ড পরমপুরুষ একই নামপরিচয়ে অথচ দেহদ্বয়া-শ্রয়ে অবতীর্ণ হইয়া, কলির প্রারম্ভে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে অভিব্যক্ত সমস্ত তত্ত্ব ও সাধনাকে পরবর্ত্তী যুগসমূহের অনুষ্ঠানোপযোগী আকারে একত্রসন্নিবিষ্ট করিলেন। যিনি আসন্ন কলির উচ্ছৃঙ্খলা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভার-তের লক্ষ্যনিরূপক বেদকে প্রথম করপুটে সংগ্রহ করিলেন, যিনি রজোব-লের সর্ব্বগ্রাসী কুক্ষি হইতে ভারতনিয়ন্তৃত্বকে উদ্ধার করিবার জন্য দ্বিতীয় করপুটে ক্ষাত্রবলবিধ্বংসী গাণ্ডীব ধারণ করিলেন, যিনি বেদবিদ্যাকে ভবিষ্যতে আশূদ্রাভিসর্পিনী করিবার জন্য তৃতীয় করপুটে গীতা প্রকাশ করিলেন, এবং মানব হৃদয়ের শান্তসখ্যাদি রসধারা মন্থন করিয়া পরমপ্রেমরূপ ব্রহ্মামৃত আচণ্ডালে বিতরণ করিবার জন্য যিনি চতুর্থ করাঞ্জলিতে বেণু ধারণ করিলেন, হে সনাতনধর্ম্মাশ্রিত ভারতবাসি, তিনিই ভগবান নারায়ণ, তিনিই তোমার জন্য বারম্বার দেহধারণে কৃতসংকল্প ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; অতএব তুমি আশ্বস্ত হও, পাশ্চাত্য আদর্শের প্রতি ধাবিত হইয়া তাঁহাকে ভুলিওনা, কারণ তিনি স্বয়ং তোমার পথপ্রদর্শক।

ভারতীয় নেশন জগদ্রঙ্গমঞ্চে সুদীর্ঘ প্রথম অঙ্ক অভিনয় করিলে যখন কুরুক্ষেত্রে যবনিকাপতন হইল, তখন দেখিতে পাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাস-দেব সংযোগসেতুরূপে দ্বিতীয় অঙ্কের প্রস্তাবনা করিয়া গেলেন। ভারতের পক্ষে সেই প্রাচীন যুগ বা প্রথম অঙ্কটী যেন লক্ষ্যস্থাপনার যুগরূপে অবধারিত। সেই জন্য যথাযোগ্য লক্ষ্যস্থাপনা হইয়াছে বুঝিয়াই মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বিভাগ ও মন্ত্রাদি চরমভাবে নিরূপণ করিয়া বেদকে যেন গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া গেলেন; পরে সহস্র বিশৃঙ্খলার মধ্যেও সেই গ্রন্থি কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে

নাই। এইরূপে বেদ ও মন্ত্রপ্রকাশের একটা সীমানির্দ্দেশ হওয়ায়, মন্ত্রদ্রষ্টৃত্ব ছাড়া আর একটা লক্ষণ ঋষিত্বে আরোপিত হইয়া গিয়াছে এবং বৈদিক ঋষি ও পরবর্ত্তী যুগের ঋষির মধ্যে একটা গৌণ পার্থক্য স্বীকৃত হইয়াছে। এই পার্থক্যের ফলে পরবর্ত্তী ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টৃত্ব লাভ করিলেও, তৎপ্রাপ্ত মন্ত্র বেদের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। এমন কি ব্যাসপ্রশিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যের দ্বারা প্রাপ্ত শুক্লযজুর্ব্বেদকে বেদে স্থান দিবার জন্য অতিপ্রাকৃতিক হেতুর আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

প্রাচীন যুগে বেদনিরূপণদ্বারা লক্ষ্যস্থাপনা হইবার পর, ভারতের সমস্ত শক্তি ঐ নেশন লক্ষ্যকে রক্ষা করিবার জন্য বেদগুপ্তিরূপ মহদনুষ্ঠানে নিয়োজিত হইল। মধ্যযুগের প্রথম পর্ব্ব বা ভাগে সেইজন্য আমরা দেখিতে পাই যে একদিকে যেমন ক্ষাত্রশক্তি বিলুপ্ত হওয়ায় আর্য্যেতর জাতি অবিরলস্রোতে ভারতখণ্ডে প্রবেশলাভ করিতেছে, অপরদিকে তেমন ব্রাহ্মণগণ বেদকে যেন বুকে আঁকড়াইয়া রক্ষা করিতেছেন। বেদগুপ্তির সৌকর্য্যার্থে যাস্কের নিরুক্ত প্রভৃতি বেদাঙ্গ এই সময় সংকলিত হইল এবং ব্রাহ্মণগণও বেদ-সংহিতার এক একটী শাখাকে বংশপরম্পরায় রক্ষা করিতে লাগিল। সেই তুমুল জাতিবিপ্লবের মধ্যে বেদনিহিত নেশন-লক্ষ্য ও তৎসাধনতত্ত্ব কি অপূর্ব্ব কৌশলে রক্ষা পাইল, ইহা ভাবিলে হৃদয় বিস্ময়ে পরিপ্লুত হয়। বেদমন্ত্রকে অবিকার্য্য রাখিবার জন্য যে সাবধানতা, যে চেষ্টা লক্ষিত হয়, তাহা জগতে এক অতুলনীয় ব্যাপার। স্মৃতি-পুরাণাদির রক্ষাকল্পে এতটা চেষ্টা প্রযুক্ত হয় নাই। সেই জন্য উহাদিগকে আমরা অবিকৃত অবস্থায় পাই না। বিভিন্নবংশীয় ব্রাহ্মণগণ নানা পুরাণকথা পুরুষানুক্রমে বলিয়া আসিয়াছেন, তাই উহা রক্ষা পাইয়াছে বটে, কিন্তু স্বাভাবিকরূপে সমসাময়িক ঘটনা বা ভাব ঐ কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হইত এবং ইতিহাস বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন স্থলে কথিত হইত। এইরূপ বৈষম্য ও প্রক্ষেপের নিদর্শন পুরাণে সর্ব্বত্রই বিদ্যমান।

পরে বৌদ্ধাধিকার হইতে কুমারিল ভট্টের আবির্ভাবের মধ্যবর্ত্তী কালে বৈদিক শাস্ত্র রক্ষা করা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রাহ্মণের বংশলোপ না করিলে শাস্ত্রলোপ করা যায় না দেখিয়া অধঃপতনোন্মুখ বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণ হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এবং বেদ বিলুপ্ত হইলে ভারতীয় নেশনও নির্ম্মূল হয় দেখিয়া, আততায়ীর বিরুদ্ধে সনাতন ধর্ম্ম ক্ষাত্রশক্তিকে উদ্বোধিত

ও নিয়োজিত করিয়াছিল। কুমারিল ভট্টের তুষানল ভারতের জাতীয় জীবনের পক্ষে একটী চিরস্মরণীয় ঘটনা। আবার সেই সময় শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া বেদের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিলেন এবং বৈদিক সকল শাস্ত্রেরই পুনঃ প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কার করিয়া গেলেন। এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হইতে আমরা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারি যে ভারতীয় নেশন কি গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে বেদকে রক্ষা করিয়াছেন, যেহেতু একমাত্র বেদই আমাদের জাতীয় জীবনের লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা, উৎপত্তি ও গঠনপ্রণালীর চিরন্তন সাক্ষী।

কিন্তু কেবলমাত্র বেদশাস্ত্রকে রক্ষা করিতে পারিলেই, ভারতের জাতীয় জীবন রক্ষা পাইবে না। প্রাচীন যুগের পরে যখন শাস্ত্ররক্ষায় ব্রাহ্মণগণ নিযুক্ত রহিয়াছেন এবং সমস্ত দেশব্যাপি জাতিসংমিশ্রণের ফলে একটা নূতন ভারত মাথা তুলিতেছে, (যে ভারতের আভাস মগধের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই), তখন স্বাভাবিক ভোগ-পরতন্ত্রতা হইতে সেই নূতন ভারতকে ফিরাইবার পক্ষে শাস্ত্র সামর্থ্যহীন, কারণ বেদকে সে ভারত মানিতে প্রস্তুত ছিলনা। তারও পূর্ব্বে দেশে নূতন জমি গড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই বেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রবল ভাবে দেখা দিয়াছিল, প্রাচীন সমাজবন্ধনও শিথিল হইয়াছিল। যদি বুদ্ধের আবির্ভাব না ঘটিত, তবে ভোগোৎকর্ষই সেই নূতন সমাজের লক্ষ্যরূপে পরিগণিত হইত, সঙ্গে সঙ্গে বেদগুপ্তির জন্য সমস্ত চেষ্টা নিস্ফল হইয়া যাইত, কারণ ভোগৈকনিষ্ঠ ভারতের জমিতে বেদ বেশী দিন টিকিতে পারে না, সেরূপ জমিতে বেদসংরক্ষক জন্মায় না।

সুতরাং ভারতীয় নেশনরূপ প্রবাহকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে কেবল উহার উদ্ভবস্থানের সন্ধান জানা থাকিলেই চলিবে না, ঐ উদ্ভবস্থান হইতে প্রবাহের প্রাণকে পরিপুষ্ট ও খাতটীকে সুনির্দ্দিষ্ট রাখিবার জন্য নব নব জলোচ্ছাস নামিয়া আসা দরকার। সেইজন্য প্রাগুদ্ধৃত বক্তৃতাংশে আচার্য্য বিবেকানন্দ বলিতেছেন যে শুধু বেদসম্পৎ আমাদের অধিকারভূত থাকিলেই চলিবেনা, যুগে যুগে অবস্থানুসারে ব্যবস্থা দিবার জন্য ভারতনিয়ন্তা লোকোত্তর মহাপুরুষদের আবির্ভাব হওয়া আবশ্যক। ভারতীয় অবতারবাদে এইরূপ আবির্ভাবই প্রতিপাদ্য তত্ত্ব।

এখন প্রশ্ন এই যে অবতারের আবির্ভাবে বিধিবত্তা আছে, না উহা অতিপ্রাকৃতিক? অতিপ্রাকৃতিক বা supernatural অর্থে যাহা বোধগম্য নহে, তাহাকেই বুঝায়; কারণ যাহা বুঝা যায়, তাহারই বিধিবত্তা রহিয়াছে,

অর্থাৎ তাহা কেমন করিয়া হয় তাহাও বুঝা যায়। যদি বল, অতিপ্রাকৃতিক মানে প্রাকৃতিক বিধির অতীত, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রকৃতি শব্দকে তুমি একটা স্বকল্পিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতেছ। প্রকৃতি ও বিধি—এই দুইটী শব্দকে যথাসম্ভব ব্যাপকতা দেওয়া উচিৎ, কারণ বুদ্ধি অপেক্ষা অনুভূতি বা চিৎশক্তির দৌড় অনেক বেশী, সেই জন্য যেখানে বুদ্ধি পৌঁছায় না সেখানেও প্রকৃতির কার্য্য হয় এবং তাহা আমাদের বোধগম্য হয়। তত্ত্ববিদ্যা বা দর্শনের কাছে অতিপ্রাকৃতিক কিছুই নাই।

কিন্তু এখানে আমরা অবতারতত্ত্বের দার্শনিক বিচার করিব না। আধুনিক বিজ্ঞানকে অতিক্রম না করিয়া যতদূর বুঝা যায়, আমরা ততদূরই যাইতে রাজি আছি। আজকাল সভ্যজগতে প্রাণীবিজ্ঞানের তুলনায় সমাজ-বিজ্ঞান বুঝিবার চেষ্টা চলিতেছে, কতকাংশে এ চেষ্টা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে করি। জীবের organism বা অঙ্গসংহতি বা শরীর, হইতে সমাজ-শরীর সম্বন্ধে অনেক তথ্য তুলনায় প্রতিপন্ন করা হইতেছে। প্রাণীবিজ্ঞানের অভিব্যক্তিবাদ হইতে সমাজবিজ্ঞানেও একটা অভিব্যক্তিবাদ দাঁড় করান হইয়াছে, এবং জীবদেহের অভিব্যক্তির নিয়মগুলি সামাজিক অভিব্যক্তিতেও অনেকস্থলে খাটিয়া যাইতেছে।

প্রাণী জগতে দেখা যায় যে অনেক কাল ধরিয়া চেষ্টা করার ফলে কোন জাতীয় জীবের স্বভাবে যখন একবার একটা উন্নত গুণ প্রকাশ পায়, তখন সেই জাতির মধ্যে ক্রমশঃ উহা সংক্রামিত হইয়া যায় এবং কোনও জীবদেহে একবার একটা অঙ্গ অভিব্যক্ত হইলে, যতকাল উহার প্রয়োজন থাকে ততকাল আর উহা বিলোপ পায় না। প্রকৃতির যে নিয়মে প্রাণী দেহের অভিব্যক্তিতে বহুচেষ্টাসিদ্ধ সুফলবিশেষের এইরূপ কালানুবর্ত্তন ঘটে, ঠিক সেই নিয়মেই সমাজশরীরে ঐরূপ সুফলবিশেষের স্থায়িত্ব বা অনুবর্ত্তন ঘটা স্বাভাবিক। সমাজ একবার যে সিদ্ধি লাভ করে, তাহা সমাজ দেহেই নিহিত থাকে, নষ্ট হয় না। সর্প আততায়ীকে আঘাত করিবার জন্য যে বিষ পাইয়াছে, তাহা সব অবস্থাতেই ক্ষরিত হয় না, সেইরূপ সমাজলব্ধ সিদ্ধিরও হয়ত সব অবস্থায় প্রয়োগ হয় না, প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই ঐ অন্তর্নিহিত শক্তির বহিঃপ্রয়োগ হয়।

প্রাচীনতম যুগ হইতে ভারতে যে ব্রহ্মসাধনা চলিয়াছে, ইহার ফলে এইরূপ প্রত্যাশা করাই স্বাভাবিক যে "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি" রূপ বাক্য

ষোল-আনা কার্য্যে পরিণত হইবেই হইবে। ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্র, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ ঐ ব্রহ্মসাধনারই পরিপক্ক ফলস্বরূপ; সমাজ হাজার হাজার বৎসর ঐকান্তিক ভাবে যে ব্রহ্মভাবের সাধন করিল, তাহাই যখন, সমাজ কর্তৃক আয়ত্তীকৃত, তখন বহিঃপ্রয়োজনকে উপলক্ষ্য পাইয়া সেই ব্রহ্মভাবই শ্রীরামচন্দ্রে বা শ্রীকৃষ্ণে মূর্ত্তিমান হইয়া প্রকাশ পাইল। ইহার মধ্যে অতি-প্রাকৃতিক কিছুই নাই। সমাজদেহে ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতীতি সত্যের বিকাশশক্তি সঞ্চিত রহিয়াছে, এবং যখনই কার্য্যক্ষেত্রে প্রকৃত প্রয়োজন উপস্থিত, তখনই সমাজদেহ হইতে সেই শক্তি প্রযুক্ত হওয়ায় ব্রহ্মভূত ব্রহ্ম-বিদের আবির্ভাব হইতেছে।

ঐশ্বর্য্যের মোহই প্রধানতঃ অবতারবাদকে দুর্ব্বোধ্য করিয়া রাখিয়াছে,—অবতারত্বে সন্দেহের প্রধান কারণ ঐশ্বর্য্যের ধন্ধ। মানুষের স্বাভাবিক দৈন্য বোধেই এই ধন্ধের উৎপত্তি। যে দীন, সে ঐশ্বর্য্যকে একটা অসম্ভব রকমের উচ্চ, অগম্য, আলাদা থাকে সরাইয়া রাখে। কিন্তু ভক্তি অহেতুকী হইলে এই দুরধিগম্যতাকে রদ করিয়া দেয়, ঐশ্বর্য্যবোধজনিত দূরত্ব তখন অলীক হইয়া যায়। বাহিরের বিভূতির মূলে তখন উহারই উৎসরূপে অপরিমেয় প্রেম সম্পদ ও আনন্দসম্পদই সাধকের দৃষ্টিগোচর হয়। ঈশ্বর কিরূপে স্থূলদেহ অবলম্বনে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন তাহা বুঝা যায়। ব্রহ্মভূত ব্রহ্মবিদের দেহিত্বে লেশমাত্র অবিদ্যাদোষ নাই। উহাতে কেবল প্রেমানন্দময় পরমশুদ্ধ ব্যক্তিত্বমাত্র বাকি থাকে, সেটুকুও তোমার আমার জন্য, সাধনব্যপদেশে নহে।

আমাদের সনাতন ধর্ম্ম এইরূপে ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠ নেতৃপুরুষের মধ্যে বারম্বার আপনাকে প্রকাশ করিয়া আপনার ঘর গুছাইয়া লইয়াছে। আমাদের সমগ্র ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সনাতন ধর্ম্মের এই জীবন্ত ভাব জাজ্বল্যমান রহি-য়াছে। প্রকৃত ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাই যে যুগে যুগে এই ঘর-গুছান কাজ নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিতেছে। তাই ঘোর দুর্দ্দিনের সূচনায় আপন সন্তানদিগকে সনাতন ধর্ম্ম করুণ স্নেহাবেশে অথচ অটল দৃঢ়তার সহিত আশ্বাস দিয়াছিলেন যে "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

বর্ত্তমান যুগে সনাতন ধর্ম্মের এই প্রতিজ্ঞা যদি পূরণ না হইত, তবে বুঝিতাম সনাতন ধর্ম্ম মরিয়াছেন, আমরা মা-হারা হইয়াছি, এখন যেমন

করিয়া পারি! একজন ধাত্রীর সন্ধান করিয়া আপনাদিগকে বাঁচাইতে হইবে অনেকে দেখি ব্যগ্রতাতিশয্যে তাহাই করিতে গিয়াছেন। অনেকে শাস্ত্র পুঁথি ঘাটিয়া, শ্লোক আওড়াইয়া আওড়াইয়া মাতৃকায়ার অভাবে তাঁর ছায়ার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু সত্যই কি সনাতন-ধর্ম্মের আজ কোনও সাড়া নাই? অনেকে বলিবেন, সাধুমহাত্মাদের মধ্যে আজও যেটুকু সাড়া পাওয়া যাইতেছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমরা অগ্রসর হইব। কিন্তু সে কি কথা হইল? আমাদের মা,—সনাতনধর্ম্মস্বরূপিনী মা আমাদের – যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন "সম্ভবামি যুগে যুগে"? আংশিক সাড়াশব্দ নয়, পূর্ণ আত্মপ্রকটন! বেদবেদান্ত পুরাণতন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র যে জননীর অঙ্গে অঙ্গীভূত সেই সনাতন ধর্ম্ম আপনি আসিয়া বলিবেন, "আমি আসিয়াছি, আমিই সেই রাম, আমিই সেই কৃষ্ণ, আমিই আবার আসিয়াছি"! হে ভারতবাসি এরূপ আত্মপরিচয় কি আজও শোন নাই, শোন শ্রীবিবেকানন্দ কি ঘোষণা করিতেছেন ঃ—

* "সততবিবদমান, আপাতদৃষ্টে বহুধাবিভক্ত, সর্ব্বথা বিপরীত আচার সঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দু ধর্ম্ম নামক যুগযুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকালযোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্ম্ম-খণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় তাহা দেখাইতে, এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্ম্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ হইয়া লোকহিতায় সর্ব্বসমক্ষে নিজ-জীবন প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন * * * এই নবযুগধর্ম্ম, সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান, এবং এই নবযুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ পূর্ব্বগ শ্রীযুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের পুনঃ সংস্কৃত প্রকাশ! হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর, ধারণা কর!

"হে মানব, মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না—গত রাত্রি পুনর্ব্বার আসে না—বিগতোচ্ছ্বাস পূর্ব্বরূপ আর প্রদর্শন করে না—জীবও দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। অতএব অতীতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে প্রত্যক্ষের পূজাতে আহ্বান করিতেছি—গতানুশোচনা হইতে বর্ত্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি—লুপ্তাবস্থার পুনরুদ্ধার হইতে, সদ্যোনির্ম্মিত বিশাল ও সন্নিকটপথে আহ্বান করিতেছি, বুদ্ধিমান, বুঝিয়া লও।"

ভারতের সনাতনধর্ম্ম অন্তর্হিত হন নাই, কারণ আজও তিনি আত্মপ্রকাশ

করিয়াছেন,—সহস্র সন্দেহ, ঘোর অবিশ্বাসের মধ্যেও আপনাকে ধরা দিয়াছেন; ভারতের ঋষিগঠিত সনাতনসমাজ মরে নাই, কারণ আজও দেহিত্বে ব্রহ্মত্বের সংযোজনরূপ পূর্ব্বার্জ্জিত মহাশক্তি সেই সমাজশরীরে অক্ষুণ্ণভাবে কাজ করিয়াছে, ভারতের প্রাচীন নেশন মরে নাই, কারণ আজও তাহার লক্ষ্যনিরূপক বেদ বিদ্যমান ও সেই বেদকে স্বীয় জীবনের অস্থিমজ্জায় পরিণত করিয়া আজও ভারতীয় নেশনের নিয়ন্তৃপদ অধিকার করিতে ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের আবির্ভাব ঘটিযাছে। নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ এখন উদ্ঘাটিত হইয়াছে,—আগামী সংখ্যায় সেই কথাই আমাদের আলোচ্য।

অদ্বৈতপ্রসঙ্গ।

অধিকারিভেদ।

মানুষের ইতিবৃত্ত খুঁজিলে দেখিতে পাই যে পৃথিবীতে আসিয়াই মানুষ সব আগে সন্ধান লইতেছে তাহাব ধর্ম্ম কি,—কি বস্তু তাহাকে অন্তরে বাহিরে ধারণ কবিযা রাখিয়াছে? এই সন্ধানের ফলে ঋষি ব্রহ্মলাভ করিয়া বলিলেন,—এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি; অর্থাৎ ইহাই মানুষের পরম গতি, ইহাই পরম সম্পদ, ইহাই পরম লোক, ইহাই পরম আনন্দ, এই আনন্দেরই কলাংশ প্রত্যেক ভূত বা জীবের উপজীব্য।

কিন্তু ধর্ম্মেব সন্ধান পাইয়া ব্রহ্মবিৎ ঋষি দেখিলেন যে সকল মানুষই সেই ধর্ম্মকে প্রত্যক্ষ করিতেছে না, তবে সকলেই এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রামুপজীবন্তি, অর্থাৎ সেই ধর্ম্মেরই কলাংশকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে; যার যে ভাব সব কাজ ও সব চিন্তার মূলে সত্তা ও শক্তি দিতেছে, জীবনের আধার ও উৎসস্বরূপ সেই ভাবটী পরম ধর্ম্মেরই অংশীভূত। যে যেখানে যেমন করেই বাঁচুক, সেই পরম ধর্ম্ম লইয়াই বাঁচিতেছে,—এতস্যৈব মাত্রামুপজীবন্তি।

র্ম্মের এই অখণ্ড ব্যাপকভাবটী বেদের ঋষি বেশ অনুভব করিয়াছিলেন। এই ব্যাপকভাব বা immanence যদি তিনি হৃদয়ঙ্গম না করিতেন, তবে বিচিত্রস্বভাব, বহির্ম্মুখ, ভোগতৎপর, মানুষকে লইয়া তিনি একটা সমাজ গড়িবার প্রয়াসী হইতেন না।

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতিনান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥

মানুষের ইন্দ্রিয়কে স্বয়ম্ভু বহির্বিষয়গ্রাহি করিয়া রাখিয়াছেন তাই মানুষ বহির্ম্মুখ,—অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না; তবে কোন ধীর ব্যক্তি অমৃতলাভেচ্ছায় ইন্দ্রিয়দিগকে প্রত্যাহৃত করিয়া ব্যাপক আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। ঋষিরাও নিবৃত্তির পথে গিয়া যখন আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিলেন তখন সঙ্গে সঙ্গে দেখিলেন যে মানুষ যতই কেন বহির্ম্মুখ হউক না, তার ভোগলক্ষ্য যত প্রকারের হউক না কেন, তাহাকে অন্তর্ম্মুখ ও মুমুক্ষু করিয়া দিতে পারিলেই সে পরম ধর্ম্ম লাভ করিবে, কারণ সেই পরম ধর্ম্ম বা পরম আনন্দকে আশ্রয় করিয়াই তাহার ভোগ ও স্বভাবে বৈচিত্র্য সম্পাদিত।

এই মুমুক্ষুত্ব বা ধর্ম্মলিপ্সা ও অন্তর্ম্মুখতাকেই প্রাচীন ঋষি পরম ধর্ম্মলাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলেন; তা' ছাড়া মানুষকে ধর্ম্মলিপ্সু ও অন্তর্ম্মুখ করিবার জন্য যত কিছু অবলম্বন থা কতে পারে বা আসিয়া জুটিতে পারে, সেগুলি অবান্তর, যথাক্ষেত্র তথা আহর্ত্তব্য,—কেবল প্রকৃতই সেগুলি অন্তর্ম্মুখতার সহায় হইলেই হইল।

মানুষকে মুমুক্ষু ও অন্তর্ম্মুখ করিবার অবলম্বনগুলিকে গণ্ডীবদ্ধ করিয়া তাহাদের একটা নির্ঘণ্ট ঋষিরা তৈয়ারী করিয়া যান নাই বলিয়াই, আমাদের সনাতন ধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্মের মত creed বা dogma নহে, অর্থাৎ উহার সাধন বিশেষ কতকগুলি প্রণালী বা মতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। কি কি অবলম্বন সহায়ে মানুষকে অন্তর্ম্মুখ ও মুমুক্ষু করা যায়, তাহার একটা নির্ঘণ্ট করিয়া যান নাই বলিয়াই যে ঋষিরা সাধন বিষয়ে কোনও ইঙ্গিত করেন নাই, তাহা নহে। শাস্ত্রে অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহারা পরম ধর্ম্মের নির্দ্দেশ ছাড়া একটা সাধনতত্ত্বও প্রচলিত

করিয়া দিয়াছেন, যাহাকে আমরা ঐ ধর্ম্মেরই যেন একটা science বা বিজ্ঞান বলিতে পারি। এই সাধনতত্ত্বকে বুঝিবার জন্য ও বুঝাইবার জন্য আমাদের দেশের আচার্য্যগণ উহাকে চার ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন, তাহাদের নাম—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ ও রাজযোগ বা ধ্যানযোগ। ধর্ম্মলাভ উদ্দেশ্যে মানুষকে অন্তর্মুখ ও মুমুক্ষু করিবার জন্য এই সাধনতত্ত্ব ছাড়া প্রাচীন ঋষিরা কি কোনও অবলম্বনের কথা বলিয়া যান নাই? উত্তর—বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে সমস্ত অবলম্বনের কোনও সীমানির্দ্দেশ করেন নাই। যাহা মানুষের পরম ধর্ম্ম তাহার পরিবর্ত্তন নাই ও তাহা সার্ব্বজনীন,—মুমুক্ষুত্ব ও অন্তর্মুখতার যে পথ সাধনতত্ত্বে নির্ণীত, তাহাও অপরিবর্ত্তনীয় ও সার্ব্বজনীন, কিন্তু যে সব বাহ্য অবলম্বন লইয়া, সংসারের যে পাথেয় লইয়া সেই অন্তর্মুখতার পথে প্রবেশ করিতে হইবে, তাহা এককালে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া সম্ভব নহে, কারণ তাহা কালে কালে বদলাইয়া যায়—কত পুরাতন ভাঙ্গে, কত নূতন গড়ে, আবার কত অপরিচিতও মাঝে মাঝে আসিয়া জুটে।

সনাতন ধর্ম্ম বলিতে আমরা মুখ্যভাবে সেই ধর্ম্মকেই বুঝি, যাহাকে ঋষি বলিয়াছেন, "এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমাসম্পদ", ইত্যাদি। প্রাণকে লইয়াই দেহটা যেমন মানুষ, তেমনি এই পরম ধর্ম্মকে লইয়াই আমাদের ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম হইয়াছেন। কিন্তু এই প্রাণ যেমন রহিয়াছে, তেমনি সনাতন ধর্ম্মের একটী অন্তরঙ্গ ও একটী বহিরঙ্গও রহিয়াছে, অন্তরঙ্গ হ'ল অপরিণামী সাধনতত্ত্ব, এবং বহিরঙ্গ হ'ল পরিণামী বাহ্যিক অবলম্বনাদি।

আমরা দেখিয়াছি, সনাতন ধর্ম্মের প্রাণ ও অন্তরঙ্গ সর্ব্বকালের ও বিশ্বমানবের সম্পত্তি, এখন প্রশ্ন এই যে উহাদের সহিত সনাতন ধর্ম্মের বহিরঙ্গের সংযোগ কিরূপে স্থাপিত ও রক্ষিত হয়। এই প্রশ্নের উত্তর, এক কথায়,—অধিকারি ভেদ, অর্থাৎ যাহার যেরূপ বাহ্য অবলম্বনে অধিকার, সেইরূপ অবলম্বনই তাহার পক্ষে সনাতন ধর্ম্মের বহিরঙ্গ।

এখন প্রথমেই এই অধিকার শব্দটী ভাল করিয়া বুঝা দরকার। আজ কাল ইংরাজী ভাবে শিক্ষা পাইয়া আমরা অধিকার শব্দটাকে বেশী ভাগই একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করি,—সে অর্থ কি? না, ইংরাজীতে right শব্দটী যে অর্থে ব্যবহার হয়। আমরা যখন বলি, "আমার ইহাতে অধিকার আছে, তোমার সে অধিকার নাই," তখন আমরা বেশী ভাগই এই অর্থে বলি যে

"আমার ইহাতে স্বত্বের দাবী আছে, তোমার সে দাবী নাই।" অধিকার শব্দের মধ্যে একটা দাবীদাওয়ার ভাব বিষম ভাবে ঢুকিয়া গিয়াছে, আর এই "অনধিকার" প্রবেশের জন্য দায়ী ইংরাজী right শব্দ। ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে শাস্ত্রীয় অধিকারিবাদের প্রতি বিরোধভাব আরও তীব্র হইয়াছে,—নিন্দাবাদ আরও ঝাঁজাল হইয়াছে, সমালোচকের অস্ত্র আরও শাণিত হইয়াছে। যাহা ভাল তাহাতে কতকগুলি চিহ্নিত লোকেরই কেবল দাবী থাকিবে, আর কেহ দাবী করিতে পারিবে না! কি ভয়ানক কথা! মানুষের right বা অধিকারে এমন বাঁধাবাঁধি গণ্ডী দেওয়া কি দম্ভ, কি ধৃষ্টতার পরিচায়ক! এই রকম একটা জঘন্য অধিকারিবাদের কল্পনায় সনাতন ধর্ম্মের সমালোচক বিষমভাবে উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছেন।

শাস্ত্রীয় অধিকারিবাদের মধ্যে দাবীদাওয়ার কথা আসে না। যাহা তোমার দ্বারা অধিকৃত, তাহাই তোমার অধিকার, যাহাতে তুমি অধিষ্ঠিত বা প্রতিষ্ঠিত, তাহাই তোমার অধিকার বা সামর্থ্যলক্ষিত ভূমি নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। তোমার দাবী কি বা কিসের উপর, সে কথাই এখানে তোলাই হইতেছে না। পরম বা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের উপর, অর্থাৎ তোমার নিজের স্বরূপের উপর তোমার দাবী নাই, এ কথা শাস্ত্র কোন মুখে বলিবেন? ঋষিরা লোকহিতৈষী, তাই শাস্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন,—মানুষের কাছে দাঁড়াইয়া বলিয়াছেন "বেদাহমেতমজরং পুরাণং সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বগতং বিভুত্বাৎ।" শাস্ত্রের মধ্যে লোকহিতৈষণার ভাবই সর্ব্বাগ্রে দেখিতে চেষ্টা করা উচিত,—সে ভাব কোনমতে যখন পরিস্ফুট হইবে না, তখন অন্য কথা।

আমাদের যেমন আজকাল মানুষের ভোক্তব্য বা কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ করিতে গেলেই দাবীদাওয়ার ভাবটা আগেই মনে উঠে, প্রাচীন শাস্ত্রকারের মনে সেরূপ উঠে নাই। তাহার কারণ এই যে আমাদের মন পাশ্চত্য শিক্ষার দ্বারা পরিপোষিত হওয়ায়, sense of right or বা দাবী দাওয়ার ভাবটা যেন মনের ধমনীতে ধমনীতে সঞ্চালিত হইয়া গিয়াছে, তাই মানুষের অনুষ্ঠেয় বা কর্ত্তব্যের বিচার করিতে গেলেই আমরা দাবী দাওয়ার দিক থেকে বিচার করি। প্রাচীন শাস্ত্রকার স্বভাবতঃ সেরূপ করিতেন না, তিনি দেখিতেন মানুষের প্রকৃতি বা সামর্থ্য। তোমার

আমার অধিকার বলিতে তিনি বুঝিতেন, তুমি আমি আমাদের সামর্থ্য অনুসারে যে ভূমিতে দাঁড়াইয়া আছি। সেই সামর্থ্যকে দৃঢ়ভাবে অতিক্রম করাই কর্ম বা সাধনার উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু আরম্ভ করিতে হইবে সেই সামর্থ্যনির্দিষ্ট ভূমি হইতে, নতুবা উন্নতিপথে বিশৃঙ্খলা আসিবে, অবনতি আসিবে। প্রকৃতিগত সামর্থ্যই অধিকারীর মধ্যে পার্থক্য গড়িয়া দিয়াছে, শাস্ত্রকার দাবীদাওয়ার হিসাব করিয়া সে পার্থক্যের সৃষ্টি করেন নাই।

তুমি বলিবে, সাধকের সামর্থ্যের মাপে সনাতন ধর্মকে কি ক'রে ছোট বড় করা যায়?* এ আপত্তির উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। সনাতন ধর্ম্মের যাহা প্রাণ ও অন্তরঙ্গ তাহার মধ্যে বাছাই হয় না, তাহা দেশ কাল পাত্রের অতীত; কিন্তু সেই সনাতন ধর্ম্মেরই অপরিহার্য্যরূপে একটা বহিরঙ্গ রহিয়াছে, যেখানে স্থূলসূক্ষ্মসবিশেষে সাধকের জন্য বাহ্য অবলম্বনেরই বাহুল্য। সাধক আপনি প্রকৃতিনিয়োগেই সনাতন ধর্ম্মের এই বহিরঙ্গে আপনার উপযুক্ত কক্ষ অধিকার করে। ধর্ম্ম বা সাধনতত্ত্ব আপনি অবিকৃত থাকিয়াই সাধককে দেখাইয়া দেয় সে কোথায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং কেমন করিয়া সে সেইখান থেকেই পূর্ণ সনাতন ধর্ম্মকে লাভ করিতে অগ্রসর হইবে। ইহাতে সনাতন ধর্ম্মের উপর "ফরমাসমত অনায়াসে দরজির কাঁচি বা ছুতারের করাত" † চলিল না, সনাতন ধর্ম্মকে ছোট করিয়া লওয়া হইল না, সাধকের হাতেই সংযোগরজ্জু ফেলিয়া দেওয়া হইল, তাহাকেই বড় করিয়া লইবার ব্যবস্থা করা হইল।

আর একটা আপত্তি এই উঠিতে পারে যে সব মানুষেরই প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট ভূমি থেকে কি সাধনা আরম্ভ হ'তে পারে? মানুষের প্রকৃতি এমন নিকৃষ্ট হ'তে পারে যে সনাতন ধর্ম্ম যদি তাকে বাদ না দেয় তবে নিজেই বিকৃত হ'য়ে যায়, তখন উপায় কি? সনাতন ধর্ম্মকে ত সত্য মিথ্যার একটা বিচার করিতে হইবে? যাহা হুবহু মিথ্যা, তাহার সহিত সনাতন ধর্ম্মের মিল হবে কি ক'রে? "যাহাদের মধ্যে সত্যকার মিল নাই, কৌশলে তাহাদের মিল করা যায় না।" ‡

---

* প্রবাসী—ফাল্গুন, ১৩১৮, ৪৬২, পৃঃ।

† ঐ ঐ ১৩১৮, ৪৬৩, পৃঃ।

‡ ঐ ঐ ৪৭০ পৃঃ

এ আপত্তির উত্তরও পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে, এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি। সমস্ত জীবই সেই পরম আনন্দের অংশ-সম্ভোগে জীবন ধারণ করে। যতই কেন নিকৃষ্ট স্বভাব হউক না মানুষের সত্য-নিত্য প্রতিষ্ঠা সেই পরম ধর্ম্মে, সে যদি "অমৃতত্বমিচ্ছন আবৃত্তচক্ষুঃ" হইতে পারে তবে সে আজ যে ভূমিতেই থাকুক, আপনার প্রতিষ্ঠা আপনি একদিন পাইবেই পাইবে। তাহার সঙ্গে তাহার পরম ধর্ম্মের "সত্যকার মিল" নাই, এ কথা শাস্ত্র মোটেই স্বীকার করে না. সেই জন্য যেখানে মিল নাই, সেখানে একটা মিল যেন তেন প্রকারে গড়িয়া দিবার জন্য শাস্ত্র কৌশল প্রয়োগ করে নাই, যেখানে সত্যকার মিলই আছে,—সেখানে বহির্ম্মুখতার আবরণ ভাঙ্গিয়া দিয়া অন্তর্ম্মুখতার আলোকে সেই মিলটুকু প্রকাশ করিয়া দিতেই শাস্ত্র কৌশল প্রয়োগ করিয়াছেন। এই কৌশলের নাম অধিকারবাদ।

অধিকারবাদ মানুষকে চোখে আঙ্গুল দিয়া তাহার হীনতা বা উচ্চতা দেখাইবার দিকেও যায় না; অধিকারিবাদ মানুষকে এই আশ্বাস দিতেছে যে তাহার যাহা অধিকার অর্থাৎ তাহার প্রকৃতি তাহাকে যে ভূমিতে দাঁড় করাইয়াছে, সেইখান থেকেই সনাতন ধর্ম্মের সাধনার জন্য সে উপযুক্ত অবলম্বন পাইয়া অন্তর্ম্মুখীন হইতে পারিবে। এই অধিকারিবাদের সঙ্গে সঙ্গে সনাতন ধর্ম্মের বহিরঙ্গে ক্রিয়াবহুল ও ক্রিয়া-বিরল পূজাপদ্ধতির এবং স্থূলসূক্ষ্মহিসাবে বিচিত্র অবলম্বন সহায়ে উপাসনার বহুল বিধান রহিয়াছে। এইরূপ ব্যবস্থা থাকায় সনাতন ধর্ম্ম "আগাছায়" কণ্টকিত ও গতিভ্রষ্ট বা কক্ষভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা রাখেন না, কারণ সনাতন ধর্ম্ম ধরিত্রীর মত সার্ব্বজনীন ও সর্ব্বংসহা,—ধরিত্রীর মত মানুষমাত্রেরই ভারবহনে সমর্থা।

সনাতন ধর্ম্ম ঘোষণা করিতেছেন যে মানুষ মাত্রেরই পরমধর্ম্মলাভে অলঙ্ঘনীয় দাবী রহিয়াছে, কারণ সে জানুক বা না জানুক পরমধর্ম্মই তার স্বরূপ, তার হাল স্বভাব যেমনই হউক না কেন উহার সহিত তার নিত্যস্বরূপের নিশ্চিতই একটা সংযোগপথ আছে, এই সংযোগ-পথই ধর্ম্মলাভের প্রকৃষ্ট পথ, প্রত্যেককে তাহার নিজের এই পথটা যিনি যথার্থই দেখাইয়া দিতে পারেন, তিনিই তাহার গুরু। মানুষের হাল স্বভাব যেমন বিচিত্র, সাধনার আরম্ভটাও তেমনি বিচিত্র; তার-

পর বৃত্তের কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত অঙ্কিত রেখা সমূহের মত সাধন-পথগুলির ব্যবধান ক্রমশঃই লোপ পায় এবং শেষে পরমধর্ম্মরূপ কেন্দ্রে সবগুলিই একাকার হইয়া যায়।

বর্ত্তমান যুগে স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা সনাতন ধর্ম্ম আপনার এই ঘোষণা দেশে বিদেশে বারম্বার প্রচার করিয়াছেন। সনাতন ধর্ম্মের বিরুদ্ধে সেকেলে আপত্তিগুলিকে যে এখনও আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে নব নব ছন্দে, নূতন নূতন পোষাক পরাইয়া—হাজির করা হইতেছে, ইহাতে আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে? হয় বুঝিতে হইবে সনাতন ধর্ম্মসম্বন্ধে স্বামীজির মতামত কেহ কেহ অনুধাবনযোগ্য বলিয়া মনে করেন না; অথবা বুঝিতে হইবে, সনাতন ধর্ম্মের প্রতি একটা বিরোধ বজায় রাখাই সম্প্রদায়বিশেষের পক্ষে জীবনীশক্তির পরিচায়ক। কারণ বিজ্ঞান বলেন যে প্রতিক্রিয়াসম্ভূত আন্দোলনকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে, যে বিরোধভাব উহার উদ্ভবস্থল, সেই বিরোধভাবকে জীবিত ও পরি-পুষ্ট করিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক। সনাতন ধর্ম্মে যে আবর্জ্জনা জমিয়াছে, তাহা সনাতন ধর্ম্মই অস্বীকার করেন না। সেই ধর্ম্মেরই শাশ্বত স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বহিরঙ্গের আবর্জ্জনাদি দূর করিবার জন্যই স্বামী বিবেকানন্দের গুরুপ্রেরণায় জীবনপাতি পরিশ্রম। আমাদের দেশের বর্ত্তমান সাহিত্য কি সেই পরিশ্রম, সেই চেষ্টা উপেক্ষা করিতে পারেন? আমাদের ত সেরূপ মনে হয় না,—সাহিত্যের উপর সে দোষারোপ করা সমীচীন নহে। তবেই বলিতে হয় যে সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ যে সাময়িক আবর্জ্জনাদি দ্বারা আবৃত হইয়াছিল, সেই আবর্জ্জনাদির বিরুদ্ধে প্রতি-ক্রিয়ায় দেশে একটা আন্দোলন ও বিরোধী সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল, এবং সেই আন্দোলনকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যই এখনও সনাতন ধর্ম্মের প্রতি বিরুদ্ধভাব পূর্ণমাত্রায় জাগাইয়া রাখিতে হয়, অতএব সনাতন ধর্ম্মের বিরুদ্ধ আপত্তিগুলির কিরূপ জবাব তদবলম্বীরা দিয়াছে তাহা অনুধাবন করা যতটা দরকার তদপেক্ষা সেই পুরাণ আপত্তিগুলিকে নূতন ভাষা-ভঙ্গিমায় সর্ব্বসমক্ষে হাজির করাই প্রতিক্রিয়াপ্রসূত সম্প্রদায়ভুক্ত কোন কোন সাহিত্যিকের পক্ষে বেশী দরকার বলিয়া বিবেচিত হয়। বঙ্গসাহিত্যের পাঠকবৃন্দ আপনারাই বলুন, যদি সনাতন ধর্ম্মের তত্ত্বা-লোচনায় আমাদিগকে উন্নতি করিতে হয়, তবে সেই আলোচনায় স্বামী-

ভিন্ন মতামতকে বাদ দেওয়া কোনও সাহিত্যিকের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত কি না। চিকাগো সহরে স্বামীজিপ্রদত্ত বিশ্ববিখ্যাত বক্তৃতার একটী অংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—পাঠক দেখিবেন, "ধর্ম্মকে কয়মাস মত ছোট করা" প্রভৃতি আপত্তিগুলিকে "সেকেলে" বলায় আমাদের অত্যুক্তিদোষ হইয়াছে কি না।

* * অতএব যেমন মানবের স্বভাবই এই যে তাঁহার অনন্তের ভাবোপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত নীলাকাশ বা অপার সমুদ্র আপনা-আপনি মনে আসিয়া পড়ে এবং যেমন কেহ কেহ সর্ব্বব্যাপিত্ব ও পবিত্রতার ভাব স্ব স্ব স্বভাবানুসারে * গির্জ্জাঘর, মসজিদ বা ক্রশের সহিত সম্মিলিত রাখেন, সেইরূপ হিন্দুরা পবিত্রতা, নিত্যত্ব সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি ভাবগুলিকে নানারূপ দেবপ্রতীকে † সম্মিলিত করিয়া রাখিয়াছেন। তবে প্রভেদ এইটুকু যে কেহ কেহ সমস্ত জীবন স্বীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়া আপনাদের উন্নতির পথে কণ্টক দিয়াছেন, কারণ তাঁহাদের ধর্ম্ম কতিপয় মতের পোষকতা করা আর লোকের উপকার করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য—অপরোক্ষানুভব। মানবকে ঈশ্বরোপলব্ধি দ্বারা স্বয়ং ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে, সুতরাং দেববিগ্রহই হউক দেবালয়ই হউক বা ধর্ম্মশাস্ত্রই হউক, এই সমুদয় তাঁহার ধর্ম্মজীবনের বাল্যাবস্থার সহকারী মাত্র; এ সকল তাঁহার চরম উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নয়। তাঁহাকে ক্রমাগত এগিয়ে যেতে

---

* "সব শিয়ালের এক রা" পরমহংসদেব বলিতেন। সেইরূপ প্রকৃত ঈশ্বরসাধকদের কাছেও একটা সাদৃশ্য আছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ "চিন্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং" এর ধারণায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইবার জন্য সূর্য্যপ্রতীকের সাহায্য লইতেন, ইহা তত্ত্বানুসন্ধিৎসু অনেকেই জানেন। সূর্য্যের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তিনি জ্যোতির্ম্ময় সত্তায় আত্মহারা হইয়া যাইতেন। আবার তাঁহার জীবনের শেষ উপদেশ কি, শেষ কথা কি? তাঁহার "আত্মজীবনী" পড়িয়া দেখ তিনি উচ্চ সাধনাবস্থায় আরূঢ় থাকিয়া দাক্ষ্য দিতেছেন,—"ঈশ্বরের অনন্ত মূর্ত্তি, মানুষের অনন্ত গতি"। যেরূপ অর্থেই বুঝুন কেন, শাস্ত্রীয় অধিকারিবাদের একটী মূলতত্ত্ব এই বাক্যে নিহিত রহিয়াছে।

† স্বামীজির ইংরাজি বক্তৃতা হইতে তাঁহার মনোভাব আরও স্পষ্ট বুঝা যায়; আমরা এখানে বক্তৃতার বাঙ্গালা অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তকে "দেববিগ্রহ" আছে, উহাকে এখানে "দেবপ্রতীক" করা হইল, ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ পাঠক মূল বক্তৃতাটিও পাঠ করিতে পারেন।

হবে, কোথাও থামিলে চলিবে না। “বাহ্যপূজা, মূর্ত্তিপূজা—প্রথমাবস্থার কার্য্য, পরে কিঞ্চিৎ উন্নত হইলে মানসিক প্রার্থনা, কিন্তু ঈশ্বরসাক্ষাতকারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং চরমাবস্থা’। হিন্দুশাস্ত্র ইহাই প্রকাশ করিতেছেন। যে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি কিছুকাল পূর্ব্বে করযোড়ে জানু পাতিয়া দেববিগ্রহের সম্মুখে পূজার্থ বসিয়া থাকিতেন, শুন, ভবিষ্যতে জ্ঞানলাভের পর তিনি কি বলিতেছেন,—‘সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারেন না চন্দ্র তারা আর এই সমুদায় বিদ্যুতও তাঁহার প্রকাশক নহেন, সুতরাং অগ্নি তাঁহাকে কিরূপে প্রকাশ করিবেন? ইঁহারা সকলেই তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়েন’। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার বাহ্যপূজা ত্যাগ হইয়া গিয়াছে বলিয়া ভিন্নধর্ম্মীদের স্থায় বিগ্রহ সেবাকে তিনি পাপজনক বলিয়া ঘৃণা করেন না। তিনি ইহাকে তাঁহার জীবনের এক অত্যাবশ্যকীয় অবস্থা বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। বাল্য যৌবনাদির জন্মদাতা। বৃদ্ধ যদি বাল্য ও যৌবনাবস্থাকে পাপের অবস্থা বলিয়া ঘৃণা করেন, তাহা হইলে কি তিনি হাস্যাস্পদ হইবেন না? আবার হিন্দুধর্ম্মে বিগ্রহসেবা যে সকলের পক্ষেই বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা নহে।

কিন্তু যদি কেহ বিগ্রহসাহায্যে সহজে আপনার ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহা হইলে কি তাহাকে পাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা সঙ্গত? এমন কি ঐ অবস্থা অতিক্রম করিয়া যাইলেও তাঁহার উহাকে ভ্রমাত্মক বলিয়া নির্দ্দেশ করা সঙ্গত নহে। হিন্দু বলেন যে, মানব ভ্রম হইতে সত্যে গমন করিতেছেন না, কিন্তু সত্য হইতে সত্যে—নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে গমন করিতেছেন। হিন্দুর পক্ষে ক্ষুদ্র অজ্ঞানীদের ধর্ম্ম হইতে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ পর্য্যন্ত যাবতীয় ধর্ম্মই অনাদি অনন্ত পরব্রহ্ম উপলব্ধির সাধন বা সোপান স্বরূপ; জন্ম ও অবস্থাভেদে যাঁহার পক্ষে যাহা উপযোগী, তিনি সেইটীকে আশ্রয় করিয়া অপরটীতে উত্থিত হইবেন। অতএব প্রত্যেক মানবাত্মাই ঈগল (বাজজাতীয় পক্ষী) সন্তানের ন্যায় ক্রমে ক্রমে অধিকতর উচ্চে উঠিতে থাকে। এইরূপে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বলশালী হইতে হইতে পরিশেষে মহান সূর্য্যের সমীপবর্ত্তী হয়।

বহুত্বের মধ্যে একত্বই প্রকৃতির নিয়ম। হিন্দুগণ ইহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। অন্যান্য ধর্ম্ম কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মতবাদ বিধিবদ্ধ করিয়া,

সমগ্র সমাজকে বলপূর্ব্বক তাহাই জানাইবার চেষ্টা করেন। সমাজ সম্মুখে এক মাপের জামাগুলি রাখিয়া রাম, শ্যাম, হরি প্রভৃতি সকলকেই উহা পরিতে হুকুম করেন। যদি হরি বা শ্যামের গায়ে না হয়, তবে তাদের জামা না পরিয়া খালি গায়ে থাকিতে হইবে। হিন্দুগণ বুঝিয়াছেন যে সাপেক্ষকে আশ্রয় করিয়াই কেবল নিরপেক্ষের ধারণা উপলব্ধি বা প্রকাশ সম্ভব। অতএব তাঁহাদের মতে হিন্দুদের দেববিগ্রহ খ্রীষ্টিয়ানদের ক্রুশ, ও মুসলমানদের চন্দ্রকলা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায় স্বরূপ। তাঁহারা এরূপ বলেন না যে, উক্ত প্রকার আশ্রয় সকলের পক্ষেই আবশ্যকীয়, কিন্তু অধিকাংশ লোকেই যে ইহাতে পরম উপকার লাভ করেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব যাঁহাদের উহা আবশ্যক নাই, তাঁহাদের অপরকে ইহা অন্যায় একথা বলিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই।

সুতরাং হিন্দুর পক্ষে সমস্ত ধর্ম্মই নানা রুচিবিশিষ্ট নরনারীর, নানা অবস্থার মধ্য দিয়া সেই একমাত্র ঈশ্বরোপলব্ধির জন্য অগ্রসর হওয়ার উপায় ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রত্যেক ধর্ম্মই জড়ভাবাপন্ন মনুষ্যকে ব্রহ্মে পরিণত করিতে নিযুক্ত এবং সেই এক ঈশ্বরই সকল ধর্ম্মপথ প্রকাশ করিয়াছেন। তবে ধর্ম্মগুলি পরস্পর এত বিরুদ্ধভাবাপন্ন কেন? হিন্দুরা বলেন, আপাতঃদৃষ্টিতে ওরূপ বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ভিন্নাবস্থাপন্ন ভিন্নপ্রকৃতিদের উপযোগী হইবার জন্য এক সত্যই এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধভাব ধারণ করিয়াছে। এক আলোক, ভিন্ন বর্ণের মধ্য দিয়া আসিতেছে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেখাইতেছে। প্রত্যেক স্বভাবের উপযোগী হইবে বলিয়া এই সকল ভিন্নতার আবশ্যক। কিন্তু সকলেরই অন্তস্তলে প্রত্যেক ধর্ম্মের মধ্যে সেই এক সত্যই রাজত্ব করিতেছেন।”

"হারাধন।"

(গাথা)

(শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত)

তাদের সে দেশে সভ্যতা না পশে,
কেবল চাষার মেলা।
পথে, গোঠে, মাঠে, নদীতটে, ঘাটে
সরল প্রাণের খেলা॥
নাই কোন লজ্জা, নাই সাজ সজ্জা,
মাগী মোটা সাড়ী পরা।
হাতে রুলি শাঁখা, গায়ে উল্কি আঁকা,
তাতেই পরাণ ভরা॥
ছেঁড়া কপ্নি আঁটা বেশ মোটা সোটা
ছেলে মেয়েগুলা ছোটে।
গরু, মোষ ল'য়ে খেলিছে অভয়ে,
বাড়ী হাতে ক'রে মাঠে॥
যুবা বুড়া যত, ক্ষেতে অবিরত,
চাষে করে কালক্ষয়।
শুধু মাঝে মাঝে, তাম্রকুট সাজে,
শ্রমের লাঘব হয়॥
বুঝেনাক ধর্ম্ম, রাজনীতি মর্ম্ম,
ঘামায় না কভু মাথা।
'দেশ' 'দেশ' ক'রে হাঁকি উচ্চৈঃস্বরে
পায় না ক হৃদে ব্যথা॥
তবে শুধু দেখি, দয়া মাখামাখি,
মায়ায় হৃদয় ভরা।
বাপ মাকে ভক্তি, জায়া অনুরক্তি,
তা'য়ে তা'য়ে হাত ধরা॥

---

* বাগবাজার সোসিয়াল ইউনিয়নের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

প্রতিবেশিগণে, সমান যতনে,
দেয় কত ভালবাসা।
রোগে, দুঃখে, সুখে এক ভাবে দেখে,
যেন প্রাণে প্রাণ মেশা॥
পাথরের চাঁই, পূজে ঠাঁই ঠাঁই,
'শিব' ব'লে নৃত্য করে।
ঢালে নদী জল, দেয় বিল্বদল,
তুষ্ট করে মহেশ্বরে॥
হারাধন নামে, তা'দের সে গ্রামে
আছিল কৃষক-যুবা।
বলিষ্ঠ সুঠাম, নয়নাভিরাম,
ছিল সে গ্রামের শোভা॥
দেহটী যেমন, হৃদয় (ও) তেমন,
পর কা'রে নাহি ভাবে।
প'ড়ে রোগে, শোকে, যেখানে যে ডাকে,
তাহারে নিকটে পা'বে॥
রাত দিন জেগে, হৃদয় আবেগে,
ব'সে থাকে রোগী পাশে।
রোগী সেরে উঠে, যবে যায় মাঠে,
মুখখানি তার হাসে॥
যদি কোন খানে, বরষার দিনে,
ভেঙ্গে যায় কা'র (ও) ঘর।
শুনে সেই কথা, হারু ছোটে তথা,
শ্রম করে অকাতর॥
পিপাসিত জনে, দেখে কোন খানে,
জল এনে দেয় ছুটে।
নিজ অন্ন দানে, তোষে অন্নহীনে,
মুখে হাসি তার ফুটে॥
আহারের পরে, চারিদিকে ঘোরে,
সারিয়া নিজের কায।

বসিতে বলিলে, ভাসে আঁখি জলে,
পড়ে যেন মাথে বাজ ॥
কোথা আর্ত্তজন, মলিন বদন,
ভাসিছে নয়ন জলে।
হারাণ ছুটিয়া, তার কাছে গিয়া,
দুটা মিঠে কথা বলে ॥
যেব হিংসা ভরে, গাঁয়ের মাঝারে,
(কভু) উঠিলে কলহ-রোল।
হারাণ তথায়, দ্রুত চলে যায়,
মিটাইয়া দেয় গোল।
দেশাচার মতে একদিন প্রাতে
গাইতে গাইতে গান।
যত নর নারী, যায় সারি সারি
নদীতে করিতে স্নান ॥
'কল্যান-ঈশ্বর', নামেতে পাথর
নদীতীরে প'ড়ে আছে।
কত কাল ধ'রে, বলিতে না পারে,
যায় সবে তাঁর কাছে।
ফুল জল দিয়া, তাঁহারে পূজিয়া,
মাঠে বসে খায় দায়।
আজ সেই মত, গ্রামবাসী যত
নদীতীরে শোভা পায় ॥
কেহ করে স্নান, কেহ গায় গান,
কেহ করে শিব-পূজা।
ছেলে গুলো মাতে বাঁশী লয়ে হাতে,
সেজেছে রাখাল-রাজা ॥
হঠাৎ 'কি হ'লো' শবদ উঠিল,
হায়! হায়! করে সবে।
সকলে ছুটিয়া, নদীতটে গিয়া,
কাঁদিতেছে উচ্চ রবে ॥

হাবু ডুবু খায়,　　　ঘুর স্রোতে যায়,
　　কৃষক-যুবতী কায় ।
বাঁচাতে তাহারে,　　　কেহ নাহি পারে,
　　আত্মীয় স্বজন তার ॥
'কি ক'রে, কি হবে',　　　কেমনে বাঁচিবে
　　আহা সে দুঃখিনী বালা ।
সাহায্য অভাবে,　　　অভাগিনী ডুবে,
　　ফুরায় জীবন-খেলা ॥
এমন সময়ে,　　　হেরিল বিস্ময়ে,
　　জলে ঝাঁপ দিল কেবা ।
তুচ্ছ করি প্রাণে,　　　দ্রুত সন্তরণে,
　　ধায় স্রোতে এক যুবা ॥
অতি ধীরে ধীরে　　　ল'য়ে যুবতীরে
　　আসে যুবা তীর পানে ।
কভু আগে আসে,　　　কভু যায় ভেসে,
　　প্রখরা নদীর টানে ॥
তীরস্থ সকলে　　　ভাবে কুতূহলে,
　　নির্ব্বাক পুতুল প্রায় ।
বাঁচাতে ইহারে,　　　যদি যুবা মরে,
　　ঘটিবে নূতন দায় ॥
বুঝি এল, এল,　　　ওই বুঝি গেল,
　　উঠিল নানান্ রব
ভাসে মৃত-প্রায়　　　সোপানের গায়
　　ঘাটে ধেয়ে গেল সব ॥
সকলে মিলিয়া　　　তীরেতে তুলিয়া
　　সেবিতেছে দুই জনে ।
যুবতী বাঁচিল,　　　সকলে কহিল,—
　　'মরে বুঝি যুবা প্রাণে ॥'
ফেলে দীর্ঘ শ্বাস,　　　করে হা হুতাশ
　　চিনিয়া সে বীর-যুবা ।

অন্ত কেহ নয়, 'হারাণ' নিশ্চয়-
তা'দের গ্রামের শোভা ॥
অন্তে দিতে প্রাণ, দিল বলিদান,
অমূল্য পরাণ তার।
'ধন্ত', 'ধন্ত' করে, অমরী অমরে,
এমন জীবন যার ॥
তার গ্রামবাসী, চল দেখে আসি,
কি ক'রেছে তার তরে।
রচিয়াছে গাথা তার কীর্ত্তি কথা
গায় সদা প্রেম ভরে ॥
বর্ষে বর্ষে আসে, নরনারী মিশে
ঢালে তথা ফুল জল।
'হারাণ' যথায় নিশ্চিন্তে ঘুমায়,
ভাবি পুণ্য-ভূমি তল ॥

নূতন পুস্তকের প্রাপ্তি স্বীকার ও মন্তব্য।

১০৮ উপনিষদ। ইহার মধ্যে ঈশ, কেন ও কঠ প্রকাশিত হইয়াছে অবশিষ্ট যন্ত্রস্থ। প্রকাশক—লোটাস্ লাইব্রেরী ২৮।২নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, অনুবাদক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক ভাগবত চতুষ্পাঠী, ভবানীপুর। মূল্য গ্রাহকের পক্ষে ।১৫ করমা, সাধারণের পক্ষে / ফরমা। গ্রাহক হইতে হইলে ১৲ টাকা জমা রাখিতে হয়।

প্রকাশিত উপনিষদ তিনখানিতে মূল উপনিষৎ, অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা, মূলের বঙ্গানুবাদ শঙ্করভাষ্য এবং তাহার বঙ্গানুবাদ আছে। ভাষ্যের জটিল অংশ বুঝাইবার জন্ত কোথাও আনন্দগিরি কৃত টীকা, কোথাও অপরের টীকা এবং কোথায় বা পণ্ডিত মহাশয় কৃত বিশদ টিপ্পনী প্রদত্ত হইয়াছে। উপনিষদের অনুবাদ যে ভাবে করা হইয়াছে তাহাকে আক্ষরিক অনুবাদ বলাও চলে, এবং যাঁহার সংস্কৃত ভাষায় অতি সামান্ত জ্ঞান আছে তিনিও ইহার

যারা অতি সহজে উপনিষদের ভাষা ও ভাব উভয়ই বুঝিতে পারিবেন। শঙ্কর-ভাষ্যের অনুবাদকে আক্ষরিক অনুবাদ বলা চলে না তবে ইহার দ্বারা ভাষ্যের অভিপ্রায় অতি সুন্দর ভাবে বুঝিতে পারা যায়। উপনিষদের এরূপ বিশুদ্ধ সংস্করণ এপর্য্যন্ত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। প্রকাশক মহাশয় এই ভাবে উপনিষদ প্রকাশিত করিয়া সাধারণের বিশেষ উপকার করিতেছেন সন্দেহ নাই, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই গ্রন্থের সাফল্য কামনা করি।

এই পুস্তকের উন্নতিকল্পে আমাদের দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা হয় কারণ ইহা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। আমাদের মনে হয় যে, যে উপনিষদ্ গুলির শঙ্কর ভাষ্য আছে তাহার আনন্দগিরি কৃত টীকাও সম্পূর্ণ দেওয়া যদি সম্ভব হয় তবে আরো ভাল হয়, কারণ আনন্দ গিরির টীকা ব্যতীত শঙ্কর ভাষ্যের গূঢ় অভিপ্রায় বুঝা সহজ নয়, এবং তাহা হইলে কেবল এই টীকাটির জন্য অনুসন্ধিৎসু পাঠকের আর পুনা প্রভৃতির দেবনাগরী সংস্করণের আবশ্যকতা থাকিবে না। দ্বিতীয়, শঙ্কর ভাষ্যের অনুবাদটিকে আক্ষরিক অনুবাদ করিয়া আবশ্যক স্থলে একটী তাৎপর্য্য দিলে ভাষ্যের ভাব ও লিখনভঙ্গি প্রভৃতি উত্তম রূপে বুঝিতে পারা যায়।

গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ ভাল, মূল্য ও সুলভ।

"A dying Race"—How dying?—অর্থাৎ ধ্বংসোন্মুখ জাতি কেন?—ইহা একখানি ইংরাজি পুস্তক, প্রণেতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সরকার, এম, এ, ১২১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। কিছুকাল পূর্ব্বে কর্ণেল উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "ধ্বংসোন্মুখ জাতি" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করেন, কিশোরী বাবু বর্ত্তমান পুস্তকে ঐ পুস্তকের একটী দীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছেন। উপেন্দ্র বাবুর "ধ্বংসোন্মুখ জাতি" ও ইংরাজিতে লিখিত।

উভয় পক্ষই আদমসুমারির উপর নির্ভর করিয়া যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু কিশোরী বাবু দেখাইয়াছেন যে কর্ণেল সাহেব যথাযথভাবে আদমসুমারির বিশ্লেষণ করেন নাই। আদমসুমারি হইতে কর্ণেল সাহেব দেখাইতেছেন যে হিন্দুজাতি সংখ্যায় ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, এবং তাঁহার মত এই যে সামাজিক কুরীতিই এই ক্ষয় প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট হেতু। কিশোরী বাবু দেখাইয়াছেন যে এই জাতিক্ষয়ের কারণ জন্মসংখ্যার হ্রাস নহে, মৃত্যুসংখ্যার আধিক্য, অথচ সামাজিক কুরীতির ফলে জন্মসংখ্যার হ্রাসই সম্ভাবিত হয়। আমাদের দেশে মৃত্যুসংখ্যার আধিক্য দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্যহানির অবশ্যম্ভাবি ফল। উত্তর প্রত্যুত্তরে সমাজনীতির কথা অনেক উঠিয়াছে। আমাদের দেশে পাশ্চাত্য আদর্শের মোহে যে অল্পদর্শিতা সংক্রামিত হইয়াছিল, তাহাদ্বারা কর্ণেল সাহেবের যুক্তি অধিকাংশ স্থলেই দুষ্ট, কিশোরী বাবুর জবাবে একথা প্রমাণিত। "ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ" আমাদের আশা এই যে কর্ণেল সাহেব সম্প্রতি যেরূপ নিস্বার্থভাবে পরহিতব্রতে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহাতে ভগবৎকৃপায় সংস্কারের প্রকৃত পন্থ

খুঁজিয়া পাইবেন, এবং হিন্দুজাতির ধর্ম্ম ও সমাজের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া, উহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির উপায়ও হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

The Hindu system of Religions Science and Art —কিশোরীলাল সরকার মহাশয়ের আর একখানি ইংরাজী পুস্তক। ইহার শিরোনামার অনুবাদ—"হিন্দুদিগের অধ্যাত্মতত্ত্ব ও সাধনা" আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব যে কত অধিক, তাহা আজ কালকার দিনে অনেকেই বিশ্বাস করেন না; মনে করেন যে সমস্ত তত্ত্বগুলির রীতিমত সাধনা না করিয়াও বা সমস্ত তত্ত্বগুলির সাধক কর্ত্তৃক সাক্ষাৎ ভাবে উপদিষ্ট না হইয়াও, পুস্তকচর্চ্চা ও মস্তিষ্কচালনা দ্বারা উহাদের সম্যক পরিচয় দিবার যোগ্যতা লাভ করা যায়, আমাদের এ বিশ্বাস নাই। তবে কিশোরী বাবুর রচনা কেবল কিশোরী বাবুর দৃষ্টিসম্মত বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। অর্থাৎ শাস্ত্রাদির আলোচনার ফলে কিশোরী বাবু যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাই আমাদের সমক্ষে স্থাপনা করিতেছেন, এইরূপ বিশ্বাসেই পুস্তকের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। নতুবা কেমন করিয়া স্বীকার করিয়া লইব যে রজোতাবপ্রসূত সকাম উপাসনার দ্বারা যে অশান্তি বর্দ্ধিত হয়, সেই অশান্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই মোক্ষসাধক অহংতত্ত্বকে নির্ব্বাণ মুক্তিতে বিলীন করিতে চাহেন, কিন্তু যাহারা সাত্ত্বিক ভক্তির সাধক তাহারা ভগবৎসাযুজ্যের অনন্ত পথে, শুদ্ধতা ও আনন্দে ক্রমোন্নতি লাভ করিতে করিতে অগ্রসর হন। এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত পুস্তক খানি হইতে দেখান যায়, যেখানে প্রকৃত সমন্বয়ের তত্ত্বদৃষ্টি অপেক্ষা ব্যক্তিগত রুচির প্রভাবই বলবত্তর। সেই জন্য আমাদের বিশ্বাস এই যে যিনি সাধনা-দ্বারা নিজজীবনে অল্পাধিক পরিমাণে আমাদের সনাতনধর্ম্মান্তর্গত সকল সম্প্রদায়ের মূলতত্ত্ব গুলির আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন ও তদধিষ্ঠিত অদ্বৈত-করণ সমন্বয়ভূমিতে পৌঁছিয়াছেন, তিনিই সনাতন ধর্ম্মের পরিচয়প্রদানে অধিকারী, নতুবা একদেশদর্শিতার দোষ থাকিবেই।

স্বামীজির জন্মোৎসব।

শ্রীমদাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব-সংবাদ নানা স্থান হইতে আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে; ফাল্গুন মাসের "উদ্বোধনে" স্থানাভাববশতঃ সে সমস্ত সংবাদ লিপিবদ্ধ হয় নাই। বর্ত্তমান সংখ্যায় সংক্ষেপে উহাদের উল্লেখ করা যাইতেছে।—

বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ

বেলুড় মঠে ১২ই জানুয়ারী, ২৯শে পৌষ রবিবার যথারীতি মহা-সমারোহে স্বামীজির জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা সমাগত ভদ্রলোকের সংখ্যা অধিক হইয়াছিল। "দরিদ্র নারায়ণদিগের

তৃপ্তি সহকারে ভোজন, সুগায়কদিগের সঙ্গীতালাপ, স্বামীজিসম্বন্ধে বক্তৃতা, বেদাদি পাঠ ভদ্রমহোদয়দিগকে অন্নপ্রসাদ বিতরণ, আতসবাজি, স্বামীজির প্রতিকৃতিস্থাপনা প্রভৃতি উৎসবের সকল অঙ্গই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল।

৺কাশী রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম।

৺কাশীর মঠেও এবার স্বামীজির জন্মোৎসবে খুব সমারোহ হইয়াছিল। উৎসবগৃহের সাজসজ্জা হইতে আরম্ভ করিয়া বক্তৃতা পর্য্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠানই সকলের আনন্দপ্রদ হইয়াছিল। উৎসবদিনে (১৪ই জানুয়ারী) বেলা দুইটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত সহস্রাধিক দরিদ্রনারায়ণের সেবা হইবার পর প্রায় ছয় সাত শত লোক সভায়, একাধিক পত্রিকার ভূত-পূর্ব্ব সম্পাদক প্রথিতনামা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছিল। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও সকলকে সঙ্গীত দ্বারা বিমোহিত করেন।

বাঙ্গালোর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ।

বাঙ্গালোরের মঠে ১৪ই জানুয়ারী স্বামীজির জন্মোৎসব সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতঃকালে সহরের নানাস্থান হইতে সংকীর্ত্তনদল ভজন গাহিতে গাহিতে আশ্রমে সমাবিষ্ট হয়। ক্ষুদ্র শকটিকায় শ্রীরাম-কৃষ্ণ ও স্বামীজির প্রতিকৃতি স্থাপিত করিয়া নানাস্থানে মিছিল সহকারে প্রদক্ষিণ করান হইয়াছিল। অপরাহ্নে সামিয়ানার নিম্নে বৃহৎ সভার অধিবেশন হয়, মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান বাহাদুর চেট্টি মহোদয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। শ্রীযুত কে, এচ, রামিয়া, শ্রীযুত এম, এ, তিরু-মলাচার, শ্রীযুত এস, ভরদারজিয়েঙ্গার প্রভৃতি স্বামীজির জীবনী ও কার্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহোদয়ের হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতায় স্বামীজির প্রতি অগাধ ভক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল।

বরিশাল রামকৃষ্ণ মিশন।

বিগত ২১শে মাঘ রবিবার, বরিশাল রামকৃষ্ণ-মিশনগৃহে স্বামীজির জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। সংকীর্ত্তন, উপনিষদ ব্যাখ্যা, স্বামীজির বক্তৃতাপাঠ, প্রবন্ধ পাঠ, কাঙ্গালীবিদায়, বক্তৃতা প্রভৃতি উৎসবের নানা অনুষ্ঠানে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইয়াছিল। কাঙ্গালীদিগকে সংখ্যা প্রায় ২৫০।৩০০) প্রত্যেকে একসের চাউল, অন্ধ আতুর হইলে তদতি-রিক্ত কিছু কিছু পয়সা দেওয়া হইয়াছিল।

ঢাকা এবং অন্যান্য স্থানের ভক্তগণও স্বামীজির জন্মোৎসব যথা-সম্ভব সমারোহে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। ঢাকায় ২৮শে পৌষ তিথি পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ২৯শে পৌষ, ১৪ই জানুয়ারী রবিবার সর্ব্বসাধারণের জন্য উৎসব হয়। উৎসবে তণ্ডুল বিতরণ, প্রসাদ বিতরণ, জীবনীপাঠ ও কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

সংবাদ।

সম্প্রতি ফরিদপুর কোটালীপাড়া হইতে আমরা একটী নূতন সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাইয়াছি। সর্ব্বসাধারণ যাহাতে এই সেবাশ্রমে সাহায্যদান করেন, তদুদ্দেশে কোটালিপাড়া হাই-স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রাইচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিস্তৃত বিবরণী হইতে এখানে আবশ্যকীয় অংশ উদ্ধৃত করা হইল:—

"যে মহাপুরুষ এই দুঃখময় মর্ত্ত্যধামে নবযুগ আনয়ন করিয়াছেন, সেই লোকপাল ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া এই কোটালীপাড়ার লোক সেবার জন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। কতিপয় নব্যযুবক ইহার প্রবর্ত্তক এবং পরিচালক, সৎকার্য্যই তাহাদের চরিত্রের পরিচায়ক। সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে আর কি বক্তব্য জানিনা। ভগবান্ তাঁহার সেই সেবকবৃন্দের সাধুকার্য্য মঙ্গলময় ও জয়যুক্ত করুন।"

"সেবাশ্রমের কার্য্য—৪০টি নিরাশ্রয় লোক এই আশ্রম হইতে দৈনিক অর্দ্ধসের হিসাবে অন্নের সাহায্য পাইতেছেন। একান্ত নিরুপায় কতিপয় ব্যক্তির বাসস্থানের জন্য কয়েকখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বস্ত্রের সংস্থান, রোগীদের ঔষধ পথ্যের এবং সেবা শুশ্রূষাদির বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। তিন জন সহৃদয় যুবক সেবাশ্রমের জন্য একটি খালের পারে প্রায় দুই তিন বিঘা জমি নিষ্কর স্বত্বে ছাড়িয়া দিয়াছেন। অর্থাভাবে সেবাশ্রমে রোগীদের জন্য উপযুক্ত গৃহাদি নির্ম্মাণ করা যাইতেছে না। গত বৎসর ২৫টি রোগীর সেবা করা হয়। তন্মধ্যে ৮টি মাত্র মারা গিয়াছে। ৭ মুষ্টি ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল এবং বস্ত্র বিতরণ বাদে নগদ প্রাপ্ত ২৫৬৸৶০ আনা, নগদ ব্যয়, ২৩৪৸৵১০ আনা—তহবিল ২১৸৶১০ আনা। যে সমস্ত সহৃদয় চিকিৎসক নিঃস্বার্থভাবে দরিদ্রগণকে ঔষধদান এবং চিকিৎসা করিতেছেন ও যাহারা যাহা কিছু দান করিতেছেন সেবাশ্রম তাহাদের নিকট চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। এই সেবার কার্য্যে যে মহাত্মা যাহা কিছু দান করিবেন তাহা সেবাশ্রমের প্রেসিডেণ্ট বা সেক্রেটারীর নামে পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম, কোটালীপাড়া, পোঃ বালীয়াভাঙ্গা, জিলা ফরিদপুর। শ্রীমনোহর দাস গুপ্ত, প্রেসিডেণ্ট; শ্রীজটাধর চক্রবর্ত্তী, সেক্রেটারী।

———

বিগত ২১ শে জানুয়ারি রবিবার কলিকাতার বিবেকানন্দ সোসাইটী বেলুড় মঠে তাঁহাদের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে স্বামীজির জন্মোৎসব সম্পন্ন করেন। প্রথিতনামা শ্রীঅমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "বঙ্গসাহিত্য ও স্বামী বিবেকানন্দ" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। অপর তিনটী বক্তার বক্তৃতাও হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল।

———

REGISTERED [illegible]

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"

সূচী।

কলিকাতা।

উদ্বোধন আফিস—১২, ১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন, বাগবাজার।
মাসিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য, সডাক ২্ দুই টাকা।
[illegible] ।০ আনা।

৮ম বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা Reserved. বৈশাখ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

সাধকভাবের প্রথম বিকাশ।

(স্বামী সারদানন্দ)

ভাববিশেষের গভীর উপলব্ধি সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলি ভিন্ন আরও অনেক কথা ঠাকুরের বাল্যজীবনে শুনিতে পাওয়া যায়। ছোট খাট অনেক বিষয়ে তাঁহার মনের ঐরূপ স্বভাবের পরিচয় আমরা অনেক সময় পাইয়া থাকি। যেমন—গ্রামের কুম্ভকার শিব দুর্গাদি দেবদেবীর প্রতিমা গড়িতেছে, বয়স্যবর্গের সহিত যথা ইচ্ছা বেড়াইতে বেড়াইতে ঠাকুর তথায় আগমন করিয়া মূর্ত্তিগুলি দেখিতে দেখিতে সহসা বলিলেন—'এ কি হইয়াছে? দেব-চক্ষু কি এইরূপ হয়?—এই ভাবে আঁকিতে হয়'—বলিয়া যে ভাবে টান দিয়া অঙ্কিত করিলে চক্ষে অমানব শক্তি, করুণা, অন্তর্মুখীনতা ও আনন্দের একত্র সমাবেশ উপস্থিত হইয়া মূর্ত্তিগুলীকে জীবন্ত দেবভাব সম্পন্ন করিয়া তুলিবে তাহাকে তদ্বিষয় বুঝাইয়া দিলেন! অথবা কুম্ভকার তাঁহার কথামত করিতে পারিতেছে না দেখিয়া ঠাকুর হয়ত স্বহস্তে তুলিকা ধারণ করিয়া ঐরূপ করিয়া দিলেন! বালক গদাধর কখন শিক্ষালাভ না করিয়া কেমন করিয়া ঐ কথা বুঝিতে ও বুঝাইতে সক্ষম হইল, সকলে অবাক হইয়া তাহা ভাবিতে থাকিলেও ঐ বিষয়ের কারণ খুঁজিয়া পাইল না! যেমন—ক্রীড়াচ্ছলে বয়স্যদিগের সহিত কোন দেব বিশেষের পূজা করিবার সঙ্কল্প করিয়া ঠাকুর স্বহস্তে ঐ মূর্ত্তি এমন সুন্দর ভাবে গড়িলেন, বা আঁকিলেন যে লোকে দেখিয়া উহা দক্ষ কুম্ভকার বা পটুয়ার কার্য্য বলিয়া স্থির করিল! যেমন—অযাচিত অতর্কিত ভাবে কোন ব্যক্তিকে এমন কোন কথা বলিলেন যাহাতে তাহার মনোগত বহুকালের সন্দেহ বিশেষ মিটিয়া গেল বা সে তাহার ভাবী জীবন নিয়মিত করিবার বিশেষ সন্ধান ও শক্তি লাভ করিয়া স্তম্ভিত হৃদয়ে ভাবিতে লাগিল, বালক গদাইকে আশ্রয় করিয়া তাহার আরাধ্য দেবতা কি তাহাকে করুণায় ঐরূপে পথ দেখাইলেন!

যেমন—শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা যে প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিতেছেন না, বালক গদাই তাহা এক কথায় মিটাইয়া দিলেন ও সকলকে চমৎকৃত করিলেন। * ইত্যাদি—

তবে এ কথা বলিতে হয় যে, ঠাকুরের বাল্যজীবন সম্বন্ধে যে সকল অদ্ভুত ঘটনা আমরা শুনিয়াছি তাহার সকলগুলিই যে তাঁহার অনন্যসাধারণ উচ্চ ভাবভূমিতে আরোহণ করিয়া দিব্যশক্তি প্রকাশের পরিচায়ক তাহা নহে। উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি ঐরূপ হইলেও অপর সকল গুলিকে আমরা সাধারণতঃ ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। উহাদিগের কতকগুলি তাঁহার অদ্ভুত স্মৃতির, কতকগুলি প্রবল বিচারবুদ্ধির, কতকগুলি বিশেষ নিষ্ঠা বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার, কতকগুলি অকুতো সাহসের, কতকগুলি রঙ্গরস-প্রিয়তার, এবং কতকগুলি অপার প্রেম বা করুণার পরিচায়ক। আর ঐ সকল শ্রেণীর সকল ঘটনাবলীর ভিতরেই তাঁহার মনের অসাধারণ বিশ্বাস, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতা ওতঃপ্রোতঃ ভাবে জড়িত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। দেখা যায়,—বিশ্বাস, পবিত্রতা ও স্বার্থহীনতাই যেন তাঁহার মনের স্বাভাবিক ধাতু, অথবা ঐ উপাদানেই যেন তাঁহার মন নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং সংসারের নানা ঘাত প্রতিঘাত মনের ঐ উপাদানকে আশ্রয় করিয়া অবস্থা বিশেষে স্মৃতি, বুদ্ধি, প্রতিজ্ঞা, সাহস, রঙ্গরস, প্রেম বা করুণার তরঙ্গসমূহের সময়ে সময়ে উদয় করিতেছে।

কয়েকটি দৃষ্টান্তের এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক আমাদিগের কথা সম্যকরূপে ধারণা করিতে পারিবেন। দেখ—

পল্লীতে রাম বা কৃষ্ণযাত্রা হইয়াছে, অন্যান্য লোকের সহিত বালক গদাই ও তাহা শুনিয়াছে ; ঐ সকল পবিত্র পুরাণ কথা ও গানের বিষয় ভুলিয়া পরদিন যে যাহার স্বার্থচেষ্টায় লাগিয়াছে, বালক গদাইয়ের মনে কিন্তু ঐ যাত্রা ও গান যে ভাবতরঙ্গ তুলিয়াছে তাহার আর বিরাম নাই ; বালক ঐ সকল কথা ও গানের পুনরাবৃত্তি করিয়া আনন্দোপভোগের জন্য বয়স্যবর্গকে সমীপস্থ আম্রকাননে একত্রিত করিয়াছেন এবং উহাদের প্রত্যেককে পালার ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের ভূমীকা যথাসম্ভব অভ্যস্ত করাইয়া ও আপনি প্রধান চরিত্রের ভূমীকা গ্রহণ করিয়া উহার পুনরাভিনয় আরম্ভ করিয়াছেন। সরল কৃষাণ পার্শ্বের ভূমীতে চাষ দিতে দিতে বালকদিগের ঐ অভিনয় দর্শনে

* গুরুভাব পূর্ব্বার্দ্ধ—৪র্থ অধ্যায়, ১২৩ পৃষ্ঠা দেখ।

মুগ্ধ হৃদয়ে ভাবিতেছে একবার মাত্র শুনিয়াই পালাটির প্রায় সমগ্র কথা ও গানগুলি বালকেরা এরূপে আয়ত্ত করিল কিরূপে!

উপনয়নকালে বালক,আত্মীয় স্বজন এবং সমাজের প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে ধরিয়া বসিল কামার জাতীয়া ধনী নাম্নী কামিনিকে ভিক্ষামাতা স্বরূপে বরণ করিবে!* অথবা, ধনীর স্নেহ ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া এবং তাহার হৃদয়ের অভিলাষ জানিতে পারিয়া বালক সামাজিক শাসন উপেক্ষা করিয়া ঐ নীচ জাতীয়া রমণীর স্বহস্ত পক্ক ব্যঞ্জনাদি কাড়িয়া খাইল!—ধনীর ভীতি-প্রসূত সাগ্রহ নিষেধ বালককে ঐ কার্য্য হইতে বিরত করিতে পারিল না!

বিভূতি মণ্ডিত জটাধারী নাগা ফকীর দেখিলে সহর বা পল্লীগ্রামের সকল বালকের হৃদয়ে সর্ব্বদা ভয়ের সঞ্চারই হইয়া থাকে। ঐরূপ ফকীরেরা অল্প বয়স্ক বালকদিগকে নানারূপে ভুলাইয়া অথবা অবস্থা বিশেষে বলপ্রয়োগ করিয়া দূরদেশে লইয়া যাইয়া দলপুষ্টি করে এরূপ কিম্বদন্তি বঙ্গের সর্ব্বত্রই প্রচলিত। কামারপুকুরের দক্ষিণ প্রান্তে ৺পুরীধামে যাইবার যে পথ আছে সেই পথ দিয়া তখন তখন নিত্য ঐরূপ সাধু ফকীর বৈরাগী বাবাজীর দল যাওয়া আসা করিত এবং গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা আহার্য্য সংগ্রহ এবং দুই এক দিন বিশ্রাম করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইত। কিম্বদন্তিতে ভীত হইয়া বয়স্যগণ দূরে পলাইলেও বালক গদাই ভীত হইবার পাত্র নহে। ঐরূপ ফকীর দেখিলেই তাহাদের সহিত মিশিয়া মধুরালাপ ও সেবায় তাহাদের প্রসন্ন করিয়া তাহাদের আচার ব্যবহার তন্ন তন্ন ভাবে লক্ষ্য করিবার জন্য অনেক কাল তাহাদের সঙ্গে কাটাইত। কোন কোন দিন তাহাদের সপ্রেমাহ্বানে তাহাদের দেবোদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্ন খাইয়াও বালক বাটীতে ফিরিয়া মাতার নিকট ঐ বিষয়ে গল্প করিত। তাহাদের প্রতি অনুরাগ বশতঃ তাহাদের ন্যায় বেশধারণের জন্য ব্যস্ত হইয়া বালক একদিন সর্ব্বাঙ্গ তিলকাঙ্কিত করিয়া পিতা মাতা প্রদত্ত নূতন বসনখানি ছিঁড়িয়া কৌপীন ও বহির্ব্বাসরূপে ধারণ করিয়া বাটীতে জননীর নিকট আগমন করিয়াছিল।

গ্রামের নীচ জাতিদের ভিতর অনেকে কৃত্তিবাসী রামায়ণাদিও পাঠ করিতে জানিত না। ঐ সকল গ্রন্থ শুনিবার ইচ্ছা হইলে তাহারা পড়িয়া বুঝাইয়া দিতে পারে এমন কোন স্বশ্রেণীর লোক বা ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিত

* গুরুভাব পূর্ব্বার্দ্ধ ৪র্থ অধ্যায় ১০০ পৃষ্ঠা দেখ।

এবং ঐ ব্যক্তি আগমন করিলে ভক্তি পূর্ব্বক পদ ধৌত করিবার জল, নূতন হুঁকায় তামাকু এবং উপবেশন করিয়া পাঠ করিবার জন্য উত্তম আসন বা তদভাবে নূতন একখানি মাতুর প্রদান করিত। ঐ সামান্য লোকমান্য টুকু পাইয়াই সে ব্যক্তি ঐকালে অহঙ্কার অভিমানে স্ফীত হইয়া শ্রোতাদিগের নিকটে কিরূপ উচ্চাসন গ্রহণ করিত এবং কত প্রকার বিসদৃশ অঙ্গভঙ্গী ও স্বরে গ্রন্থপাঠ করিতে করিতে তাহাদিগকে আপন প্রাধান্য জ্ঞাপন করিত, তীক্ষ্ণ বিচার সম্পন্ন রঙ্গরসপ্রিয় বালক ঐ স্থানে উপস্থিত থাকিয়া তাহা এই বয়সেই লক্ষ্য করিত এবং সময়ে সময়ে গম্ভীরভাবে অপরের নিকট উহার অভিনয় করিয়া হাস্য কৌতুকের রোল ছুটাইয়া দিত।

ঠাকুরের বাল্যজীবনের ঐ সকল কথার আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারি তিনি কিরূপ মন লইয়া সাধনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। বুঝিতে পারি যে, এ মন, যাহা ধরিবে তাহা করিবেই করিবে, যাহা শুনিবে তাহা কখনও ভুলিবে না এবং অভীষ্ট লাভের পথে যাহা অন্তরায় বলিয়া বুঝিবে সবলহস্তে তাহা তৎক্ষণাৎ দূরে নিক্ষেপ করিবে। বুঝিতে পারি যে, এ হৃদয়, ঈশ্বরের উপর, আপনার উপর এবং মানব সাধারণের অন্তর্নিহিত দেবপ্রকৃতির উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সংসারের সকল কার্য্যে অগ্রসর হইবে, নীচ অপবিত্র ভাবসমূহ তো দূরের কথা, সঙ্কীর্ণতার স্বল্পমাত্র গন্ধও যে সকল ভাবে অনুভূত হইবে কখনই তাহাকে উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না, এবং পবিত্র প্রেম ও করুণাই কেবল উহাকে সর্ব্বকাল সব বিষয়ে নিয়মিত করিবে। আর সঙ্গে সঙ্গে একথাও হৃদয়ঙ্গম হয় যে, এহৃদয় ও মনকে আপনার বা অন্যের, অন্তরের বা বাহিরের, কোন ভাবই আপন আকার লুক্কায়িত রাখিয়া ছদ্মবেশে প্রতারিত করিতে পারিবে না। ঠাকুরের হৃদয় মনের ঐরূপ গঠনের কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিয়া অগ্রসর হইলে তবেই আমরা তাঁহার সাধক জীবনের গভীরতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব।

সাধক ভাবের প্রথম বিকাশ ঠাকুরের জীবনে আমরা দেখিতে পাই কলিকাতায়, তাঁহার ভ্রাতার চতুষ্পাঠিতে—যেদিন বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগী হইবার জন্য অগ্রজ রামকুমারের তিরস্কার ও অনুযোগের উত্তরে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন—"ও চাল কলা বাঁধা বিদ্যা আমি শিখিতে চাহি না। আমি এমন বিদ্যা শিখিতে চাহি যাহাতে বাস্তবিক জ্ঞানের উদয় হইয়া মানুষ কৃত কৃতার্থ হয়!" ঠাকুরের বয়স তখন চৌদ্দ বা পনর বৎসর হইবে।

গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁহার শিক্ষা বিশেষ অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া অভিভাবকেরা পরামর্শ স্থির করিয়া ইহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া রাখিয়াছেন। ঝামাপুকুরে দিগম্বর মিত্রের বাটীর সমীপে স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠ অগ্রজ তখন টোল খুলিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেছিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত মিত্র পরিবার ভিন্ন পল্লীর অপর কয়েকটি বর্দ্ধিষ্ণু ঘরে নিত্য দেবসেবার ভারও গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিজ নিত্যক্রিয়া সমাপন এবং ছাত্রগণকে পাঠ দান করিতেই তাঁহার প্রায় সমস্ত সময় অতিবাহিত হইত, সুতরাং অপরের গৃহে দুই সন্ধ্যা নিত্য গমন করিয়া দেবসেবা যথারীতি সম্পন্ন করা তাঁহার পক্ষে বিষম ভার হইয়া উঠিতেছিল। অথচ সহসা উহা ত্যাগ করিতেও পারিতেছিলেন না। কারণ, বিদায় আদায়ে টোলের যাহা উপসত্ব হইত তাহা অল্প, এবং দিন দিন হ্রাস ভিন্ন উহার বৃদ্ধি হইতেছিল না; এরূপ অবস্থায় দেবসেবার পারিশ্রমিক স্বরূপে যাহা পাইয়া থাকেন তাহা ত্যাগ করিলে সংসার চলিবে কিরূপে? অতএব নানা তোলাপাড়ার পর কনিষ্ঠকে আনাইয়া তাহার উপর দেবসেবার ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং অধ্যাপনাতেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। গদাধরও নিজ মনোমত কর্ম্ম পাইয়া সানন্দে উহা সম্পন্ন করিতেছিলেন, এবং অগ্রজের সেবা এবং তাঁহার অনুরোধে সময়মত কিছু কিছু পাঠাভ্যাসও করিয়া আসিতেছিলেন। অশেষগুণসম্পন্ন প্রিয়দর্শন বালক এখানেও অল্পকালেই যজমান পরিবারবর্গ সকলের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, কামারপুকুরের ন্যায় এখানেও ঐ সকল সম্ভ্রান্ত পরিবারের রমণীগণ তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা, সরল ব্যবহার, মিষ্টালাপ এবং দেবভক্তি দর্শনে তাঁহার নিকট নিঃসঙ্কোচে আগমন করিতেছিলেন এবং তাঁহার নিকট মনের কথা খুলিয়া বলিয়া পরামর্শ লইতেও তাঁহার মধুর কণ্ঠের ভজন শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা ছোট খাট 'ফাই-ফরমাস' করাইয়া লইতেছিলেন। এইরূপে কামারপুকুরের ন্যায় এখানেও বালকের একটি আপনার দল বিনা চেষ্টায় অল্পকালেই গঠিত হইয়াছিল এবং বালকও অবসর পাইলেই এই সকল স্ত্রীপুরুষদিগের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দে দিন কাটাইতেছিলেন। সুতরাং এখানে আসিয়াও বালকের বিদ্যাশিক্ষার যে বড় একটা সুবিধা হইতেছিল না, ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি।

রামকুমার ভ্রাতার সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বিষয় লক্ষ্য করিয়াও সহসা কিছু

বলিতে পারিতেছিলেন না। কারণ, একে তো মাতার প্রিয় কনিষ্ঠকে তাঁহার স্নেহ সুখে বঞ্চিত করিয়া নিজের সুবিধার জন্যই এক প্রকার, দূরে আনিয়াছেন তাহার উপর ভ্রাতার গুণে আকৃষ্ট হইয়া লোকে তাহাকে অন্বেষণ করিয়া সাদরে বাটীতে আহ্বান ও নিমন্ত্রণাদি করিতেছে, বালকও তাহাতে আনন্দিত, এ অবস্থায় বালকের আনন্দে বিঘ্নোৎপাদন করা কি যুক্তিযুক্ত?—এবং করিলেও বালকের কলিকাতা বাস কি বনবাস তুল্য অসহ্য হইয়া উঠিবে না? সংসারে অভাব না থাকিলে বালককে মাতার নিকট হইতে দূরে আনিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কামারপুকুরের নিকটবর্ত্তী গ্রামান্তরের কোন মহোপাধ্যায়ের নিকটে পড়িতে পাঠাইলেই চলিত। বালক তাহাতে মাতার নিকটে থাকিয়াই বিদ্যাভ্যাস করিতে পারিত। এইরূপ চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া রামকুমার কয়েক মাস কোন কথা না বলিলেও পরিশেষে কর্ত্তব্য জ্ঞানের প্রেরণাতেই একদিন বালককে পাঠে মনোযোগী হইবার জন্য মৃদু তিরস্কার করিয়াছিলেন। কারণ, সরল সর্ব্বদা আত্মহারা বালককে পরে তো সংসারে প্রবিষ্ট হইতে হইবে? এখন হইতে যদি সে আপনার সাংসারিক অবস্থা যাহাতে উন্নতি হয় এমন পথে আপনাকে নিয়মিত করিয়া না চলিতে শিখে তবে ভবিষ্যতে কি আর ঐরূপ করিতে পারিবে? অতএব ভ্রাতৃ বাৎসল্য এবং সংসারের অভিজ্ঞতাই যে রামকুমারকে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল একথা স্পষ্ট।

কিন্তু স্নেহপরবশ রামকুমার সংসারের স্বার্থপর কঠোর প্রথায় ঠেকিয়া শিখিয়া কতকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিলেও নিজ কনিষ্ঠের অদ্ভুত মানসিক গঠন সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন না। বালক যে এই অল্প বয়সেই সংসারী মানবের সর্ব্ববিধ চেষ্টার এবং আজীবন পরিশ্রমের কারণ ধরিতে পারিয়াছে, এবং দুই দিনের প্রতিষ্ঠা ও ভোগ সুখ লাভকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া মানব জীবনের অন্য উদ্দেশ্য নির্দ্ধারিত করিয়াছে, একথা তিনি স্বপ্নেও হৃদয়ে আনয়ন করিতে পারেন নাই। সুতরাং তিরস্কারে বিচলিত না হইয়া সরল বালক যখন তাঁহাকে প্রাণের কথা পূর্ব্বোক্তরূপে খুলিয়া বলিল তখনও রামকুমার বালকের কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, পিতামাতার বহু আদরের বালক, জীবনে এই প্রথম তিরস্কৃত হইয়া অভিমান বা বিরক্তিতে ঐরূপ উত্তর প্রদান করিতেছে। সত্যনিষ্ঠ বালক তাঁহাকে আপন অন্তরের কথা বুঝাইতে সেদিন অনেক চেষ্টা পাইল

অর্থকরী বিদ্যা শিখিতে মনোযোগী হইতে সে যে কিছুতেই পারিতেছে না একথা নানাভাবে প্রকাশ করিল কিন্তু বালকের সে কথা শুনে কে? বালক তো বালক, বয়োবৃদ্ধ কাহাকেও যদি কোনদিন আমরা স্বার্থচেষ্টায় পরাঙ্মুখ দেখি তবে গম্ভীরভাবে সিদ্ধান্ত করিয়া বসি—তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে!

বালকের ঐ সকল কথা তো রামকুমার সেদিন বুঝিলেনই না, অধিকন্তু ভালবাসার পাত্রকে তিরস্কার করিয়া পরক্ষণেই আমরা যেমন অনুতপ্ত হই এবং তাহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে আদর যত্ন করিয়া স্বয়ং শান্তি লাভ করিতে চেষ্টা করি, কনিষ্ঠের প্রতি তাঁহার প্রাতিকার্য্যে ব্যবহার যে এখন কতকাংশে ঐরূপ হইয়াছিল একথা আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। বালক গদাধর কিন্তু নিজ মনোগত অভিপ্রায় সফল করিবার জন্য এখন হইতে যে অবসর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এ বিষয়ের পরিচয় আমরা তাঁহার পর পর কার্য্য দেখিয়া বিশেষরূপেই পাইয়া থাকি।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরের বৎসরে ঠাকুর এবং তাঁহার অগ্রজের জীবনে পরিবর্ত্তনের প্রবাহ কিছু প্রবলভাবে চলিয়াছিল। অগ্রজের আর্থিক অবস্থা দিন দিন অবসন্ন হইতেছিল এবং উপায় উদ্ভাবন করিয়া নানাভাবে চেষ্টা করিলেও তিনি কিছুতেই ঐ বিষয়ের উন্নতি সাধন করিতে পারিতেছিলেন না। টোল বন্ধ করিয়া অপর কোন কার্য্য স্বীকার করিবেন কি না তদ্বিষয়ে নানা তোলাপাড়াও তাঁহার মনোমধ্যে চলিতেছিল। কিন্তু কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। তবে একথা মনে মনে বেশ বুঝিতেছিলেন যে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের অন্য উপায় শীঘ্র গ্রহণ না করিয়া এরূপে দিন কাটাইলে পরিশেষে ঋণগ্রস্ত হইয়া নানা অনর্থের সম্ভাবনা। কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিবেন? যজন, যাজন ও অধ্যাপন ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যই তো শিখেন নাই, এবং চেষ্টা করিয়া এখন যে, সময়োপযোগী কোন অর্থকরী বিদ্যা শিখিবেন সে উদ্যম উৎসাহই বা প্রাণে কোথায়? আবার ঐ শিক্ষা লাভ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের পথে অগ্রসর হইলে নিজ নিত্যক্রিয়া পূজাদি সম্পন্ন করিবার অবসর লাভ যে কঠিন হইবে, ইহাও বুঝিতে পারিলেন। সুতরাং "যাহা করেন ৺রঘুবীর" বলিয়া ঐরূপ চিন্তা হইতে মনকে ফিরাইয়া যাহা এতকাল করিতেছিলেন তাহাই ভগ্ন-হৃদয়ে করিয়া যাইতে লাগিলেন। কারণ, ঈশ্বর বিশ্বাসী, সামান্যে সন্তুষ্ট সাধুপ্রকৃতি রামকুমার বৈষয়িক ব্যাপারে বিশেষ উদ্যমী পুরুষ ছিলেন বলিয়া

আমাদের মনে হয় না। সে যাহা হউক এই অনিশ্চয়তার মধ্যে একটি ঘটনা ঈশ্বরেচ্ছায় রামকুমারকে পথ দেখাইয়া শীঘ্রই নিশ্চিন্ত করিয়াছিল।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ।)

স্বামীজি আজ দুইদিন যাবৎ বাগবাজারে ৺বলরাম বসুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। শিষ্যের সুতরাং বিশেষ সুবিধা, প্রত্যহ তথায় যাতায়াত করে। অদ্য সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে স্বামীজি ঐ বাড়ীর ছাদে বেড়াইতেছেন। শিষ্য ও অন্য চার পাঁচজন লোক সঙ্গে আছে। বড় গরম পড়িয়াছে। স্বামীজির খোলা গা। ধীরে ধীরে দক্ষিণে হাওয়া দিতেছে। বেড়াইতে বেড়াইতে স্বামীজি গুরু গোবিন্দের কথা পাড়িয়া তাঁহার ত্যাগ তপস্যা, তিতিক্ষা ও প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে শিখজাতির কিরূপে পুনরভ্যুত্থান হইয়াছিল, কিরূপে তিনি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত পূর্ব্ব ব্যক্তিগণকে পর্য্যন্ত দীক্ষা দান করিয়া পুনরায় হিন্দুকরতঃ শিখজাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, এবং কিরূপেইবা তিনি নর্ম্মদা তীরে মানবলীলা সম্বরণ করেন ওজস্বী ভাষায় তাহারই কিছু কিছু বর্ণনা করিতে লাগিলেন। গুরু গোবিন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণকারীর মধ্যে তখন যে কি মহাশক্তি সঞ্চারিত হইত তাহার উল্লেখ করিয়া স্বামিজী শিখজাতির মধ্যে প্রচলিত একটি দোঁহার আবৃত্তি করিয়া বলিলেন—

"সওয়া লাখ পর এক চড়াউঁ।
যব গুরু গোবিন্দ নাম শুনাউঁ।"

অর্থাৎ—গুরু গোবিন্দের নিকট নাম (দীক্ষা) শুনিয়া এক একজন ব্যক্তিতে সওয়া লক্ষ সংখ্যক ব্যক্তি অপেক্ষাও অধিক তাঁহার শক্তিতে জীবন যথার্থ ধর্ম্মপ্রাণতা উপস্থিত হইয়া গুরু গোবিন্দের প্রত্যেক শিষ্যের অন্তর এমন অদ্ভুত বীরত্বে পূর্ণিত হইত যে সে তখন সওয়া লক্ষ বিধর্ম্মীকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইত। ধর্ম্মমহিমা সূচক ঐ কথাগুলি শক্তি সঞ্চারিত হইত। বলিতে বলিতে স্বামিজীর উৎসাহ। বিস্ফারিতনয়নে যেন তেজ ফুটিয়া

বাহির হইতে লাগিল। শ্রোতৃবৃন্দ স্তব্ধ হইয়া স্বামিজীর মুখপানে চাহিয়া—উহাই দেখিতে লাগিল! কি অদ্ভুত উৎসাহ ও শক্তিই স্বামিজীর ভিতরে ছিল। যখন যে বিষয়ের কথা পাড়িতেন তখন তাহাতে তিনি এমন কি তন্ময় হইয়া যাইতেন। মনে হইত, ঐ বিষয়কেই তিনি বুঝি জগতের অন্য সকল বিষয়াপেক্ষা বড় এবং তল্লাভই মনুষ্য জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, বলিয়া বিবেচনা করেন! কিছুক্ষণ পরে শিষ্য বলিল, "মহাশয় ইহা কিন্তু বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার যে, গুরু গোবিন্দ হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া একই উদ্দেশ্যে চালিত করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঐরূপ দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।

স্বামিজী :—Interest common না হলে (এক প্রকারের স্বার্থ চেষ্টা ভিতরে অনুভব না করিলে) লোক কখনো একতাসূত্রে আবদ্ধ হয় না। সভা সমিতি লেক্‌চার করে সর্ব্বসাধারণকে কখনো unite (এক) করা যায় না—যদি তাদের interest (স্বার্থ) না এক হয়। গুরু গোবিন্দ বুঝিয়ে দিয়ে ছিলেন যে তদানীন্তন কালের কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই ঘোর অত্যাচার অবিচারের রাজ্যে বাস করিতেছে। গুরুগোবিন্দ common Interest create (এক প্রকারের স্বার্থ চেষ্টার স্থল) করে নাই, কেবল উহা ইতর সাধারণকে বুঝিয়ে দিয়ে ছিল মাত্র। তাই হিন্দু মুসলমান সবাই তাকে follow (অনুসরণ) করেছিল। তিনি মহাশক্তি সাধক ছিলেন। ভারতের ইতিহাসে তাঁহার ন্যায় দৃষ্টান্ত বিরল।

অনন্তর রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া স্বামিজী সকলকে সঙ্গে লইয়া দোতলার বৈঠকখানায় নাবিয়া আসিলেন। তিনি এখানে উপবেশন করিলে সকলেই তাঁহাকে আবার ঘিরিয়া বসিল। এই সময়ে myracle সিদ্ধাই সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা উঠিল।

স্বামিজী বলিলেন, সিদ্ধাই বা বিভূতি শক্তি অতি সামান্য মনঃসংযমনেই লাভ করা যায়। শিষ্যকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিলেন তুই thought reading (অপরের মনের কথা ঠিক্ ঠিক্ পাঠ করতে) শিখবি? চার পাঁচ দিনেই তোকে ঐ বিদ্যাটা শিখাইয়া দিতে পারি।

শিষ্য :—তাতে কি উপকার হবে?

স্বামীজি :—কেন? পরের মনের ভাব জান্‌তে পার্‌বি।

শিষ্য :—তাতে ব্রহ্মবিদ্যা লাভে কিছু সহায়তা হবে কি?

স্বামীজি :—কিছুমাত্র নয়।

শিষ্য :—তবে আমার ঐ বিদ্যা শিখিবার প্রয়োজন নাই। ঐরূপ কথা বার্ত্তার পর শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল—মহাশয় আপনি সিদ্ধাই সম্বন্ধে যাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বা দেখিয়াছেন তাহার বিষয় কিছু বলুন।

স্বামীজি :—আমি একবার হিমালয়ে ভ্রমণ কত্তে কত্তে কোন পাহাড়ী গ্রামে এক রাত্রের জন্য বাস করেছিলুম। সন্ধ্যার খানিক বাদে ঐ গাঁয়ে মাদলের খুব বাজনা শুনতে পেয়ে বাড়ীওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলুম গ্রামের কোন লোকের উপর দেবতার ভর হইয়াছে। বাড়ীওয়ালার আগ্রহাতিশয়ে এবং নিজের curiosity কৌতূহল চরিতার্থ কত্তে ব্যাপারখানা দেখতে যাওয়া গেল। গিয়ে দেখি বহুলোকের সমাবেশ। লম্বা, ঝাঁকড়া চুলো একটা পাহাড়ীকে দেখাইয়া বলিল ইহারই উপর দেবতার ভর হইয়াছে। দেখলুম, তাহার নিকটেই একখানি কুঠার আগুনে পোড়াইতে দেওয়া হইয়াছে। খানিক বাদে দেখি, ঐ অগ্নিবর্ণ কুঠারখানা ঐ দেবতাবিষ্ট লোকটার দেহের স্থানে স্থানে লাগাইয়া ছ্যাঁকা দেওয়া হইতেছে চুলেও লাগান হইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ কুঠার স্পর্শে তাহার কোন অঙ্গ বা চুল দগ্ধ হইতেছে না বা তাহার মুখে কোন কষ্টের চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে না। দেখে অবাক্ হয়ে গেলুম। ইতিমধ্যে গাঁয়ের মোড়ল করযোড়ে আমার কাছে এসে বল্লে "মহারাজ—আপনি দয়া করে এর ভূতাবেশ ছাড়াইয়া দিন্।" আমি তো ভেবে অস্থির। কি করি—সকলের অনুরোধে ঐ উপদেবতাবিষ্ট লোকটার কাছে যেতে হ'লো। গিয়েই কিন্তু অগ্রে কুঠারখানা পরীক্ষা কত্তে ইচ্ছা হলো। যাই হাত দিয়ে ধরা হাত পুড়ে গেল। তখন কুঠারটা তবু কালো হয়ে গেছে। হাতের জ্বালায় তো অস্থির। থিওরী মিওরী তখন সব লোপ পেয়ে গেলো। কি করি জ্বালায় অস্থির হয়েও ঐ লোকটার মাথায় হাত দিয়ে খানিকটা জপ কল্লুম। আশ্চর্য্যের বিষয় ঐরূপ করার দশ বার মিনিটের মধ্যেই লোকটা সুস্থ হয়ে গেলো। তখন গাঁয়ের লোকের আমার উপর ভক্তি দেখে কে। আমায় একটা কেষ্ট বিষ্টু ঠাওরালে। আমি কিন্তু ব্যাপারখানার কিছুই বুঝতে পারলুম না। অগত্যা বিনা বাক্য ব্যয়ে আশ্রয়দাতার সঙ্গে তাহার কুটীরে ফিরে এলুম। তখন রাত ১২টা হবে। এসে শুয়ে পড়লুম। কিন্তু হাতের জ্বালায় আর এই ব্যাপারের কিছুমাত্র রহস্য ভেদ কত্তে পাল্লুম না বলে

চিন্তায় ঘুম হোলো না। অলক্ষ্য কুঠারে মানুষের শরীর দগ্ধ হলোনা দেখে কেবলই মনে হতে লাগলো, "there are more thiorys in heaven and earth, than are dreacet of in your philosophy" পৃথিবীতে ও স্বর্গে এমন অনেক ব্যাপার আছে দর্শন শাস্ত্র যার স্বপ্নেও সন্ধান পায় না।

শিষ্য :—পরে ঐ বিষয়ের কোন সুমীমাংসা করিতে পারিয়াছিলেন কি?

স্বামীজি :—না। আজ কথায় কথায় ঘটনাটী মনে পড়ে গেল। তাই তোদের বলুম।

অনন্তর স্বামীজি পুনরায় বলিতে লাগিলেন—ঠাকুর কিন্তু সিদ্ধাই সকলের বড় নিন্দা কর্ত্তেন। বলতেন, 'ঐ সব দিকে মন দিলে পরমার্থ তত্বে পৌঁছান যায় না।' কিন্তু মানুষের এমনি দুর্ব্বল মন গৃহস্থের তো কথাই নাই সাধুদের মধ্যেও চৌদ্দ আনা লোক সিদ্ধাইয়ের উপাসক হয়ে পড়ে।

পাশ্চাত্য দেশে ঐ প্রকার বুজরুগি দেখলে লোকে অবাক্ হয়ে যায়। সিদ্ধাই লাভটা যে একটা খারাপ জিনিস, ধর্ম্মপথের অন্তরায়, একথা ঠাকুর কৃপা করে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন তাই বুঝতে পেরেছি। সেজন্য দেখিসনি? ঠাকুরের সন্তানেরা কেহই ঐদিকে খেয়াল রাখে না।

স্বামী যোগানন্দ এই সময়ে স্বামীজিকে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে মান্দ্রাজে যে একটা ভূতুড়েটার দেখা হয়েছিল সেই কথাটা "বাঙ্গাল"কে বল না।"

শিষ্য ঐ বিষয় ইতিপূর্ব্বে শুনে নাই। সুতরাং ঐ কথা বলিবার জন্য স্বামীজিকে জেদ্ করিয়া ধরিয়া বসিল। স্বামীজি অগত্যা ঐ কথা তাহাকে এইরূপে বলিলেন—

মান্দ্রাজে যখন মন্মথ বাবুর* বাড়ীতে ছিলুম তখন একদিন স্বপ্ন দেখলুম মা (স্বামীজির গর্ভধারিণী) মরে গেছেন। মনটা ভারী খারাপ হযে গেলো। তখন মঠেও বড় একটা চিঠি পত্র লিখতুম্ না—তা বাড়ীতে লেখা ত দূরের কথা। মন্মথকে স্বপ্নের কথা বলায় তিনি তখনি ঐ বিষয়ের সংবাদের জন্য কলিকাতায় তার করিলেন। কারণ, স্বপ্নটা দেখে মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। আবার এদিকে মান্দ্রাজের বন্ধুগণ তখন আমার এমেরিকা যাবার জন্য যোগাড় করে তাড়া লাগাচ্ছিল। কিন্তু মার শারীরিক কুশল সংবাদটা না পেয়ে যেতেও ইচ্ছা হচ্ছিল না। আমার ভাব বুঝে মন্মথ বল্লেন যে সহরের কিছু দূরে একজন পিশাচ সিদ্ধ লোক বাস

* ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺ মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য।

করে—সে জীবের শুভাশুভ ভূত ভবিষ্যৎ সকল খবর ব'লে দিতে পারে। মন্মথর অনুরোধে ও নিজের মানসিক উদ্বেগ দূর কত্তে তাহার নিকট যেতে রাজী হলুম। মন্মথ বাবু, আমি, আলাসিংগ্না ও আর একজন খানিকট রেলে করে গিয়ে পরে পায়ে হেঁটে সেখানে তো গেলুম। গিয়ে দেখি একটা শ্মশানের পাশে বিকটাকার শুঁটকো ভূষকালো লোক ব'সে আছে। তাহার অনুচরগণ "কিড়িং মিড়িং" করে মাদ্রাজি ভাষায় বুঝিয়ে দিল উনিই পিশাচ সিদ্ধ পুরুষ। প্রথমটা আমাদের সেতো আমলেই আন্‌লে না। তারপর যখন আমরা ফেরবার উদ্যোগ করছি তখন আমাদের দাঁড়াবার জন্য অনুরোধ করলে। সঙ্গে আলাসিংগ্না সেই দোভাষার কাজ করছিল। তারপর একটা পেন্‌সিল দিয়ে লোকটা খানিকক্ষণ ধরে কি আঁক পাড়তে লাগলো। পরে দেখলুম লোকটা concentration (মন একাগ্র) করে যেন একেবারে স্থির হয়ে পড়লো। তারপর আগে আমার নাম গোত্র চৌদ্দ পুরুষের খবর বল্লে; আর বল্লে যে, ঠাকুর আমার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত ফিরছেন। মার মঙ্গল সমাচারও বল্লে। আর ধর্ম্ম প্রচার কত্তে আমাকে যে বহুদূরে অতি শীঘ্র যেতে হবে তাও ব'লে দিলে। এইরূপে মার মঙ্গল সংবাদ পেয়ে ভট্টাচার্য্যের (মন্মথনাথ) সঙ্গে সহরে ফিরে এলুম। এসে কলিকাতার তারেও মার মঙ্গল সংবাদ পেলুম।

যোগানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজি বলিলেন—বেটা কিন্তু যা যা ব'লেছিল ঠিক তাই তাই হয়েও গেলো। তা "কাকতালীয়ের" ন্যায়ই হোক বা যাই হোক্‌!

স্বামী যোগানন্দ উত্তরে বলিলেন, "তুমি পূর্ব্বে এ সব কিছু বিশ্বাস কত্তে না, তাই তোমারও সব দেখবার প্রয়োজন হয়েছিলো।"

স্বামীজি :—তা বলে আমি কি আর তোদের মত না দেখে না শুনে যা তা কতকগুলি বিশ্বাস করবো এমন ছেলেই নই। মহামায়ার রাজ্যে এসে জগৎ ভেল্‌কীর সঙ্গে সঙ্গে কত কি ভেল্‌কীই না দেখলুম! মায়া—মায়া!!! রাম রাম আজ কি ছাই ভস্ম কথাই সব হলো। ভূত ভাব্‌তে ভাব্‌তে লোকে ভূত হয়ে যায়। আর, যে দিন রাত্ জান্‌তে অজান্তে ব'লে আমি নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তাত্মা সেই ব্রহ্মজ্ঞ হয়!

এই বলিয়া স্বামিজী স্নেহভরে শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"ঐ সব ছাই ভস্ম কথা গুলোকে মনে কিছুমাত্র স্থান দিবিনি। কেবল সদসৎ বিচার

করবি—আত্মাকে প্রত্যক্ষ করতে প্রাণপণে যত্ন করবি। আত্মজ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। আর সবই মায়া—ভেল্‌কী বাজি। এক প্রত্যগাত্মাই অবিতথ সত্য। এ কথাটা বুঝেছি; সেজন্যই তোদের বুঝাবার চেষ্টা করছি। "এক মেয়াদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহনানাস্তি কিঞ্চন।"

কথা হইতে হইতে রাত্রি ১১টা বাজিয়া গেল। অনন্তর স্বামিজী আহারান্তে বিশ্রাম করিতে উঠিলেন। শিষ্য স্বামিজীর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিল। স্বামিজী বলিলেন—"কাল আস্‌বি তো?"

শিষ্য :—আজ্ঞে আসিব বৈ কি? আপনাকে দিনান্তে না দেখিলে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া ছট্‌ ফট্‌ করিতে থাকে।

স্বামিজী :—তবে এখন আয়। রাত্রি হয়েছে। অনন্তর শিষ্য স্বামিজীর মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে রাত্রি ১২টার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিল।

প্রশ্নোত্তর।

(মঠের দৈনন্দিন লিপি হইতে সংগৃহিত)

(স্বামীজি যখন প্রথম বার আমেরিকা হইতে ফিরিয়া কিছুদিন মতিলাল শীলের কাশীপুরের বাগানে অবস্থান করেন, তখন একদিন জনৈক জিজ্ঞাসু ব্যক্তির সহিত তাঁহার নিম্নলিখিত কথা বার্ত্তা হয়)

প্র। গুরু কাকে বলিতে পারা যায়?

উ। যিনি তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন, তিনিই তোমার গুরু। দেখনা আমার গুরু আমার ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিয়েছিলেন।

প্র। ভক্তিলাভ কিরূপে হবে?

উ। ভক্তি তোর ভিতরেই রয়েছে—কেবল তার উপর কামকাঞ্চনের আবরণ পড়ে রয়েছে। ঐ আবরণটা সরিয়ে দিলে সেই ভিতরকার ভক্তি আপনিই প্রকাশিত হয়ে পড়্‌বে।

প্র। আপনি বলে থাকেন, আপনার পায়ের উপর দাঁড়াও। এখানে 'আপনার' বলতে কি বুঝব?

উ। অবশ্য পরমাত্মার উপরই নির্ভর করতে বলা আমার উদ্দেশ্য। তবে এই "কাঁচা আমির" উপর নির্ভর করবার অভ্যাস করলেও ক্রমে উহাতে আমাদিগকে ঠিক জায়গায় লয়ে যায়, কারণ, জীবত্মা সেই পরমাত্মারই মায়িক প্রকাশ বই আর কিছু নয়।

প্র। যদি এক বস্তুই যথার্থ সত্য হয়, তবে এই দ্বৈতবোধ—যা সদা-সর্ব্বদা সকলে দেখছে, তাহা কোথা থেকে এল?

উ। বিষয় যখন অনুভব হয়, ঠিক সে সময় কখন দ্বৈতবোধ হয়না ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয় সংযোগ হবার পর যখন আমরা সেই জ্ঞানকে বুদ্ধিতে আরূঢ় করাই, তখনই দ্বৈতবোধ এসে থাকে। বিষয়ানুভূতির সময় যদি দ্বৈতবোধ থাক্‌তো, তবে জ্ঞেয় জ্ঞাতা হোতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপে এবং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় হোতে স্বতন্ত্ররূপে অবস্থান কোর্‌তে পার্‌তো।

প্র। সামঞ্জস্যভাবে চরিত্রগঠনের প্রকৃষ্ট উপায় কি?

উ। যাঁদের চরিত্র সেই ভাবে গঠিত হয়েছে, তাঁদের সঙ্গ করাই এর সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।

প্র। বেদ সম্বন্ধে আমাদের কিরূপ ধারণা রাখা কর্ত্তব্য?

উ। বেদই একমাত্র প্রমাণ—অবশ্য বেদের যে অংশগুলি যুক্তিবিরোধী সেগুলি বেদশব্দবাচ্য নহে। অন্যান্য শাস্ত্র যথা পুরাণাদি—ততটুকু গ্রাহ্য, যতটুকু বেদের অবিরোধী। বেদের পরে জগতের যে কোন স্থানে যে কোন ধর্ম্মভাবের আবির্ভাব হয়েছে, তা বেদথেকে নেওয়া বুঝতে হবে।

প্র। এই যে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারিযুগের বিষয় শাস্ত্রে পড়া যায়, ইহা কি কোনরূপ জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা সম্মত অথবা একটা কাল্পনিক বিজ্ঞান মাত্র?

উ। বেদে ত এইরূপ চতুর্যুগের কোন উল্লেখ নাই উহা পৌরানিক যুগের কল্পনামাত্র।

প্র। শব্দ ও ভাবের মধ্যে বাস্তবিক কি কোন নিত্য সম্বন্ধ আছে, না, যে কোন শব্দের দ্বারা যে কোন ভাব বোঝাতে পারা যায়? লোকে কি ইচ্ছামত যে কোন শব্দে যে কোন ভাব জুড়েদিয়েছে?

উ। এ বিষয়টিতে অনেক তর্ক উঠ্‌তে—পারে স্থির সিদ্ধান্ত করা বড় কঠিন। বোধ হয়, যেন শব্দ ও ভাবের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কিন্তু সেই সম্বন্ধ যে নিত্য, তাহাই বা কিরূপে বলা যায়? দেখনা একটা ভাব

বোঝাতে বিভিন্ন ভাষায় কতরূপ বিভিন্ন শব্দ রয়েছে। কোনরূপ সূক্ষ্ম সম্বন্ধ থাকতে পারে যা আমরা এখনও ধরতে পারছি না।

প্র। ভারতের কার্য্যপ্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত?

উ। প্রথমতঃ, সকলে যাতে কাজের লোক হয় এবং তাদের শরীরটা যাতে সবল হয়, সেইরূপ শিক্ষা দিতে হবে। এইরূপ দ্বাদশজন পুরুষসিংহে জগৎ জয় করবে—কিন্তু লক্ষ লক্ষ ভেড়ার পালের দ্বারা তা হবেনা দ্বিতীয়তঃ, যত বড়ই হোক না কেন, কোন ব্যক্তিগত আদর্শ শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়।

তার পর স্বামীজি কয়েকটী হিন্দু প্রতীকের কিরূপ অবনতি হইয়াছে, তাহা বলিতে লাগিলেন। তিনি জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের বিভিন্নতা বুঝাইলেন প্রথমোক্ত মার্গ প্রকৃতপক্ষে আর্য্যদের ছিল এবং তজ্জন্যই উহাতে অধিকারী বিচারের বিশেষ কড়াকড় ছিল। দ্বিতীয় মার্গের উৎপত্তি—দাক্ষিনাত্য হইতে অনার্য্যজাতি হইতে। সেই জন্য উহাতে অধিকারীবিচার নাই।

প্র। রামকৃষ্ণ মিসন ভারতের—পুনরুত্থানকার্য্যে কোন্ অংশ অভিনয় করবে?

উ। এই মঠ থেকে সব চরিত্রবান্ লোক বেরিয়ে সমগ্র জগৎকে আধ্যাত্মিকতার বন্যায় প্লাবিত করবে। এর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয়েও উন্নতি হতে থাকবে। এইরূপে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির অভ্যুদয় হবে শূদ্রজাতি আর থাকবেনা তারা যে সব কায এখন করছে সে সব কলের দ্বারা হবে ভারতের বর্ত্তমান অভাব--ক্ষত্রিয়শক্তি।

প্র। মানুষের জন্মান্তরে কি পশ্বাদি নীচযোনী হওয়া সম্ভব?

উ। খুব সম্ভব। পুনর্জ্জন্ম কর্ম্মের উপর নির্ভর করে। যদি লোকে পশুরমত কায করে, তবে সে পশুযোনিতে আকৃষ্ট হবে।

প্র। মানুষ আবার পশুযোনি প্রাপ্ত হবে কিরূপে, তা বুঝতে পারছিনা ক্রমবিকাশের নিয়মে সে যখন একবার মানবদেহ পেয়েছে, তখন সে আবার কিরূপে পশুযোনি প্রাপ্ত হতে পারে?

উ। কেন, পশুথেকে যদি মানুষ হতে পারে, মানুষ থেকে পশু হবে না কেন? একটা সত্তাই ত বাস্তবিক আছে—মূলেতে ত সবই এক।

আর একবার এইরূপ প্রশ্নোত্তরকালে (১৮৯৮ খৃঃ) স্বামীজি মূর্ত্তিপূজার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করেন। প্রথমতঃ বৌদ্ধ চৈত্য, পরে

স্তূপ—তাহা হইতে বুদ্ধের মন্দির নির্ম্মিত হইল। হিন্দু মন্দির সমূহের উৎপত্তি এই বৌদ্ধমন্দির হইতে।

প্র। কুণ্ডলিনী বোলে বাস্তবিক কোন পদার্থ আমাদের স্থূলদেহের মধ্যে আছে কি?

উ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বল্‌তেন যোগীরা যাকে পদ্ম বলেন, বাস্তবিক তা মানবের দেহে নাই। যোগাভ্যাসের দ্বারা ঐগুলির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

প্র। মূর্ত্তিপূজারদ্বারা কি মুক্তি লাভ হতে পারে?

উ। মূর্ত্তিপূজার দ্বারা সাক্ষাৎভাবে মুক্তি হতে পারেনা—তবে উহা মুক্তিলাভের গৌণ কারণ স্বরূপ, ঐ পথের সহায়ক। মূর্ত্তিপূজার নিন্দা করা উচিত নয়, কারণ, অনেকের পক্ষে উহা অদ্বৈত জ্ঞান উপলব্ধির জন্য মনকে প্রস্তুত করে দেয়—ঐ অদ্বৈতজ্ঞান লাভেই মানব মুক্ত হইতে পারে।

প্র। আমাদের চরিত্রের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ কি হওয়া উচিত?

উ। ত্যাগ।

প্র। আপনি বলেন, বৌদ্ধধর্ম্ম তাহার দায়স্বরূপ ভারতে ঘোর অবনতি আনয়ন করেছিল—এটী কি করে হল?

উ। বৌদ্ধেরা প্রত্যেক ভারতবাসীকে সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী কর্‌বার চেষ্টা করেছিল। সকলেত আর তা হতে পারেনা। এইরূপে যে সে সাধু হওয়াতে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীর ভিতরে ক্রমশঃ ত্যাগের ভাব কমে আস্‌তে লাগ্‌ল। আর এক কারণ ধর্ম্মের নামে তিব্বত ও অন্যান্য দেশের বর্ব্বর আচার ব্যবহারের অনুকরণ। ঐ সকল স্থানে ধর্ম্মপ্রচার কর্‌তে গিয়ে তাদের ভিতর ওদের দূষিত আচারগুলি ঢুক্‌লো। তারা শেষে ভারতে সেগুলি চালিয়ে দিলে।

প্র। মায়া কি অনাদি অনন্ত?

উ। সমষ্টি ভাবে ধর্‌লে অনাদি অনন্ত বটে, ব্যষ্টিভাবে কিন্তু সান্ত।

প্র। মায়া কি?

উ। বস্তু প্রকৃত পক্ষে একটী মাত্রই আছে তাহাকে জড় বা চৈতন্য যে নামেই অভিহিত কর না কেন। কিন্তু উহাদের মধ্যে একটী ছাড়িয়া আর একটীকে ভাবা শুধু কঠিন নহে; অসম্ভব। ইহাই মায়া বা অজ্ঞান।

প্র। মুক্তি কি?

উ। মুক্তি অর্থে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা—ভালমন্দ উভয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। লোহার শিকলও শিকল সোণার শিকলও শিকল। শ্রীরামকৃষ্ণ

দেব বল্‌তেন পায়ে একটা কাঁটা ফুটলে সেই কাঁটা তুলতে আর একটা কাঁটার প্রয়োজন হয়। কাঁটা উঠে গেলে দুটো কাঁটাই ফেলে দেওয়া হয়। এইরূপ সৎ প্রবৃত্তির দ্বারা অসৎ প্রবৃত্তি গুলিকে দমন কর্‌তে হবে—তারপর কিন্তু সৎপ্রবৃত্তি গুলিকে পর্য্যন্ত জয় করতে হবে।

প্র। ভগবৎকৃপা ব্যতীত কি মুক্তিলাভ হতে পারে?

উ। মুক্তির সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ নাই। মুক্তি আমাদের ভিতরে পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান।

প্র। আমাদের মধ্যে যাহাকে আমি বলা যায়, তাহা দেহাদি থেকে উৎপন্ন নয়, তার প্রমাণ কি?

উ। 'আমি' আর উহার বিপরীত 'যা আমি নই বা অনাত্মা' দেহ অনাদি থেকেই উৎপন্ন। প্রকৃত 'আমি'র অস্তিত্বেই প্রমাণ কেবল প্রত্যক্ষ উপলব্ধি।

প্র। প্রকৃত জ্ঞানী এবং প্রকৃত ভক্তই বা কাকে বলা যায়?

উ। প্রকৃত জ্ঞানী তিনিই যাঁর হৃদয়ে অগাধ প্রেম বিদ্যমান আর যিনি সর্ব্বাবস্থাতে অদ্বৈততত্ত্ব সাক্ষাৎকার করেন। আর তিনিই প্রকৃত ভক্ত, যিনি জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত অভেদভাবে উপলব্ধি করে অন্তরে প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন হয়েছেন এবং সকলকেই যিনি ভাল বাসেন, সকলের জন্য যার প্রাণ কাঁদে। জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে যিনি একটীর পক্ষপাতী হয়ে অপরটীর নিন্দা করেন, তিনি জ্ঞানীও নন, ভক্তও নন, তিনি জুয়োচোর।

প্র। ঈশ্বরের সেবা কর্‌বার কি দরকার?

উ। যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব একবার স্বীকার কর, তবে তাঁকে সেবা করায় যথেষ্ট কারণ পাবে। সকল শাস্ত্রের মতে ভগবৎসেবা অর্থে স্মরণ যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হও, তবে তোমার জীবনের প্রতিপদক্ষেপ তাকে স্মরণ কর্‌বার হেতু উপস্থিত হবে।

প্র। মায়া বাদ কি অদ্বৈতবাদ থেকে কিছু আলাদা?

উ। না—একই। মায়াবাদ ব্যতীত অদ্বৈতবাদের কোন ব্যাখ্যাই সম্ভবপর নহে।

প্র। ঈশ্বর অনন্ত—তিনি মানুষরূপ ধরে এতটুকু হতে পারেন কি করে?

উ। সত্য বটে, ঈশ্বর অনন্ত, কিন্তু তোমরা যে ভাবে অনন্ত মনে কোর্‌ছো, অনন্ত মানে তা নয়।

তোমরা অনন্ত বল্‌তে একটা খুব প্রকাণ্ড জড়সত্তা মনে কোরে গুলিয়ে ফেল্‌ছো। ভগবান্ মানুষরূপ ধরতে পারেন না বল্‌তে তোমরা বুঝ্‌ছো, একটা খুব প্রকাণ্ড জড়ধর্ম্ম পদার্থকে এতটুকু কর্‌তে পারা যায় না। কিন্তু ঈশ্বর ও হিসাবে অনন্ত নন—তাঁর অনন্তত্ব চৈতন্যের অনন্তত্ব। সুতরাং উহা মানবাকারে আপনাকে অভিব্যক্ত করণে উহার স্বরূপের কোন হানি হয় না।

প্র। কেহ কেহ বলেন, আগে সিদ্ধ হও, তারপর তোমার কার্য্যে অধিকার হবে, আবার কেহ কেহ বলেন, গোড়া থেকেই কর্ম্ম করা উচিত; এই দুইটী বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য সাধন কিরূপে হতে পারে?

উ। তোমরা দুটী বিভিন্ন জিনিষে গোল করে ফেল্‌ছো কর্ম্ম অর্থে দুটী জিনিষ বুঝাতে পারি—মানবজাতির সেবাও ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য। প্রকৃত প্রচারে অবশ্য সিদ্ধ পুরুষ ব্যতীত আর কারও অধিকার নেই। কিন্তু সেবাতে সকলেরই অধিকার আছে; শুধু তা নয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা অপরের সেবা নিচ্চি ততক্ষণ আমরা অপরকে সেবা করিতে বাধ্য।

নর্ম্মদা তীরে শঙ্কর।

১

নর্ম্মদা মাতার স্তব করিতে করিতে শঙ্করের হৃদয়ে প্রগাঢ়-ভক্তি ভাব উচ্ছলিত হইতে লাগিল। তাঁহার মধুর স্তোত্র মানব কর্ণে প্রবেশ করিল না বটে, কিন্তু স্বয়ং নর্ম্মদা মাতা তাহাতে মোহিত হইলেন। তাঁহার তরঙ্গ কল্লোলে যদি সে মধুর স্তবের মাধুর্য্য নষ্ট হয়, এই জন্যই যেন তিনি নিজ উচ্ছ্বাস সংযত করিলেন। মুখরিত বিহগকুল শঙ্করের সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া লজ্জা পাইয়াই যেন নীরব হইল। পবনদেব যেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিজ অঙ্গ সঞ্চালনেও বিস্মৃত হইলেন। তাই ফলভার নত কুসুম সুশোভিত, বনপাদপরাজি আজি নিস্পন্দ ভাবে শঙ্কর সম্মুখে আনত।

বালক শঙ্করের স্তোত্র সম্পূর্ণ হইল। তিনি করযোড়ে নর্ম্মদা মাতাকে প্রণিপাত করিয়া জলমধ্যে অবতরণ করিলেন। নর্ম্মদা দেবীও তখন সানন্দে প্রিয়তম শঙ্করের কোমল অঙ্গে যেন স্বীয় স্নিগ্ধকর সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন।

নর্ম্মদা সস্নেহ স্পর্শে শঙ্করের শ্রান্ত দেহ সুশীতল হইল। তিনি তীরে উঠিলেন। পরিধানে একবস্ত্র সুতরাং সিক্ত বস্ত্র তাঁহার দেহেই শুষ্ক হইতে লাগিল। তিনি কিন্তু সেই দিকে দৃষ্টি না দিয়া তীরে উঠিয়া গোবিন্দ যোগীর গুহা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে শঙ্কর পথিপার্শ্বস্থ এক গ্রামে প্রবেশ করিলেন। পথে যাহাকেই দেখেন গোবিন্দ পাদের গুহার কথা তিনি জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু গ্রামবাসীরা তাহা বলিতে সমর্থ হইল না। অনেকে তাঁহার কথা বুঝিতে পারিল না, কারণ তিনি তাঁহার স্বদেশীয় মলয়ালম্‌ ভাষায় কথা কহিতেছিলেন। কখন বা তিনি সংস্কৃত ভাষায় জিজ্ঞাসা করেন কিন্তু তাহারা তাহাতেও অনভিজ্ঞ। আবার কেহ বা বুঝিয়াও শঙ্করকে বালক দেখিয়া তাঁহার কথার উত্তর দিল না, কেবল চাহিয়া দেখিল মাত্র। কেহ কেহ তাঁহার কমনীয় মূর্ত্তি দেখিয়া পথ চলিতে চলিতে দু একবার ফিরিয়া ফিরিয়া তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিল।

এইরূপে কিছুদূর গমন করিলে তিনি এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ পাইলেন। বৃদ্ধ দেখিয়া শঙ্কর ভাবিলেন, ইনি বয়সে প্রাচীন হয় ত ইনি গোবিন্দযোগীর সংবাদ জানিতে পারেন। এই ভাবিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া সংস্কৃত ভাষায় কহিলেন "মহাশয়! বলিতে পারেন নর্ম্মদা তীরে মহাযোগী গোবিন্দপাদের গুহা কোথায়?

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শঙ্করের প্রশ্নে একটু বিস্মিত হইয়া কিছুক্ষণ তাঁহার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। পরে কিছু কৌতূহলী হইয়া কহিলেন "হাঁা বাপু আমি জানি। কিন্তু তুমি কে? কোথা হইতে আসিতেছ? গোবিন্দযোগীর গুহাতে তোমার প্রয়োজন কি?"

ব্রাহ্মণের প্রশ্নে শঙ্কর বিনীত ভাবে বলিলেন "মহাশয়! আমার প্রয়োজন আছে। আপনি কৃপা করিয়া গুহাটী কোথায় বলিয়া দিন।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "দেখ বাপু আমরা এক গোবিন্দযোগীর কথা জানি। তিনি বহুদিন হইতে ওঙ্কারনাথের নিকট এক গুহায় সমাধিস্থ অবস্থায় আছেন। তুমি কি তাঁহারই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ?"

উত্তরে শঙ্কর বলিলেন "হাঁ মহাশয়। আমি তাঁহারই কথা বলিতেছি। ওঙ্কারনাথের গুহা কতদূর?"

ব্রাহ্মণ তখন আর একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "এঁ্যা তুমি তাঁহারই কথা বলিতেছ! তিনিত বহুকাল সমাধিস্থ ও শুনিয়াছি সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান বিহীন। তুমি তাঁহার নিকট যাইয়া কি করিবে? আর সে পথ ও অতি দুর্গম, তুমি কি তথায় যাইতে পারিবে?"

শঙ্কর বলিলেন "শুনিয়াছি তিনি মহাযোগী তাই একবার তাঁহাকে দর্শন করিব।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "তুমি দেখছি নিতান্ত বালক, অগ্রে বিদ্যা উপার্জ্জন কর, পরে যোগ সাধন করিও। যোগ সাধন বড় কঠিন। যদি তোমার লেখাপড়া করিবার ইচ্ছা হয়, আমাদের এখানে থাক তোমার সে সুবিধা হইবে।" ব্রাহ্মণ যতই শঙ্করের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন কমনীয় কান্তি ও বেশ ভূষা দেখিয়া ততই তাঁহার প্রতি যেন বাৎসল্য স্নেহের সঞ্চার হইতে লাগিল। তিনি পুনরায় বলিলেন "বাপু! তুমি এই বয়সে এত কঠোর আচার করিতেছ কেন? তুমি কি জন্য গৃহত্যাগ করিয়াছ? তোমার কি কেহ নাই? তোমার কথাবার্ত্তায় বুঝিতেছি তুমি মূর্খ নও, কিছু শাস্ত্র পাঠ ও করিয়াছ, তুমি কি জান না কলিতে "সন্ন্যাস নাই?" শঙ্কর পুনরপি সবিনয়ে বলিলেন মহাশয়। গোবিন্দপাদের দর্শনই "আমার একমাত্র অভীষ্ট। আপনি অনুগ্রহ করিয়া কোন দিকে যাইব বলিয়া দিন।"

ব্রাহ্মণ বুঝিলেন এ বালক বয়সে বালক হইলেও নিতান্ত নির্ব্বোধ নহে, কদাচ মনোভাব প্রকাশ করিবে না। তিনি তখন বলিলেন "দেখ সে স্থান এখান হইতে প্রায় চারি পাঁচ দিনের পথ—প্রাচীন কালে উক্ত স্থান মান্ধাতা-রাজের রাজধানী ছিল। তথায় নদীগর্ভে তিনটী উচ্চ শৃঙ্গ বিশিষ্ট পর্ব্বতময় একটী দ্বীপ আছে। সেই দ্বীপে ওঙ্কারনাথ এবং মহাকাল নামে দুইটী শিবমন্দির আছে। মহাকালের মন্দির নিম্নে একটী গুহা মধ্যে গোবিন্দ-যোগী বাস করেন। নর্ম্মদা সেখানে অতি গভীর। দূর হইতে নর্ম্মদা পার হইয়া পরপার দিয়া কিছু পথ গমন করিয়া পুনরায় নর্ম্মদা অতিক্রম করিলে সেই দ্বীপ মধ্যে যাওয়া যায়। কিন্তু গোবিন্দযোগীর দর্শন লাভ বাপু সহজ নয়।"

ইহা শুনিয়া শঙ্কর ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া গমনোদ্যত হইলেন। ব্রাহ্মণ

কিন্তু শঙ্করের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহাকে গমনোদ্যত দেখিয়া শঙ্করকে নিজ গৃহে ভিক্ষা গ্রহণের জন্ম অনুরোধ করিলেন। শঙ্কর কিন্তু তাহাতে বিলম্ব হইবে ভাবিয়া তাহা অস্বীকার করিলেন। ব্রাহ্মণ তখন শঙ্করকে কিঞ্চিৎ ফলমূল গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অগত্যা শঙ্করও তাহাই লইয়া পূর্ব্বাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

কিয়দ্দূর যাইয়া শঙ্কর নর্ম্মদার অতুলনীয় শোভা দেখিয়া আকৃষ্ট হইলেন। তিনি দেখিলেন নর্ম্মদা তীরে কোথাও সুদৃশ্য অট্টালিকা শ্রেণী, দুর্ভেদ্য দুর্গ-প্রাকার, দেব মন্দিরাদি সুশোভিত জনপূর্ণ নগরী, কোথায় বা বিস্তীর্ণ শস্য-ক্ষেত্র, ফলপুষ্পে ভূষিত বৃক্ষরাজীপূর্ণ উদ্যান এবং সারি সারি পর্ণ কুটীর-বহুল পল্লীচিত্র। এই সকল তীরস্থিত মনোরম দৃশ্যের শোভা শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়া নৃত্যশীলা নর্ম্মদা দেবী সানন্দে স্ফীতবক্ষে প্রবাহিতা। তিনি কোথাও সরলগতি কোথা বা বক্রগতি, আবার কোথাও বা পথিককে পরিহাস ছলে পথভ্রান্ত করিবার জন্য সহসা পর্ব্বত মধ্যে আত্মগোপন করিতেছেন। নর্ম্মদা যেন নিত্য নূতন, ও বিচিত্রতার উপমা স্থল। কোথাও বা মধ্যে মধ্যে নর্ম্মদা সলিলে প্রবাহিত পত্র পুষ্পাদি দেখিয়া শঙ্কর ভাবিলেন যেন জননী জাহ্নবী দেবী জগৎ পিতা শঙ্করের অর্চ্চনা করিয়া দেবতার নির্ম্মাল্য সন্তান-গণকে বিতরণের জন্য সাগ্রহে চলিয়াছেন। আবার কোথায় বা নিবিড় অরণ্যানী এবং কঠিন প্রস্তরময় ভীষণ উন্নত শৈল শ্রেণী বিদীর্ণ করিয়া গভীর গর্জ্জনে প্রবাহিতা হইয়া নর্ম্মদাদেবী যেন সাধককে সাধনার দুরন্ত বাধা অতিক্রম করিতে সংকেত করিতেছেন। কোথাও বা অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাখণ্ডে প্লাবিত করিয়া নর্ম্মদাদেবী ধীরে ধীরে চলিয়াছেন, যেন তিনি ভক্তিমতী গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় নির্জ্জনে বাণ লিঙ্গ শঙ্করের শিরে শীতল ধারা ঢালিয়া তাঁহার পূজা করিতেছেন। আবার কোথায় বা নর্ম্মদাদেবী নাতি বৃহৎ শিলাসমূহের পাদদেশ বিধৌত করিয়া ক্ষীণ রেখায় শৈলতলে লুকায়িত হইতেছেন; দেখিলে মনে হয়—কোনও পতিব্রতা পত্নী পথশ্রান্ত পতি দেবতার পদপ্রান্ত শীতল জলে বিধৌত করিতেছেন। কোন স্থানে নর্ম্মদা জল প্রপাতরূপে পরিণত এবং কোথাও বা প্রপাততলে সুবৃহৎ গভীর গহ্বর। আবার কোথাও বা এই গহ্বর মধ্যে নর্ম্মদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগণিত শিলাখণ্ড নিয়ত আবর্ত্তিত করিয়া তাহাদিগকে সুগোল সুঠাম করিয়া তুলিতেছেন,

এবং কত লোক এই শিলাখণ্ড সংগ্রহের জন্য কত যত্ন করিতেছে; শঙ্কর অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন ইহাই মানব সমাজে অনাদি লিঙ্গ অথবা বাণ লিঙ্গ নামে পূজিত হয়। নর্ম্মদাগর্ভে অনাদি বাণলিঙ্গের উৎপত্তি দেখিয়া ভাবিলেন, আহা! নর্ম্মদাদেবী কি এখানে আদ্যাশক্তি ভগবতীর "শঙ্কর জননী রূপ" ধারণ করিয়া বিরাজমানা। আবার স্থানে স্থানে দেখিলেন বিরাটকায় পর্ব্বতের একাংশ যেন বঙ্কিম ভাবে নর্ম্মদা জলে হেলিয়া পড়িয়াছে। পর্ব্বত গাত্রে কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী কোটর কোথাও বা নাতিবৃহৎ গুহা সমূহ। ইহাদের মধ্যে কোন কোন গুহাতে দুই এক জন সাধক বাস করিতেছেন এবং কোন কোন কোটর মধ্যে হয়ত একটী বিহগপুঙ্গব মস্তক অবনত করিয়া একদৃষ্টে মীনগতি লক্ষ্য করিতেছে। তাঁহার একাগ্রতা দেখিয়া মনে হয়, যেন সেই প্রাচীন কালের কাকভূষণ্ডীর কোন বংশধর নর্ম্মদাচরণে চিত্তসমর্পণ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে শঙ্করের হৃদয়ে গোবিন্দ যোগীর দর্শন বাসনা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল, তিনি দ্রুতবেগে পথ চলিতে লাগিলেন।

এইরূপে চারি পাঁচ দিন পথ চলিয়া শঙ্কর ক্রমে যথা স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের নির্দ্দেশ মত তিনি দ্বীপমধ্যে পৌঁছিলেন এবং অবিলম্বে ওঁকারনাথের মন্দিরে গমন করিলেন। তিনি প্রথমে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া যথারীতি দেবদর্শন ও পূজাদি করিলেন। তৎপরে মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া নিকটস্থ দেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে গোবিন্দ যোগীর গুহার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। একজন ব্রাহ্মণ শঙ্করকে গুহা দেখাইয়া দিলেন। শঙ্কর তখন কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া গুহাভিমুখে চলিলেন। তাঁহার বহুদিনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা আজ পূর্ণ হইতে চলিল সুতরাং গুহা দর্শনেই তাঁহার হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইল। ক্ষণেকের জন্য তাঁহার সর্ব্বদেহ যেন অসাড় হইল শরীরের অনুভূতি যেন বিলুপ্ত হইল তথাপি তিনি গুহার নিকট আসিলেন ও উহার প্রশস্ত দ্বারমধ্যে প্রবেশ করিলেন। শঙ্কর গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন কতিপয় ভস্মাচ্ছাদিতদেহ জটা জুটধারী সাধু গুহা মধ্যে উপবিষ্ট তাঁহাদের কেই বা ধ্যান নিমগ্ন, কেহ বা গ্রন্থ দেখিতেছেন কেহ বা অর্দ্ধশায়িত অবস্থিত পরন্তু কেহ কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন না।

শঙ্কর ইহা দেখিয়া নীরবে তথায় ক্ষণকাল দণ্ডায়মান রহিলেন। এই অবসরে তিনি গুহাটীও নিরীক্ষণ করিলেন। দেখিলেন উহা একটী চতুস্কোন প্রশস্ত নাতি উচ্চ গৃহবিশেষ কারুকার্য্য খচিত প্রস্তরময় কয়েকটী স্তম্ভোপরি গুহার ছাদদেশ সুরক্ষিত দক্ষিণদিকে একটী অতি ক্ষুদ্র দ্বার কিন্তু এই দ্বারমুখে একটী বৃহৎ শিলাখণ্ড স্থাপিত।

ইতি মধ্যে একজন সাধু শঙ্করের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন শঙ্কর তাহা দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন মহাত্মন্ এই খানেই মহাযোগী গোবিন্দপাদ সহস্রবৎসরাবধি সমাধিস্থ হইয়া অবস্থান করিতেছেন"

শঙ্করের কমনীয় কান্তি প্রসন্ন বদন, সন্ন্যাসবেশ এবং বালক বয়স দেখিয়া সাধুটী সুমিষ্ট কথায় বলিলেন হ্যাঁ। তাঁহাকে তোমার কি প্রয়োজন?

শঙ্কর বলিলেন—মহাত্মন্ শুনিয়াছি ভগবান্ পতঞ্জলিদেব মহাযোগী গোবিন্দপাদ রূপে যোগবলে সহস্রবৎসর সমাধি আশ্রয় করিয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন এজন্য তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিতে আসিয়াছি তিনি কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন।

সাধুটী তখন শঙ্করের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিলেন বৎস তুমি কে? তুমি কোথা হইতে আসিতেছ গোবিন্দ যোগী এখানেই আছেন স্থির হও দর্শন পাইবে শঙ্কর বলিলেন ভগবন্ আমি ব্রাহ্মণ তনয় সুদূর কেরল দেশ হইতে আসিতেছি।"

শঙ্করের কথা শুনিয়া সাধুটী এইবার একটু বিস্মিত হইলেন তিনি ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন বৎস! তুমি এত কষ্ট করিয়া সেই দূরদেশ হইতে আসিয়াছ কেন? গোবিন্দ যোগী ত বাহ্যজ্ঞান শূন্য ও সমাধিস্থ তিনি কাহারও সহিত কথা কহেন না। আমরা কতকাল হইতে এখানে বাস করিতেছি কিন্তু একদিনও তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইতে দেখিলাম না। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ যৌবনকালে এ স্থানে আসিয়া ক্রমে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন, কেহ বা পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু কাহারও ভাগ্য তাঁহার সঙ্গলাভ ঘটিল না। আমরা তাঁহার সমাধি মূর্ত্তি দেখিয়াই এই স্থানে জীবন অতিবাহিত করিতেছি এই বলিয়া তিনি সেই ক্ষুদ্রদ্বার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন এই গুহা মধ্যে মহাযোগী গোবিন্দ পাদ অবস্থিতি করেন দ্বারস্থিত প্রস্তরের পার্শ্বদেশ দিয়া দেখ।"

শঙ্কর সাগ্রহে সেই সমাধি মূর্ত্তি দেখিতে অগ্রসর হইলেন সাধুটী তখন নিজ আসন ত্যাগ করিয়া গুহাদ্বারে আসিলেন এবং গুহা মুখে রক্ষিত প্রস্তর খণ্ড এক পার্শ্বে সরাইয়াদিলেন।

শঙ্কর তখন যোগী বরের গুহা মুখে জানু নত করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। গুহামধ্যে একপার্শ্বে একটী মৃন্ময়দীপ প্রজ্বলিত ছিল, শঙ্কর সেই দীপালোকে সতৃষ্ণনয়নে যোগীবরের মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন।

দেখিলেন যোগীবরের দীর্ঘকায় তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট দেহখানি শিরাবহুল ও শীর্ণ যেন চর্ম্মাচ্ছাদিত কঙ্কাল বিশেষ, সুদীর্ঘ জটা জুট প্রশস্ত ললাট এবং উভয় গণ্ডদেশ আবৃত করিয়া ভূমি চুম্বন করিতেছে। নাসা-উন্নত দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ কোটর মধ্য গত নয়নদ্বয় মুদিত, শ্মশ্রুভার লম্বিত অঙ্কদেশে স্থাপিত হস্ত দ্বয়কে স্পর্শকরিতেছে কিন্তু সেই শীর্ণ দেহ হইতে যেন কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতি নির্গত হইতেছে।

বহুদিনের ইপ্সিত প্রিয়তমের দর্শন লাভে হৃদয় যেমন আনন্দ ও সুখে অভিভূত হয়; আবার আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি যদি পূজনীয় হয়েন প্রাণের পরম আরাধ্য ধন হয়েন তাহা হইলে সেই সুখ ও আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকে হৃদয় যেমন ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে প্লাবিত হয় বালক শঙ্করের ও আজ সেই অবস্থা শঙ্কর তাঁহার হৃদয়ের দেবতা গোবিন্দ যোগীকে দেখিযা কি যেন এক অপূর্ব্ব ভাবে অভিভূত হইযা পড়িলেন মধ্যে মধ্যে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পুলক সঞ্চার হইতে লাগিল নয়ন যুগলে অবিরল ধারায় অশ্রু-জল প্রবাহিত হইতে লাগিল ভক্তিভরে তাঁহার দেহ যেন বিকল হইল মস্তক যেন তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইতে চাহিল রসনা যেন মহাযোগীর স্তুতি করিবার জন্য উন্মুখ হইল। তিনি তখন যুগল করে গদগদকণ্ঠে যোগী বরের উদ্দেশ্যে মনের আবেগে বলিতে লাগিলেন।

"শরীরং সুরূপং সদা রোগমুক্তং
যশশ্চারু চিত্রং ধনং মেরু তুল্যম্।
গুরোরঙ্‌ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥ ১
কলত্রং ধনং পুত্র পৌত্রাদয়শ্চ
গৃহং বান্ধবাঃ সর্ব্বমেতদ্ধি ভূয়াৎ।
গুরোরঙ্‌ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥ ২

ষড়ঙ্গাদিবেদো মুখে শাস্ত্র বিদ্যা
কবিত্বঞ্চ লোকেষু কীর্ত্তিং বিধত্তাম্।
গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥ ৩

বিদেশেষু মান্যঃ স্বদেশেষু ধন্যঃ
সদাচার বৃত্তেষু সক্তস্তথাপি।
গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥ ৪

ক্ষমামণ্ডলেহশেষভূপালবৃন্দৈঃ
সদা সেবিতং যস্য পাদারবিন্দম্।
গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥ ৫

যশশ্চেদ্ গতং দিক্ষু দান প্রতাপা-
জ্জগদ্বস্তু সর্ব্বং করে যৎ প্রসাদাৎ।
গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥ ৬

ন ভোগে ন যোগে ন বা বাজিরাজৌ
ন কান্তামুখে নৈব বিত্তেষু চিত্তম্।
গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্ন লং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কি ততঃ কিম্॥ ৭

অনর্ঘ্যাণি রত্নানি ভুক্তানি সম্যক্
সমালিঙ্গিতা কামিনা যামিনীষু।
গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥ ৮"

সাধুগণ বালক-কণ্ঠ-নিঃসৃত সুললিত স্তোত্ররত্ন শুনিতে শুনিতে যেন মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা তখন সকলে নিজ নিজ আসন ত্যাগ করিয়া শঙ্করের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন। কেহ বা তখন বালকের মুখখানি একবার দেখিবার ইচ্ছায় মধ্যে মধ্যে শঙ্করের দিকে অবনত হইতেছিলেন।

স্তোত্র সম্পূর্ণ হইল। শঙ্কর ভূমিতে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া যোগীবরের

চরণোদ্দেশে প্রণিপাত করিলেন। সাধুগণও সেই সঙ্গে গোবিন্দ যোগীর উদ্দেশে প্রণিপাত করিলেন।

অহো কি আশ্চর্য্যঃ, কি অদ্ভুত! আজ কতদিনের পর গোবিন্দপাদের সমাধিভঙ্গ হইল! তিনি ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন শরীরে যেন জীবন-সঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। মুখ-জ্যোতি যেন উজ্জ্বলতর হইল, ক্ষীণালোকিত অন্ধকার মধ্যে যেন কে দীপ-মালা জ্বালিয়া দিল গোবিন্দযোগীর গুহা উজ্জ্বল হইল, দর্শকবৃন্দেও যেন সেই সঙ্গে হৃদয়োন্ধকার বিদূরিত হইল। তথাপি সাধুগণের মধ্যে অনেকেই এমনও সন্দিহান হইতেছিলেন, গোবিন্দযোগীর সমাধিভঙ্গ। অসম্ভব তাঁহারা যেন নিজ নিজ চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা সকলেই নিবিষ্টচিত্তে বিস্ফারিত নেত্রে যোগীবরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণমধ্যেই তাঁহাদের সে সংশয় দূর হইল। গোবিন্দযোগীর সত্য সত্যই সমাধি ভঙ্গ হইয়াছে। এইবার সাধুগণের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তাঁহারা সকলে একবার মিলিত কণ্ঠে অথচ যেন ভয়ে ভয়ে মৃদুস্বরে "জয় গোবিন্দযোগীর জয়" বলিয়া উঠিলেন। সাধুগণের জয়ধ্বনি শুনিয়া যোগীবর যেন একটু চমকাইয়া উঠিলেন; তাহাতে তাঁহার সমাধি ভাবটী যেন একে-বারেই অপনীত হইল, তিনি তখন বালক শঙ্করের প্রতি চাহিলেন, ইচ্ছা যেন তাহাকে কিছু বলিবেন। সাধুগণ ইহা দেখিয়া বালককে দেখিবেন কি যোগীবরকে দেখিবেন তাহা স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহারা একবার শঙ্করকে প্রণাম করেন, আবার গোবিন্দযোগীকে প্রণাম করেন। কেহ বা আনন্দে জয় গোবিন্দপাদের জয় এবং কেহ বা নীরবে শঙ্করের দিকেই চাহিয়া রহিলেন।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! যোগীবর শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "বৎস! তুমি কে? তোমার নাম কি? তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?

বালক শঙ্কর তখন আত্মপরিচয় দিতে যাইয়া কি বলিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে আবেগভরে বলিলেন :—

"ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার চিত্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণ নেত্রে।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ু
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥ ১

ন চ প্রাণসংজ্ঞো ন বৈ পঞ্চবায়ু
　　ন বা সপ্ত ধাতুর্ন বা পঞ্চকোষঃ।
ন বাক্ পাণিপাদং ন চোপস্থপায়ু
　　শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ ২
ন মে দ্বেষরাগৌ নমে লোভমোহৌ
　　মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবঃ।
ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ-
　　শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ ৩
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং
　　ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা
　　শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ ৪
ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা নমে জাতিভেদঃ
　　পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরু নৈব শিষ্য-
　　শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ ৫
অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপো
　　বিভুত্বাচ্চ সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন চাসঙ্গতং নৈব মুক্তির্ন মেয়-
　　শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ ৬"

গোবিন্দপাদ তাঁহার পরিচয় পাইয়া সকলই বুঝিতে পারিলেন। তথাপি পরীক্ষা মানসে আসন পরিত্যাগের ছলে পদদ্বয় গুহাদ্বারাভিমুখে প্রসারিত করিয়া দিলেন। বালক শঙ্কর ইষ্ট গুরুর শ্রীচরণ সম্মুখে পাইয়া যুগল করে যুগল পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিলেন এবং ভক্তিপুষ্পে নয়ন জলে মনে মনে সেই শ্রীপাদপদ্ম যথাবিধি পূজা করিতে লাগিলেন।

পরীক্ষা শেষ হইল, গোবিন্দপাদের ও সংশয় দূর হইল। তিনি তখন বুঝিলেন "এই সেই শিবাবতার শঙ্কর ইঁহাকে উপদেশ দিবার জন্য গুরুদেব আমাকে দেহরক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন।" তিনি তখন হৃদয়ের প্রসন্নভাব সংযত করিয়া উদাসীন ভাবে বলিলেন "বৎস। তুমি এখানেই থাকিতে পার, সাধন করিলে তোমার বাসনা পূর্ণ হইতে পারে।" শঙ্কর গোবিন্দপাদের

বাক্যে শান্ত ও নীরব হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন।

ইতিমধ্যে পূর্ব্বোক্ত সাধুদিগের সেবার জন্য গ্রাম হইতে কয়েকজন লোক কিছু দুগ্ধ এবং কয়েকটী ফল আনিয়া উপস্থিত করিল। গুহার বহির্দ্বারে লোকে লোকারণ্য কিন্তু সাধুগণের ইঙ্গিতে কেহই গুহামধ্যে প্রবেশ করিতেছেনা। একজন সাধু এই অবসরে গোবিন্দযোগীর চরণে একটু দুগ্ধ ও উক্ত ফলগুলি নিবেদন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহাদের আগ্রহ দেখিয়া গোবিন্দপাদ একটু ফল ও সামান্য দুগ্ধ পান করিলেন এবং অবশিষ্ট শঙ্করকে প্রদান করিলেন। শঙ্কর তখন গুরুদেবের ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ স্বরূপ মস্তকে ধারণ করিয়া সকলে মিলিয়া মহা আনন্দে ভক্ষণ করিলেন এবং গুরু আদেশে তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

অতঃপর এক শুভদিনে শুভক্ষণে গোবিন্দপাদ শঙ্করকে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। শঙ্কর মস্তক মুণ্ডিত করিয়া উপবীত পরিত্যাগ করিয়া দণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক গৈরিক কৌপীন ধারণ করিলেন। আজ গোবিন্দপাদের নিকট শঙ্কর সনাতন সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

ধরিত্রী তুমি আজ ধন্যা, ভারতভূমি তুমি আজ ধন্য। শঙ্কর জননী তুমি আজ ধন্যা, আজ তোমার সন্তান, 'শঙ্কর মূর্ত্তি' শঙ্কর আজ সন্ন্যাসী, আজ শঙ্কর সকলের শঙ্কর, আজ শঙ্করের জীবন সকলের জীবন, আজ শঙ্করের জীবন সকলের জন্য উৎসর্গীকৃত হইল। আজ শঙ্কর সন্ন্যাসী হইলেন।

শ্রীমতী—

ভারতের সাধনা।

(৪) নেশনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা—ধর্ম্মজীবন।

"গড়িবার বিষয়ে প্রস্তাব করিবার জন্য আমি আজ এখানে দণ্ডায়মান, ভাঙ্গিবার বিষয়ে নহে। সমালোচনার দিন গিয়াছে, এখন আমরা পুনর্গঠনের প্রতীক্ষায় রহিয়াছি। সংসারে সময় সময় সমালোচনা তীব্র

সমালোচনার—প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু সে কেবল সাময়িক প্রয়োজন; উন্নতি ও গড়িবার কাজই নিত্য কালের কাজ, প্রতিবাদ ও ভাঙ্গিবার কাজ নহে। প্রায় বিগত একশত বৎসর ধরিয়া সমালোচনার প্লাবনে আমাদের দেশ যেন ভাসিয়া গিয়াছে এবং তমসাচ্ছন্ন স্থানগুলির উপরে—যেখানে যাহা দৃষ্টির আড়ালে, সংকীর্ণ কোণে রন্ধ্রমধ্যে পতিত ছিল, তাহাদের উপরে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রখর রশ্মিরেখার সম্পাতে অন্য স্থান অপেক্ষা ঐ সকল স্থানই চক্ষুসমক্ষে তীব্রভাবে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার স্বাভাবিক ফলে দেশের মধ্যে সর্ব্বত্র এমন মনীষীগণ আবির্ভূত হইলেন, যাঁহাদের হৃদয়ে সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, দেশবাৎসল্য, ধর্ম্মোৎসাহ ও ঈশ্বরপ্রীতি প্রবল, এবং যাহারা ভালবাসেন বলিয়াই প্রাণে এমন আঘাত পাইলেন যে যাহা অন্যায় বলিয়া মনে করিলেন, তাহার বিরুদ্ধেই ঘোর প্রতিবাদ উত্থাপন করিলেন। অতীতের এই সমস্ত মহাত্মাদের জয় হউক, তাহারা অনেক মঙ্গলসাধন করিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান যুগের ঘোষণাবাণী আসিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন, "যথেষ্ট হইয়াছে", প্রতিবাদ যথেষ্ট হইয়াছে, দোষোদ্ঘাটন যথেষ্ট হইয়াছে, পুনঃ প্রতিষ্ঠা, পুনর্গঠনের সময় আসিয়াছে। সময় আসিয়াছে, যখন আমাদের বিক্ষিপ্ত শক্তিসমূহ একত্রিত করিতে হইবে, একটীমাত্র কেন্দ্রে সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে, এবং তারপর কেন্দ্রীভূত শক্তিতে নেশনকে সন্মুখের পথে পরিচালিত করিতে হইবে,—কেন না বহুশতাব্দী হইল উহার গতি একেবারে থামিয়া গিয়াছে। গৃহ মার্জ্জনা ও পরিষ্কার করা হইয়াছে, এস আবার আমরা গৃহে বসবাস করি। পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে, আর্য্যসন্তানগণ, এস অগ্রসর হও।"*

স্বামী বিবেকানন্দ।

উদ্ধৃত বক্তৃতাংশে স্বামীজি নির্দ্দেশ করিতেছেন—সম্প্রতি আমাদের কাজের প্রকৃতি কি হওয়া উচিৎ। নেশনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা—পুনর্গঠনই এখন সমস্ত কাজে আমাদের লক্ষ্য হওয়া দরকার, নতুবা বৃথা শক্তিক্ষয় হইবে, বৃথা কালক্ষেপ ঘটিবে। লাহোরে প্রদত্ত এই দ্বিতীয় বক্তৃতা স্বামীজি সেই পুনঃ প্রতিষ্ঠার পথ পষ্টভাবে ইঙ্গিত করিয়াছেন কিন্তু তিনি উদ্ধৃতাংশে তিনি এককেন্দ্র শক্তিসন্নিবেশের কথা বলিতেছেন। এখানে কিরূপ

* হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ ভিত্তি" নামক লাহোরে প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত। "ভারতে বিবেকানন্দ" দেখ।

উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা পরে প্রকাশ আছে, যথা :—National union in India. must be a gathering up of the scottered spiritual forces in india. a nation in india must be a union of those whose hearts beat the same spiritual time "ভারতবর্ষে নেশন রূপ সমষ্টিবদ্ধতার অর্থে বুঝিতে হইবে বিক্ষিপ্ত অধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের একত্র সমাবেশ। ইহা সুনিশ্চিত যে ভারতের পক্ষে নেশন বলিতে এমন বহু মানুষের সমবায় বুঝাইবে যাহাদের হৃদয়তন্ত্রী একই পারমার্থিক সুরে এক যোগে ঝঙ্কৃত হয়।"

বক্তৃতার শেষভাগে স্বামীজি দেখাইতেছেন যে শত শত বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও ভারতে কিরূপে ধর্ম্মসাধনার একটা বিশাল সমন্বয় সম্ভাবিত হয়। সমন্বয় যে হইতে পারে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন। তিনি একাধারে অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতের প্রমাণস্থল,—তিনি একাধারে শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গানপত্য, মুসলমান ও খ্রীষ্টান। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার ভারতীয় বক্তৃতামালায় বারম্বার এই মহা-সমন্বয়ের ব্যাখ্যা ঘোষণা করিতেছেন। বেদ এই মহাসমন্বয়ের পুঁথিগত ভিত্তি এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব উহারই সাধনাগত ভিত্তি। ধর্ম্মসমন্বয়ের উপর ভারতে যে নেশন গড়িতে পারা যায়, তাহা প্রত্যক্ষ আমরা দেখিয়াছি, কারণ ভারতীয় ধর্ম্মসমন্বয় ব্যষ্টিতে প্রত্যক্ষীভূত হইয়া যেন শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আমাদিগকে ধরা দিয়াছেন।

গত মাঘমাসে প্রথম প্রবন্ধে আমরা দেখাইযাছি যে ভারতীয় নেশনের লক্ষ্য পরমার্থের সাধন ও প্রচার। যিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত হউন না কেন, প্রথমেই তাঁহাকে এই সাধারণ লক্ষ্যটী স্বীকার করিতে হইবে—পরমার্থ বলিতে তিনি যাহাই বুঝুন, কিছু আসে যায় না, অদ্বৈতভাবেই বুঝুন, বিশিষ্টাদ্বৈত ভাবেই বুঝুন, অথবা দ্বৈতভাবেই বুঝুন পরমার্থের সাধন ও প্রচারই যে ভারতীয় নেশনে সর্ব্বজনীন লক্ষ্য এইটুকু প্রথমতঃ অবশ্য-স্বীকার্য্য। দ্বিতীয়তঃ স্বীকার করিতে হইবে যে ঐ লক্ষ্য সাধনার জন্য সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে আমাদিগকে একযোগ হইতে হইবে; কারণ একযোগ হওয়াই নেশনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

এই দুইটী ভাব যাহার বা যে সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান, নেশনের অঙ্গীভূত হইবার পক্ষে তাহার কোনও বিঘ্ন নাই। কিন্তু কি কি বিদ্বেষ

দ্বারা এই দুইটী ভাব সম্প্রতি আমাদের দেশে প্রতিহত হইয়া রহিয়াছে? প্রত্যেক ভাবের বিরুদ্ধে এক একটী বিষম বিঘ্ন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। সমাগত নব্যদের মধ্যে বিশেষ একটা ভাব দেখিয়া পরমহংসদেব যেন ঘৃণার সহিত বলিতেন, "আধানিক।" কোন ভাবটীর উপর তিনি এই আধুনিকতারূপ দোষের আরোপ করিতেন? কোন ভাবটী তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সনাতন বলিয়া ঠেকিত না? দৃষ্টান্তগুলি বিচার করিয়া দেখ, বেশ বুঝিবে যে নব্যদিগের যে সমস্ত ভাবের মধ্যে সনাতন পারমার্থিক ভিত্তি তাঁহার অলৌকিক দৃষ্টিতে প্রতিভাত না হইত, সেগুলিকে "আধানিক" বলিয়া তিনি হেয় জ্ঞান করিতেন। সংবাদপত্রের প্রসঙ্গে পারমার্থিক ভিত্তি নাই, সেই জন্য সংবাদপত্র তিনি ছুঁইতেন না; হাঁসপাতাল প্রভৃতি গড়িয়া দিয়া জগতের উপকার করিবার ভাবে যখন সূক্ষ্ম পরোপকারের অভিমান তিনি দেখিতেন, তখন ধিক্কার দিতেন, কারণ পরোপকার করিবার অভিমানে আধুনিকভাবে কাজ করার মধ্যে পারমার্থিক ভিত্তি নাই। আবার দেখিতেছি অর্থ ও সামর্থ্য সদনুষ্ঠানে নিবেদন করিয়া দিবার ভাবে তাঁহার অসম্মতি নাই। * অতএব বুঝা যায় যে যাহা পরমার্থসাধনরূপ সনাতনভাবের অঙ্গীভূত নহে, তাহাকেই পরমহংসদেব "আধানিক" বলিয়া বাদ দিতেন। এই "আধানিকতা"ই আমাদের দেশের সনাতন সার্ব্বজনীন লক্ষ্যকে আবৃত করিয়াছে, সেই জন্য এতকাল আমরা পাশ্চাত্য রাজনৈতিক লক্ষ্য প্রভৃতির অনুকরণে নেশন গড়িবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম।

অতএব ভারতীয় নেশনের লক্ষ্য স্বীকার করিবার পক্ষে বিঘ্ন এই "আধানিকতা"। পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রসূত এই আধুনিকতা দোষ ভারতের সকল সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে, অতএব ভারতের সনাতন লক্ষ্যটী সর্ব্বত্র প্রচার করিতে হইবে। শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মোহ কাটিলেই যেদিন তাঁহারা একযোগে আমাদের সনাতন নেশন-লক্ষ্য স্বীকার করিবেন, সেদিন নেশন-প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান বিঘ্ন অপসারিত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ আর একটী বিঘ্ন একযোগ হইবার পথ বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেছে, অথচ দেশের লোককে যথাসম্ভব একযোগ করাই নেশনের

* শুনিয়াছি বরিশালবাসী ব্রজমোহনের বুকে কলেজ স্থাপনায় পরমহংসদেব সম্মতি জানাইয়াছিলেন, অথচ কর্ম্মবীর কৃষ্ণদাস পালের কথাও সকলেই জানেন।

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। পরমহংসদেব এই দ্বিতীয় বিঘ্নটীর নাম দিয়াছেন,—"মতুয়ার বুদ্ধি।" মতুয়ার বুদ্ধি কাহাকে বলে? না,—"আমার ধর্ম্মমতটী কেবল ভাল, অপরের ধর্ম্মমত মন্দ, আমার ধর্ম্মমতের দ্বারাই জগতের ইষ্ট, অপর ধর্ম্মমতে জগতের অনিষ্ট, আমার ধর্ম্মমতটীকে দাঁড় করাইতে হইবে অপরের ধর্ম্মমত চুলোয় যাক্"—এইরূপ ভাবকে "মতুয়ার বুদ্ধি" বলে। এইরূপ বুদ্ধি থাকিতে, কোনও সম্প্রদায় অপরের সহিত ভারতীয় নেশন গড়িবার জন্য একযোগ হইতে যাইবে না। এই বুদ্ধি নাশ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়ও—শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়া গিয়াছেন,—"মত, পথ" এই মন্ত্রটী যেন সকলকেই তিনি সর্ব্বদা অনুধাবন করিতে বলিতেছেন। কেননা তিনি সকলকে হাতে ধরিয়া, কাজে দেখাইয়া, প্রাণপাত করিয়া, দেখাইয়া গিয়াছেন যে সকলেরই গন্তব্য লক্ষ্য এক, ভিন্ন ভিন্ন মত কেবল ভিন্ন ভিন্ন কেবল পথমাত্র। কোনও পথই অপর পথকে রদ করিয়া দিতেছে না, কোনও পথকেই অবজ্ঞা করা যায় না। গন্তব্য লক্ষ্য ও সম্পূর্ণ এক ভিন্ন ভিন্ন পথে যাইতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখায় মাত্র। "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি", একই চরম বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বলা হইয়াছে। "মত,পথ" রূপ এই মহাসত্যের দ্বারা "মতুয়ার" বুদ্ধিকে নাশ করিতে হইবে তবেই দ্বিতীয় বিঘ্ন বিনষ্ট হইবে।

কিন্তু এখানে একটা আপত্তি উঠিতে পারে এই যে উল্লিখিত বিঘ্ন দুইটী নাশ করিয়া দেশের লোককে এক যোগ করা বহুকাল সাপেক্ষ বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে দেশে নেশন প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত এখনও বহুকাল না হইবারই কথা। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে যেমন দেখা যায় যে মহাকাশে জ্যোতিষ্ক প্রভৃতির গঠনারম্ভে বিক্ষিপ্ত, অসংযত বাষ্পাণুগুলি প্রথমতঃ একটী সামান্য কেন্দ্রে একত্রিত হইতে থাকে, এবং কালে ক্রমশঃ উহাদেরই উপচয় ও ঘনসন্নিবেশে গ্রহ প্রভৃতির সৃষ্টি হয়, নেশনগঠনেও ঐরূপ একটা কেন্দ্র বা nucleus প্রথমতঃ দাঁড় করাইতে হয়। আমাদের দেশের সনাতন নেশন লক্ষ্য, উহার সর্ব্বাঙ্গীন সাধন ও প্রচার, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের ভাব এবং সেবাপরায়ণতা প্রভৃতি শিরোধার্য্য করিয়া দেশে একস্থানে বা কেন্দ্রে জমাট বাঁধা ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, সম্যকদর্শী আচার্য্য বিবেকানন্দের চেষ্টায় প্রকৃতপক্ষে নেশনগঠনের কেন্দ্র বা nucleus ইতিমধ্যেই গড়িয়া উঠিতেছে, অতএব নেশন প্রতিষ্ঠা সুদূরপরাহত নহে, সম্প্রতি উহাই আমাদের একমাত্র অনুষ্ঠেয়।

তবে নেশন-প্রতিষ্ঠায় আমাদের দেশে একটা বিষয়ের অপেক্ষা আছে কৃষিকার্য্য যেমন বর্ষার অপেক্ষা রাখে, ভারতে নেশন-প্রতিষ্ঠাও সেইরূপ ধর্ম্ম-ভাবের একটা প্লাবনের উপর নির্ভর করে। যেমন জমি তৈয়ারী না থাকিলে, বীজ ভাল করিয়া বসে না বা গজায় না, তেমনি দেশের সর্ব্বত্র ধর্ম্মভাব যদি না জাগিয়া উঠে, তবে নেশন-প্রতিষ্ঠার আদর্শ ও প্রণালী জানা থাকিলেও, নেশন-প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইবে। সেইজন্য নেশন-প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে প্রথমেই ধর্ম্মজীবনের কথা তুলিতে হইযাছে।

"The national ideals of India are Renunciation and Service, Intensify her in those two channels and the rest will take care of itself." স্বামীজি বলিতেছেন, "ভারতীয় নেশনে সার্ব্বজনীন জীবনাদর্শ কি? ত্যাগ ও সেবা। এই দুইটী দিক দিযা ভারতীয় জীবন-প্রবাহকে পরিপুষ্ট করিয়া তোল, দেখিবে আর সব দিকেই আপনা-আপনি উন্নতি হইবে।" ভারতীয় সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভিতর দিযাই ত্যাগ ও সেবার ভাবটী পরিপুষ্ট করা সম্ভব। অতএব ধর্ম্মজীবনের ত্যাগ ও সেবা-রূপ অঙ্গ নির্দ্দেশ করায, নেশন-গঠনের জন্য সমগ্র ভারতে ধর্ম্মভাব কোন্ পথে পরিচালিত উদ্বোধিত করিতে হইবে তাহার একটা অসাম্প্রদাযিক ইঙ্গিত আমরা স্বামীজির নিকট পাইতেছি।

'ত্যাগ' এই শব্দটী বড় সামান্য নহে; ঐ একটী কথায় ধর্ম্ম সাধনার প্রকৃত গতি নির্দ্ধারিত হইযা রহিযাছে। পরমহংসদেব বলিতেন যে গীতার শিক্ষা যদি হৃদয়ঙ্গম করিতে চাও তবে গীতা শব্দটী পাল্টাইযা দশবারে উচ্চারণ কর,—দেখিবে ত্যাগী হইতে বলাই গীতার সার উপদেশ। সমগ্র সৃষ্টিচক্রটী স্থূলতঃ ভোগের দিকে অবিরত ঘূর্ণায়মান; মানুষের স্বভাব সেই চাকার পাকে ভোগের দিকে গড়াইয়া পড়িতেছে। এই অবিরাম আবর্ত্তন সামলাইবার পরম উপায়ের নামই ধর্ম্ম। সুতরাং ধর্ম্মসাধনার স্বাভাবিক গতি ভোগের বিপরীত দিকে, অর্থাৎ ত্যাগ বা অনাসক্তির দিকে। যে কোনও ধর্ম্মেরই হউক, ঠিক ঠিক সাধন হইতেছে কিনা তাহা জানিবার নির্ভুল উপায় সাধনার গতির দিকে লক্ষ্য করা,—অর্থাৎ সাধকের অনাসক্তির ভাব বাড়িতেছে কিনা তাহা লক্ষ্য করা। সাধনায় নানা সিদ্ধাই বা শক্তি লাভ করা উন্নতির অভ্রান্ত পরিচয় নহে, অথবা বিচিত্র দর্শনাদি হওয়া উন্নতির অভ্রান্ত পরিচয় নহে, অথবা অতি সহজে বারম্বার "ভাব" লাগাও উন্নতির

অভ্রান্ত পরিচয় নহে। সম্পূর্ণ নির্ভুল ও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে চাও ত ত্যাগের প্রতি, অনাসক্তির প্রতি লক্ষ্য কর। স্থূল ও সূক্ষ্ম ভোগলালসা যে পরিমাণে স্বভাব থেকে দাগটী পর্য্যন্ত না রাখিয়া খসিয়া পড়িতেছে, সেই পরিমাণে ধর্ম্মপথে উন্নতি লাভ হইতেছে, সেই পরিমাণে নিত্যসত্য পরমবস্তুর প্রতি প্রকৃতভাবে অগ্রসর হওয়া ঘটিতেছে। পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, 'সাধু কিরূপে চিনিব?" তিনি বলিয়াছিলেন যিনি সাধু তিনি কামকাঞ্চন-ত্যাগী। কেন, বলিতে পারিতেন ত—যিনি নাচিয়া কাঁদিয়া ভাসান, অথবা যিনি অলৌকিক দর্শনাদি করেন, অথবা যিনি পরলোকের সপ্তমস্বর্গ পর্য্যন্ত সূক্ষ্মদেহে বেড়াইয়া আসিতে পারেন ইত্যাদি ইত্যাদি? বৌদ্ধ তান্ত্রিক যুগে দেশটার হাড়ে হাড়ে ভেল্কি এমনই ঢুকিয়া গিয়াছে যে এখনও লোকে সিদ্ধাই ছাড়া সাধুই মানে না! সাধন পথে অগ্রসর হইলেই প্রায় আপনার ভিতর সিদ্ধাই বা শক্তির বোধ হইবে, তখন সেই সব শক্তির ভোগ হইতে মনকে টানিয়া আসল কাজে লাগাইয়া রাখিতে হইবে, নচেৎ আবার বাঁধন পড়িবে, আবার পতন হইবে।

ত্যাগের আরম্ভ ইন্দ্রিয় মনের সংযমে ও পরাকাষ্ঠা পরমার্থ লাভে। যিনি যে পথেরই পথিক হউন, অর্থাৎ যে সম্প্রদায় ভুক্তই হউন, 'ত্যাগ' এই মন্ত্রটী তাঁহার সাধনার গতি নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। আজকাল যাঁহারা পাশ্চাত্য হিগেল-দর্শনের ক্রমোন্নতিবাদ স্বীকার করিয়া বলেন যে বিষয়ভোগের ভিতরেই আমরা পরম বস্তুর সম্ভোগ করিব, তাঁহাদিগকেও মানিতে হইবে যে মন যদি অল্পমাত্রও আসক্তিতে বাঁধা থাকে, তবে বিষয়ের মধ্যে পরমবস্তুর সম্ভোগ, মুখের ফাঁকা কথাই থাকিয়া যাইবে। ত্যাগ বা অনাসক্তিই ধর্ম্মজীবনের মেরুদণ্ড। সুস্থ, সবল ধর্ম্মজীবন এই মেরুদণ্ডের উপর নির্ভর করে। যদি নিজের দ্বারা নিজে ঠকিতে না চাও, যদি পরের দ্বারা নিজে ঠকিতে না চাও, যদি দেশে সুস্থ সবল ধর্ম্মজীবন গড়িয়া তুলিতে চাও, তবে, হে ভারতবাসি, যে সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত হও, ত্যাগ বা অনাসক্তিকেই সাধনতরীর কম্পাসরূপে গ্রহণ কর।

ভারতীয় নেশনে জীবনাদর্শের দ্বিতীয় অঙ্গ, সেবা। স্বামীজি যে সেবাতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহা আজকাল সকলেরই পরিষ্কার ভাবে বুঝা আবশ্যক। কারণ আধুনিক যুগে পরোপকার করা, দেশের কাজ করা, দশের ও দেশের উপকারে আসা প্রভৃতি একটা নূতন রকমের ধূয়া

উঠিয়াছে। কেহ কেহ বলেন এই ভাবটা পাশ্চাত্য ঐহিকতার নকল,—উহার সহিত প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের সংযোগ নাই, অর্থাৎ ধর্ম্মসাধনায় যতই উন্নতি হইবে, ঐ সব হাঙ্গামা ততই কমিয়া যাইবে। আবার ঠিক বিপরীত আর একদল লোক আছেন যাহারা বলেন যে এতকাল কেবল "ধর্ম্ম ধর্ম্ম" ও "পরকাল পরকাল" করিয়া দেশটা গোল্লায় গিয়াছে, এখন ও সব রাখিয়া দশের জন্য দেশের জন্য খাটিতে হইবে; এখন চাই দেশের দুঃখ ঘুচাইবার চেষ্টা।

এই দুই শ্রেণীর লোকই ধর্ম্মের পূর্ণস্বরূপ বুঝিয়া দেখেন নাই। প্রথম দলের লোক যাহা বলেন, তাহা কতকটা সত্য, কারণ পাশ্চাত্য লোকহিত-সাধন ধর্ম্মজীবনের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত নহে; পরের জন্য খাটা, পরোপকার করার মধ্যে কর্তৃত্বাভিমান বা লোকমান্যের স্থান যথেষ্ট রহিয়াছে এবং ধর্ম্মভিত্তিহীন কর্ম্মপ্রবণতায় চিত্ত কেবলই অশান্ত ও চঞ্চল হইয়া পড়ে। এ অবস্থায় ধর্ম্মলিপ্সু সাধক ঐরূপ কর্ম্মজালের প্রতি পরাঙ্মুখ হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি! আবার ইহাও সত্য যে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া আমাদের দেশে অনেক লোক কর্ম্ম বিমুখ হইয়া পড়িয়াছেন এবং তমোগুণের জালে আবদ্ধ হইয়াছেন। ধর্ম্মান্বেষণে তমোগুণী সহজেই ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পথ হারাইয়া বসিয়া থাকেন। স্বামীজি একদিকে যেমন পাশ্চাত্য ইহসর্ব্বস্ব ভাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন, অপরদিকে তেমনই ধর্ম্মাবরণের ভিতর দিয়া তমোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়ার বিরুদ্ধে জলদমন্দ্রে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।

বাস্তবিক, পরমার্থসাধন মানুষের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মজীবনের একটা বিশেষ বিভাগ নহে। মানুষ নিজের দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিবার জন্য ধর্ম্ম-সাধনের একটা আলাদা বিভাগ, নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখে। যাহা বহির্ম্মুখ মানুষকে অন্তর্ম্মুখ করে, তাহার নামই ধর্ম্ম; মনুষ্যোচিত সকল কাজেই যেমন বহির্ম্মুখতার অবকাশ রহিয়াছে, তেমনই অন্তর্ম্মুখতারও অবকাশ রহিয়াছে। অতএব মানুষের সমগ্র জীবনটাই ধর্ম্মের পক্ষে উপযুক্ত প্রয়োগ-ক্ষেত্র। মনুষ্যোচিত যেরূপ কর্ম্মক্ষেত্রেই মানুষ দাঁড়াইয়া থাকুক না কেন, সেইখান থেকেই সে ধর্ম্মের সাড়া পাইতে পারে, সেইখান থেকেই তাহার জন্য সাধনসোপান বিলম্বিত রহিয়াছে। মানুষের অন্তরেই পরমবস্তু রহিয়াছে,—"যা চাবি তা ব'সে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।" অতএব মানুষ দৈনন্দিন জীবনের যেরূপ কর্ম্মকক্ষেই অবস্থিত থাকুক, পরমার্থসাধনের

এলাকার বাহিরে যাইবার তাহার উপায় নাই। সমস্ত লোকব্যবহারে অন্তর্মুখতা যাঁহার যত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ধর্ম্মের আস্বাদ তত গভীর ভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ।

অতএব যাহাকে আমরা পরের উপকার করা, পরের জন্য খাটা বলি, তাহারই অনুষ্ঠানকে প্রকৃত পরমার্থসাধনে পরিণত করা যাইতে পারে। স্বামীজির সেবাতত্ত্বে এই উদ্দেশ্যটীই সাধিত হইয়াছে।

সমাধিবিলীনসর্ব্বস্ব শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন প্রথম ভাবমুখে থাকিতে আরম্ভ করিলেন, তখন দেখা গিয়াছে লৌকিক বাহ্যজ্ঞানের ভূমিতে থাকা তাঁহার অল্পই ঘটিয়া উঠিত, নিয়তই তাঁহার মনবুদ্ধি মহাকারণে লীন হইয়া যাইত। জলে বরফখণ্ডের মত এই অবস্থা যখন কমিয়া আসিতে লাগিল,—যখন ঠাকুর আকৃষ্টচিত্ত যুবকদের সহিত বেশ মেলামেশা করিতেছেন,—তখন হাজরা মহাশয় একবার, "ছেলেদের সঙ্গে তোমার অত মেলামেশার দরকার কি"—এইরূপ ভৎর্সনা বাক্যে তাঁহাকে ঐ কাজ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে গিয়াছিলেন। বাস্তবিকই যিনি শ্রেষ্ঠ উপাসক, তিনি কি প্রয়োজনে উপাসনা হইতে মুহূর্ত্তের জন্যও বিরত হইবেন? যিনি জীবনের প্রতিমুহূর্ত্ত উপাস্যের সহিত যোগযুক্ত হইয়া থাকিতে চান, তিনি কেন লোকের সহিত মেলামেশা করিবেন, তিনি কেন কর্ম্মে লিপ্ত হইবেন? এই সমস্ত প্রশ্ন যাঁহাদের মনে উঠে যেন তাঁহাদেরই প্রতিনিধি হইয়া হাজরা মহাশয় ঠাকুরকে বলিলেন,—"তোমার আবার ও সব কেন?"

প্রশ্নটী পরমহংসদেব স্বীকার করিয়া লইলেন এবং মীমাংসার জন্য উচ্চ ভাবভূমিতে লইয়া গেলেন। তারপর মার মুখে তিনি যে মীমাংসা পাইলেন, তাহা হাজরা মহাশয়কে উপলক্ষ্য করিয়া জগৎ শুনিয়া রাখিয়াছে। পরম সিদ্ধাবস্থাতেও নারায়ণ জ্ঞানে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা চলিতে পারে,—এই সাক্ষ্য ও আশ্বাস আমাদের দেশের পক্ষে আবশ্যক ছিল। কর্ম মানে জীবজগতের সঙ্গে ব্যবহার। এই ব্যবহার পরমসিদ্ধের পক্ষেও সম্ভব, এ কথা ঠাকুরের মুখে প্রকাশ না হইলে, আমাদের দেশে কর্ম্মযোগ বা সেবাতত্ত্বের প্রচার একপ্রকার ভিত্তিহীন হইয়া থাকিত।

আপ্তপুরুষে প্রকটিত ভাবসমূহই মানব সাধারণের সাধন চেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করে। ঠাকুরের কথায় তাঁহারা যাহার "ষোলটাং" করেন, তাহারই "এক টাং" অন্ততঃ কারবার চেষ্টাই সাধারণের পক্ষে সাধনা। পরম সিদ্ধা-

বস্তুর সদ্ব্যবহারে জীব ও জগৎ সম্বন্ধে যে নারায়ণ জ্ঞান বা ইষ্ট জ্ঞান জাজ্বল্যমান থাকে, তাহার ষোল ভাগের একভাগ করিবার চেষ্টাই কর্ম্ম-যোগের সাধনা।

সেবাতত্ত্ব কর্ম্মযোগের প্রধান অঙ্গ। নেশন প্রতিষ্ঠার সূচনায় দেশে যে ধর্ম্ম-জীবনের উৎকর্ষ হওয়া দরকার, তাহার পক্ষে একদিকে ত্যাগের ভাব যেমন একটী প্রধান অবলম্বন, অপর দিকে সেবার ভাবও আর একটী প্রধান অবলম্বন। নেশন প্রতিষ্ঠার জন্য ত্যাগের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে দেশে সেবার সাধনাও হওয়া আবশ্যক। পরের জন্য খাটা, পরের উপকার করা—এ সমস্ত বাস্তবিকই পাশ্চাত্যভাব; "অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।" উপকার বা মঙ্গল সাধনের একমাত্র উৎস স্বয়ং পরমপুরুষ, তোমার আমার পক্ষে একমাত্র কাজ তাঁহারই সেবা করা, অন্য কাজ কিছু নাই। যে সময় আমরা জ্ঞানাগ্নিতে আত্মাহুতি দিতেছি না, অথবা ভক্তির তন্ময়তায় ইষ্ট-পূজা করিতেছি না, তখন সাধারণ ব্যবহারক্ষেত্রে থাকিয়াও পরমার্থ সাধন করিবার একমাত্র উপায় ভগবৎজ্ঞানে জীব বা জগতের সেবা করা। সমস্ত সাধকেরই জীবনে এই সেবার জন্য অবসর রহিয়াছে; তবে কোনও সাধকের পক্ষে ঐরূপ সেবাই মুখ্য সাধনা, কাহারও পক্ষে বা উহা অপর সাধনার আনুষঙ্গিক। সেবার সাধনা কাহার পক্ষে প্রধান বা কাহার পক্ষে আনুষঙ্গিক, তাহা তাহার প্রকৃতি অনুসারে নির্দ্দেশ্য। আবার একই সাধক-জীবনে কখনও বা কর্ম্মত্যাগের ভাব কখনও বা সেবারূপ সাধনার ভাব প্রবল হওয়া সম্ভব।

জীবরূপে ভগবান যখন আমাদের সেবা গ্রহণ করেন, তখন সেই সেবার উপকরণ তিন রকম হইতে দেখা যায়; সেবাগ্রাহী নারায়ণের মায়ারূপগুলি প্রধানতঃ তিন প্রকারের,—রুগ্ন দরিদ্র প্রভৃতি দৈহিক অভাবগ্রস্ত নারায়ণ, অজ্ঞান, মূর্খ প্রভৃতি মানসিক অভাবগ্রস্ত নারায়ণ এবং আধ্যাত্মিক অবিদ্যা-মোহগ্রস্ত নারায়ণ। এই ত্রিবিধমায়ারূপধারী নারায়ণের সেবাও ত্রিবিধ কোথাও অর্থ-ঔষধ-পথ্য-শুশ্রূষাই নারায়ণসেবার উপকরণ, কোথাও বিদ্যাদি-দানই নারায়ণসেবার উপকরণ, এবং কোথাও বা পারমার্থিক জ্ঞানদানই নারায়ণসেবার উপকরণ। যে ক্ষেত্রে নারায়ণের যেরূপ মায়ারূপ দেখিব, সে ক্ষেত্রে সেবার উপকরণও তদনুরূপ হইবে। মায়ারূপী নারায়ণ যখন যে সেবা চাহিবেন, আমাদিগকে তখন সেই সেবাই দিতে হইবে। ভগবৎজ্ঞানে

লোকসেবার আদর্শ এই ভাবে হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া লইতে হইবে। হে মানব, সাধনার আসনে বসিলেই যে শুধু ভগবান তোমার নিকট আসেন তাহা নহে, যখন আসন ছাড়িয়া লোকসমাজে মিশিতেছ, তখনও তিনি নানাভাবে তোমার পূজা লইতে তোমার দ্বারস্থ; তুমি আসনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিলেও, তিনি যে ছাড়েন না! তোমার মন সরিয়া আসিতে চাহিলেও, তিনি সর্ব্বদা হাজির।

এই সেবার ভাব ও ত্যাগের ভাব যেন দুইটী ডানা; এই দুই পক্ষের উপর ভর দিয়া আমাদের দেশে সাধক পক্ষীকে পরমার্থসাধনরূপ আকাশে উড়িয়া যাইতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ এইজন্য ঘোষণা করিয়াছেন: The National Ideals of India are Renunciation and Service (প্রবন্ধের পূর্ব্বভাগ দেখ)।

ত্যাগ ও সেবা—উভয়ই ভারতীয় সার্ব্বজনীন ধর্ম্মজীবনের পক্ষে অসাম্প্রদায়িক অবলম্বন। তুমি যে সম্প্রদায়েরই সাধক হও, ত্যাগ ও সেবার ভাবে নিজ ধর্ম্মজীবন পরিপুষ্ট করিয়া, ভারতীয় নেশনের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিতে পার এবং হৃদয় হইতে সংক্রামক আধুনিকতাদোষ দূর করিয়া ও "মতুয়ার বুদ্ধি" নাশ করিয়া, নেশনের পুনর্গঠন কার্য্যে যোগদান করিতে পার। তোমার সাধনপথ যেরূপই হউক, হে ভারতবাসি, সনাতন ধর্ম্ম ভারতীয় নেশন প্রতিষ্ঠাযজ্ঞে তোমাকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন। এস, নিজ সাধনপথে দাঁড়াইয়া ত্যাগ ও সেবার দ্বারা পরমার্থলাভ করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ কর, কারণ আমাদের নেশনে পরমার্থলাভই সার্ব্বজনীন লক্ষ্য। ভারতীয় নেশনকে আবার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, আবহমান কাল যে নিয়ন্তৃশক্তি ভারতেই অন্তর্নিহিত ছিল, সেই নিয়ন্তৃশক্তি পুনরায় সর্ব্বসমক্ষে আবির্ভূত হইয়াছে,—বেদোক্ত অসাম্প্রদায়িক পরমার্থভাবে তদাকারকারিত হইয়া নেশন-নেতা প্রকটিত হইয়াছেন,—নেশন-প্রতিষ্ঠার পথ আবার উন্মুক্ত হইয়াছে, হে ভারতবাসি, অগ্রসর হও।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উপযুক্ত কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া নেশন গড়িবার জন্য প্রথমেই দেশে ধর্ম্মভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে আগামীবারে নেশন-প্রতিষ্ঠার কেন্দ্র কিরূপ তাহা বিশদভাবে বুঝিতে হইবে। তারপর সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কিরূপে নেশন-গঠন কার্য্য সুরু করিতে হইবে, তাহা আমরা বিচার করিব।

নিবেদিতা।

নিবেদিতা চলিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লিখিতে গেলে চোখের জলের কালী দিয়া না লিখিলে সে লেখা সম্পূর্ণ হয় না। তিনি যে আমাদেরই ছিলেন, তিনি যে ভারতবর্ষে কায়মনোবাক্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন এই কথাটী আমরা এখন অন্তরের সঙ্গে বুঝিতে পারিতেছি। স্বামী বিবেকানন্দ এই দুর্লভরত্ন আনিয়া জননী ভারতবর্ষের পাদপদ্মে উপহার দিয়াছিলেন।

ভগিনী নিবেদিতার জীবনের সহিত ভারতবর্ষের এই যে একান্ত সংযোগ ইহা অতি বিচিত্র বলিয়া বোধ হয়। কোথায় ধনজন সম্পদময়ী সুদূর ইংলণ্ডের সুসভ্য সমাজে প্রতিষ্ঠাময় জীবন—আর কোথায় ধ্বংশদশাগ্রস্থ ভারতবর্ষের কোন এক দরিদ্র পল্লীতে নিতান্ত অখ্যাতভাবে জীবন যাপন। কোথায় সুখ সৌভাগ্য ও আভিজাত্যের গৌরব আর কোথায় দুঃখ দারিদ্র্য ও নিন্দা অপমান। কোথায় স্বজন গৃহ পরিবারের সুখময় আশ্রয় আর কোথায় বহুদূরদেশে এক নিতান্ত-বিভিন্ন আচারাবলম্বী ভিন্ন ভাষাভাষী বিদেশীর সহিত ধনী-দীন-জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বন্ধন। কোথায় উত্তুঙ্গ হিমাচল, আর কোথায় বা সাগরাভিমুখিনী স্রোতঃস্বতী। কোন্ শক্তির দ্বারা চালিত হইয়া নিবেদিতার জীবনের গতি এরূপভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল প্রথমে তাহাই জানিতে কৌতূহল হয়। নিবেদিতা তাঁহার "The Master as I saw him" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয়ই তাঁহার এইরূপ ভাবে জীবনের গতি পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ।

১৮৯৫ খৃঃ অব্দে স্বামী বিবেকানন্দ যখন ইংলণ্ডে গিয়া বেদান্ত প্রচার করিতেছিলেন সেই সময় ভারতবর্ষীয় দর্শনশাস্ত্রের দিকে নিবেদিতার মন কিছু কিছু আকৃষ্ট হয়। স্বামীজী বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন, বক্তৃতা শেষ হইলে পরে শ্রোতাগণ যে যে প্রশ্ন করিতেন তাহারও মীমাংসা করিয়া দিতেন। এই সকল বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর শুনিয়া প্রথমতঃ নিবেদিতার মনে বর্ত্তমানকালে প্রচলিত ইউরোপীয় ধর্ম্মানুশাসনের সহিত ভারতীয় দর্শনের তুলনা উদিত হইল। যদিও নিবেদিতা তখনও বেদান্তদর্শনের ভাব সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, তথাপিও তিনি বুঝিতে পারিলেন যে বর্ত্তমান কালের ইউরোপীয়,

সভ্যতা, ধর্ম্ম, পরোপকার, ধর্ম্মপ্রচার ও সমাজ, এই সমুদায়ের মূলে আধ্যাত্মিকতা থাকিলেও পার্থিব ভাবও ভোগসুখ-লালসা তাহার সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত আছে। কিন্তু, যাহা প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা তাহা একেবারে পার্থিব ভাব সম্পর্ক শূন্য হওয়া চাই। পরহিতার্থে কর্ম্মানুষ্ঠানে যদি বিন্দুমাত্র আত্মাভিমান ও স্বার্থানুসন্ধিৎসা থাকে তবে অফল বৃক্ষের ন্যায় তাহা নিবর্থক হইয়া যায়। স্বামীজীর নিকট এই সকল বিষয়ে বক্তৃতা শুনিয়া নিবেদিতার মনের ভাব ক্রমশঃই পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইল, সেই সঙ্গে স্বামীজীর প্রতি তাহার শ্রদ্ধাও বাড়িতে লাগিল। নিবেদিতা কেবল যে বিদ্যাবতী ছিলেন তাহা নহে, তিনি একজন অসাধারণ বুদ্ধিমতী, লোক চরিত্র অধ্যয়নে তাঁহার ন্যায় সুনিপুণা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। স্বামীজীর সহিত পরিচয়ে নিবেদিতা বুঝিতে পারিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ শুধু সুপণ্ডিত, দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ ও অলোকসাধারণ প্রতিভাশালী নহেন, তাঁহার অসাধারণ সত্যানুরাগ ও বীরত্ব প্রভাবেই তাঁহার চরিত্র এত অধিক সমুজ্জ্বল হইয়াছে। তিনি আজ যাহা মনের সঙ্গে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ও সর্ব্বলোক সমক্ষে সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, কাল যদি সেই মতে ভ্রম দেখিতে পান তাহা হইলে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তখনই তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন, কেননা তিনি সত্যানুরাগী, তিনি বীর। তিনি ত্যাগ-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া এমন ভাবে আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন যে কিছুরই আকাঙ্ক্ষা রাখেন না, প্রতিষ্ঠা তো তাহার কাছে অতি তুচ্ছ, যোগীগণের আজীবন তপস্যার ফলস্বরূপ মুক্তি বা অন্তে নির্ব্বাণলাভও তিনি প্রার্থনা করেন না।

নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ যদি কিছুরই কামনা রাখে না, তবে অনন্ত শূন্যতাই কি তাহার একমাত্র আশ্রয়? তাহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। নিবেদিতা স্বামীজীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "তিনি যে কেবল ত্যাগী সন্ন্যাসীই ছিলেন, তাহা নহে, মাতৃভূমির প্রতি তাঁহার যে অসাধারণ প্রেম তাহার তুলনা হয় না। মাতৃ-ভূমির যদি যথার্থ কল্যাণ হয়, তাহার জন্য তিনি এমন কাজ করিতেও প্রস্তুত ছিলেন, যাহাতে তাঁহাকে যোগীজনকাম্য মুক্তিমার্গচ্যুত হইয়া নীরবগামী হইতে হয়। কেবল ভারতবর্ষের জন্য নহে, বুভুক্ষিত, পীড়িত, অত্যাচারিত লোক সাধারণের জন্যও তিনি এইরূপ ভাবে আত্মদানে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে জগত-সমাজ আহ্বান ধ্বনিতে পরিপূর্ণ করিয়া বলিয়াছেন, "What the world wants to-day, is twenty men and women who can dare to stand in the street yonder, and say that they possess

nothing but God Who will go? * * * why should one fear? If this is true, what else could matter? If it is not true, what do our lives matter?

"আজিকার দিনে পৃথিবী কি চায়?—বিংশতি জন এমন রমণী এবং পুরুষ যাহারা সাহস করিয়া একেবার পথে দাঁড়াইয়া বলিতে পারে, ঈশ্বর ভিন্ন আর আমাদের কিছুই সম্বল নাই। কে যাইবে? * * * ঐরূপ (ঈশ্বরকে ধরিয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ) করিতে ভয়ই বা কেন? ইহা যদি সত্য হয় (অর্থাৎ ঈশ্বর যদি থাকেন) তবে অপর সমস্ত ত্যাগে কি আসে যায়? আর ইহা যদি সত্য না হয় (ঈশ্বর যদি না থাকেন) তবে জীবনধারণেই বা কি আসে যায়?"

স্বামীজীর এই আহ্বান নিবেদিতার কর্ণে-বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় ধ্বনিত হইয়াছিল। তিনি মনে মনে এক প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন, কে যেন তাঁহাকে এক অপূর্ব্ব বিশ্বাসের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল! স্বামীজী আবার বলিয়াছেন "The world is in need of those whose life is one burning love—self-less The love will make every word tell like a thunderbolt. Awake, awake, great souls! The world is burning in misery, can you sleep?

"পৃথিবী চায় তাহাদিগকে যাহাদিগের জীবন আত্মাহুতি দানে জ্বলন্ত প্রেম-স্বরূপ হইয়াছে। সেই ভালবাসাই তোমার প্রত্যেক কথাতে বজ্রতুল্য বল দিবে। জাগো, জাগো মহাপ্রাণগণ, পৃথিবী দুঃখ ক্লেশে দগ্ধ হইতেছে, তুমি কি ঘুমাইতে পার?"

স্বামী বিবেকানন্দের এই সকল বাক্য নিবেদিতার জীবনেই সফল হইয়াছিল। ধন মান সম্পদ গৃহ পরিবার সমস্ত ত্যাগ করিয়া তিনি কেবল ভগবান-কেই সম্বল করিয়া জগতের পথে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনই 'আত্মস্মৃতি-রহিত জ্বলন্ত প্রেমের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়াছিল।

"নিবেদিতা!" এই নাম তাঁহার কি সার্থকই হইয়াছিল। ভগবৎপাদপদ্মে তিনি সম্পূর্ণভাবে আত্ম নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন, 'আপনার' বলিয়া অভি-মানের বেড়া দিয়া পৃথক্ করিয়া এতটুকুও রাখেন নাই। "নিবেদিতা" এই নামটীতেই তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহার পরিচয় দিবার জন্য অন্য কিছুরই আর আবশ্যক হয় না।

বোসপাড়ার একটী ছোট বাড়ীতে নিবেদিতা থাকিতেন, এই বাড়ীতে

মেয়েদের পাঠশালাও বসিত। সাধারণ হিসাবে বিদ্যালয় বলিলে যাহা বুঝায় এই বিদ্যালয়টী সেরূপ ধরণের নহে, স্বামী বিবেকানন্দ যে ব্রহ্মচারিণীগণের মঠ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সেই সঙ্কল্পকে ভিত্তি করিয়া নিবেদিতা এই বিদ্যালয়ের স্থাপনা করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ের কার্য্যেই নিবেদিতা তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং এই বিদ্যালয়ের কার্য্যেই জীবন দান করিয়া গিয়াছেন। বোসপাড়ার একটী ছোট গলি—, তাহার ভিতর একটী ক্ষুদ্র বিদ্যালয়,—নিবেদিতার ন্যায় অসাধারণ প্রতিভাশালিনী একান্ত নিষ্ঠাব্রতাবলম্বিনী রমণী—যাঁহার পক্ষে পৃথিবীতে কোন কার্য্যে সফল হওয়াই অসম্ভব ছিল না, তিনি যে সমস্ত জীবন এই বিদ্যালয়ের জন্যই দান করিয়া গিয়াছেন, প্রথমে একথা শুনিলেই আশ্চর্য্য হইতে হয়, এবং এইরূপ ভাবে জীবন উৎসর্গ করাকে অনেকে শক্তির অযথা অপচয় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এই জন্য নিবেদিতাকে ও নিবেদিতার সঙ্কল্পিত কার্য্যকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে ভারতের পুনর্জ্জীবনলাভের উপায় সম্বন্ধে তাঁহার যাহা মত ছিল প্রথমে তাহাই বুঝিয়া লইতে হয়।

সকল মানবেরই একমাত্র সনাতন ধর্ম্ম মনুষ্যত্ব, সেই মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করিয়া তুলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষার উদ্দেশ্য একই, কিন্তু দেশ, কাল ও প্রয়োজনভেদে শিক্ষাপ্রণালী বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় শিক্ষা প্রণালী যেরূপ হওয়া উচিত নিবেদিতা তাঁহার "The web of Indian life" এবং "The Master as I saw him" নামক পুস্তকদ্বয়ে সে সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন, তাহা হইতেই আমরা তাঁহার মতের সারমর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—নিবেদিতা বলিয়াছেন "পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে "ভারতের সর্ব্বত্র একটা অশান্তভাবের উদয় হইয়াছে, সেই সঙ্গে উন্নতির জন্য শত শত সর্ব্বরোগহর ঔষধ আবিষ্কৃত হইতেছে। এই সকল উন্নতিকামীগণের ভিতর একদল সমাজ সংস্কারক, মনে করেন ভারতবর্ষের "কতকগুলি প্রাচীন সামাজিক প্রথা ধ্বংশ করিলেই মাতৃভূমির উন্নতি হইবে। সমাজ সংস্কারের জন্য এই সংস্কারকদলের প্রবল উৎসাহ দেখিয়া বুঝা যায়, ভারতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে প্রাণহীন হয় নাই। যদি ভারতের জীবন দীপ একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইত তাহা হইলে কি আর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংঘর্ষে "সংস্কারকরূপ এই সকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিষ্কাসিত হইত? কিন্তু এই উপর উপরের সংস্কারের চেষ্টায় ভারতবর্ষ প্রাচীন যুগের

ন্যায় এখনও বিচলিত হয় নাই। তাহাতে কি ইহাই বুঝায় না, যে, ভারতের আভ্যন্তরীন গভীরতা, গুরুত্ব ও সঞ্জীবতা এখনও প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান ?

"ভারতবর্ষের উন্নতিকামী আর একদল আছেন, তাঁহারা রাজনৈতিক আন্দোলনকারী। ভারতে পাশ্চাত্য "রাজনীতির প্রচলনই ভারতকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিবার প্রকৃষ্ট উপায় ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। বৈদেশিক রাষ্ট্রপরিচালন প্রণালীর মধ্যে অনেক নিয়মই যে ভারতের আত্মস্থ করিয়া লওয়া প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় "রাজনীতি" এই বাক্যের ব্যবহারই একরূপ ক্লেশকর আত্মপ্রবঞ্চনা (painful insincerity) ভিন্ন আর কিছুই নহে। অপর একদল আছেন যাঁহাদের মতে বিভিন্ন ধর্ম্মের কেন্দ্রগুলিকে সজাগ করিয়া তোলাই উন্নতির উপায়। তাহা ভিন্ন আর এক চতুর্থদল আছেন যাঁহাদের মতে "অর্থনীতি শাস্ত্রঘটিত দুর্ভাগ্যই" (economic grievences) ভারতের শোচনীয় অবস্থার একমাত্র কারণ, এবং তাহারই প্রতিকারের দ্বারা দরিদ্রভারতের দারিদ্রদশা দূর করিতে পারিলেই তাহার ভবিষৎ উন্নতির পথে আর বাধা থাকে না।"

নিবেদিতা বলিতেছেন যে, "এইরূপভাবে সামাজিক সংশোধনই হউক, রাজনৈতিক শিক্ষাই হউক, নির্জ্জীব ধর্ম্মভাবের স্পন্দন অথবা অর্থনৈতিক শাস্ত্রোক্ত অভাবপূরণ যাহাই হউক না কেন এই সকলেরই আধারস্বরূপ এই সকলের অপেক্ষা অধিক বাস্তব একটী পদার্থ আছে, তাহা ভারতবর্ষের জাতীয়ত্ব। এই জাতীয়ত্ব বিশাল ভারতের অসংখ্য সম্প্রদায়ের কোন সম্প্রদায়গত নহে, কিন্তু সকল সম্প্রদায়কেই এই জাতীয়ত্বরূপ মিলনসূত্রে বিবৃত করিয়া রাখিয়াছে। সমাজের দিক দিয়া, অর্থনীতি রাজনীতি অথবা ধর্ম্মনীতির দিক দিয়া যে কেহ উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা পরোক্ষ-ভাবে "জাতীয়ত্বকেই জাগ্রত করিয়া তুলিতেছেন। এই যে জাতীয়ত্বের অভ্যুদয় ইহা ভারতের প্রাচীন কলাবিদ্যার নববিকাশ স্বরূপ হইবে। ইহা ভারতের প্রাচীন পাণ্ডিত্য ক্ষমতার নব আলোচনা, পুরাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের একটী জীবন্ত নূতন ভাষ্য। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বিগত জাতির যথার্থ আত্মজ স্বরূপ উহা একটী নব আদর্শ। সেই নূতন আদর্শ যুবকগণের মধ্যে জীবন্তভাব সজাগ করিয়া তুলিবে এবং প্রাচীনগণের শ্রদ্ধার ভিত্তিস্বরূপ হইবে। এই নব আদর্শের সাফল্য ইহাতেই পরীক্ষিত হইবে যে ইহার প্রভাবে ভারতবর্ষের

প্রত্যেক ব্যক্তি সম্প্রদায় ও সমাজ জীবনস্পন্দনে স্পন্দিত হইবে। নিজের কেন্দ্রমধ্যে আয়ত্ত করিয়া রাখিবার ক্ষমতা এবং আপনাকে বিকশিত করিয়া তুলিবার ক্ষমতা উহা দ্বারা এরূপ বৃদ্ধি পাইবে যে এ পর্য্যন্ত ঐরূপ অজ্ঞাত আছে। জাতীয় জীবনের এই নব আদর্শ—বা ঐরূপ জাতীয়ত্ব ভারতে বিকাশ করিয়া তুলিবার জন্য দুইটী জিনিষের প্রয়োজন। প্রথম, মাতৃভূমির প্রতি প্রেম, জলন্ত প্রেম। যে প্রেম আত্মা হইতে, বিত্ত হইতে, পুত্র হইতেও অধিক হইবে। আপনার সম্প্রদায়ের প্রতি যে প্রেম লোকের এখন দেখা যায় তাহা অপেক্ষাও অধিক প্রেম করিতে হইবে, তাঁহাকে যিনি সকল সম্প্রদায়কে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছেন, সকল ধর্ম্মকেই আশ্রয় দিয়াছেন, সেই সর্ব্বধাত্রী মাতৃভূমিকে ভাই যেমন ভাইকে আপনা হইতেও অধিক ভালবাসে তেমনি মাতৃভূমির প্রত্যেক মনুষ্য ধনী দরিদ্র বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, বিভিন্ন ভাষা ভাষী, ভিন্ন মতাশ্রয় সকলেরই প্রতি এই প্রেম নির্ব্বিচারে আপনার উপর অপেক্ষা অধিক ঘনীভূত ভাবে প্রকাশিত হইবে। এই জলন্ত প্রেম সম্প্রদায়ের গণ্ডি ছাড়াইয়া সমগ্র ভারতবর্ষবাসীকেই এক করিয়া লইবে। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা। এই শিক্ষার অর্থ বাহিরের দ্রব্য আহরণ নহে, আপনার ভিতর হইতে এই শিক্ষাকে বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে।"

"ভারতবর্ষের শিক্ষার ভিত্তি ত্যাগ ও প্রেম। আত্মত্যাগেই প্রেমের জীবন, এবং প্রেমেই ত্যাগের উৎপত্তি ও ব্যাপ্তি। ত্যাগ অর্থে নিঃস্ব নহে, অক্ষয় ধনে ধনী হইবার পথই ত্যাগ, ত্যাগ অর্থে পরাজয় নহে, সংসার জগৎসমাজে বিজয়ী হইবার একমাত্র উপায়ই আত্মত্যাগ। কিন্তু সে ত্যাগ একেবারে স্বার্থ বোধমাত্র বিহীন হওয়া চাই, যাহার ত্যাগে অজ্ঞাতসারেও অভিমানের অথবা কামনার ছায়া স্পর্শ করে তাঁহার অমূল্য দান ও ধূলি মুষ্টির ন্যায় তুচ্ছ হইয়া যায়। নিবেদিতার মতে ইহাই ভারতবর্ষের সনাতন শিক্ষা। এই জাতীয় শিক্ষা বংশপরম্পরা হইতে ভারতবাসীতে অন্তর্নিহিত ভাবে আছে, তাহাকে জাগ্রত করিয়া তুলাই বর্ত্তমান শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষা যখন কেবল গ্রন্থে নিবদ্ধ থাকে তখন তাহা কতকগুলি বর্ণে অঙ্কিত রেখা মাত্র জ্ঞান, বুদ্ধির তুলিকায় তাহার অস্পষ্ট ছায়াময়ী মূর্ত্তি কখন অঙ্কিত করিতে পারিলেই উহাতে জীবন দিতে পারে না। শিক্ষা তখনই জীবন প্রাপ্ত হয় যখন তাহা মানবহৃদয়ে ভাবরূপে জাগ্রত হইয়া উঠে। তখন তাহার সমগ্র জীবনে, ছোট বড় প্রত্যেক কার্য্যে বাক্যে, চিন্তায় দিনে, রাত্রে প্রতি মুহূর্ত্তে

শিক্ষার সাফল্য প্রস্ফুটিত হয়।" নিবেদিতা এই ভাবেই ভারতবর্ষীয় রমণীগণের ভিতর শিক্ষা জাগ্রত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, এবং এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যও তাহাই ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার আবির্ভাবের প্রারম্ভে ভারতে রমণীগণকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য যখন প্রথম চেষ্টা হইয়াছিল তখন সমাজ তাহার বিরোধী হইয়াছিল। তখন অনেকেরই বিশ্বাস হইয়াছিল যে ভিন্ন প্রদেশীয় রমণী হইতে ভারতরমণীর যে কৌলিক বিশেষত্ব তাহা এই পাশ্চাত্য অনুকরণের শিক্ষায় ধ্বংশ হইয়া যাইবে। ঐ বিরোধের ফলেই পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল বন্যায় আমাদের তৎকালীন যুবক সমাজ একেবারে ভাসিয়া যাইলেও পাশ্চাত্য শিক্ষার ঐরূপ মোহকারী প্রভাব ভারতবর্ষের অন্তঃপুরে সেরূপভাবে বিস্তৃত হইতে পারে নাই। পতি, পুত্র, পরিবার, আত্মীয়, স্বজন, প্রতিবাসী পরিচিতের নিয়ত কল্যানধ্যানে দেহবোধ পর্য্যন্ত বিরহিতা নিয়ত শ্রমপরায়ণা আমাদের পূর্ব্ব-পিতামহীগণের জীবন যাপনের স্মৃতি বিশুষ্ক বকুল-মালার সৌরভের ন্যায় ভারতবর্ষের অন্তঃপুরেই রক্ষিত ছিল, নবশিক্ষার প্রবল ঝটিকায় তাহা একেবারে উড়িয়া যায় নাই। ভগিনী নিবেদিতা সুদূর প্রতীচ্য দেশ হইতেও সেই সৌরভে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

রমণী, জাতীর জননী। একটী দীপ হইতে আর একটী দীপ জ্বালিবার মত মায়ের জীবনের আলো হইতেই সন্তানের জীবন দীপ প্রজ্জ্বলিত হয়। নিবেদিতা তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন "সমস্ত পৃথিবীতে রমণীই ন্যায়ের আদর্শের রক্ষাকর্ত্রী। বালক নিঃসহায়ের শবদেহ দাহঘাটে লইয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইবে না, যদি না যখন সে শিশু ছিল তখন তাহার জননী এইরূপ ভাবের সৎকার্য্যেরপ্রশংসায় তাহার চিত্ত পরিপূর্ণ করিত। স্বামী তাহার হৃদয়ের উচ্চভাব লইয়া গৃহে ফিরিতে এত চেষ্টাশীল হইত না, যদি না তাহার স্ত্রী স্বামীর সেই সকল চরিত্রগত উন্নত গুণগুলি স্মরণ করিয়া সুখী হইত? তদ্ব্যতীত দেখিতে পাওয়া যায় রমণীগণ প্রত্যেক কার্য্যে এবং তাহাদিগের সম্পূর্ণ জীবন উচ্চ আদর্শের দৃষ্টান্ত স্বরূপে দান করে।"

রমণী স্থিতি বিধায়িনী। কুলে ক্রমাগত শোণিতধারায় প্রবাহিত যে সকল মহৎভাব আজ পর্য্যন্ত ভারত রমণীর প্রকৃতির মধ্যে রক্ষিত আছে, স্বামী বিবেকানন্দ সেই সকল ভাবকেই শিক্ষা সংস্কারের দ্বারা নবভাবে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিতে চাহিয়া ছিলেন। স্বামীজীর সেই ইচ্ছাকে অনুবর্ত্তন করিয়াই ভগিনী নিবেদিতা এই শিক্ষালয়ের কার্য্যে তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

যদিও ইহার আয়োজন বৃহৎ নহে, তথাপি নিবেদিতা জানিতেন অগ্ন্যুৎপাদনের প্রয়োজন হইলে রাশি রাশি ইন্ধন সংগ্রহে জীবন যাপনই একমাত্র আবশ্যকীয় নহে। সামান্য ইন্ধনে অগ্ন্যুৎপাদিত করিয়া ধীরে ধীরে উহার পোষণ করিতে পারিলে কালে উহা আপনা হইতেই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল, এই বিদ্যালয় হইতেই ভারতবর্ষে মৈত্রেয়ী, গার্গীর পুনরভ্যুদয় হইবে।

এই শিক্ষালয়ে ছোট ছোট বালিকা হইতে বয়ঃপ্রাপ্ত, বধূ, গৃহিণী ও বিধবাগণ সকলকেই যিনি যেরূপভাবে শিক্ষালাভ করিতে চাহেন তাঁহাকে সেইরূপভাবে শিক্ষা দিবার ব্যাবস্থা ছিল। ভাষা, অঙ্ক, শিল্পকার্য্য, সেলাই এবং চিত্রবিদ্যা ও শিক্ষা দেওয়া হইত। নিম্নশ্রেণীর ছোট ছোট মেয়েদের উচ্চশ্রেণীর মেয়েরাই শিক্ষা দিত। উচ্চ শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে তিন চারিটা বিধবা ও ছিল, ইহারা এই বিদ্যালয়ের কার্য্যেই জীবন সমর্পণ করিবে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিল। শ্রীমতী সুধীরা যিনি এই উচ্চশ্রেণীর মেয়েদের শিক্ষয়িত্রী এবং সমস্ত বিদ্যালয়ের পরিচালিকা ছিলেন, তিনি চিরকুমারী ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি স্বেচ্ছায় বিদ্যালয়ের কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

তাঁহার ন্যায় উন্নতমনা ও ধর্ম্মপরায়ণা রমণী অতি দুর্ল্লভ। সন্তানের কল্যাণে মাতার যেরূপ প্রাণপণ চেষ্টা, বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের কল্যাণের জন্য তাঁহার চেষ্টা ও সেইরূপ ঐকান্তিক ছিল, এবং ছাত্রীরাও তাঁহাকে মনের সঙ্গে ভালবাসিত ও সকল প্রকারে তাঁহার আদেশ পালনের চেষ্টা করিত। শিক্ষালয় পরিচালনে সুধীরাদেবীই নিবেদিতার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন।

এই শিক্ষালয় বাড়ীটী তেমন স্বাস্থ্যকর নয়। উপরের ঘরগুলি খুব ছোট ছোট, ছাত ও নীচু। গ্রীষ্মকালের দ্বিপ্রহরে সেই ঘরগুলি এত গরম হইত যে, কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে থাকিলেই মাথা ধরিয়া যাইত।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসীর পক্ষে এইরূপ গরম অনেকটা অভ্যস্ত, কিন্তু শীতপ্রধান দেশের অধিবাসীর পক্ষে গ্রীষ্মকালে সেরূপ গৃহে বাস করা কিরূপ কষ্টকর তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

নিবেদিতার ঘরে গ্রীষ্মনিবারণের জন্য টানা পাখাও ছিল না, কেবল একখানি হাতপাখা সর্ব্বদা তাঁহার কাছে থাকিত। তাঁহার ছোট ঘরটী তিনি

নিজের ইচ্ছামত সাজাইয়াছিলেন। সেই ঘরের ভিতর দিনের অধিকাংশ সময়ই তিনি কাযের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন। বেশীর ভাগই লেখাপড়ার কায। কাযে তাঁহার মন এত নিবিষ্ট থাকিত যে সে সময় শীতগ্রীষ্ম বোধ থাকিত না। আমরা দেখিয়াছি কখন কখনও কাজ ছাড়িয়া যখন তিনি বাহিরে আসিতেন তখন অসহ্য গরমে তাঁহার মুখ চোখ রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপে এক একবার এ ঘর ও ঘর ঘুরিয়া ছাত্রীরা কে কোথায় কি করিতেছে তাহা তিনি দেখিয়া আসিতেন, কপালে হাত দিয়া মাঝে মাঝে চাপিয়া ধরিতেছেন দেখিয়া শিক্ষয়িত্রীদিগের কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "মাথায় বড় কষ্ট।" আবার তখনই গিয়া কাগজ কলম লইয়া বসিতেন।

এই যে লেখাপড়ার কায, ইহা ও বিদ্যালয়েরই জন্য। বিদ্যালয়ের অর্থানুকুল্যের জন্যই তাঁহার পুস্তক লিখিবার অধিক প্রয়োজন হইত। যখন খরচের টানাটানি পড়িত, তখন নিজের সম্বন্ধে কোন খরচটা কমাইতে পারা যায় সেই দিকেই তাঁহার দৃষ্টি পড়িত, নিজের শরীর পোষণে যে যৎসামান্য ব্যয় তাহাও যেন তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিত। ইহার ফলে, শারীরিক অনিয়মে তাঁহার শরীর দিন দিন রক্তহীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িত, তখন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য স্থানপরিবর্ত্তনে যাইতে হইত। মনের একাগ্রতার জন্য শরীর সম্বন্ধে তাঁহার লক্ষ্যই ছিল না, সে জন্য শরীর যে দিন দিন ভগ্ন হইতেছে তাহা যেন তিনি বুঝিতেই পারিতেন না।

বিদ্যালয়ের জন্য সাহায্যার্থি হইয়া যদিও তিনি দ্বারে দ্বারে দাঁড়ান নাই, তথাপি বিদ্যালয়ের আর্থিক অনাটনের বিষয় আমাদের দেশবাসীগণের যে একেবারেই অজ্ঞাত ছিল তাহা নহে।

এই বিদ্যালয়ের আর একটী শাখা বিদ্যালয় ছিল, সেটীতে কেবল ছোট মেয়েদেরই শিক্ষা দেওয়া হইত। আর্থিক অভাবের জন্য নিবেদিতা যখন কোনরূপে সেই পাঠশালাটীকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, তখন মাসিক ত্রিশটী টাকা যদি সাহায্য পান সে জন্য কয়েকবার বেঙ্গলী কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে ও যখন কিছু ফল হইল না তখন পাঠশালাটী তুলিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার "ভগিনী নিবেদিতা' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "তিনি যে ইহার ব্যয় বহন করিয়াছেন তাহা চাঁদার টাকা হইতে নহে, উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে নহে, একেবারেই উদরান্নের অংশ হইতে।"

এখন আর নিবেদিতা নাই, নিজে অর্দ্ধাশনে অনশনে থাকিয়াও তিনি যে ভারতবর্ষে একমাত্র জাতীয় রমণী বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন কখনও কি দেশবাসীব সে বিদ্যালয়ের দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর ঘটিবে না ?

বড় মেয়েদের শিক্ষা দিবার ভার শ্রীমতী সুধীরাব উপর ছিল, নিবেদিতা যখন অবসর পাইতেন তখনই তিনি ছাত্রীদের শিক্ষাব ভাব লইতেন গণিত ও চিত্রবিদ্যা এই দুইটাই তিনি বেশীব ভাগ শিক্ষা দিতেন। অবসব মত ইংরাজী ভাষাও শিখাইতেন। তাঁহাব শিখাইবাব প্রণালী অত্যন্ত সুন্দর ও নূতন ধরণের। যে প্রণালীতে তিনি গণিত ও চিত্রবিদ্যা শিখাইতেন, তাহাতে যাহাদের শিখিবার ও বুঝিবার ক্ষমতা কম, তাহারাও অতি সহজে বুঝিয়া লইত। ছোট ছোট মেয়েরা খেলা কবিতে করিতে তেঁতুলের বীজ অথবা অন্য কোন ফলের বীজ দিয়া প্রথমে গণনা শিখিত। জোড় কি বিজোড় খেলাতাই প্রথমে ছোট ছোট মেয়েদেব যোগ বিয়োগ অভ্যাস হইত, তাহার পব তাহারা শ্লেটে অঙ্ক বাখিয়া অঙ্ক কসিতে শিখিত। শিক্ষালয়ের বড় মেয়েবা ছোট মেয়েদেব শিক্ষা দিত, নিবেদিতা তাহাদেব শিক্ষা দিবার প্রণালী সম্বন্ধে যেরূপ ভাবে উপদেশ দিতেন তাহার কিছু এখানে তাঁহাব নিজের কথাতেই দিলাম,—"মেয়েবা যদি কিছু না জানে তবে তাহাদের বলিবে আচ্ছা আমরা চেষ্টা কবিব, তাহা হইলে নিশ্চয় শিখিতে পারিব।" "মেয়েরা যদি কিছু বলিতে পাবে আব কিছু ভুল করে তবে তাহাদের বলিবে হাঁ, হইল কিন্তু আমরা আবও ভাল কবিতে চেষ্টা কবিব।" "যদি কোন মেয়ে ঠিক করিয়া বলিতে পারে তবে তাহাকে বলিবে ঠিক্, ঠিক।" "এবং অন্য মেয়েদেব বলিবে আমরা ও পারিব আবার আমরা চেষ্টা কবিব।" কথা বলিবাব সময় তিনি কতকগুলি কথার উপব জোর দিয়া বলিতেন। "নিশ্চয়" এই কথাটীব উপব জোব দিয়া বলিতেন। আবার যখন কাহাবও কোন বিষয় ঠিক হইত তখন ঠিক্, ঠিক। বলিয়া বলিবার মত আনন্দে হাততালি দিতেন। লেখায় অথবা অঙ্কে যদি ভুল থাকিত তবে তখনই তাহা ভাল করিয়া কাটিয়া দিতেন এবং সর্ব্বদা বলিতেন "ভুল কখনও রাখিবে না। ভুল বুঝিবামাত্র কাটিয়া দিবে।"

ভারতবর্ষীয় ভাস্কর্য্য ও চিত্র প্রভৃতি কলাবিদ্যার উপব তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। ভারতীয় ভাস্কর্য্য, চিত্র ও কলাবিদ্যা সকলেরই মূলে আধ্যাত্মিকতার বীজ নিহিত আছে ইহা তিনি মনের সঙ্গে বিশ্বাস করিতেন।

সুনিপুন চিত্রকরের অঙ্কিত একখানি চিত্র অপেক্ষা মেয়েদের হাতের আঁকা পিঁড়ি আল্পনা তাঁহার নিকট অধিক আদরের ছিল। একটী মেয়ের হাতের আঁকা আল্পনা তিনি তাঁহার শয়নগৃহে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া ছিলেন, সেই আল্পনার মধ্যে একটী বড় শতদল পদ্ম ও চারিপাশে ছোট ছোট যুঁই-ফুলের মত ফুল ছিল। এই আল্পনা তাঁহার এত ভাল লাগিয়াছিল যে, যে কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তাহাকেই তিনি সেই আল্পনা দেখাইতেন। তিনি সকলের কাছেই বলিতেন, "কুমার স্বামী এই আল্পনার অনেক প্রশংসা করিলেন।" কুমার স্বামী যে তাঁহার ছাত্রীর অঙ্কিত আল্পনার প্রশংসা করিয়াছেন এ আনন্দ তাঁহার আর রাখিবার স্থান ছিলনা। পদ্মফুলের চিত্র বিশেষতঃ সহস্রদল শ্বেতপদ্মের চিত্র তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল, তিনি বলিতেন এই ফুল ভারতবর্ষীয় ভিন্ন অন্য কেহ আঁকিতে জানে না। আল্পনার পদ্মের চারিপাশের ছোট ছোট ফুল দেখাইয়া তিনি প্রায়ই বলিতেন কি সুন্দর সাদা ছোট ফুল। এই ছোট ফুলগুলি সকলে ঐ বড় ফুলের দিকেই মুখ ফিরাইয়া আছে, যেন বলিতেছে, আমরা তোমার কাছেই যাইতে চাই।" নিবেদিতা মেয়েদের পাথরে ও মাটীতে ছাঁচ কাটার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। ছাঁচ কাটিবার জন্য একরাশি মাটী ও নরুণ আনিয়া সকল মেয়েদের সঙ্গে লইয়া "আমরা সকলেই শিখিব" বলিয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত ছাঁচ কাটিতে বসিতেন। তাঁহার এই উৎসাহে অনেক মেয়ে ছাঁচ কাটিতে অভ্যাস করিতেছিল। যে প্রথম যে ছাঁচটী প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে আনিয়া দিত সেটী যতই খারাপ হউক না কেন তিনি অতি আদরের সঙ্গে লইতেন এবং দেবতার প্রসাদ যেমন লোকে মাথায় ধারণ করে সেইরূপ ভাবে মাথায় ছুঁয়াইয়া নিজের ঘরে সাজাইয়া রাখিতেন। ছোট মেয়েরা তাঁহাকে ছোট ছোট পুতুল গড়িয়া আনিয়া দিত, সে পুতুল গুলি একটী বাক্সে করিয়া রাখিতেন। তাঁহার ঘরে মেয়েদের হাতে প্রস্তুত এই সকল দ্রব্য স্তরে স্তরে সাজানো থাকিত, এক একদিন সব মেয়েদের একত্র করিয়া তাহাদের হাতের শিল্প কেমন ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে তাহা দেখাইতেন। মেয়েদের সপ্তাহের মধ্যে একদিন করিয়া সংস্কৃত শিখানো হইবে এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল। নিবেদিতা বলিলেন "যেদিন মেয়েদের হাতে তালপাতে লেখা সংস্কৃত শ্লোক আমার ঘরের দেয়ালে শোভা পাইবে সে দিন কি আনন্দের দিনই হইবে।"

সপ্তাহের মধ্যে একদিন অথবা দুইদিন তিনি ইতিহাস পাঠ দিতেন, সে সময় তিনি এতই তন্ময় হইয়া যাইতেন যে তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইত তিনি কোথায় আছেন ও কাহাদের নিকট বলিতেছেন তাহা ও তাঁহার মনে নাই। এক দিন রাজপুতানার ইতিহাস বলিতে বলিতে তিনি যখন চিতোর গিয়াছিলেন তাঁহার সেই সময়ের ভ্রমন কাহিনী বলিতে ছিলেন। "আমি পাহাড়ে উঠিয়া পাথরের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিলাম, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পদ্মিনী দেবীর কথা স্মরণ করিলাম" বলিতে বলিতে নিবেদিতা যথার্থই চক্ষুমুদ্রিত করিয়া হাত যোড় করিয়া বসিলেন। নিবেদিতার তখনকার মুখের ভাব যিনি দেখিয়াছেন তিনি আর ভুলিতে পারিবেন না। নিবেদিতা বলিতে লাগিলেন "অনল কুণ্ডের সম্মুখে পদ্মিনী দেবী হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমি চোখ বুজিয়া পদ্মিনীর শেষ চিন্তা মনে আনিতে চেষ্টা করিলাম। আঃ কি সুন্দর! কি সুন্দর! বলিতে বলিতে ভাবাবেশে মুগ্ধা নিবেদিতা কিছুক্ষণ মুদ্রিত নেত্রে নীরব হইয়া রহিলেন। তিনি যে স্কুল ঘরে বালিকাদের সম্মুখে বসিয়া তাহাদের ইতিহাস পাঠ দিতেছেন তাহা আর তাঁহার মনে নাই পদ্মিনীর শেষ চিন্তায় সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার মন লয় হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার এই তন্ময়ভাব কতবার দেখিয়াছি। ভারতবর্ষের কথা উঠিলেই তিনি একেবারে ভাবমগ্ন হইয়া যাইতেন। মেয়েদের বলিতেন "ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ!! ভারতবর্ষ!!! মা! মা! মা! ভারতের কন্যাগণ! তোমরা সকলে জপ করিবে ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! মা! মা! মা"! বলিয়া নিজের জপ মালা হাতে লইয়া নিজেই জপ করিতেন মা! মা! মা! ভারতবর্ষ যে তাঁহার কি প্রাণের প্রিয় ছিল তাহা বলিয়া বুঝাইবার ভাষা খুঁজিয়া পাইনা। কে জানে কে তাঁহার চোখে এমন সোনার কাজল পরাইয়া দিয়াছিল যে তাঁহার নিকট সকলই সুবর্ণময় হইয়া গিয়াছিল। কে জানে তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে দীক্ষা দিয়া মৃণ্ময়ীর ভিতর কি চিণ্ময়ী প্রতিমার অধিষ্ঠান দেখাইয়া ছিলেন তাই ভারতের ধূলিকনার ভিতরও তিনি আধ্যাত্মিকতারূপ অমৃত রসের আস্বাদ পাইয়াছিলেন সেই অমৃত পানে বিভোর হইয়া তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, কত লোক তাহা শুনিয়া তাঁহাকে পাগল বলিবে। কিন্তু ধন, মান, যশঃ লইয়া যাহারা পাগল তাহারা এমন পাগলের কথা বুঝিবে কি করিয়া?

বাঙ্গলাভাষা ভাল করিয়া শিখিবেন ইহা তাঁহার বহুদিনের বাসনা ছিল, কিন্তু সময়ের অভাবে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়া শিখিতে পাবেন নাই বলিয়া বাঙ্গলাভাষা ভাল করিয়া আয়ত্ব করিতে পারেন নাই। তথাপি এক একটী ছোট ছোট কথা যখন যাহার নিকট শিখিবার সুবিধা পাইতেন, শিখিয়া লইতেন। সে সময় যদি একটী ছোট মেয়ে ও তাঁহার শিক্ষয়িত্রী হইত, তাহার নিকটে ও তাঁহার বিনীতা ছাত্রীর ন্যায় আচরণ দেখা যাইত। একটী নূতন কথা শিখিলেই ক্ষুদ্র বালিকার মত আনন্দে অস্থির হইতেন। একদিন কোন মেয়ে শ্লেটে দাগ টানিতে টানিতে বলিয়াছিল "লাইন টানিতেছি।" "লাইন" এই শব্দটী শুনিবামাত্র নিবেদিতা তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন "আপনার ভাষায় বল।" কিন্তু "লাইন" এর বাঙ্গলা প্রতি শব্দটী যে কি তাহা কোন মেয়েই ভাবিয়া পাইল না। সকলেই বলিতে লাগিল "সিষ্টার, আমরা তো বরাবরই লাইনই বলি।" দুঃখে বিরক্তিতে নিবেদিতার মুখ লাল হইয়া উঠিল, নিবেদিতা বলিলেন "তোমরা আপনার ভাষাও ভুলিয়া গেলে?" তাহার পর একটী মেয়ে বলিল "লাইনের বাংলা রেখা।" তখন আর নিবেদিতার আনন্দের সীমা রহিল না, যেন তিনি একটী হারাণো জিনিস কুড়াইয়া পাইয়াছেন। বার বার "রেখা, রেখা রেখা" উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

নিবেদিতা যখন ছবি আঁকিতে শিখাইতেন তখন সকল মেয়েকে সারি দিয়া বসাইতেন, ছোট বড় কাহাকেও বাদ দিতেন না। শিক্ষয়িত্রীরাও সে সময় ছাত্রীদের শ্রেণীভুক্ত হইতেন সিষ্টার ক্রিশ্চিয়ানাও এই সময়ে সকলকে উৎসাহিত করিবার জন্য ছাত্রীদলভুক্ত হইয়া বসিতেন। ক্রিশ্চিয়ানা ছোট মেয়েদের কাছে ঘেঁসিয়া বসিতেন। এবং এমন ভাব দেখাইতেন যেন তাঁহার বড় ভয় যে তাঁহার আঁকা ছবি ভাল হইবে না। তাহা দেখিয়া মেয়েরা সকলে খুব হাসিত।

মেয়েরা প্রত্যেকে, রং তুলী পেন্সিল ও একখানা করিয়া কাগজ পাইতেন, নিবেদিতার নিজের হাতেও তুলি আর কাগজ থাকিত, তিনি প্রায়ই প্রথমে পেন্সিল দিয়া একটী বৃত্ত আঁকিতেন, সেই কাগজখানি হাতে লইয়া কি রকম ভাবে হস্ত চালনা করিয়া বৃত্ত আঁকিতে হইবে প্রত্যেক মেয়ের কাছে দাঁড়াইয়া এক একবার দেখাইয়া দিতেন।

মেয়েরা প্রথমে পেন্সিলের উল্টাপিঠ দিয়া কাগজে দাগ না পড়ে অথচ

সমভাবে রেখা টানিবার মত হস্তচালনা অভ্যাস হয় এইরূপভাবে কাগজের উপর দাগা বুলাইবার মত পেন্সিল বুলাইত তাহার পর দ্রুতহস্তে রেখা টানিত। এইরূপ রেখা হইতে আরম্ভ করিয়া নানারূপ চিত্র আঁকা হইত।

বিদ্যালয়টী যেন মেয়েদের একটী আনন্দ নিকেতন ছিল। বড় মেয়েরা যাহারা বিদ্যালয়ে আসিত তাহারা কেহই অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বধূ বা কন্যা নহে, এজন্য তাহাদের সংসারের কাজ শেষ করিয়া তাহার পর আসিতে হইত। স্কুলে আসিতে হইবে এই উৎসাহে মেয়েরা সকাল হইতে প্রাণপণে সংসারের কাজ শেষ করিত। নিবেদিতা প্রায়ই মাঝে মাঝে তাঁহার ছাত্রীদের দক্ষিণেশ্বর অথবা কলিকাতার অন্য কোন স্থানে বেড়াইতে লইয়া যাইতেন, সে সময় ছাত্রীদের যথাসম্ভব আতিথ্য ও করিতেন। আবার গ্রীষ্মাবকাশ প্রভৃতির সময়েও বিদায়কালে মেয়েদের খাবার খাওয়াইতেন। ছাত্রীর সংখ্যা কম নহে, তিনিও দরিদ্র, অপর্য্যাপ্ত সামগ্রী কোথায় পাইবেন? যে খাবার আনিতেন, ছাত্রীর সংখ্যা গণনা করিয়া সকলের জন্য ছোট ছোট একটী করিয়া সুন্দর শালপাতের ঠোঙ্গা গড়িতেন, তাহারই ভিতর খাবার রাখিয়া ঝুড়ি হাতে একে একে সকলকে পরিবেষণ করিতেন। আবার খাওয়া শেষ হইলে মেয়েরা ঠোঙ্গা ফেলিবে বলিয়া নিজেই ঝুড়ি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন, এইরূপে তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র অতিথিগণের আতিথ্য সৎকার সমাধা করিতেন।

পুরী, ভুবনেশ্বর অথবা ঐরূপ কোন স্থানে মাঝে মাঝে মেয়েদের বেড়াইতে লইয়া যাইতে তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল, অনেকবার এইরূপ যাইবার প্রস্তাবও হইয়াছে, কিন্তু অর্থাভাববশতঃ ঘটিয়া উঠে নাই। নিবেদিতা দেশ ভ্রমণের বিশেষতঃ তীর্থ ভ্রমণের অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি নিজে ভারতবর্ষের সকল তীর্থই প্রায় ভ্রমণ করিয়াছেন। সেই সকল ভ্রমণ কাহিনী মেয়েদের নিকট গল্প করিতেন। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে বদরিকাশ্রমে গিয়াছিলেন, মেয়েদের নিকট যখন তাঁহার বদরিকা যাত্রার পথের কাহিনী বর্ণনা করিতেন, তখন মনে হইত এইমাত্র যাহা দেখিতেছেন, তাহাই যেন বলিতেছেন। নিবেদিতা পথে অলকানন্দার তীরে এক বৃদ্ধাকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার কথা মেয়েদের কাছে বলিতেছেন "তিনি (সেই বৃদ্ধা) স্নান করিয়া উঠিয়াছেন, তখনও ভিজা কাপড় পরিয়া আছেন। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার মাথার চুল সাদা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তিনি শীতকে গ্রাহ্য করেন না। অলকানন্দা নদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া যোড়হাতে (বলিতে বলিতে নিবেদিতা হাত যোড় করিলেন) সূর্য্যের দিকে

মুখ ফিরাইয়া তিনি প্রণাম করিতেছেন। কি সুন্দর! কি সুন্দর তাঁহার মুখ। আমি আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।" আবার বদরিকার পথে আর এক স্থানে একজন প্রাচীনা পথে চলিয়াছেন, নিবেদিতা তাঁহার কিছুদূরে পিছনে চলিতেছেন। নিবেদিতা বলিতেছেন "তুষার গলিয়া গিয়াছে, পিছলে তাঁহার পা সরিয়া যাইতেছে। আমার ভয় হইল, তিনি হয়তো পড়িয়া যাইবেন। তিনি কি আমার সাহায্য গ্রহণ করিবেন? আমি তাঁহার বাহু ধরিতে পারি কি? আমি তাঁহার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলাম, তিনি আমার দিকে চাহিয়া হাসিলেন। আঃ কি সুন্দর সে হাসি। তিনি আপনার যষ্টির উপর ভর দিয়া চলিয়া গেলেন।"

"তিনি কি আমার সাহায্য গ্রহণ করিবেন?" নিবেদিতার এই কথা বেদনার মত হৃদয়ে আঘাত করে। নিবেদিতা যখন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে যাইতেন তখন যেন কত দীন হীন এইভাবে প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। তিনি জানিতেন, মন্দিরে উঠিয়া দেবীদর্শন করিবার অধিকার তাঁহার নাই। কিন্তু মন্দিরে যাঁহারা দেবীর পূজা করিতেন তাঁহাদের মধ্যে নিবেদিতার মত অধিকারী কি কেহ ছিল? যাঁহার চরণধূলি স্পর্শে লোক পবিত্র হয়, তিনি নিজেকে অস্পৃশ্য ভাবিয়া সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হইতেন। যে সর্ব্বত্যাগিনী, গৃহ, সমাজ, সামাজিক সম্মান, আত্মীয় স্বজনের দুশ্ছেদ্য স্নেহপাশ সকলই পরিহার করিয়া ভারতের কল্যাণে নিঃশেষভাবে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন ভারতবাসী কি তাঁহাকে আপনার গৃহে, পরিবারে, হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছিল? তাহা যদি হইত তবে এত শীঘ্র আমরা তাঁহাকে হারাইতাম না।

বদরিকার তুষার পিচ্ছিল পথে প্রাচীনা রমণী যে নিবেদিতার সাহায্য করিবার জন্য সাগ্রহ প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়া হাসিয়া আপনার যষ্টির উপর ভর দিয়াই চলিয়া গেলেন নিবেদিতা তাহাতে ক্ষুব্ধ অথবা দুঃখিত হন নাই। বরং আনন্দিতা হইয়াছিলেন। নিবেদিতা বলিয়াছেন "কি সুন্দর সে হাসি!" নিবেদিতার বলিবার ভাবে বোধ হয় ক্ষুদ্র বালিকা তাহার জননীকে সাহায্য করিতে চাহিলে মা যেমন মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া হাসেন সে হাসিতে উপেক্ষা প্রকাশ পায় না বরং অক্ষম চেষ্টার প্রতি স্নেহ ও আত্মনির্ভরের ভাবই প্রকাশ পায় প্রাচীনার হাসিতেও সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছিল।

এই ভাবটী নিবেদিতার বড় শ্রদ্ধার সামগ্রী ছিল। নিবেদিতা ইহাকে ভারতবর্ষের বংশগত ভাব বলিয়া গ্রহণ করিতেন "তিনি ভারতবাসী" নিবে-

দিতা অতি সম্ভ্রমের সঙ্গে এই কথা উচ্চারণ করিতেন। শুনিয়াছি নিবেদিতার কাছে যে গোয়ালা দুধ দিত, সে একদিন তাঁহার নিকট ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছু উপদেশ চাহিয়াছিল। নিবেদিতা তাহার কথা শুনিয়া নিতান্ত সঙ্কুচিত হইলেন, এবং আপনাকে অপরাধী মনে করিয়া বার বার তাহাকে নমস্কার করিলেন। বলিলেন "তুমি ভারতবাসী, তুমি আমার নিকট কি উপদেশ চাও? তোমরা কি না জান? তুমি শ্রীকৃষ্ণের জাতি, তোমাকে আমি নমস্কার করি।"

মেয়েদের কখন কখন তিনি যাদুঘর (মিউসিয়াম) দেখাইতে লইয়া যাইতেন। মিউসিয়ামের যে সব গৃহে প্রাচীনকালের স্থাপত্যের নিদর্শন আছে সেই-সব গৃহই ভাল করিয়া দেখাইতেন। বৌদ্ধযুগের ভাস্কর নির্ম্মিত প্রস্তরময় মূর্ত্তি ও স্তম্ভ প্রভৃতি যে গৃহে আছে একদিন সেই গৃহে মেয়েদের লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে নিবেদিতা একখানি শিলালিপির নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া মেয়েদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন "এই প্রস্তরের নাম 'কাম্য প্রস্তর' মহারাজ অশোক এই প্রস্তরের নিকট বসিয়া কামনা করিয়া ছিলেন, এসো আমরা সকলে এখানে কামনা করি।" বলিয়া সেই প্রস্তরমূলে মেয়েদের সকলকে লইয়া উপবেশন করিলেন এবং "তোমরা সকলেই মনে মনে কামনা কর" বলিয়া নিজে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। আবার যখন মেয়েদের জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কি কামনা করিয়াছিলে?" মেয়েরা উত্তর দিতে ইতঃস্তত করিতেছে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন "ঠিক কাম্য মন্ত্র মনে মনেই জপ করিবে।"

ধর্ম্ম সম্বন্ধে কখনও তিনি কাহারও সহিত আলোচনা অথবা তর্ক-বিতর্ক করিতেন না কিন্তু তাঁহার জীবনকেই একখানি জীবন্ত ধর্ম্মশাস্ত্র বলা যায়। তাঁহার হৃদয়ে যে প্রবল আধ্যাত্মিকতার পিপাসা ছিল সে পিপাসা কলসীর জলে পূর্ণ হইবার নহে। তিনি যে দেশে, যে সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেখানে রমণীর স্বাধীনতা অব্যাহত, সমাজে তাঁহাদের উচ্চসম্মান, জীবনের পথে যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকেই পথ নির্ণয় করিয়া লইবার অধিকার তাঁহাদের আছে নিবেদিতা ও নিজের জীবনের পথের লক্ষ্য নিজেই স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি ও অনন্যসাধারণ প্রতিভা ছিল তাহাতে সমাজ তাঁহাকে রমণীকুলের বরেণ্যা ও শীর্ষস্থানীয়া বলিয়া গ্রহণ করিত। তথাপি নিবেদিতা

জীবনের সেই পুষ্পাস্তীর্ণ পথ পরিত্যাগ করিয়া এমন এক দুর্গম পথে চলিয়া ছিলেন যে লোকে তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে নিবেদিতার এই আজীবন তপস্যাকে সতীর তপস্যার সহিত তুলনা করিয়াছেন। বাস্তবিকই নিবেদিতা মূর্ত্তিমতী তপস্যাই ছিলেন। তপস্যা ও তাঁহার জীবন মিলিয়া মিশিয়া যেন এক হইয়া গিয়াছিল। তপঃসমুদ্রের তীরে বসিয়া অঞ্জলি বারিপানে তাঁহার তৃষ্ণা দূর হয় নাই, তিনি একেবারে সেই সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কথাতেই বলিতে পারি তাঁহার চিত্ত "ভাবৈক রস" হইয়া পরম কল্যানে স্থিত হইয়াছিল।

ভাব মানব সমাজে প্রাণস্বরূপ, ভাবহীন সমাজ মৃতপ্রায়। কর্ত্তব্যের পাষাণ মূর্ত্তিতে ভাবই প্রাণদান করে। ভাবের তরঙ্গমালাই কর্ম্মপ্রবাহে নির্ম্মল স্রোতা স্রোতস্বিনীর প্রাণময়ী গতি আনিয়া দেয়। নিবেদিতা যাহা করিতেন তাহা কেবল মাত্র কর্ত্তব্য বুদ্ধিতেই করিতেন না, উহাতে হৃদয়ের ভালবাসা ঢালিয়া দিতেন। কর্ত্তব্য বুদ্ধি কৃতকার্য্য হইতে আপনাকে পৃথক্ করিয়া রাখে, ভালবাসা কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে মিশাইয়া দেয়। কর্ত্তব্যের দান দীনের প্রতি দয়া, ভালবাসার দান পরমাত্মীয়ের ন্যায় তাঁহার কল্যানে জীবন সমর্পণ। নিবেদিতা ভালবাসিয়া ভারতবর্ষকে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন, কেবল কর্ত্তব্য বোধে করেন নাই।

তিনি কোন কোন দিন মেয়েদের নিকট তাঁহার গুরুদেবের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিতেন। কিন্তু গুরুদেবের নাম মাত্র উল্লেখে তাঁহার অন্তর ভাবরসে এতই পরিপূর্ণ হইত যে অধিক কথা বলা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইত। কেবল গুরুদেবের সম্বন্ধে এই একটী মাত্র কথা তিনি বার বার বলিতেন "তাঁহার নাম বীরেশ্বর তিনি বীরদিগের ঈশ্বর ছিলেন। পৃথিবীর বীরগণ তাঁহার পদানুসরণ করিয়া চলিবে। তোমরা সকলে ছোট ছোট সুখ দুঃখ ছাড়িয়া বীর হও।" 'বীর" এই কথাটীর উপর তিনি সব সময়ই জোর দিয়া বলিতেন।

মেয়েদের পড়িবার ঘরে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি চিত্র ছিল। অপর দিকের দেয়ালে মানচিত্র টাঙ্গানো থাকিত। নিবেদিতা এক দিন মানচিত্রখানি আনিয়া পরমহংসদেবের ছবির নীচে টাঙ্গাইয়া দিয়া মেয়েদের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন "রামকৃষ্ণদেব জগৎগুরু ছিলেন জগতের মানচিত্র তাঁহার পদতলে থাকিবে।"

নিবেদিতার এই কথা তাঁহার মনের কথা। তিনি যাহা বুঝিতেন জগৎসমক্ষে তাহা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন "না মরিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না।" অর্থাৎ আপনাকে একেবারে লয় করিয়া না দিলে আধ্যাত্মিক জগতে কেহ পুনর্জ্জন্ম লাভ করিতে পারে না। নিবেদিতা সেই ভাবে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছিলেন, তিনি অপার মহোদধিতে আপনার বিন্দুত্ব একেবারে লয় করিয়া দিয়াছিলেন। তাহা না হইলে নিবেদিতা যে ভাবে আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন, তেমন অপার্থিব আত্মত্যাগ জগতে কখনও সম্ভব হয় না। আত্মত্যাগের কাহিনী আমরা লোকমুখে শুনিয়াছি, পুস্তকেও পড়িয়াছি, কিন্তু নিবেদিতার আত্মত্যাগ, যাহা চক্ষের সম্মুখে দেখিয়াছি তাহা আর কোন স্থানে দেখিয়াছি অথবা দেখিব বলিয়া মনে হয় না।

নিবেদিতা যখনই নিজের নাম স্বাক্ষর করিতেন "Nivedita of Ramkrishna-Vivekananda" এই বলিয়া নিজের নাম স্বাক্ষর করিতেন। যদিও ইহার বঙ্গানুবাদে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মণ্ডলী ভুক্তা নিবেদিতা এই অর্থ হয়, কিন্তু এই কথার যে কেবলই এই একমাত্র অর্থ তাহা নহে। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ এই যুক্তনামে ইহাই বুঝায় যে তাঁহার নিকট গুরু ও ঈশ্বরে ভেদ ছিল না। উদার মতাবলম্বীগণ সম্প্রদায়ের গণ্ডি অত্যন্ত ঘৃণা করিয়া থাকেন, নিবেদিতা সর্ব্বদাই সম্প্রদায়ের নামের সহিত আপনার নাম যুক্ত করিয়া রাখিতেন, অথচ তাঁহার মত উদার মত অতি অল্পলোকেরই আছে। বস্তুতঃ সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী এবং একনিষ্ঠতা, ইহার একটীর সঙ্গে আর একটীর আকাশ পাতাল প্রভেদ। একটীতে আত্মপ্রতিষ্ঠা আর একটীতে আত্মবিসর্জ্জন। জগতে কেন্দ্রানুগ গতির সহিত কেন্দ্রতীগ গতির যেমন অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, সেইরূপ একনিষ্ঠার সহিত অনন্তে আত্মব্যাপ্তির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ! নিবেদিতার জীবন একনিষ্ঠতার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিবেদিতা যে পথ ধরিয়া চলিয়াছিলেন সে পথের কঠোরতা, ব্যর্থতা তাঁহার নির্ম্মল হৃদয় আকাশে বিন্দুমাত্র সংশয়মেঘের সঞ্চার করিতে পারে না। এক মাত্র ধ্রুব তারাকেই লক্ষ্য করিয়া অসংশয়ে তিনি যেন আপন পথে নিয়ত চলিয়া গিয়াছেন। এক পরিপূর্ণ চন্দ্রের মধুর জ্যোৎস্নায় তাঁহার চিত্ত মধুময় হইয়া গিয়াছিল, তাই তিনি মাতৃরূপে সকলকেই বুকে ধরিয়াছেন। তাঁহার ভালবাসা স্বার্থগন্ধ রহিত, এজন্তই সে প্রেম প্রতিদানের কামনা রাখিত না, অপ্রতিদানেও ম্লান না হইয়া সমভাবেই উজ্জ্বল থাকিত।

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

"Nevedita of Ramkrishna-Vivekananda" রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দে নিবেদিত নিবেদিতা, অর্থাৎ নিবেদিতা তাঁরই।

পার্থিব জগতে যত দুঃখই তিনি সেচ্ছায় বরণ করিয়া লউন না কেন, সংশয় পীড়ায় কখনও তাঁহার চিত্ত পীড়িত হয় নাই। তাঁহার শেষ বাক্য ও ঐ ভাবের পরিচায়ক "the boat is sinking, but I shall yet see the sun rise."

তিনি এমন ভাবময়ী ছিলেন যে অনেক সময় তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইত ভাব যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। কখনও তিনি লোক-শিক্ষয়িত্রী, কখন স্নেহ বিগলিতা জননী, কখন কর্ত্তব্যে একনিষ্ঠ মায়া মমতা বর্জ্জিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ-কর্ম্মী, কখন বিনীতা-ছাত্রী অথবা সেবিকা আবার কখনও ভগবৎভাবে বিভোরা। বোসপাড়ার বাটীতে এইরূপে দুইটি য়ুরোপীয় মহিলা বৎসরের পর বৎসর বাস করিয়াছিলেন, ভগিনী নিবেদিতা ও ক্রিশ্চিয়ার, ক্রিশ্চিয়ানার কথা আমরা ইতিপুর্ব্বে একস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। বাগবাজার উদ্বোধন আফিসে শ্রীশ্রীমাতাদেবী (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্ম্মিনী) কখন কখন আসিয়া বাস করেন। ভগ্নী নিবেদিতা ও ক্রিশ্চয়ানা দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার তথায় গিয়া কিছুক্ষণ মাতাদেবীর নিকট বসিয়া থাকিতেন। সে সময় নিতান্ত বালিকা যেমন মায়ের মুখের দিকেই চাহিয়া থাকে, সেইরূপ ভাবে নিবেদিতা মাতা দেবীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। ভগিনী নিবেদিতা যাঁহার ন্যায় তেজস্বিনী রমণী রমণীকুলে দুর্লভ, মাতাদেবীর নিকট তাঁহার এইরূপ শিশুর মত ভাব ছিল। মাতাদেবী যখন তাঁহার দিকে সস্নেহহাস্যে চাহিতেন তখন মায়ের আদরে বালিকার মত তিনি একেবারে গলিয়া যাইতেন। মা যে আসনে বসিবেন, নিবেদিতা যদি সেই আসনখানি পাতিয়া দিবার অধিকার পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার যে আনন্দ হইত সে আনন্দ তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেই বুঝা যাইত। কতবার সেই আসনকে প্রণাম করিতেন, অতি যত্নে ধূলা ঝাড়িয়া তাহার পর আসনখানি পাতিতেন, তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইত এই অধিকারটুকু পাইয়াই যেন তাঁহার জীবন সার্থক হইয়াছে।

মাতাদেবী একদিন বিদ্যালয়ে আসিবেন এইরূপ কথা হইয়াছিল, নিবেদিতা

সেই অবধি বিদ্যালয়ের সংস্কার আরম্ভ করিলেন। যে দিন মা বিদ্যালয়ে আসিবেন নিবেদিতা সে দিন আনন্দে একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন। এখানে ওখানে ছুটাছুটী করিতেছেন, কেবলই হাসিতেছেন, আবার কখনও বা আনন্দে অধীর হইয়া কখন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীদিগের, কখন ছাত্রীদিগের এবং কখন বা দাসীর পর্য্যন্ত গলা জড়াইয়া ধরিতেছেন।

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি নয়জন নির্ব্বাসিত যে দিন মুক্তিলাভ করিলেন সে দিন ও নিবেদিতার এমনই আনন্দ দেখিয়াছিলাম। সে দিন ও বিদ্যালয়ের দ্বারে পূর্ণকুম্ভ কদলী স্থাপিত হইয়াছিল। সে দিনও আনন্দের দিন বলিয়া মেয়েদের অনধ্যায় হইয়াছিল।

অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে নিবেদিতা দৃপ্তাসিংহীর মত উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন, সে সময় তিনি জগতে কাহাকে ও দৃক্‌পাত করিতেন না। তাঁহার রোষাগ্নিদীপ্ত দৃষ্টির সম্মুখে অতি গর্ব্বিতকেও মস্তক অবনত করিতে হইত। আবার অপর দিকে তাঁহার নম্রতা ও অনন্যদুর্লভ ছিল, সে নম্রতা মৌখিক বিনয় নহে, আন্তরিক সৌজন্য। তিনি অতি দরিদ্রের সহিতও যেরূপ সসম্ভ্রম ব্যবহার করিতেন সেরূপ ব্যবহার কেবল তাঁহাতেই সম্ভব হইত।

তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে একটী সদাজাগ্রতভাব ছিল, সেইটীকে তাঁহার যোদ্ধৃভাব ও বলা যাইতে পারে। তিনি একদিকে যাহা বুঝিতেন তাহার ভিতর যেমন তিলমাত্র জটিলতা, বা সংশয়ের সম্পর্ক রাখিতেন না, তেমনি আবার অন্যদিকে যাহা বুঝিয়াছেন তাহা তাঁহার জীবনের প্রতিক্ষণেই সফল করিবার জন্য যোদ্ধা যেমন যুদ্ধের সময় সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে সেইরূপ তাঁহার সমগ্র প্রকৃতিতে এই সদাজাগ্রতভাব বর্ত্তমান থাকিত। এইজন্য তাঁহার কথায় ও কাজে বিন্দুমাত্র গরমিল দেখা যাইত না। মনুষ্যত্বের উপর শ্রদ্ধা নিবেদিতার স্বভাবের মজ্জাগত ভাব। মানুষ যেন মানুষ হয় ইহাই তিনি চাহিতেন। মানুষের ভিতরে যেখানে যে ভাবেই মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখিয়াছেন, তেজস্বিনী নিবেদিতা সেই খানেই শ্রদ্ধা সহকারে আপনার মস্তক নত করিয়াছেন।

নিবেদিতার জীবন আলোচনা করিতে গেলে এত কথা বলিবার আসিয়া উপস্থিত হয় যে তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এবং লেখকের সামর্থ্যে কুলায় না। তিনি যে সকল পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন তাহার ভিতর তাঁহার পরিচয় অনেকাংশে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে যে ভালবাসা

দিয়া তিনি ভারতকে আপন করিয়া লইয়াছিলেন সেই ভালবাসা দিয়াই তাহাকে বুঝিতে হয়।

আজ নিবেদিতার কথা বলিতে গিয়া একদিকে যেমন সেই দৃঢ়ব্রতা সন্ন্যাসিনীর সত্য, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও প্রেমপূত চরিত্র স্মরণ করিয়া বিমল আনন্দে চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তেমনি অপর দিকে আবার আপনাদিগকে অপৌরুষতা ও দৈন্য স্মরণ করিয়া ক্ষোভে ও লজ্জায় অভিভূত হইতে হইতেছে। ভারতবর্ষের সৌভাগ্য যে নিবেদিতাকে পরমাত্মীয়ারূপে সে হৃদয়ের কাছে পাইয়াছিল।

ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য যে নিবেদিতা যখন জগতে ছিলেন তখন তাঁহাকে আপনার জন বলিয়া বুঝিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারি নাই। পার্থিব দৃষ্টিতে আজ আমরা তাঁহাকে হারাইয়াছি, আজ তাঁহার সেই আনন্দময়ী মূর্ত্তি লোকলোচনের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, আজ বোসপাড়ার বিদ্যালয় গৃহ শূন্য, নিবেদিতা আর সেখানে নাই। কিন্তু তাঁহার আজীবন সাধনার মূর্ত্তিরূপ এখনও রহিয়াছে। নিবেদিতা যাহা প্রাণ দিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন সেই বোসপাড়ার বিদ্যালয়টী এখনও আছে, নিবেদিতা অভাবে তাহা কি শূন্যগর্ভেই মিলাইয়া যাইবে? স্বামী বিবেকানন্দের সেই বজ্র নির্ঘোষ আহ্বান ধ্বনি, "জাগো জাগো মহাপ্রাণগণ, পৃথিবী দুঃখ ক্লেশে দগ্ধ হইতেছে, তুমি কি ঘুমাইতে পার"—যে আহ্বান ধ্বনি শুনিয়া নিবেদিতা কেবল ঈশ্বর মাত্র সম্বল করিয়া জগতের পথে দাঁড়াইয়া ছিলেন সে আহ্বান কি ভারতবাসীর শ্রবণে ব্যর্থ হইবে?

ভারতে কি এমন বিংশতি জন রমণী এবং পুরুষ নাই যাঁহারা ভগবানের নাম মাত্র সম্বল করিয়া ভারতের কল্যাণ কামনার পথে গিয়া দাঁড়াইতে পারেন?

ইহা যদি সম্ভব না হয় ভারতবাসীর এতটুকুও কি প্রাণ নাই যে নিবেদিতা অনশন অর্দ্ধাশন স্বীকার করিয়াও যাহাকে রক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা কপর্দ্দকমাত্র ভিক্ষা দিয়াও সেই বিদ্যালয়কে রক্ষা করিতে পারেন? তপস্বিনী নিবেদিতা অনাহার অনিদ্রায় শিক্ষা সমিধে যে হোমানল প্রজ্জলিত করিয়াছিলেন তাহার উজ্জল শিখা কি সমস্ত ভারতবর্ষকে আলোকিত করিবে না? হব্য অভাবে তাহা কি যজ্ঞারম্ভেই নির্ব্বাপিত হইবে?

শ্রীসরলাবালা দাসী।

সমালোচনা।

গোধূলি। শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ৷৹ আনা, বসিরহাটে গ্রন্থকার বা প্রকাশক শ্রীযুত দুর্লভকৃষ্ণ চৌধুরীর নিকট প্রাপ্তব্য। "গোধূলি" পড়িয়া অনেক দিন পরে সাহিত্যে প্রকৃত কবিত্বের রসাস্বাদ পাইলাম। গোধূলিতে কবিতুলিকা মস্তিষ্কের কল্পনারূপ মসীধারে সিক্তি।

"আত্মিক-তত্ত্ব" সিটিবুক সোসাইটী ৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতায়, ও আমলাপাড়া, নারায়ণগঞ্জে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

এদেশে "আত্মিক-তত্ত্বের" অনুশীলনের দ্বারা এ পর্য্যন্ত এমন কোনও সত্য আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা প্রাচীন শাস্ত্রীয় সূক্ষ্মজগৎবাসীকে অতিক্রম করিয়াছে বা প্রাচীন পরলোকতত্ত্বে নিহিত নাই। অতএব সাধনভজনের জন্য ঐ সমস্ত তত্ত্ব যদি আবশ্যক বোধ হয়, তবে প্রেতের পশ্চাতে ছুটিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না। এতদিন প্রেতাত্মার সঙ্গলাভ করিয়াও "আত্মিক-তত্ত্বের" লেখকমহাশয় যখন পূনর্জন্মবাদ-সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন না, তখন "কা কথা তদিতরানাং"। তত্ত্বজ্ঞান সাধনলভ্য, এমন কি পরলোকাদিতত্ত্বে প্রকৃত বিশ্বাসও সাধনলভ্য। "প্ল্যানচেট" "মিডিয়ম" "চক্র" প্রভৃতির সাহায্যে যে সমস্ত দর্শনশ্রবণাদির কথা শুনা যায়, সাধনলব্ধ সূক্ষ্মদৃষ্টিতেও সে সমস্ত সম্ভাবিত, প্রভেদ এই যে স্থূলবস্তুকে অবলম্বন করিলে তথ্যলাভে নিশ্চয়তা নাই, বিপক্ষের যুক্তিও যথেষ্ট থাকে, সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রত্যক্ষ সুনিশ্চিত। আমাদের দেশে সূক্ষ্মদৃষ্টির সাহায্যেই সূক্ষ্মজগৎ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে। পূর্ব্বাচার্য্যগণ কৌতুহলপরবশ হইয়া ঐ দৃষ্টি লাভ করেন নাই, উহা অধ্যাত্মসাধনারই একটী সিদ্ধিবিশেষ। আধুনিক যন্ত্রাদি স্থুল অবলম্বন অপেক্ষা এই সিদ্ধি যে অধিকতর নির্ভরযোগ্য, ইহা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য। নচেৎ একথা ভুলিলে চলিবে না, যে কৌতুহলবশতঃ ঐ সিদ্ধিলাভের চেষ্টায় বা উহার প্রয়োগতৎপরতায় সাধনার ক্ষতি হয়। যার ভগবান লাভ হয়, সেই তাঁর সর্ব্ববিধ সৃষ্টির কথা প্রকৃতভাবে জানিতে পারে, নচেৎ ভ্রান্তির হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই।

সতী মালাবতী; প্রথম সংস্করণ। শ্রীগিরীশচন্দ্র দত্ত প্রণীত; মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান,—পরামাণিক ঘাট রোড, বরাহনগর। ইহা মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় প্রকাশিত একখানি নাটক।

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব।

(জনৈক উৎসব-দর্শক কর্ত্তৃক লিখিত)

বিগত ১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার বেলুড়ের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মঙ্গল বারের তিথি পূজায় যে সমারোহ ও উৎসাহ তরঙ্গ দেখা গিয়াছে, তাহাও একটী উল্লেখযোগ্য ব্যাপার রূপে গণ্য হইয়া সাময়িক সাহিত্যে স্থান পাইতে পারে। যুগাবতার কোন পথ দিয়া অলক্ষ্যে জন সমাজের হৃদয় নীরবে অধিকার করেন, তাহা মানব বুদ্ধির কাছে দুরধিগম্য। তাহার জীবন যেমন আশৈশব রহস্যময়, লোক সমাজে তাঁহার অমোঘ, অব্যর্থ, প্রভাবের ক্রম-সংক্রমণও তেমনই রহস্যময়। পাঠক, যদি ১৩ই ফাল্গুন বেলুড় মঠের উৎসব প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া থাক, তবে ঐ গভীর রহস্য তোমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে,—তুমি দেখিয়াছ যুগধর্ম্মাবতার প্রভাব কেমন নিঃশব্দে দেশ বিদেশে সঞ্চারিত হইয়া যাইতেছে,—তুমি দেখিয়াছ, কিন্তু কেমন করিয়া ঐরূপ হইতেছে তাহা বুঝ নাই। সেইজন্য বলিতে হয় এ রহস্য বুদ্ধির অগম্য।

সুপ্তোত্থিতের চক্ষু যখন প্রথম সূর্য্যকিরণ পান করে, তখন কোনও আড়ম্বর নাই, কোনও আরাম নাই, কিন্তু সূর্য্যালোকের মত অপ্রতিহতগতি, অমোঘ-সঞ্চারী সৃষ্টিতে আর কি আছে? আবার সূর্য্যরশ্মির বিশ্বসঞ্চরণ কোনও ঘোষণাকারীর অপেক্ষা রাখে না, বিশ্বের যেখানে যিনি জাগ্রত হইয়া চক্ষু ও গৃহবাতায়ন উন্মুক্ত করিতেছেন, তিনিই আলোক প্লাবনে প্লাবিত হইতেছেন। তেমনি বিচার করিয়া দেখ, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব কি রহস্যময়, সেই নবোদিত মরীচিমালীর পূতরশ্মি বিশ্বজগৎকে আবেষ্টন করিয়াছে, সন্দেহ হয়ত ভাবিয়া দেখ, পৃথিবীর যে কোন দেশেই হউক, মানুষের ধর্ম্মজীবনের উপর সেই পূত-রশ্মির স্পর্শ কেমন সহজে, অনায়াসে, অনাড়ম্বরে, সংক্রামিত হইতেছে। মানব, এ যুগে যেখানেই থাক চক্ষু উন্মীলন কর—ধর্ম্মপিপাসু হও,—আর চক্ষু যদি খুলিয়া থাক, তবে গৃহবাতায়ন উন্মুক্ত কর - দলাদলির ভাব দমন কর,—দেখিবে নবারুণ রশ্মিতে বিশ্বমণ্ডল আলোকিত হইয়াছে, ঐহিকতা, সংকীর্ণতা, কাম-কাঞ্চনের সান্দ্র তিমির অপসারিত করিয়া, জগতে নবজীবন সঞ্চার করিয়া, সূর্য্যোপম চরিত্র যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক উদিত হইয়াছেন। নিজের জন্য, স্বদেশের জন্য,

জগতের জন্য দুশ্চিন্তা বা আশঙ্কার আর অবসর নাই, কারণ রাত্রির পর দিনকে ডাকিয়া আনিতে হয় না, অন্ধকারের সঙ্গে বুঝিয়া দিবসালোকের জন্য পথ নির্ম্মাণ করিতে হয় না। সেইজন্য স্বামী বিবেকানন্দ ভাবাবেগে দৃঢতার সহিত বলিতেন, "আমি কেবল সমাচার বহন করিতেছি,—আমার কাজ সমাচার বহন করা।" সেইজন্য স্বামীজি বারম্বার জলদ মন্দ্রে ঘোষণা করিতেছেন, "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" সময় উঠিয়াছে, চক্ষু উন্মোচন কর, জাগ্রত হও, নবজীবন লাভ কর,—দেশের দুঃখ ঘুচিবে, জগতের অশান্তি ঘুচিবে।

১৩ই ফাল্গুন মঠের উৎসব প্রাঙ্গনে বিপুল জনোচ্ছ্বাস ও কোলাহলের মধ্যে মনে হইয়াছিল যেন ক্ষীণ উষালোকে ধরণী পাদপে কয়েকটী পক্ষিনীড়ে জীবিত-স্পন্দন ও কূজনের অভিনয় হইতেছে। দিবসের এই অস্ফুট সূচনা মঠ প্রাঙ্গণে কেন্দ্রীভূত হইয়া, হে পাঠক, তোমার আমার দেহ মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে—ধাবণা ক্লান্ত হইয়া ফিরিয়া আসে,—আর ভাবিয়া দেখ দিবস সঞ্চারে বিশ্বব্যাপী উদ্বোধন ও নবজীবন লাভের উৎসাহোচ্ছ্বাস।

কথা উঠিয়াছে, মঠের অঙ্গিনা বাড়াইতে হইবে—আর লোকসংকুলান হয় না, প্রসাদ বিতরণ আরো বাড়াইতে হইবে—অনেকে প্রসাদ পান না, যাত যাতের আরো সুবিধা করা চাই—যাত্রীর কষ্ট হয়। অলঙ্ঘ্য প্রয়োজন বশে উৎসবের সমারোহ বাড়িতে চলিল, কিন্তু হে গুণমুগ্ধ মানব, ভাবিবার একটা কথা রহিয়াছে। কোন দেবতারই বোধন পূজন একটী গৃহপ্রাঙ্গনে সীমাবদ্ধ থাকে না,—ঘরে ঘরে দেবতার পীঠ স্থাপিত হয়,—বাদ্যভাণ্ড ঘরে ঘরে বাজিয়া উঠে। হে স্বদেশবাসি, আর কতদিন ঘরের দেবতা, প্রাণের দেবতাকে অর্ঘ্য দিবার জন্য ঘরের বাহিরে ছুটিতে হইবে? আর কত দিন আপনার রত্ন ঘরের বাহিরে গচ্ছিত রাখিবে? এস, ভাণ্ডার লুটিয়া লও, এস, গৃহে গৃহে ঠাকুর-ঘর, ঘরে ঘরে উৎসব জাগাও। শৈল নির্ঝরিণী পর্ব্বতপ্রাচীরে রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন, এস এইবার উপলখণ্ড সরাইয়া দাও, জীবনপ্রদ অমৃত বন্যায় সমাজ ভাসিয়া যাক্, দেশ ভাসিয়া যাক্। ঘরে ঘরে উৎসবের দেউটী জ্বলিয়া উঠুক, মঠের দেওটী আরো উজ্জল হইবে।

কাছাড়ে দুর্ভিক্ষ।

আবেদন।

স্বদেশবাসিগণ! আমরা ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া আপনাদের দ্বারে উপস্থিত হইলাম। ভিক্ষা দেওয়া ত আপনাদের স্ব স্ব সনাতন ধর্ম্মেরই একটী অঙ্গ এবং ইহাতে আপনারা শৈশব হইতেই অভ্যস্ত। ভিক্ষুক নিরাশ হইয়া গৃহ ত্যাগ করিলে আপনারা চিত্তে একটু সঙ্কোচ ও উদ্বেগ বোধ করেন না কি? আমরা যাহাদের জন্য এই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি তাহারা আপনাদের করুণা লাভের যোগ্য কিনা তৎবিষয়ক চিন্তা আপনাদের প্রশান্ত চিত্তকে কিংৎ কালের জন্য অধিকার করিলে আমাদের ক্ষোভের আর কোন কারণ থাকিবে না।

জেলা কাছাড়ের অন্তর্গত হাইলাকান্দি মহকুমার দক্ষিণ দিগস্থ পর্ব্বতময় স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া লসাই দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে দুর্ভিক্ষ তদীয় করালবদন ব্যাদান করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই সমস্ত স্থানের অধিবাসী-দিগের মধ্যে প্রায় সমস্তই কুকী, টিপ্রা প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতীয় লোক। চা বাগানে কার্য্য করিবার জন্য যে সমুদয় কুলী এ অঞ্চলে আসিয়াছিল—তাহাদের মধ্যে অনেকে চুক্তির ম্যাদ অতীতে কিছু কিছু জমি বন্দোবস্ত লইয়া গৃহাদি প্রস্তুত করতঃ এখানকার স্থায়ী অধিবাসী হইয়াছে। ইহারা এখন স্বাধীন ভাবে কৃষি কার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সময় সময় অবসর মত চা বাগীচার কার্য্য করিয়াও কিছু কিছু উপার্জ্জন করে। কুকী, টীপ্রা প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতিগণ জুম নামক এক প্রকার কৃষি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান বর্ষে ইহাদিগের জুম ফসল এবং কুলীদিগের ধান্য ফসল সম্পূর্ণ-রূপে বিনষ্ট হইয়াছে। মুষিকের পাল ক্ষেত্রে প্রবেশ করতঃ সমস্ত ফসল কাটিয়া বিনাশ করিয়াছে। ইহাদের সমস্ত বৎসরের পরিশ্রম একেবারে পণ্ড হইয়াছে। এই সমস্ত লোক সাধারণতঃ অত্যন্ত দরিদ্র। এই কয়েক মাস অত্যন্ত কষ্টে কোন মতে চালাইয়াছে কিন্তু এখন একেবারে নিরুপায়। বিশেষতঃ এখন জুমের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। জুমের চাষে, মাঘ মাস হইতে জঙ্গল কাটিতে আরম্ভ করিয়া চৈত্র মাস পর্য্যন্ত লিপ্ত থাকিতে হয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে বীজ রোপণ করিয়া আষাঢ় শ্রাবণে আগাছা তুলিতে হয়। তৎপর চিনার, কচু প্রভৃতি শাক সব্জি

কিছু কিছু আশু ধান্য এবং অন্যান্য ফসলাদির প্রাপ্তি ঘটে। এখন ইহারা জুমের চাষ পরিত্যাগ করিয়া যদি শ্রমজীবির কার্য্য করিতে বাধ্য হয় তবে আগামী বৎসর কি খাইয়া বাঁচিবে? এবং পরেই বা ইহাদের কি অবস্থা হইবে? আশা করি ইহাদের এই সঙ্কট কালে সুহৃদয় পাঠকগণ একটু মুক্ত হস্ত হইবেন। বিপদ্ ঘনীভূত, বিলম্ব করার সময় নাই। যিনি যাহা দিবেন, দান যত ক্ষুদ্রই হউক না, অত্যন্ত প্রীতির সহিত গৃহীত হইবে এবং সংবাদ পত্রে প্রাপ্তি স্বীকার করা যাইবে। টাকা কড়ি পেনসন প্রাপ্ত হেড্ ক্লার্ক শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাশচন্দ্র দাস হাইলা কান্দি কাছাড়, এবং চিঠি পত্র শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন রায় উকিল হাইলা কান্দি, এঠিকানায় পাঠাইবেন।

ইতি সন ১৩১৮ ১৬ই ফাল্গুন।

ভিক্ষার্থী।

শ্রীহরকিশোর চক্রবর্ত্তী, মিরানাদার।
শ্রীগোলাম রাজা চৌধুরী, মিরানাদার।
শ্রীকৈলাসচন্দ্র দাস, গবর্ণমেণ্ট পেনসনার।
শ্রীবিনোদবিহারী চৌধুরী, গবর্ণমেণ্ট পেনসনার।
শ্রীসতীশচন্দ্র রায় মিরানাদার।
শ্রীরুদ্রকিশোর বর্দ্ধন, মোক্তার।
শ্রীআনন্দমোহন রায়, উকীল।

REGISTERED No. C ...

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"।

সূচী।

কলিকাতা।

উদ্বোধন আফিস—১২, ১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন, বাগবাজার।

মাসিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য, সডাক ২৲ দুই টাকা।

প্রতি সংখ্যা ।০ আনা।

১৪শ বর্ষ—৫ম সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ সাল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

(স্বামী সারদানন্দ।)

সাধক ভাবের প্রথম বিকাশ—দক্ষিণেশ্বর কালিবাটী।

সন ১২৫৪ বা ৫৫ সালে রামকুমার যখন কলিকাতায় চতুষ্পাঠি খুলিয়াছিলেন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৮ বা ৪৯ বৎসর ছিল। সংসারের অভাব অনাটন ঐ কালের কিছু পূর্ব্ব হইতে তাঁহাকে কিছু কিছু চিন্তিত করিতেছিল। ঐ কালেই তাঁহার একমাত্র পুত্র অক্ষয়ের জন্ম হয় এবং তাঁহার পত্নী পুত্র প্রসবান্তে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কথিত আছে সাধক রামকুমার তাঁহার পত্নীর মৃত্যুর কথা পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন এবং পরিবারস্থ কাহাকেও কাহাকেও বলিয়াছিলেন, ও (তাঁহার পত্নী), এবার আর বাঁচিবে না। ঠাকুর তখন ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন মাত্র। সমৃদ্ধিশালী কলিকাতায় নানা ধনী ও মধ্যবিৎ শ্রেণীর লোকের বাস; শান্তি স্বস্ত্যয়ণাদি ক্রিয়াকলাপে, বিবিধ ব্যবস্থাপত্রদানে এবং টোলের ছাত্রদিগকে বিদ্যালাভে পারদর্শী করিয়া সেখানে সুপণ্ডিত বলিয়া একবার খ্যাতি লাভ করিতে পারিলে সংসারের আয় ব্যয়ের জন্য তাঁহাকে আর চিন্তান্বিত হইতে হইবে না—বোধহয় এইরূপ একটা কিছু ভাবিয়াই পত্নী-বিয়োগবিধুর রামকুমার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। অথবা এমনও হইতে পারে, পত্নী-বিয়োগে তিনি জীবনে যে বিশেষ পরিবর্ত্তন ও অভাব অনুভব করিতেছিলেন, বিদেশে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে তাহার হস্ত হইতে স্বয়ং কথঞ্চিৎ মুক্তি লাভ করিবেন এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সংসারের আয়ের ও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইবে এইরূপ ধারণাই তাঁহাকে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল। যাহাই হউক ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠির জন্ম হইবার এক বা দেড় বৎসর পরে তিনি ঠাকুরকে যেজন্য কলিকাতায় আনয়ন করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ ১২৫৬ সালে কলিকাতায় আসিয়া ঠাকুর যে ভাবে দুই তিন বৎসর কাল অতিবাহিত করেন তাহা আমরা ইতি পূর্ব্বেই পাঠককে বলিয়াছি।

ঠাকুরের জীবনের অতঃপর ঘটনাবলী জানিতে হইলে পাঠককে এইবার অন্যত্র দৃষ্টি করিতে হইবে। বিদায় আদায়ের সুবিধার জন্য ছাতুবাবুর দলে নাম লিখাইয়া তাঁহার অগ্রজ যখন নিজ চতুষ্পাঠীর শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নপর ছিলেন

তখন কলিকাতার অন্যত্র একস্থলে, এক সুবিখ্যাত পরিবারমধ্যে ঈশ্বরেচ্ছায় যে ঘটনা পরম্পরার উদয় হইতেছিল তাহাতেই এখন পাঠককে একবার মনোনিবেশ করিতে হইবে।

কলিকাতার দক্ষিণাংশে জানবাজার নামক পল্লীতে প্রথিত-কীর্ত্তি রাণী রাসমনির বাস ছিল। চারিটি কন্যার মাতা হইলেও রাণী অল্প বয়সেই বিধবা হইয়া স্বামী ৺রাজচন্দ্র মাড়ের প্রভূত সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছিলেন এবং তদবধি ঐ বিষয়ের তত্ত্বাবধানে স্বয়ং নিযুক্তা থাকিয়া এবং উহার সমধিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া কলিকাতাবাসীগণের সুপরিচিতা হইয়া উঠিয়া ছিলেন। আবার কেবল বিষয়কর্ম্মের পরিচালনায় দক্ষতা দেখাইয়াই তিনি যে সাধারণের নিকট যশস্বিনী হইয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু সাহস বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিশ্বাস ভক্তি ও ওজস্বিতা * এবং সর্ব্বোপরি দরিদ্রদিগের দুরবস্থার সহিত নিরন্তর সহানুভূতি, † অজস্র দান ও অকাতর অন্নব্যয় প্রভৃতি তাঁহার অন্তরের অশেষ গুণরাজী ও

---

† শুনা যায় রাণী রাসমণির জানবাজারের বাটীর নিকট পূর্ব্বে ইংরাজ সৈনিকদিগের একটি ব্যায়্যাক্ বা আড্ডা তখন প্রতিষ্ঠিত ছিল। মদ্যপানে উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকেরা একদিন রাণীর দ্বার রক্ষকদিগকে বলপ্রয়োগে অক্ষম করিয়া বাটী মধ্যে প্রবেশ ও লুটপাট করিতে আরম্ভ করে। মথুর বাবু প্রমুখ পুরুষেরা তখন কার্য্যান্তরে বাহিরে গিয়াছিলেন। সৈনিকেরা বাধা না পাইয়া ক্রমে অন্দরে প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়া রাণী স্বয়ং অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিতা হইয়া তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য নিজ কোষাগারের সম্মুখে দণ্ডায়মানা হন।

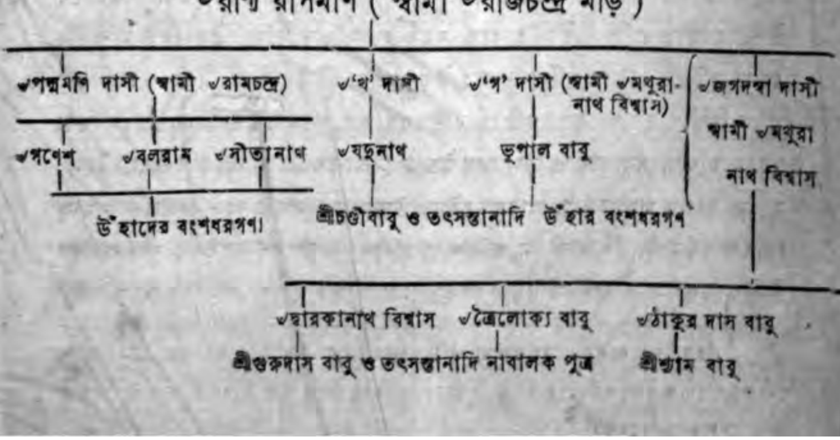
* কথিত আছে গঙ্গায় মৎস্য ধরিবার জন্য ধীবরদিগের উপর ইংরাজ রাজ-সরকার একবার কর বসাইয়াছিলেন। ঐ সকল ধীবরদিগের অনেকে রাণীর জমীদারীতে বাস করিত। পূর্ব্বোক্ত কর বসায় তাহারা উৎপীড়িত হইয়া রাণীর নিকট আপনাদিগের দুঃখ কষ্টের কথা নিবেদন করে। রাণী শুনিয়া তাহাদিগকে অভয় দিলেন ও বহু অর্থ দিয়া সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে গঙ্গায় মৎস্য ধরিবার ইজারা লইলেন। সরকার বাহাদুর, রাণী মৎস্য ব্যবসায় করিবেন ভাবিয়া উক্ত অধিকার প্রদান করিবামাত্র গঙ্গায় কয়েক স্থলে এক কূল হইতে অন্য কূল পর্য্যন্ত রাণী এমন শৃঙ্খলিত করিলেন যে ইংরাজ রাজের জলযান সমূহের নদী মধ্যে প্রবেশ পথ প্রায় রুদ্ধ হইয়া যাইল। তাঁহারা তখন রাণীর ঐ কার্য্যের প্রতিবাদ করিলে রাণী বলিয়া পাঠাইলেন "আমি অনেক অর্থ ব্যয়ে নদীতে মৎস্য ধরিবার অধিকার আপনাদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি; সেই অধিকার সূত্রেই ঐরূপ করিয়াছি; ঐরূপ করিবার কারণ, নদী মধ্য দিয়া জলযানাদি নিরন্তর গমনাগমন করিলে মৎস্য সকল অন্যত্র পলায়ন করিবে এবং আমার সমূহ ক্ষতি হইবে; অতএব নদী গর্ভ

সুকর্ম্মানুষ্ঠান সমূহ তাঁহাকে সকলের বিশেষ প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। বাস্তবিক; কৈবর্ত্তক কুলোদ্ভূতা এই রমণী তখন নিজগুণ ও কর্ম্মে আপন 'রাণী' নাম সার্থক করিতে এবং ব্রাহ্মণেতর নির্বিশেষে সকল জাতির হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি যথার্থই আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন রাণীর কন্যাগণের বিবাহ এবং সন্তান সন্ততিও হইয়াছে; এবং একটী মাত্র পুত্র রাখিয়া রাণীর তৃতীয়া কন্যার মৃত্যু হওয়ায়, প্রিয় দর্শন তৃতীয় জামাতা শ্রীযুক্ত মথুরানাথ বিশ্বাস ঐ ঘটনায় এখন হইতে পর হইয়া যাইবেন ভাবিয়া, রাণী তাঁহার চতুর্থ কন্যা শ্রীমতি জগদম্বা দাসীর বিবাহ উক্ত জামাতারই সহিত সম্পন্ন করিয়া তাঁহার ছিন্নহৃদয় পুনরায় স্নেহপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। রাণীর ঐ চারি কন্যার সন্তান সন্ততিগণ এখনও বর্ত্তমান। *

অশেষ গুণশালিনী রাণী রাসমনির জগদম্বা শ্রীশ্রীকালীকার শ্রীপাদপদ্মে চির-কাল বিশেষ ভক্তি ছিল। জমীদারী সেরেস্তার কাগজপত্রে নামাঙ্কিত করিবার

শৃঙ্খলমুক্ত কেমন করিয়া করিব? তবে যদি আপনারা নদীতে মৎস্য ধরিবার নূতন কর উঠাইয়া দিতে রাজী হন তবে আমিও আমার অধিকার সব স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে স্বীকৃতা আছি। নতুবা ঐ বিষয় লইয়া ঘোরতর মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে এবং সরকার বাহাদুরকে আমার ক্ষতিপূরণে বাধ্য হইতে হইবে।" শুনা যায় রাণীর ঐরূপ যুক্তিযুক্ত কথায় এবং গরিব ধীবরদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই রাণী ঐরূপ করিতেছেন একথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সরকার বাহাদুর ঐ কর অল্প দিন বাদেই উঠাইয়া দেন এবং ধীবরেরা পূর্ব্বের ন্যায় নদীতে বিনা করে যথা ইচ্ছা মৎস্য ধরিয়া রাণীকে আশীর্ব্বাদ করিতে থাকে।

* পাঠকের অবগতির জন্য তাঁহাদের বংশতালিকা আমাদের যতদূর জানা আছে মোটামুটি ভাবে এখানে প্রদান করিতেছি——



জন্য তিনি যে শীলমোহর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহাতেও খোদিত ছিল—"কালীপদ অভিলাষী শ্রীমতী রাসমনি দাসী" আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি তেজস্বিনী রাণীর দেবী-ভক্তি ঐরূপে সকল বিষয়ে সকল কথায় ও কার্য্যে সর্ব্বদা প্রকাশ পাইত।

শুনিতে পাওয়া যায় রাণীর হৃদয়ে ৺কাশীধামে যাইবার ও তথায় শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা মাতাকে দর্শন ও বিশেষ ভাবে পূজা করিবার বাসনা বহুকাল হইতে বলবতী ছিল। শুনাযায় বহু অর্থও তিনি ঐ জন্য সঞ্চিত করিয়া পৃথক করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীর সহসা মৃত্যু হইয়া সমগ্র বিষয়ের তত্ত্বাবধান আপন স্কন্ধে পতিত হওয়ায় এতদিন ঐ বাসনা ফলবতী করিতে পারেন নাই। এখন, জামাতাগণ বিশেষতঃ তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত মথুরা নাথ তাঁহাকে ঐ বিষয়ে সহায়তা করিতে শিক্ষালাভ করিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া উঠায় রাণী, ১২৫৪-৫৫ সালে কাশী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। সমস্ত আয়োজন স্থির হইলে যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্ব্ব রাত্রে তিনি স্বপ্নে ৺দেবীর দর্শন লাভ এবং প্রত্যাদেশ পাইলেন—কাশী যাইবার আবশ্যক নাই, ভাগীরথী তীরে মনোরম প্রদেশে আমার পাষাণময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্টিত করিয়া নিত্য পূজা ও অন্নাদি ভোগের ব্যবস্থা কর, আমি ঐ মূর্ত্ত্যাশ্রয়ে আবির্ভূতা হইয়া তোর পূজা নিত্য গ্রহণ করিব।* রাণীর বিশ্বাসী হৃদয় ঐরূপ আদেশ লাভে বিশেষ পরিতৃপ্ত হয় এবং কাশীযাত্রা স্থগিত করিয়া রাণী পূর্ব্বোক্ত সঞ্চিত ধনরাশি ঐ কার্য্যেই নিয়োজিত করেন।

পূর্ব্বোক্ত কিম্বদন্তী সত্য কিনা, বলিতে পারি না, কিন্তু একথা সত্য যে, শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতি রাণীর হৃদয়ের বহুকাল সঞ্চিত ভক্তি ঐকালেই মন্দির ও উদ্যানবাটিরূপ সাকার মূর্ত্তি পরিগ্রহে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল, এবং ভাগিরথী তীরে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ক্রয় করিয়া রাণী বহু অর্থ ব্যয়ে তদুপরি নবরত্ন-শোভিত সুবৃহৎ মন্দির,দেবারাম ও তৎসংলগ্ন উদ্যান নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরব্ধ হইয়া উক্ত দেবালয় ১২৫৮ সালেও সম্যক্ নির্ম্মিত হয় নাই, কিন্তু জীবন অনিশ্চিৎ, মন্দির নির্ম্মাণেই বহুকাল ব্যয় করিলে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প নিজ জীবন কালে কার্য্যে পরিণত হইয়া

* কেহ কেহ বলেন যাত্রা করিয়া রাণী কলিকাতার উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রাম পর্য্যন্ত নৌকাযোগে অগ্রসর হইয়া সে রাত্রি ঐ স্থানে নৌকার উপর বাস করিবার সময় ঐ প্রকার প্রত্যাদেশ লাভ করেন।

উঠিবে কি, না, তাহা কে বলিতে পারে?—ঐ কথার আলোচনা করিয়া রাণী মোটামুটিভাবে মন্দিরটি নির্ম্মিত হইলেই সন ১২৫৯ সালের আষাঢ় মাসে স্নানযাত্রার দিনে প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করেন। কিন্তু উহার পূর্ব্বের কয়েকটি কথা পাঠকের অগ্রে জানা আবশ্যক। আমরা এখন তাহাই বলিতে আরম্ভ করিব।

প্রত্যাদেশ পাইয়াই হউক বা হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসেই হউক—কারণ, ভক্তেরা নিজ ইষ্টদেব দেবীকে সর্ব্বদা আত্মবৎ সেবা করিতেই ভালবাসেন—রাণীর শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নিত্য অন্নভোগ দিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। রাণী ভাবিলেন—মন্দিরাদি তো মনের মত নির্ম্মিত হইতে চলিল, দেবাসেবা চিরকাল বিশেষভাবে চলিবার জন্য দেবোত্তর সম্পত্তিও তো যথেষ্ট করিয়া দিতেছি, কিন্তু এতটা করিয়াও যদি জগদম্বার মনের মত সেবা করিতে না পারি, এতটা করিয়াও যদি তাঁহাকে, প্রাণ যেমন চাহে, নিত্য অন্নভোগ না দিতে পারি তবে সকলই বৃথা পণ্ডশ্রম। ফলে এই পর্য্যন্ত দাঁড়াইবে যে লোকে বলিবে, রাণী রাসমণি এত বড় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু লোকের ঐরূপ কথায় আমার কি আসে যায়? হে জগদম্বে, অন্য নানা বিষয়ে নাম যশ তো আমাকে অনেক দিয়াছ?—এ বিষয়ে আর অন্তঃসারহীন নাম যশ মাত্র দিয়াই আমাকে ফিরাইও না।—আমার নাম হউক বা নাই হউক তুমি এখানে সত্য সত্যই আবির্ভূতা হও এবং নিত্য সেবা গ্রহণ করিয়া দাসীর কামনা পূর্ণ কর।

রাণী দেখিলেন, দেবীকে মনের মত সেবা করিবার পথে তাঁহার প্রধান অন্তরায় তাঁহার জাতি ও সামাজিক প্রথা। নতুবা তাহার প্রাণ তো একবারও বলে না যে অন্নভোগ দিলে জগন্মাতা উহা গ্রহণ করিবেন না—তাঁহার হৃদয় তো ঐ চিন্তায় উৎফুল্ল ভিন্ন কখন সঙ্কুচিত হয় না! ভাবিলেন, তবে এ বিপরীত প্রথার সৃষ্টি ও প্রচলন কেন? কে করিল,—শাস্ত্র? শাস্ত্রকার কি তবে প্রাণহীন ব্যক্তি ছিলেন? অথবা স্বার্থ প্রেরিত হইয়া ঈশ্বরীর নিকটেও উচ্চবর্ণের উচ্চাধিকার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন? ঐরূপ হইলে শাস্ত্রে আমার প্রয়োজন নাই, আমি আমার প্রাণের পবিত্রাকাঙ্ক্ষারই অনুসরণ করিব। আবার ভাবিলেন—তাহা হইলেই বা নিস্তার কোথায়? প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে কার্য্য করিলেও ভক্ত ব্রাহ্মণ সজ্জনেরা তো কেহই দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিবেন না। তবে উপায়? রাণী নানা স্থান হইতে প্রসিদ্ধ

নানা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের ঐ বিষয়ক ব্যবস্থা আনাইতে লাগিলেন—কিন্তু ঐ সকলের একটিও তাঁহার মনের মত হইল না।

এদিকে মন্দির নির্ম্মাণ ও মূর্ত্তি গঠন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল। কিন্তু প্রাণের পিপাসা মিটাইয়া সেবা প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প পূর্ণ করিবার কোন উপায়ই দেখা যাইল না। ছোট বড় সকল পণ্ডিতদিগের নিকটে পুনঃপুনঃ ব্যবস্থা গ্রহণ ও বারম্বার প্রত্যাখ্যাত হইয়া রাণীর আশা যখন প্রায় নির্ম্মূলিত হইতেছিল, এমন সময়ে নগণ্য, নবপ্রতিষ্ঠিত, ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠী হইতে ব্যবস্থা আসিল—"প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে রাণী যদি উক্ত অপ্রতিষ্ঠিত দেবালয় ও সম্পত্তি কোন ব্রাহ্মণকে দান করেন এবং তদনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ ঐ মন্দিরে দেবী প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্নভোগের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে শাস্ত্র নিয়ম যথাযথ রক্ষিত হইবে এবং ব্রাহ্মণ সজ্জনেরা উক্ত দেবালয়ে প্রসাদ গ্রহণ করিলেও দোষের ভাগী হইবেন না।"

ব্যবস্থা পাইয়াই রাণীর হৃদয়ের আশা আবার মুকুলিত হইয়া উঠিল। তিনি ব্যবস্থাকার পণ্ডিত রামকুমারকে উচ্চ বিদায় পাঠাইয়া নিজ গুরুকে ঐ দেবালয় ও সম্পত্তি প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই লেখা পড়া করিয়া দান করিবার এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া স্বয়ং, গুরুর ঐ সম্পত্তি ও দেবসেবার তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারীর পদবী লইয়া থাকিবার সংকল্প স্থির করিলেন। পরে রামকুমার ভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থানুযায়ী নিজ পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় রাণী অপরাপর পণ্ডিতগণকে জানাইলে তাঁহারা, 'কার্য্যটী সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধ,' 'ঐরূপ করিলেও ব্রাহ্মণ সজ্জনেরা কেহই ঐ স্থানে আসিবেন না' ইত্যাদি নানা কথা বলিলেও উহা যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ হইবে একথা কেহই স্পষ্ট বলিতে সাহসী হইলেন না।

ভট্টাচার্য্য রামকুমারের প্রতি রাণীর দৃষ্টি যে, উক্ত ঘটনায় বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল একথা আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। ভাবিয়া দেখিলেও বাস্তবিক, তখনকার কালে রামকুমারের ঐরূপ ব্যবস্থাদান সামান্য উদারতার পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয় না। সমাজের নেতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মন তখন সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যে নিতান্তই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল এবং ঐ গণ্ডীর সীমার বাহিরে যাইয়া শাস্ত্র শাসনের ভিতর একটা উদার ভাব দেখিতে এবং অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা প্রদান করিতে তাঁহাদের ভিতর বিরল ব্যক্তিই সক্ষম হইতেন! ফলে অনেক স্থলে তাঁহাদিগের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিতেই লোকের মনে প্রবৃত্তির উদয় হইত।

সে যাহা হউক রামকুমারের সহিত রাণীর সম্বন্ধের ঐখানেই পরিসমাপ্তি হইল না। বুদ্ধিমতী রাণী নিজ গুরুবংশীয়গণকে যথাযথ সম্মান প্রদান করিলেও তাঁহাদিগের শাস্ত্রজ্ঞানরাহিত্য এবং শাস্ত্রমত দেবসেবা সম্পন্ন করিবার সম্পূর্ণ অযোগ্যতা বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহাদের ন্যায্য বিদায় আদায় অক্ষুন্ন রাখিয়া নূতন দেবালয়ের যাবতীয় সেবাকার্য্যের ভার যাহাতে কার্য্যদক্ষ শাস্ত্রজ্ঞ সদাচারী সদ্ব্রাহ্মণগণের হস্তে সর্ব্বকাল অর্পিত হয় তদ্বিষয়ের বন্দোবস্তে মনোনিবেশ করিলেন। এখানেও কিন্তু প্রচলিত সামাজিকপ্রথা তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। শূদ্র প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর পূজা করা দূরে যাউক সদ্বংশজাত সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ ঐকালে প্রণাম করিয়াও তাঁহাদিগের সম্মান রক্ষা করিতেন না এবং রাণীর গুরুবংশীয়গণের ন্যায় ব্রহ্মবন্ধুদিগকেও তাঁহারা একপ্রকার শূদ্র মধ্যেই পরিগণিত করিতেন। সুতরাং যজনযাজনক্ষম সদাচারী কোন ব্রাহ্মণই যে এরূপ স্থলে রাণীর দেবালয়ে পূজকপদে ব্রতী হইতে স্বীকৃত হইবেন না একথায় আর আশ্চর্য্য কি আছে? যাহা হউক এককালে হতাশ না হইয়া রাণী বেতন ও পারিতোষিকের হার বৃদ্ধি করিয়া পূজকের জন্য নানা স্থানে সন্ধান করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের ভগ্নী শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর বাটি কামারপুকুরের অনতিদূরে সিহড় নামক গ্রামে ছিল। সিহড়ে অনেক ব্রাহ্মণের বসতি। তথাকার ৺মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়* নামক এক ব্যক্তি তখন রাণীর সরকারে কর্ম্ম করিতেন। বোধ হয়, রাণীর দেবালয়ে ব্রাহ্মণ দিতে পারিলে দুপয়সা লাভ হইতে পারে ভাবিয়া ইনিই এখন পূজক পাচক প্রভৃতি সকল প্রকার ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীর জোগাড় করিয়া দিবার ভার লইতে অগ্রসর হইলেন। রাণীর দেবালয়ে চাকরি স্বীকার করাটা যে দূষণীয় নহে ইহা গ্রামস্থ দরিদ্র ব্রাহ্মণগণকে বুঝাইবার জন্যই হউক, বা আপন সংসারের আর্থিক উন্নতি বিধানের জন্যই হউক, অথবা তদুভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধিসংকল্পেই হউক, মহেশ, রাণীর নিকট হইতে নব দেবালয়ের জন্য উক্ত বন্দোবস্তের ভার লইয়াই নিজ অগ্রজ ক্ষেত্রনাথকে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর মন্দিরে পূজক পদে মনোনীত করিলেন। আমরা বেশ বুঝিতে পারি মহেশ নিজ পরিবারস্থ এক ব্যক্তিকে ঐরূপে রাণীর কার্য্যে নিযুক্ত করায় তাঁহার পক্ষে অন্যান্য ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী সকলের জোগাড় করা অনেকটা সহজ হইয়াছিল। কিন্তু নানা প্রযত্নেও মহেশ শ্রীশ্রীকালিকা দেবীর মন্দিরের জন্য সুযোগ্য পূজক জোগাড় করিতে না পারিয়া বিশেষ চিন্তিত হইলেন।

* কেহ কেহ বলে এই বংশীয়েরা কোন সময়ে মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রামকুমার ভট্টাচার্য্যের সহিত মহেশ পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন। শুধু পরিচয় নহে গ্রাম সম্পর্কে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কোন একটা সুবাদ ও যে পাতান ছিল ইহা আমরা পল্লীগ্রামের রীতি দেখিয়া অনুমান করিতে পারি। রামকুমার যে বিশেষ ভক্তিমান তান্ত্রিক সাধক ছিলেন এবং বহুপূর্ব্বে স্বেচ্ছায় শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ছিলেন একথাও মহেশের অবিদিত ছিল না। আবার রামকুমারের বর্ত্তমান সাংসারিক অভাব অনাটনের কথাও যে তিনি কিছু কিছু জানিতেন ইহাও আমরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। সুতরাং এরূপ স্থলে শ্রীশ্রীকালিকা মাতার পূজক নির্ব্বাচন করিতে যাইয়া মহেশের দৃষ্টি যে রামকুমারের প্রতিই আকৃষ্ট হইবে একথা বুঝা কঠিন নহে। কিন্তু অশূদ্রযাজী রামকুমার কলিকাতায় আসিয়া ৺দিগম্বর মিত্র প্রভৃতির বাটীতে পূজকপদ কখন কখন গ্রহণ করিলেও কৈবর্ত্তক জাতীয়া রাণীর দেবালয়ে কি ঐরূপ করিতে স্বীকৃত হইবেন?—বিশেষ সন্দেহ। যাহা হউক ৺দেবী প্রতিষ্ঠার দিন অতি সন্নিকট, সুযোগ্য লোক ও পাওয়া যাইতেছে না, অতএব সকল দিক ভাবিয়া মহেশ একবার ঐ বিষয়ে চেষ্টা করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। কিন্তু স্বয়ং ঐবিষয়ে সহসা অগ্রসর না হইয়া রাণীর নিকট সকল কথা বলিয়া প্রতিষ্ঠার দিনে অন্ততঃ রামকুমার যাহাতে পূজকের পদ গ্রহণ করিয়া সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করেন তজ্জন্য অনুরোধ ও নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইতে বলিলেন। রামকুমারের নিকট হইতে পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাপত্র পাইয়া রাণী তাঁহার যোগ্যতার বিষয়ে পূর্ব্বেই উচ্চ ধারণা করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার পূজক পদে ব্রতী হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া বিশেষ আনন্দিতা হইলেন এবং অতিদীনভাবে তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন—শ্রীশ্রীজগন্মাতার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে আপনার ব্যবস্থা বলেই আমি অগ্রসর হইয়াছি, এবং আগামী স্নান যাত্রার দিনে শুভ মুহূর্ত্তে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য সমুদয় আয়োজনও করিয়াছি, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীর জন্য পূজক পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু কোন সুযোগ্য ব্রাহ্মণই শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজক পদ গ্রহণে সম্মত হইয়া আমাকে প্রতিষ্ঠা কার্য্যে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইতেছেন না, অতএব আপনিই এ বিষয়ে যাহা হয় একটা শীঘ্র ব্যবস্থা করিয়া আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করুন, আপনি সুপণ্ডিত এবং শাস্ত্রজ্ঞ, অতএব ঐ পূজকের পদে যাহাকে তাহাকে যে নিযুক্ত করা চলে না, একথা বলা বাহুল্য।

রাণীর ঐ প্রকার অনুরোধ পত্র লইয়া মহেশ যে, রামকুমারের নিকট স্বয়ং স্ব,

আসিয়া তাঁহাকে নানারূপে বুঝাইয়া সুযোগ্য কোন পূজক পাওয়া পর্য্যন্ত পূজকের আসন গ্রহণে স্বীকৃত করাইয়াছিল তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। এইরূপে লোভপরিশূন্য ভক্তিমান রামকুমার শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতিষ্ঠা ও পূজা বন্ধ হইবার আশঙ্কাতেই প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন এবং পরে রাণী ও মথুর বাবুর অনুনয় বিনয়ে এবং সুযোগ্য পূজকের অভাব দেখিয়াই ঐ স্থানে যাবজ্জীবন থাকিয়া যান। শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছাতেই সংসারে ছোট বড় সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, কে বলিবে, দেবীভক্ত রামকুমার ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা জানিতে পারিয়াই ঐ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন কি না?

সে যাহা হউক, ঐরূপ অসম্ভাবিত উপায়ে রামকুমারকে পূজকরূপে পাইয়া রাণী রাসমণি সন ১২৫৯ সালের স্নান যাত্রার দিবসে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শুনা যায়, দীয়তাং ভুজ্যতাং' শব্দে সেদিন ঐ স্থান দিবারাত্র সমভাবে কোলাহলময় হইয়া উঠিয়াছিল এবং রাণী অকাতরে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া অতিথি অভ্যাগত সকলকেই আপনার ন্যায় আনন্দিত করিয়া তুলিতে সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কেহ কেহ বলেন ভট্টাচার্য্য রামকুমার ঐদিন সিধা লইয়া গঙ্গাতীরে স্বহস্তে রন্ধন করতঃ আপন অভীষ্ট দেবীকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ ভোজন করিয়া ছিলেন। কিন্তু আমাদের ঐ কথা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, দেবীভক্ত রামকুমার কোনরূপ প্রত্যাশায় প্রলোভিত না হইয়া রাণীকে যথাজ্ঞান ব্যবস্থা দিয়া দেবীর অন্নভোগের বন্দোবস্ত করাইয়াছিলেন। এখন তিনিই যে স্বয়ং ঐ নিবেদিত অন্ন গ্রহণ না করিয়া আপন বিধানের এবং ভক্তিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কার্য্য করিবেন একথা নিতান্তই অযুক্তিকর এবং ঠাকুরের মুখেও আমরা ঐরূপ কথা শুনি নাই। অতএব তিনি পূজান্তে হৃষ্টচিত্তে শ্রীশ্রীজগদম্বার নৈবেদ্যান্নই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আর আমাদের ধর্ম্মপ্রাণ একনিষ্ঠ লোভপরিশূন্যঠাকুর?—ঠাকুর সেদিন ঐ আনন্দোৎসবে সম্পূর্ণ হৃদয়ে যোগদান করিলেও আহারের বিষয়ে নিজ নিষ্ঠা রক্ষা করিয়া সন্ধ্যাগমে নিকটবর্ত্তী বাজারে এক পয়সার মুড়ি মুড়্কিমাত্র কিনিয়া খাইয়া পুনরায় পদব্রজে ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠীতে আসিয়া সে রাত্রি বিশ্রাম করিয়াছিলেন!

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে চিরকালের জন্য পূজক পদ গ্রহণ করা যে ভট্টাচার্য্য রামকুমারের প্রথম অভীপ্সিত ছিল না তাহা আমরা ঠাকুরের এই

সময়ের ব্যবহারেই বুঝিতে পারি। ঐ কথার অনুধাবনে মনে হয় সরল রামকুমার যেন ঐ বিষয় তখনও বুঝিতেই পারেন নাই। আবার রাণীকে ঐরূপে দেবী প্রতিষ্ঠার বিধান দিয়া স্বয়ং ঐ কার্য্য সম্পন্ন করতঃ প্রতিষ্ঠার দিনে দেবীকে অন্নভোগ নিবেদন করিতে বসিয়া তিনি যে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই বা কোনরূপ অন্যায় অশাস্ত্রীয় কার্য্য করিতেছেন মনে করেন নাই একথাও কনিষ্ঠের সহিত তাঁহার এই সময়ের ব্যবহারে বুঝিতে পারা যায়। এজন্য ঐ সকল কথাই আমরা এখানে পাঠককে বলিব।

মন্দির প্রতিষ্ঠার পরদিনে প্রত্যূষেই ঠাকুর অগ্রজের সংবাদ লইবার জন্যই হউক বা তৎপর প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত যে সকল কার্য্য বাকি ছিল, তাহা দেখিতে কৌতূহল পরবশ হইয়াই হউক দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং কিছুকাল তথায় থাকিয়া বুঝেন, রাণী ও মথুর বাবুর অনুরোধ এড়াইয়া অগ্রজের সেদিন ঝামাপুকুরে ফিরিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ঐস্থানে প্রসাদ পাইয়া সন্ধ্যায় ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিলেও অগ্রজের কথা না শুনিয়া তাঁহাকে বলিয়া ভোজনকালে পুনরায় ঝামাপুকুরে ফিরিয়া আসেন। ইহার পর ঠাকুর পাঁচ সাত দিন আর দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন নাই। দক্ষিণেশ্বরের কার্য্য সমাপনান্তে অগ্রজ রামকুমার যথাসময়ে ঝামাপুকুরে ফিরিবেন ভাবিয়া ঐ স্থানেই অবস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু সপ্তাহ অতীত হইলেও যখন রামকুমার ফিরিলেন না, তখন মনে নানা প্রকার তোলাপাড়া করিয়া ঠাকুর পুনরায় সংবাদ লইতে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন এবং শুনিলেন রাণীর সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি চিরকালের জন্য তথায় শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজকের পদে ব্রতী হইতে সম্মত হইয়াছেন। শুনিয়াই ঠাকুরের মনে নানা কথার উদয় হইল এবং তিনি পিতার অশূদ্রযাজিত্বের এবং অপ্রতিগ্রাহিত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে ঐ কার্য্য হইতে ফিরাইবার নানামতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শুনা যায় রামকুমার ঠাকুরের ঐপ্রকার মনোভাব জানিতে পারিয়া তাঁহাকে শাস্ত্র ও যুক্তি সহায়ে নানা প্রকারে বুঝাইলেও কোন কথাই যখন তাঁহার মনে ধরিল না তখন পল্লীগ্রামের প্রথানুসারে তিনি তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য ধর্ম্ম পত্ররূপ * সরল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন।

* পল্লীগ্রামে এখনও রীতি আছে, কোন বিষয় যুক্তিসহকারে সুমীমাংসিত হইবার সম্ভাবনা না দেখিলে লোকে দৈবের উপর নির্ভর করিয়া দেবতার ঐ বিষয়ে কি অভীপ্সিত

শুনা যায় ধর্ম্মপত্রে উঠিয়াছিল, "রামকুমার পূজকের পদ গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া নিন্দিত কর্ম্ম করে নাই, উহাতে সকলেরই মঙ্গল হইবে।"

ধর্ম্মপত্রের মীমাংসা দেখিয়া ঠাকুরের মন ঐ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলেও এখন অন্য এক চিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। চিন্তা এই যে, ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠি তো এইবার উঠিয়া যাইল, তিনি এখন কি করিবেন। ঝামাপুকুরে ঐদিন আর না ফিরিয়া ঠাকুর ঐ বিষয়ক চিন্তাতেই মগ্ন রহিলেন এবং রামকুমার তাঁহাকে ঠাকুর বাড়ীতে প্রসাদ পাইতে বলিলেও তাহাতে সম্মত হইলেন না। রামকুমার নানাপ্রকারে বুঝাইলেন, বলিলেন—"দেবালয়, গঙ্গাজলে রান্না, তাহার উপর শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নিবেদিত হইয়াছে, ইহা ভোজনে কোন দোষ হইবে না।" ঠাকুরের কিন্তু ঐ সকল কথা মনে লাগিল না। তখন রামকুমার বলিলেন "তবে সিধা লইয়া পঞ্চবটী তলে গঙ্গাগর্ভে

জানিবার জন্য ধর্ম্ম পত্রের অনুষ্ঠান করে এবং উহার সহায়ে দেবতার ইচ্ছা জানিয়া ঐ বিষয়ে আর যুক্তি তর্ক না করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। ধর্ম্মপত্র নিম্নলিখিত ভাবে অনুষ্ঠিত হয়:-

কতকগুলি টুকরা কাগজে বা বিল্বপত্রে "হাঁ" "না" লিখিয়া একটি ঘটিতে রাখিয়া কোন শিশুকে উহা হইতে একখণ্ড তুলিতে বলা হয়। শিশু "হাঁ" লিখিত কাগজ তুলিলে অনুষ্ঠাতা বুঝে দেবতা তাহাকে ঐ কার্য্য করিতে বলিতেছেন। বলা বাহুল্য বিপরীত উঠিলে অনুষ্ঠাতা দেবতার অভিপ্রায় অন্যরূপ বুঝে। ধর্ম্মপত্রের অনুষ্ঠানে কখন কখন বিষয় বিভাগাদিও হইয়া থাকে। যেমন পিতার চারি সন্তান পূর্ব্বে একত্রে ছিল, এখন হইতে পৃথক হইবার সংকল্প করিয়া বিষয় বিভাগ করিতে যাইয়া কে কোন বিষয়টি লইবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না, গ্রামের কয়েক জন নিঃস্বার্থ ধার্ম্মিক লোককে মীমাংসা করিয়া দিতে বলিল। তাঁহারা তখন স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তিকে যতদূর সম্ভব সমান চারিভাগে বিভাগ করতঃ কোন ভ্রাতার ভাগে কোন ভাগটি পড়িবে তাহা ধর্ম্মপত্রের দ্বারা মীমাংসা করিয়া থাকেন। ঐ সময়েও প্রায় পূর্ব্বের ন্যায়ই অনুষ্ঠান হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজ খণ্ডে বিষয়াধিকারীদিগের নাম লিখিয়া কেহ না দেখিতে পায় এরূপভাবে মুড়িয়া একটি ঘটির ভিতর রক্ষিত হয় এবং উক্ত চারিভাগে বিভক্ত সম্পত্তির প্রত্যেক ভাগ "ক" "খ" ইত্যাদি নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজ খণ্ডে লিপিবদ্ধ হইয়া অন্য একটি পাত্রে পূর্ব্ববৎ রক্ষিত হইয়া থাকে। অনন্তর দুই জন শিশুকে ডাকিয়া এক জনকে একটি পাত্র হইতে এবং অপরকে অপর পাত্র হইতে ঐ কাগজ খণ্ডগুলি তুলিতে বলা হয়। অনন্তর কাগজগুলি খুলিয়া দেখিয়া যে নামে সম্পত্তির যে ভাগটি উঠিয়াছে তাহাই তাহাকে লইতে বাধ্য করা হয়।

স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন কর: গঙ্গাগর্ভে অবস্থিত সকল বস্তুই পবিত্র, একথা তো মান?" আহার সম্বন্ধীয় ঠাকুরের মনের ঐকান্তিক নিষ্ঠা এইবার তাঁহার অন্তর নিহিত গঙ্গাভক্তির নিকট পরাজিত হইল, শাস্ত্রজ্ঞ রামকুমার তাঁহাকে যুক্তি সহায়ে এত করিয়া বুঝাইয়া ইতিপূর্ব্বে যাহা করাইতে পারেন নাই, বিশ্বাস ও ভক্তি তাহা সংসাধিত করিল, ঠাকুর ঐ কথায় সম্মত হইলেন এবং ঐ প্রকারে ভোজন করিয়া দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বাস্তবিক, আজীবন ঠাকুরের গঙ্গার প্রতি কি গভীর ভক্তিই আমরা দেখিয়াছি! গাঙ্গ বারিকে বলিতেন 'ব্রহ্মবারি'। বলিতেন,—গঙ্গাতীরে বাস করিলে দেবতুল্য অন্তঃকরণ হয়, ধর্ম্মবুদ্ধি স্বতঃ স্ফুরিত হয়। গঙ্গার পবিত্র স্পর্শে পূতবাষ্পকণাপূর্ণ পবন উভয় কূলে যতদূর সঞ্চরণ করে ততদূর পর্য্যন্ত পবিত্র ভূমী—ঐ ভূমীবাসীদিগের জীবনে সদাচার, ঈশ্বরভক্তি, নিষ্ঠা, দান এবং তপস্যার ভাব শৈলসুতা ভাগীরথীর কৃপায় সদাই বিরাজিত। অনেকক্ষণ যদি কেহ বিষয় কথা কহিয়াছে বা বিষয়ী লোকের সঙ্গ করিয়া আসিয়াছে তো ঠাকুর তাহাকে বলিতেন, একটু গঙ্গাজল খাইয়া আয়। ঈশ্বরবিমুখ ঘোর বিষয়াসক্ত বদ্ধ মানব পুণ্যাশ্রমের কোন স্থানে বসিয়া বিষয় চিন্তা করিয়া কলুষিত করিলে তথায় গঙ্গাবারি ছিটাইয়া দিতেন, এবং গঙ্গাবারিতে কেহ শৌচাদি কার্য্য করিতেছে দেখিলে মনে বিশেষ ব্যথা পাইতেন।

সে যাহা হউক, মনোরম ভাগীরথী তীরে বিহঙ্গকুজিত পঞ্চবটী শোভিত উদ্যান, সুন্দর সুবিশাল দেবালয়ে ভক্তিমান সাধকানুষ্ঠিত সুসম্পন্ন দেবসেবা, ধার্ম্মিক সদাচারী পিতৃতুল্য অগ্রজের অকৃত্রিম স্নেহ এবং দেবদ্বিজপরায়ণা পুণ্যবতী রাণী রাসমণি ও তজ্জামাতা মথুর বাবুর শ্রদ্ধা ও ভক্তি শীঘ্রই দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীকে ঠাকুরের নিকট কামারপুকুরের গৃহের ন্যায় আপনার করিয়া তুলিল এবং কিছুকাল স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন করিলেও তিনি তথায় সানন্দচিত্তে বাস করিয়া নিজ মনের পূর্ব্বোক্ত কিংকর্ত্তব্য-অনিশ্চয়তার ভাবটি দূর পরিহার করিতে সক্ষম হইলেন।

ঠাকুরের আহার সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত দৃঢ় নিষ্ঠার কথা শুনিয়া কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, ঐরূপ অনুদারতা তো আমাদের ন্যায় মানবে সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে—ঠাকুরের জীবনে উহার উল্লেখ করিয়া তোমরা কি ইহাই বলিতে চাও যে ঐরূপ অনুদার না হইলে আধ্যাত্মিক জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন চরমোন্নতি সম্ভবপর নহে? তদুত্তরে আমরা বলি, অনুদারতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা দুইটী একই বস্তু

নহে। অহঙ্কারেই প্রথমটির জন্ম এবং উহার প্রাদুর্ভাবে মানব স্বয়ং যাহা বুঝিতেছে করিতেছে তাহাকেই সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানে আপনার চারিদিকে গণ্ডী টানিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসে, এবং শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণের অনুশাসনে বিশ্বাস হইতেই দ্বিতীয়ের উৎপত্তি—উহার উদয়ে মানব নিজ অহঙ্কারকে খর্ব্ব করিয়া উচ্চ উচ্চতর অনুশাসনের অধিকার ভুক্ত হইয়া ক্রমে পরম সত্যের অধিকারী হইয়া থাকে। নিষ্ঠার প্রাদুর্ভাবে মানব প্রথম প্রথম কিছুকাল অনুদাররূপে আপাততঃ প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু উহার সহায়ে সে ঈশ্বর কৃপায় জীবন-পথে উচ্চ উচ্চতর আলোকে দেখিতে পায় এবং অমনি তাহার গণ্ডীও খসিয়া পড়ে? অতএব আধ্যাত্মিক উন্নতি পথে নিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজনীয়তা কেমনে অস্বীকার কবি? ঠাকুরের জীবনে উহাব পরিচয় পাইয়া ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে শাস্ত্র শাসন এবং মহর্ষিদিগের বাক্যের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা রাখিয়া আমরা যদি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকলের উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসর হই তবেই কালে যথার্থ উদাবতার অধিকারী হইব এবং শান্তি লাভে সক্ষম হইব, নতুবা নহে। ঠাকুর যেমন বলিতেন—কাঁটাদিয়াই আমাদিগকে কাঁটা তুলিতে হইবে, নিষ্ঠাকে অবলম্বন করিয়াই আমাদিগকে সত্যের উদারতায় পৌঁছিতে হইবে শাসন নিয়মাদিকে অনুসরণ করিয়াই আমাদিগকে শাসনাতীত নিয়মাতীত অবস্থা লাভ করিতে হইবে।

আবাব যৌবনের প্রারম্ভে ঠাকুরের জীবনে ঐরূপ অসম্পূর্ণতা বিদ্যমান দেখিয়া অপব কেহ কেহ হয়ত নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—তবে আর তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার ঠাকুর বলা কেন, মানুষ বলিলেই তো হয়? আর যদি তাঁহাকে ঠাকুর বানাইতেই চাও তবে তাঁহার ঐরূপ অসম্পূর্ণতা গুলি ছাপিয়া ঢাকিয়া বলাই ভাল। আমরা বলি—ভ্রাতঃ আমাদেরও এককাল গিয়াছে যখন ঈশ্বরের অবতীর্ণ হইবার কথা স্বপ্নেও সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস করি নাই, আবার যখন তাঁহারই অহেতুক কৃপায় ঐ কথা সম্ভবপর বলিয়া তিনি আমাদিগকে বুঝাইলেন তখন দেখিলাম মানব দেহ ধারণ করিতে গেলে ঐ দেহের অসম্পূর্ণতা গুলির ন্যায় মানব মনের অসম্পূর্ণতা গুলিও যথাযথভাবে গ্রহণ করিতে হয়। ঠাকুর বলিতেন,স্বর্ণাদি ধাতুতে "খাদ্ না থাক্‌লে গড়ন হয় না"। তিনি তাঁহার জীবনের ঐ সকল অসম্পূর্ণতার কথা আমাদের নিকট কোনও দিন কিছুমাত্র লুকাইবার প্রয়াস করেন নাই, [illegible] স্পষ্টাক্ষরে বারম্বার আমাদিগকে বলিয়াছেন—"যে রাম যে কৃষ্ণ হইয়াছিল সেই ইদানীং (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই খোলটার ভিতরে

আসিয়াছে, তবে এবার গুপ্তভাবে, রাজা যেমন ছদ্মবেশে সহর দেখিতে বাহির হন, সেই প্রকার।" আমরাও তদ্রূপ তাঁহার সকল কথাই,আমাদের যতদূর জানা আছে তোমায় বলিব, তোমার লইতে ইচ্ছা হয় লইও অথবা যথা ইচ্ছা আমাদিগকে নিন্দা তিরস্কার করিও।

স্বামী-শিষ্য-সংবাদ।

শেষ দেখা।

আজ ১৩ই আষাঢ়। শিষ্য বালী হইতে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে মঠে আসিয়াছে। বালিতেই তখন তাহার কর্ম্মস্থান। অদ্য সে আফিসের পোষাক পরিয়াই আসিয়াছে। উহা পরিবর্ত্তন করিবার সময় পায় নাই। আসিয়াই স্বামীজির পাদপদ্মে প্রণত হইয়া—সে তাঁহার শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিল। স্বামীজি বলিলেন "বেশ্ আছি। (শিষ্যের পোষাক দেখিয়া) তুই কোট প্যাণ্ট্ পরিস্—কলার পরিস্ নি কেন?" ঐকথা বলিয়াই নিকটস্থ স্বামী সারদানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন—"আমার যে সব কলার আছে তা থেকে দুটো কলার একে কাল (প্রাতে) দিস্‌তো।" সারদানন্দ স্বামীও স্বামীজির আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন।

অতঃপর শিষ্য মঠের অন্য এক গৃহে উক্ত পোষাক ছাড়িয়া হাত মুখ ধুইয়া স্বামীজির কাছে আসিল। স্বামীজি তখন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আহার পোষাক্ ও জাতীয় আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিলে ক্রমে জাতীয়ত্ব লোপ্ হয়ে যায়। বিদ্যা সকলের কাছেই শিখ্‌তে পারা যায়। কিন্তু যে বিদ্যালাভে জাতীয়ত্বের লোপ্ হয় তাতে উন্নতি হয় না—অধঃপাতের সূচনাই হয়।"

শিষ্যঃ—মহাশয় আফিস অঞ্চলে এখন সাহেবদের অনুমোদিত পোষাকাদি না পরিলে চলেনা।

স্বামীজি:—তা কে বারণ কর্‌ছে? আফিস্ অঞ্চলে কার্য্যানুরোধে ঐরূপ পোষাক্ পর্‌বি বইকি। কিন্তু ঘরে গিয়ে ঠিক্ বাঙ্গালী বাবু হবি। সেই কোঁচা ঝুলানো—কামিজ গায়—চাদর কাঁধে বুঝলি?

শিষ্য :— আজ্ঞা হাঁ।

স্বামীজি :—তোবা কেবল সাট্ পরেই এবাড়ি ওবাড়ি যাস্—ওদেশে (পাশ্চাত্যে) ঐরূপ পোষাক পরে লোকের বাড়ি যাওয়া ভারি অভদ্রতা— naked (নেংটো) বলে। সাটেব উপর কোট না পরলে ভদ্রলোকে বাড়ী ঢুকতেই দেবেনা। পোষাকের ব্যাপারে তোবা কি ছাই অনুকরণ কত্তেই শিখেছিস্! আজ কাল্কার ছেলে ছোক্‌রারা যে সব পোষাক পবে তা না এদেশী—না ওদেশী, এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ!

এইরূপ কথাবার্ত্তাব পর স্বামীজি গঙ্গার ধারে একটু পাইচালী করিতে লাগিলেন। সঙ্গে কেবলমাত্র শিষ্যই বহিল। শিষ্য সাধন সম্বন্ধে একটি কথা এখন স্বামীজিকে বলিবে কি না ভাবিতে লাগিল।

স্বামীজি: কি ভাব্ছিস্? বলেই ফেল্ না। (যেন মনের কথা টের পাইয়াছেন।)

শিষ্য সলজ্জভাবে বলিতে লাগিল, "মহাশয়, ভাবিতেছিলাম যে আপনি যদি এমন্ একটা কোন উপায় শিখাইয়া দিতেন যাহাতে খুব শীঘ্র মন স্থির হইয়া পড়ে—যাহাতে খুব শীঘ্র ধ্যানস্থ হইতে পাবি—তবে খুব উপকার হয়। সংসার চক্রে পড়িয়া সাধন ভজনের সময়ে মন স্থিব কবিতে পারা ভার।

স্বামীজি শিষ্যের ঐরূপ দীনতা দর্শনে বড়ই সন্তোষ লাভ করিলেন, বোধ হইল। প্রত্যুত্তরে তিনি শিষ্যকে সস্নেহে বলিলেন খানিক বাদে "আমি উপরে যখন একা থাক্‌বো তখন তুই যাস্। ঐ বিষয়ে কথাবার্ত্তা হবে এখন্।"

শিষ্য আনন্দে অধীর হইয়া স্বামীজিকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। স্বামীজি "থাক্ থাক্" বলিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে স্বামীজি উপরে চলিয়া যাইলেন।

শিষ্য ইত্যবসরে নীচে একজন সাধুর সঙ্গে বেদান্তের বিচার আরম্ভ করিয়া দিল এবং ক্রমে দ্বৈতাদ্বৈত মতের বাদ বিতণ্ডায় মঠ কোলাহলময় হইয়া উঠিল। গোলোযোগ দেখিয়া শিবানন্দ মহারাজ তাহাদের বলিলেন, "ওরে আস্তে আস্তে বিচার কর, ওমন চীৎকাব করলে স্বামীজির ধ্যানের ব্যাঘাত হবে।" শিষ্য ও ঐ কথা শুনিয়া বিচাব সাঙ্গ করিয়া উপরে স্বামীজির কাছে চলিল।

শিষ্য উপরে উঠিয়াই দেখিল, স্বামীজি পশ্চিমাস্তে মেজেতে বসিয়া ধ্যানস্থ হইয়াছেন। মুখে চন্দ্রকান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। একেবারে স্থির—যেন

"চিত্রার্পিতরম্ভ ইবাতস্থে" ! সে, স্বামীজির সেই ধ্যানস্থ মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক হইয়া নিকটেই দাঁড়াইয়া রহিল। কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়াও স্বামীজির বাহ্যিক হুঁষের কোন চিহ্নই দেখিল না। সুতরাং নিঃশব্দে ঐ স্থানে বসিয়া রহিল। এইরূপে আরও অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইলে স্বামীজির ব্যাবহারিক রাজ্যসম্বন্ধীয় জ্ঞানের একটু আভাস দেখা গেল, তাঁহার বদ্ধ পাণিপদ্ম কম্পিত হইতেছে, শিষ্য দেখিতে পাইল। উহার পাঁচ সাত মিনিট বাদেই স্বামিজী চক্ষু রুন্মিলন করিয়া শিষ্যের প্রতি চাহিয়া বলিলেন "কখন এখানে এলি ?"

শিষ্যঃ—এই কতক্ষণ আসিয়াছি।

স্বামীজিঃ—তা বেশ। এক গ্লাস জল নিয়ে আয়।

শিষ্য তাড়াতাড়ি স্বামীজির জন্য নিদ্দিষ্ট কুঁজো হইতে জল লইয়া আসিল। স্বামীজি একটু জল পান করিয়া গ্লাসটী শিষ্যকে যথা স্থানে রাখিতে বলিলেন। শিষ্য ঐরূপ করিয়া আসিয়া পুনরায় স্বামীজির কাছে বসিল।

স্বামীজিঃ—আজ্ খুব ধ্যান জমেছিল।

শিষ্যঃ—মহাশয়, ধ্যান করিতে বসিলে মন যাহাতে ঐরূপ ডুবিয়া যায় তাহা আমাকে শিখাইয়া দিন।

স্বামীজিঃ—তোকে সব উপায় তো পূর্ব্বেই বলেদিয়েছি প্রত্যহ সেই প্রকারে কর্‌বি। কালে টের্ পাবি। আচ্ছা বল্ দেখি তোর কি ভাল লাগে ?

শিষ্যঃ—মহাশয় ঐরূপ করিয়া থাকি তত্রাচ আমার ধ্যান এখনো ভাল জমে না। আবার কখন কখন মনে হয় কি হইবে ধ্যান করিয়া ? আপনার চির সামিপ্যই আমার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

স্বামীজিঃ—ও সব weaknessর (মানসিক দৌর্ব্বল্যে চিহ্ন। সর্ব্বদা নিত্য প্রত্যক্ষ আত্মায় তন্ময় হয়ে যাবার চেষ্টা কর্‌বি আত্মদর্শন একবার হলে সব হোলো—জন্ম মৃত্যুর পাশ কেটে চলে যাবি।

শিষ্যঃ—আপনি কৃপা করিয়া তাহাই করিয়া দিন; আপনি আজ নিরি-বিলি আসিতে বলিয়াছিলেন, তাই আসিয়াছি কিছু বলুন।

স্বামীজিঃ—সময় পেলেই ধ্যান কর্‌বি। সুষুম্না পথে মন যদি একবার চলে যায় তো আপনাপনি সব ঠিক্ হয়ে যাবে। তোকে বেশী কিছু আর কত্তে হবে না।

শিষ্যঃ—আপনি তো কত উৎসাহ দেন। কিন্তু আমার সত্যবস্তু প্রত্যক্ষ হইবে কি ? যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইতে পারিব কি ?

স্বামীজি:—হবে বই কি! আকীটব্রহ্মা সব কালে মুক্ত হয়ে যাবে—আর তুই হবিনি? ও সব weakness মনেও স্থান দিবিনি। ইহার পর বলিলেন "শ্রদ্ধাবান হ,—বীর্য্যবান্ হ,—আত্মজ্ঞান লাভ কর্—আর পরহিতায় জীবন পাত কর—এই আমার ইচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ।"

অতঃপর প্রসাদের ঘণ্টা পড়ায় স্বামীজি শিষ্যকে বলিলেন, "যা প্রসাদের ঘণ্টা পড়েছে।"

শিষ্য স্বামীজির পাদপদ্মে প্রণত হইয়া কৃপা ভিক্ষা করায় স্বামীজি শিষ্যের মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন ও বলিলেন "আমার আশীর্ব্বাদে যদি তোর কোন উপকার হয় তো বল্‌ছি, ভগবান রামকৃষ্ণ তোকে কৃপা করুন। এর চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ আমি জানি না।"

শিষ্য এইবার আনন্দ মনে নীচে নাবিয়া আসিয়া শিবানন্দ মহারাজকে স্বামীজির আশীর্ব্বাদের কথা বলিল। শিবানন্দস্বামী ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন—"যাঃ বাঙ্গাল তোর্ সব হয়ে গেল। এর পর স্বামীজির আশীর্ব্বাদের ফল জান্‌তে পার্‌বি।"

আহারান্তে শিষ্য আর সে রাত্রে উপরে যায় নাই। কারণ স্বামীজি আজ সকাল সকাল নিদ্রা যাইবার জন্য শয়ন করিয়াছিলেন। মঠের মহারাজগণের নিকট ঐকথা শুনিয়াই শিষ্য আর রাত্রে স্বামীজির ঘরে যায় নাই।

পরদিন প্রত্যূষে শিষ্যকে কার্য্যানুরোধে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতেই হইবে। সুতরাং তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া সে উপরে স্বামীজির কাছে উপস্থিত হইল।

স্বামীজি:—এখনি যাবি?

শিষ্য:—আজ্ঞা হাঁ।

স্বামীজি:—আগামী রবিবারে আস্‌বি তো?

শিষ্য:—নিশ্চয়।

স্বামীজি:—তবে আয়, ঐ একখানা চল্‌তি নৌকাও আস্‌ছে।

শিষ্য স্বামীজির পাদপদ্মে এজন্মের মত বিদায় লইয়া চলিল। সে তখনও জানেনা যে তাহার ইষ্টদেবের সঙ্গে স্থূলশরীরে তাহার এই শেষ দেখা। স্বামীজি তাহাকে প্রসন্ন বদনে বিদায় দিয়া পুনরায় বলিলেন "রবিবার আসিস্"। শিষ্যও "আসিব" বলিয়া নীচে নামিয়া গেল।

স্বামী সারদানন্দ তাহাকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া বলিলেন 'ওরে কলার ফুটো

নিয়ে যা। নৈলে স্বামীজির বকুনি খেতে হবে।' শিষ্য বলিল "আজ বড়ই—তাড়াতাড়ি—আর একদিন লইয়া যাইব—আপনি স্বামীজিকে এই কথা বলিবেন।"

চলতি নৌকার মাঝি ডাকাডাকি করিতেছে সুতরাং শিষ্য ঐ কথাগুলি বলিতে বলিতেই নৌকায় ছুটিল। শিষ্য নৌকায় উঠিয়াই দেখিতে পাইল স্বামীজি উপরের বারিন্দায় পাইচারী করিতেছেন সে তাঁহাকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিল। নৌকা ভাঁটার টানে আধ ঘণ্টার মধ্যেই আহীরীটোলার ঘাটে পঁহুছিল।

ইহার সাতদিন পরেই স্বামীজি স্বস্বরূপ সংবরণ করেন। শিষ্য ঐ ঘটনার পূর্ব্বে কোন আভাসই প্রাপ্ত হয় নাই। তাঁহার দেহান্তের দ্বিতীয় দিনে সংবাদ পাইয়া সে মঠে উপস্থিত হয়। সুতরাং স্থূলশরীরে স্বামীজির সন্দর্শন তাহার ভাগ্যে আর ঘটিয়া উঠে নাই।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ সমাপ্ত।

মন্তব্য।

গত সাতবৎসর যাবৎ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ উদ্বোধন পত্রিকায় ধারাবাহিক ক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে। শীঘ্রই পুস্তকাকারে উদ্বোধন আফিস্ হইতে ইহা প্রকাশিত হইবে।

স্বামীজি যখন প্রথমবার বিলাত হইতে আসিয়া কলিকাতা, বাগবাজার ৺বলরাম বসুর বাড়ীতে অবস্থান করেন তখন হইতে শিষ্যের সহিত স্বামীজির নানারূপ বিচার ও শাস্ত্র প্রসঙ্গ হইত। পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ঐসময়ে একদিন তথায় উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিন তিনি শিষ্যকে বলেন যে স্বামীজির সহিত যে সব প্রসঙ্গ হয় তাহা যেন সে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে। মাষ্টার মহাশয়ের আদেশে শিষ্য এই সকল প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল—তাহাতেই বিস্তৃত আকারে "স্বামি-শিষ্য-সংবাদ" লিখিত হইয়াছে। এখানে ইহাও প্রকাশ থাকে যে বেলুড়মঠের শ্রীযুক্ত নির্ম্মলানন্দ স্বামী মহারাজও এই সকল প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে শিষ্যকে বহুধা উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এই দুই মহাপুরুষের নিকট এইজন্ত শিষ্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে।

শিষ্যের ডায়েরীতে মাস, সন, তারিখ, তিথি, নক্ষত্র লিপিবদ্ধ ছিল না। শিষ্য ঐ সকল লিখিয়া রাখিবার প্রয়োজনীয়তাও তখন বোধ করে নাই। সেইজন্য প্রবন্ধ সকলে ঐরূপে সময়ের নির্ণয় করিয়া দেওয়া হয় নাই। এই সকল প্রবন্ধের অধিকাংশই ডায়েরী হইতে লিখিত হইয়াছে। যেখানে স্মৃতি হইতে লেখা হইয়াছে সে সকল স্থান স্বামীজির গুরু ভ্রাতৃগণ ও শিষ্যবর্গকে (যাঁহাদের সম্মুখে প্রসঙ্গোক্ত বিষয় সকল স্বামীজি ঐ ভাবে বলিয়াছিলেন)—দেখাইয়া তাঁহাদের দ্বারা প্রসঙ্গের সত্যতা পরীক্ষা করাইয়া ছাপানো হইয়াছে। সুতরাং এই সকল প্রসঙ্গে কোনরূপ ভ্রমপ্রমাদ আছে বলিয়া শিষ্যের বিশ্বাস নাই। এই প্রসঙ্গের পঠনপাঠনাদ্বারা যদি কাহারো কল্যান সাধিত হয় তবেই শিষ্য আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবে।

প্রকাশ থাকে যে এই স্বামি-শিষ্য-সংবাদের সমগ্র সত্ত্ব (entire right) বেলুড় মঠের trustee গণকে শিষ্য দান করিয়াছে। ইহার সমগ্র আয় স্বামীজির সমাধিমন্দিরের ব্যয়সঙ্কুলনে ব্যয়িত হইবে, এবং অতঃপর যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহাতে রামকৃষ্ণ মঠের সেবাকল্পে ব্যয়িত হইবে। গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইলে ইহার উত্তরোত্তর সমগ্র সংস্করণে শিষ্য বা সংসারসম্পর্কে শিষ্যের দায়াদগণের কোনরূপ দাবী থাকিল না বা থাকিবে না।

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বারাকপুর।

প্রশ্নোত্তর।

(১)

(ব্রুকলিন নৈতিকসভা, ব্রুকলিন, আমেরিকা।)

প্র। আপনি বলেন, সবই মঙ্গলের জন্য, কিন্তু দেখিতে পাই, জগতে অমঙ্গল, দুঃখ কষ্ট চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। আপনার ঐ মতের সঙ্গে এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট ব্যাপারের আপনি কিরূপে সামঞ্জস্য সাধন করিবেন?

উ। যদি আপনি প্রথম অমঙ্গলের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারেন,

তবেই আমি ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি—কিন্তু বৈদান্তিক ধর্ম্ম অমঙ্গলের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। সুখের সহিত অসংযুক্ত অনন্ত দুঃখ থাকিলে তাহাকে অবশ্য প্রকৃত অমঙ্গল বলিতে পারা যায়। কিন্তু যদি সাময়িক দুঃখ-কষ্ট হৃদয়ের কোমলতা ও মহত্ত্ব বিধান করিয়া মানুষকে অনন্ত সুখের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়, তবে তাহাকে আর অমঙ্গল বলা চলে না—বরং উহাই পরম মঙ্গল বলিতে পারা যায়। আমরা কোন জিনিষকে মন্দ বলিতে পারি না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমরা অনন্তের রাজ্যে উহার পরিণাম কি দাঁড়ায়, তাহার অনুসন্ধান করি। * *

ভূত বা পিশাচোপাসনা হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ নহে। মানবজাতি ক্রমোন্নতির পথে চলিয়াছে, কিন্তু সকলেই একরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারে নাই। সেই জন্য দেখা যায়, পার্থিব জীবনে কেহ কেহ অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা মহত্তর ও পবিত্রতর। প্রত্যেক ব্যক্তিরই—তাহার বর্ত্তমান উন্নতিক্ষেত্রের সীমার মধ্যে—আপনাকে উন্নত করিবার সুযোগ বিদ্যমান। আমরা নিজেদের নষ্ট করিতে পারি না, আমরা আমাদের আভ্যন্তরীণ জীবনীশক্তিকে নষ্ট বা দুর্ব্বল করিতে পারি না, কিন্তু আমাদের উহাকে বিভিন্ন দিকে পরিচালিত করিবার স্বাধীনতা আছে।

প্র। জাগতিক জড় পদার্থের সত্যতা কি কেবল আমাদের নিজ মনেরই কল্পনা নহে?

উ। আমার মতে বাহ্য জগতের অবশ্যই একটা সত্তা আছে—আমাদের মনের চিন্তার বাহিরেও উহার একটা অস্তিত্ব আছে। সমগ্র প্রপঞ্চ চৈতন্যের ক্রমবিকাশরূপ মহান্ বিধানের অনুবর্ত্তী হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হই-তেছে—এই চৈতন্যের ক্রমবিকাশ জড়ের ক্রমবিকাশ হইতে পৃথক্। জড়ের ক্রমবিকাশ চৈতন্যের বিকাশপ্রণালীর সূচক বা প্রতীকস্বরূপ, কিন্তু ঐ প্রণালীর ব্যাখ্যা করিতে পারে না। আমরা বর্ত্তমান পার্থিব পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বদ্ধ থাকায় এখনও অখণ্ড ব্যক্তিত্বপদবী লাভ করিতে পারি নাই। আমরা যতদিন না সেই উচ্চতর অবস্থা লাভ করিব, যে অবস্থায় আমাদের অন্তরাত্মার পরমলক্ষণসমূহ প্রকাশার্থে আমরা উপযুক্ত যন্ত্ররূপে পরিণত হই, ততদিন আমরা প্রকৃত ব্যক্তিত্বলাভ করিতে পারিব না।

প্র। যীশুখ্রীষ্টের নিকট একটী জন্মান্ধ শিশু আনিয়া জিজ্ঞাসা করা হইয়া-ছিল, শিশুটীর নিজের কোন পাপবশতঃ অথবা তাহার পিতামাতার পাপ-

প্রযুক্ত সে অন্ধ হইয়া জন্মিয়াছে—আপনি এই সমস্যার কিরূপ মীমাংসা করেন?

উ। এ সমস্যার ভিতর পাপের কথা আনিবার কোন প্রয়োজন ত দেখা যাইতেছে না—তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস—শিশুটীর এই অন্ধতা তাহার পূর্ব্বজন্মকৃত কোন কার্য্যের ফলস্বরূপ। আমার মতে এইরূপ সমস্যাগুলি পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করিলেই কেবল ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

প্র। আমাদের আত্মা কি মৃত্যুর পর আনন্দের অবস্থা প্রাপ্ত হয়?

উ। মৃত্যু কেবল অবস্থার পরিবর্ত্তনমাত্র। দেশ কাল আপনার মধ্যেই বর্ত্তমান, আপনি দেশকালের অন্তর্গত নহেন। এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট যে, আমরা ইহলোকে বা পরলোকে যতই আমাদের জীবনকে পবিত্রতর ও মহত্তর করিব, ততই আমরা সেই ভগবানের সমীপবর্ত্তী হইব, যিনি সমুদয় আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য ও অনন্ত আনন্দের কেন্দ্রস্বরূপ।

(২)

(টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরি ক্লাব, বোষ্টন, আমেরিকা।)

প্র। বেদান্ত কি মুসলমান ধর্ম্মের উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল?

উ। বেদান্তের আধ্যাত্মিক উদারতা মুসলমান ধর্ম্মের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভারতের মুসলমান ধর্ম্ম অন্যান্য দেশের মুসলমান ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিষ। কেবল যখন মুসলমানেরা অপর দেশ হইতে আসিয়া তাহাদের ভারতীয় স্বধর্ম্মীদের নিকট বলিতে থাকে যে, তাহারা বিধর্ম্মীদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া রহিয়াছ কিরূপে?—তখনই অশিক্ষিত গোঁড়া মুসলমানের দল উত্তেজিত হইয়া দাঙ্গাহাঙ্গামা করিয়া থাকে।

প্র। বেদান্ত কি জাতিভেদ স্বীকার করেন?

উ। জাতিভেদ বৈদান্তিক ধর্ম্মের বিরোধী। জাতিভেদ একটী সামাজিক প্রথা, আর আমাদের বড় বড় আচার্য্যেরা উহা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল সম্প্রদায়ই জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু যতই ঐরূপ প্রচার হইয়াছে, ততই জাতিভেদের নিগড় আরো দৃঢ়তর হইয়াছে। জাতিভেদ ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ

হইতে উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র। উহা বংশপরম্পরাগত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলির সমবায় (Trade guild)। কোনরূপ উপদেশ অপেক্ষা, ইউরোপের সহিত বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় জাতিভেদ বেশী ভাঙ্গিয়াছে।

প্র। বেদের বিশেষত্ব কি ?

উ। বেদের একটী বিশেষত্ব এই যে, যত শাস্ত্রগ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে একমাত্র বেদই বার বার বলিয়াছেন, বেদকেও অতিক্রম করিতে হইবে। বেদ বলেন, উহা কেবল অসিদ্ধাবস্থারূঢ় মানবের জন্য লিখিত। সিদ্ধাবস্থায় বেদের গণ্ডী ছাড়াইয়া যাইতে হইবে।

প্র। আপনার মতে প্রত্যেক জীবাত্মা কি নিত্য সত্য ?

উ। জীবসত্তা কতকগুলি সংস্কার বা বৃত্তির সমষ্টিস্বরূপ, আর এই বৃত্তিসমূহের প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তন হইতেছে। সুতরাং উহা কখন অনন্তকালের জন্য সত্য হইতে পারে না। এই মায়িক জগৎপ্রপঞ্চের মধ্যেই উহার সত্যতা। জীবাত্মা চিন্তা ও স্মৃতির সমষ্টি উহা কিরূপে নিত্য সত্য হইতে পারে ?

প্র। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে লোপ পাইল কেন ?

উ। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে প্রকৃত পক্ষে লোপ পায় নাই। উহা কেবল একটী বিপুল সামাজিক আন্দোলন মাত্র ছিল। বুদ্ধের পূর্ব্বে যজ্ঞার্থে এবং অন্যান্য কারণেও অনেক জীবহত্যা হইত আর লোকে প্রচুর মদ্যপান ও মাংস ভোজন করিত। বুদ্ধের উপদেশের ফলে মদ্যপান ও জীবহত্যা ভারত হইতে প্রায় লোপ পাইয়াছে।

(৩)

(আমেরিকায় হার্টফোর্ডে, আত্মা, ঈশ্বর ও ধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতার অবসানে শ্রোতৃবৃন্দ কয়েকটী প্রশ্ন করেন। সেই প্রশ্নগুলি ও তাহাদের উত্তর নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।)

শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি বলিলেন,—

যদি খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ লোককে নরকাগ্নির ভয় না দেখান্ তবে লোকে আর তাঁহাদের কথা মানিবে না।

উত্তর।—তাই যদি হয় ত না মানাই ভাল। যাহাকে ভয় দেখাইয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করাইতে হয়, বাস্তবিক তাহার কোন ধর্ম্মই হয় না। লোককে তাহার আসুরী প্রকৃতির কথা কিছু না বলিয়া তাহার ভিতরে যে দেবভাব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে তাহার বিষয় উপদেশ দেওয়াই ভাল।

প্র। প্রভু (যীশুখ্রীষ্ট) "স্বর্গরাজ্য এ জগতের নহে," এ কথা কি অর্থে বলিয়াছিলেন।

উ। তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য ছিল যে, স্বর্গ রাজ্য আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে। য়াহুদীদের ধারণা ছিল যে, এই পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য বলিয়া একটী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। যীশুর সে ভাব ছিল না।

প্র। আপনি কি বিশ্বাস করেন, আমরা পূর্ব্বে পশু ছিলাম, এক্ষণে মানব হইয়াছি?

উ। আমার বিশ্বাস, ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে উচ্চতর প্রাণিসমূহ নিম্নতর জীবসমূহ হইতে আসিয়াছে।

প্র। আপনি কি এমন কাহাকেও জানেন, যাঁহার পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণ আছে?

উ। আমার এমন কয়েকজন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, যাঁহারা আমাকে বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ আছে। তাঁহারা এমন এক অবস্থালাভ করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি উদিত হইয়াছে।

প্র। আপনি খ্রীষ্টের ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া ব্যাপার কি বিশ্বাস করেন?

উ। খ্রীষ্ট ঈশ্বরাবতার ছিলেন—লোকে তাঁহাকে হত্যা করিতে পারে নাই। যাহা তাহারা ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহা একটা ছায়া মাত্র, মরুমরীচিকা স্বরূপ একটা ভ্রান্তি মাত্র।

প্র। যদি তিনি ঐরূপ একটা ছায়াশরীর নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাহাই কি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অলৌকিক ব্যাপার নহে?

উ। আমি অলৌকিক ঘটনা সমূহকে সত্যলাভের পথে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিঘ্নকর বলিয়া মনে করি। বুদ্ধের শিষ্যগণ একবার তাঁহাকে একটী তথাকথিত অলৌকিক ক্রিয়াকারী ব্যক্তির কথা বলিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি স্পর্শ না করিয়া খুব উচ্চস্থান হইতে একটী পাত্র লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু বুদ্ধদেবকে সেই পাত্রটি দেখাইবামাত্র তিনি তাহা লইয়া পদদ্বারা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন, আর তাহাদিগকে অলৌকিক ক্রিয়ার উপর ধর্ম্মের ভিত্তি নির্ম্মাণ করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, সনাতন তত্ত্বসমূহের মধ্যে সত্যের অন্বেষণ করিতে হইবে। তিনি তাহাদিগকে যথার্থ আভ্যন্তরিক জ্ঞানালোকের বিষয়, আত্মতত্ত্ব, আত্মজ্যোতির বিষয় শিক্ষা দিয়াছিলেন—আর ঐ আত্ম-

জ্যোতির আলোকে অগ্রসর হওয়াই এক মাত্র নিরাপদ পন্থা। অলৌকিক ব্যাপারগুলি ধর্ম্মপথের কেবল প্রতিবন্ধক মাত্র। সে গুলিকে সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে।

প্র। আপনি কি বিশ্বাস করেন, যীশু শৈলোপদেশ (Sermon on the Mount) দিয়াছিলেন?

উ। যীশু শৈলোপদেশ দিয়াছিলেন, ইহ আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু এ বিষয়ে অপরাপর লোকে যেমন গ্রন্থের উপর নির্ভর করেন, আমাকেও তাহাই করিতে হয়, আর আমি ইহা জানি যে, কেবল গ্রন্থের প্রমাণের উপর সম্পূর্ণ আস্থা করা যাইতে পারে না। তবে ঐ শৈলোপদেশকে আমাদের জীবনের পথ প্রদর্শকরূপে গ্রহণ করিলে আমাদের কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। আধ্যাত্মিক কল্যাণপ্রদ বলিয়া আমাদের প্রাণে যাহা লাগিবে, তাহাই আমা-দিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। বুদ্ধ খ্রীষ্টের পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন—তাঁহার বাক্যাবলী প্রেম ও আশীর্ব্বাদপূর্ণ। কখন তাঁহার মুখ হইতে কাহার প্রতি একটী অভিশাপবাণী উচ্চারিত হয় নাই—তাঁহার জীবনের মধ্যেও কাহারও অশুভানুধ্যানের কথা শুনা যায় না। জরতুষ্ট্র বা কংফুছের মুখ হইতেও কখন অভিশাপবাণী নির্গত হয় নাই।

(৪)

প্র। ভারতরমণীগণ তত উন্নত নহেন কেন?

উ। বিভিন্নযুগে যে অনেক অসভ্য জাতি ভারত আক্রমণ করিয়াছিল, প্রধানতঃ তাহার জন্যই ভারতমহিলা এত অনুন্নত। কতকটা ভারতবাসীর নিজের দোষ।

এক সময় আমেরিকায় স্বামীজিকে বলা হইয়াছিল, হিন্দুধর্ম্ম কখন অন্যধর্ম্মাবলম্বীকে নিজধর্ম্মে আনয়ন করে না—তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন,—যেমন প্রাচ্যভূভাগে ঘোষণার্থ বুদ্ধের বিশেষ একটী সমাচার ছিল আমারও তদ্রূপ পাশ্চাত্যদেশে ঘোষণা করিবার একটী সমাচার রহিয়াছে।

প্র। আপনি কি এদেশে (আমেরিকায়) হিন্দুধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানাদির প্রবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন।

উ। আমি কেবল দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করিতেছি।

প্র। আপনার কি মনে হয় না, যদি ভবিষ্যৎ নরকের ভয় লোকের সম্মুখ হইতে অপসারণ করা হয়, তবে তাহাদিগকে কোনরূপ শাসন করা যাইবে না?

উ। না বরং আমার মনে হয়, ভয় অপেক্ষা হৃদয়ে প্রেম ও আশার সঞ্চার হইলে সে দেশ ভাল হইবে।

---

(৫)

(নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তরগুলি আমেরিকার বিভিন্ন বক্তৃতার অন্তে হইয়াছিল। সেই সকল বিভিন্ন স্থান হইতে এগুলি সংগৃহিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটী আমেরিকার একটী সংবাদপত্র হইতে সংগৃহিত।)

প্র। আত্মার পুনর্দ্দেহধারণ সম্বন্ধীয় হিন্দু মতবাদটী কিরূপ?

উ। বৈজ্ঞানিকদের শক্তি বা জড়সাতত্য বা নৈরন্তর্য্য (Conservation of energy or matter) মত যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহাও সেই ভিত্তির উপর স্থাপিত। এই মতবাদ (Conservation of energy or matter) আমাদের দেশের জনৈক দার্শনিকই প্রথম প্রকাশ করেন। তাঁহারা 'সৃষ্টি' বিশ্বাস করিতেন না। সৃষ্টি বলিলে বুঝায়,—কিছু না হইতে কিছু হওয়া। ইহা অসম্ভব। যেমন কালের আদি নাই, তদ্রূপ সৃষ্টির ও আদি নাই। ঈশ্বর ও সৃষ্টি যেন দুইটী রেখার মত—উহাদের আদি নাই, অন্ত নাই—উহারা নিত্য পৃথক্। সৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে, উহা ছিল, আছে ও থাকিবে। পাশ্চাত্যদেশীয়গণকে ভারত হইতে একটি বিষয় শিখিতে হইবে—পরধর্ম্ম-সহিষ্ণুতা। কোন ধর্ম্মই মন্দ নহে কারণ, সকল ধর্ম্মেরই সারভাগ একই প্রকার।

রামানুজ দর্শন।

(শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ।)

আচার্য্য রামানুজ মতে শাব্দ প্রমাণ মধ্যে বেদ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা ইতিপূর্ব্বে জানা গিয়াছে। এক্ষণে তৎসম্মত বেদের পরিচয় লাভ করা আবশ্যক। কারণ বেদের তাৎপর্য্য লইয়া দার্শনিক মুনিগণের মধ্যে যেমন মতভেদ ঘটিয়াছে, বেদের পরিচয় লইয়াও তদ্রূপ মতভেদ ঘটিয়াছে। একজন রামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত যে ভাবে বেদের পরিচয় প্রদান করিবেন, একজন নৈয়ায়িক বা

একজন অদ্বৈতবাদী ঠিক সেভাবে বেদের পরিচয় কখনই দিবেন না। এজন্য রামানুজ দর্শন অধ্যয়ন করিবার কালে, একজন রামানুজসম্প্রদায়ভুক্ত যে দৃষ্টিতে বেদকে দেখেন, তাহা জানা আবশ্যক। বস্তুতঃ আমাদের গ্রন্থকার শ্রীনিবাস দাসও সেইজন্য শাব্দপ্রমাণের লক্ষণ বিচার করিয়াই বেদের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এজন্য নিম্নে আমরা গ্রন্থকারের বাক্যেরই অনুবাদ প্রদান করিলাম।

"উক্তবেদ কর্ম্ম ও ব্রহ্ম-প্রতিপাদক, এবং পূর্ব্ব ও উত্তর—এই দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে যাহা আরাধনা-কর্ম্মের প্রতিপাদক, তাহা পূর্ব্ব কাণ্ড, এবং যাহা আরাধ্যের প্রতিপাদক তাহা উত্তর কাণ্ড। উভয়েব মীমাংসাদ্বয়ও সুতরাং একই শাস্ত্র।"

বেদের এই পরিচয় হইতে অনায়াসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রামানুজ মতে নির্গুণ ব্রহ্ম বেদে উপদিষ্ট হয় নাই, কারণ বেদে যে ব্রহ্মের কথা উক্ত হইয়াছে,তাহা আরাধ্য ব্রহ্ম,জ্ঞেয় ব্রহ্ম নহে। আর জ্ঞেয় ব্রহ্ম না হইলে ব্রহ্মের নির্গুণত্ব প্রতিপাদন সম্ভব নহে। ইহার কারণ, নির্গুণ ব্রহ্মের আরাধনা অসম্ভব, নির্গুণ ব্রহ্মবাদীর মতে নির্গুণ ব্রহ্ম জ্ঞেয়মাত্র, আরাধ্য হইতে পারেন না। আরাধ্য হইতে গেলে তাঁহাকে সগুণ হইতে হয়। আর বেদকে এই মতে আরাধ্য ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্র বলায় প্রকারান্তরে ইহাও বলা হইল যে, যাহারা নির্গুণ ব্রহ্মবাদী তাহারা অবৈদিক বা বেদ বহির্ভূত মতের পোষক।

তাহার পর উপরি-উক্ত বাক্যে আর একটী জ্ঞাতব্য আছে। রামানুজ বলেন, ব্যাসের ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শন, এবং জৈমিনীর পূর্ব্বমীমাংসা বা কর্ম্মদর্শন এই দুই শাস্ত্রই এক, ইহারা একই মীমাংসা নামক শাস্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ বিশেষ। আর এইজন্য ব্রহ্মসূত্রের একটী নাম উত্তর মীমাংসা। এই কথাটী ইঙ্গিত করিবার জন্য গ্রন্থকার পূর্ব্বোক্ত শেষ বাক্যটী ("উভয়ের মীমাংসাদ্বয়ও সুতরাং একশাস্ত্র") প্রয়োগ করিয়াছেন। রামানুজ মতে এই কথাটী বলিবার তাৎপর্য্য অতি গহন। তাঁহারা এতদ্দ্বারা মুক্ত পুরুষেরও কর্ম্ম স্বীকার করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। যেহেতু অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণ, "মুক্ত পুরুষের কর্ম্ম নাই," "জীব মুক্ত হইলে ব্রহ্মমাত্রে থাকিয়া যায়—ব্রহ্মে মিলিয়া যায়" এই প্রকার কথা বলিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে রামানুজ মতে জীব ব্রহ্মের অঙ্গ, জীব এজন্য ব্রহ্মে মিশে না, মুক্ত হইলেও জীবের জীবত্ব যায় না, জীব নিজ নির্ম্মল ব্রহ্মস্বরূপে থাকিয়া—ব্রহ্মধামে গিয়া ব্রহ্মের সেবা করে, এই সব

সিদ্ধান্ত। এখন যদি রামানুজ উক্ত উভয় "মীমাংসা দর্শন"কে এক না বলিয়া ভিন্ন শাস্ত্র বলিতেন, তাহা হইলে, জীবের ব্রহ্মধামে গিয়া ভগবৎ সেবারূপ কর্ম্মের সম্ভাবনা থাকিত না, কারণ ভিন্ন শাস্ত্রের অধিকারী ও তাৎপর্য্য সবই ভিন্ন হইবার কথা। অগত্যা বেদের পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইয়া একজন রামানুজ-সম্প্রদায়-ভুক্তকে কেন মীমাংসা দর্শনের কথা বলিতে হইয়াছে তাহা বুঝা যাইতেছে। যাহা হউক ইহার পরই আবার বেদের পরিচয় আরম্ভ করা হইয়াছে, ইহাতেও লক্ষ্য করিবার অনেক জিনিষ আছে, কিন্তু তাহা অতি সূক্ষ্ম কথা বলিয়া এস্থলে আর আলোচিত হইল না, নিম্নে কেবল গ্রন্থকারের বাক্যের অনুবাদ মাত্র প্রদান করিলাম,—

"ভাগবদ্বয়াত্মক বেদ অনন্তপ্রকার হইলেও ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব ভেদে চারি প্রকার। ঋক্ আদিরূপে এই অনন্ত বেদ মন্ত্র,অর্থবাদ ও বিধি ভেদে ত্রিবিধ। যাহা অনুষ্ঠেয়ের অর্থপ্রকাশক তাহা মন্ত্র, বিধির অধীন প্রবৃত্তিজনক বাক্যই অর্থবাদ, হিত অনুশাসনবাক্যই বিধি। সেই বিধি আবার ত্রিবিধ, যথা,—অপূর্ব্ব বিধি, পরিসংখ্যান বিধি ও নিয়ম বিধি। তাহারা আবার—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্যাদি ভেদে বহু প্রকার। (এস্থলে ইহাদের দৃষ্টান্তগুলি পরিত্যক্ত হইল)। এই প্রকার বিধি, অর্থবাদ ও মন্ত্রাত্মক বেদের ছন্দ, কল্প, শিক্ষা, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ব্যাকরণ নামক ছয়টী অঙ্গ আছে। ছন্দ, যথা—অনুষ্টুপ ও ত্রিষ্টুপ আদি, শ্রৌত স্মার্ত্ত প্রতিপাদনপর শাস্ত্রই কল্প, বর্ণ বিষয়ক শাস্ত্রই শিক্ষা; পূর্ব্বার্থ-প্রতিপাদক শাস্ত্রই নিরুক্ত, অধ্যয়ন আদি অনুষ্ঠান-কাল নির্ণায়ক শাস্ত্রই জ্যোতিষ, এবং শব্দ ও স্বর প্রভৃতির প্রতিপাদক শাস্ত্রই ব্যাকরণ। ইহারা বেদের অঙ্গ, বেদের প্রামাণ্যে ইহাদেরও প্রামাণ্য স্বীকার্য্য।" ইতি

এই পর্য্যন্ত বেদের পরিচয় শেষ। ইহার পর গ্রন্থকার স্মৃতি, ইতিহাস প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থাদি যে ভাবে রামানুজমতে প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয় তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহাতেও জ্ঞাতব্য অনেক আছে, এজন্য আমরা সে অংশেরও যথাযথ অনুবাদ নিম্নে প্রদান করিলাম। ইহাতে দেখা যাইবে যে তিনি কতকগুলি শাস্ত্রকে অংশতঃ প্রমাণ, কতকগুলিকে পূর্ণরূপে প্রমাণ,কতকগুলিকে প্রমাণতর এবং কতকগুলিকে প্রমাণতম আখ্যা দিয়াছেন। এবং পরিশেষে শব্দ প্রমাণ হইতেও যে সবিশেষ ব্রহ্মই সিদ্ধ হয় তাহার উল্লেখ করিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ করিয়াছেন।

"ইহার পর শ্রুতির অবিরুদ্ধ, আচার ব্যবহার প্রায়শ্চিত্তাদি-প্রতিপাদক, আপ্তজন-প্রণীত স্মৃতিও প্রমাণ। ব্রহ্মাদি আপ্ত হইলেও তাঁহাদের গুণত্রয় আবশ্যক বলিয়া তাঁহার রচিত যোগশাস্ত্র, কপিলাদি স্মৃতি সমূহের সহিত মনুপ্রভৃতি স্মৃতির যে অবিরুদ্ধ অংশ তাহাই প্রমাণ। তত্ত্বের বিপর্য্যয় হওয়ায় বিরুদ্ধাংশে অপ্রমাণ বুঝিতে হইবে। বেদের উপবৃংহণরূপ ইতিহাস পুরাণেরও প্রামাণ্য স্বতঃ সিদ্ধ। তন্মধ্যে মহাভারত ও রামায়ণের কোন কোন স্থলে বিরোধ ভান হইলেও তত্তাংশে বেদান্তবাক্যের ন্যায় অবিরোধ বুঝিয়া লইতে হইবে। সর্গাদি পঞ্চলক্ষণাত্মক পুরাণ সমূহে সাত্ত্বিক রাজস ও তামস ভেদ আছে, তত্তাংশে তাহাতে বিরোধ থাকিবার কথা নাই, এজন্য তাহার বিরুদ্ধাংশ অপ্রমাণ এবং অবিরুদ্ধাংশ প্রমাণ। পাশুপত প্রভৃতি আগমসমূহও সেই প্রকার। আগম, দিব্যতন্ত্র, তন্ত্রান্তর সিদ্ধান্তভেদে শ্রীপঞ্চরাত্র আগমের কোথাও বেদবিরোধ নাই এজন্য উহার সমুদায়ই প্রমাণ। বৈখানস আগমও ঐ প্রকার। ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহও সেই প্রকার। এই সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্রপ্রণেতা শাণ্ডিল্য, পরাশর, ভরদ্বাজ বশিষ্ঠ হারীত প্রভৃতি। শিল্প, আয়ুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববিদ্যা, ভরতাদি শাস্ত্র উপযুক্ত অংশে প্রমাণ। শিল্প বলিতে কর্ষণাদিকর্ম্ম, গোপুর প্রাকারাদি নির্ম্মাণ বুঝায়। আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বৈদ্যক শাস্ত্র, গান্ধর্ব্ব শাস্ত্র অর্থাৎ গানাদি প্রতিপাদক শাস্ত্র। ভরতাগম বলিতে নৃত্যাদি নিরূপক। এতদ্ব্যতীত চতুঃষষ্টিকলারূপ শাস্ত্রমধ্যে যাহারা তত্ত্বোপায় পুরুষার্থের উপযুক্ত তাহাও প্রমাণ। বকুলাভরণাদি সূরি সূক্তিসমূহ (অর্থাৎ শঠকোপের গ্রন্থাদি) সমুদায়ই প্রমাণতম। শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি প্রণীত শ্রীভাষ্যাদি প্রবন্ধাবলী প্রমাণতম। যাহা পুরুষের স্বতন্ত্রতাধীন রচনা বিশেষ, তাহাই পৌরুষেয় শাস্ত্র। এতদ্দ্বারা কাব্য নাটক অলঙ্কারাদিরও লক্ষণ বলা হইল। ঐরূপ আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা-সন্নিধিবিশিষ্ট লৌকিক বাক্যগুলিও প্রমাণ। যেমন নদীর তীরে পাঁচটী ফল আছে ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত লৌকিক ও বৈদিক শব্দ, মুখ্যবৃত্তি ও গৌণবৃত্তি ভেদে দ্বিবিধ। মুখ্যবৃত্তির অপর নাম অভিধা বৃত্তি, ইহার দৃষ্টান্ত যেমন সিংহ শব্দের অর্থ মৃগেন্দ্র। উক্ত অভিধাবৃত্তি আবার রূঢ়ী, যৌগিক ও যোগরূঢ়িভেদে বহুবিধ। আর যেখানে মুখ্যার্থ বাধিত হয় সেখানে সেই মুখ্যার্থের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট-অর্থকেই গৌণবৃত্তি বলা হয়। উহাও আবার লক্ষণা ও গৌণীভেদে দ্বিবিধ। প্রথমের দৃষ্টান্ত "গঙ্গাতে ঘোষেরা বাস করে"। এখানে গঙ্গাজলের উপর

বাস অসম্ভব বলিয়া গঙ্গাতীরে বাস করে এইরূপ অর্থ করিতে হয়। দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টান্ত, যেমন,—"দেবদত্ত—সিংহ"। এস্থলে সিংহের শৌর্য্যাদি গুণ দেবদত্তে আছে বুঝিতে হইবে। যাহা হউক এই সকল লৌকিক ও বৈদিক বাক্যসমূহের বিষয়ই সবিশেষ এবং ভেদবিশিষ্ট। "শরীর" বাচক শব্দসমূহের যেমন শরীরীতে পর্য্যবসান হয়, সেইরূপ ভগবানের শরীরভূত, ব্রহ্মা, রুদ্র, অগ্নি, ইন্দ্রাদি চিদ্বাচক এবং প্রকৃতি কাল আকাশ প্রাণাদি অচিদ্বাচক শব্দসমূহের সেই শরীরী পরমাত্মা শ্রীনারায়ণেই পর্য্যবসান হয়—একথা আচার্য্য রামানুজ প্রতিপাদন করিয়াছেন, আর ইহা বেদান্তজ্ঞান হইতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, ইহাও পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। নারায়ণ যে সর্ব্বশব্দবাচ্য এবং সর্ব্বান্তর্য্যামী ইহা আমরা ঈশ্বর নিরূপণ প্রকরণে প্রতিপাদন করিব। ইতি শব্দ প্রমাণ নিরূপিত হইল।

ইতি তৃতীয় অবতার সম্পূর্ণ হইল।

এতদূরে রামানুজসম্মত প্রমাণতত্ত্বের আলোচনা শেষ হইল, এইবার এই প্রমাণের সাহায্যে প্রমেয় তত্ত্ব আলোচিত হইবে। এই প্রমেয় তত্ত্ব মধ্যে রামানুজমতের অতীব প্রয়োজনীয় কথা কথিত হইয়াছে।

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।] [শ্রীকানাইলাল পাল, এম, এ।

গ্রীক দর্শন—সিনিক সম্প্রদায়।

(Cynic School)

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে সক্রেটীস্ প্রচারিত "কল্যাণে"র স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে অগ্রসর হইয়া তিনটী সম্প্রদায় তিন প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। মেগেরা সম্প্রদায় অতীন্দ্রিয় জগতে এই কল্যাণের অস্তিত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া, ইহাকে জ্ঞানের সহিত অভিন্ন ও মূলে এক বলিয়া প্রচার করেন। অতীন্দ্রিয় জগতে কল্যাণের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইলে প্রত্যক্ষ জগতের সহিত তাহার সম্পর্ক কি, বুঝা দুষ্কর হইয়া পড়ে। তত্ত্বানুশীলনে মেগারা সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্য-

মান জগতের প্রতি কোন লক্ষ্য না রাখায় কেবলমাত্র ভাব রাজ্যেই তাহাদের চিন্তা স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। অন্য দিকে দেখি সিনিক সম্প্রদায় ভাবরাজ্যের প্রতি লক্ষ্য হারাইয়া প্রত্যক্ষজগতে কল্যাণকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে একান্ত সচেষ্ট।

এই স্থলে মনে রাখা উচিত যে এই তিনটী সম্প্রদায়ের মত ক্রমবিকাশ সূত্রে প্রকাশ পায় নাই। সেই কারণে দেখিতে পাই ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস লেখকগণ সকলে এই তিন সম্প্রদায়কে একরূপ পর্য্যায়ে বিভাগ করেন নাই। কেহ মেগেরা সম্প্রদায়ের পর সিনিক সম্প্রদায়কে, কেহ বা সিরিয়নিক্ সম্প্রদায়কে উল্লেখ করিয়াছেন, কেহ বা আবার মেগেরা সম্প্রদায়কে সর্ব্বশেষে স্থান প্রদান করিয়াছেন। আমরা (Zeller) জেলার (Ubberweg) ইউবার-বেগ (Grote) গ্রোট (Butler) বাটলার প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের মতানুযায়ী হইয়া মেগেরা সম্প্রদায়ের পর এক্ষণে সিনিক সম্প্রদায়ের পরিচয় দানে অগ্রসর হইতেছি।

(Antisthenes) এণ্টিস্থিনিস।

জীবনী—এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা (Antisthenes) এণ্টিস্থিনিস্ আন্দাজ ৪৪৪ খৃঃ পূঃ অব্দে এথেন্স্ নগরে অতি দীন গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে ইনি (cynosarges gymnasium) সাইনোসারজিস বিদ্যালয়ে বাল্যকালে শিক্ষা প্রাপ্ত হন এবং সেইজন্য তাহার সম্প্রদায় (cynic) সিনিক নামে অভিহিত। cynic বলিতে কেহ কেহ দুঃখবাদী বা ঘৃণাবাদী বুঝেন, বাস্তবিক কিন্তু মনে রাখা উচিৎ (cynic) সিনিক শব্দটীর ভাব উক্ত অর্থের দ্বারা সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না। তিনি প্রথম জীবনে জর্জিয়াসের (Georgias) নিকট কিছুকাল অধ্যয়ন করেন, সেই শিক্ষার ফল তাহার জীবনে ও দর্শনে বেশ পরিলক্ষিত হয়। প্রৌঢ় বয়সে সক্রেটীসের সহিত তিনি পরিচিত হন এবং সেই সূত্রে সক্রেটীসের অসাধারণ নৈতিক চরিত্রবলে আকৃষ্ট হইয়া তাহার প্রতি এত অনুরক্ত হইয়া পড়েন যে সক্রেটীসের মৃত্যুকালাবধি তিনি তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সক্রেটীসের সহিত পরিচয় হইবার পূর্ব্বে ইনি একজন সোফিষ্ট শিক্ষাদাতা ও আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। ইহা বোধ হয় জর্জিয়াসের শিক্ষার ফল, সক্রেটীসের মৃত্যুর পরও তিনি পূর্ব্ব ব্যবসায় একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি নিজ মতামত পুস্তকে লিপিবদ্ধ

করিয়া যান, কিন্তু বর্ত্তমান কালে সেই সকল পুস্তকের প্রামণিকতা সন্দেহের স্থল। সুতরাং সে বিষয়ের উল্লেখে আমরা বিরত রহিলাম।

তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে (Diogenes) ডাইওজিনিসের নাম প্রথম উল্লেখ যোগ্য। ইঁহার সম্বন্ধে গল্পকথা অনেকেই অল্পবিস্তর জ্ঞাত আছেন। ইনি (Simope) সিনোপ দেশে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু টাকা জাল করার অপরাধে পিতার সহিত তিনিও অভিযুক্ত হওয়ায় জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া এথেন্সে পলাইয়া আসিতে বাধ্য হন। তথায় এণ্টিস্থিনিসের অমানুষিক আত্মত্যাগে একান্ত আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব প্রার্থনা করেন। গুরু প্রথমে অস্বীকৃত হইলেও তাঁহার সহিষ্ণুতাগুণে অবশেষে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। তিনিও উপযুক্ত শিষ্যের ন্যায় আত্মত্যাগে, পার্থিব সুখ ইচ্ছাপূর্ব্বক বর্জ্জনে, কৃচ্ছ্র সাধনে গুরুকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়।

(Alexzander) আলেকজান্দারের সহিত ইঁহার যে কথোপকথন হয় তাহা অনেকেই অবগত আছেন সর্ব্বসাধারণের বিদিতার্থে আমরা সংক্ষেপে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। মহাপরাক্রমশালী বিশ্ববিজেতা আলেকজান্দার এথেন্স নগরে উপস্থিত হইয়া লোক বিখ্যাত ডায়োজিনিসের অনুসন্ধান করিয়া তৎসকাশে উপস্থিত হন, এবং তাহার (ডায়োজিনিসের) প্রার্থনীয় কোন বস্তু আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেন। ডায়োজিনিস তখন আতপতাপে শীত নিবারণ করিতেছিলেন, উত্তরে তিনি আলেকজান্দারকে ও তাহার সহচরবর্গকে রৌদ্র ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করেন মাত্র। এরূপ নির্ভিক উত্তরে আলেকজান্দার অত্যন্ত বিস্মিত হন, কথিত আছে তিনি বলেন "Were I not Alexzander the great I would have been Diogenes the cynic" আমি বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্দার না হইলে সর্ব্বত্যাগী ডায়োজিনিস হইতাম।

একসময়ে জলযাত্রা কালে তিনি বন্দীরূপে গৃহীত হন, গ্রীসদেশে দাস ব্যবসায় তখন প্রচলিত ছিল, সুতরাং তিনি ও বন্দী হইবার পর বিক্রীত হন। শুনা যায় বিক্রয়কালে তিনি বলিয়াছিলেন "যাহার প্রভুর আবশ্যক আছে তিনি আমাকে লইতে পারেন।" এরূপ উত্তরে মুগ্ধ হইয়া (Xeniades) জিনায়েডিস্ নামে জনৈক ধনী তাহাকে ক্রয় পূর্ব্বক নিজ পুত্র কন্যার শিক্ষার ভার অর্পণ করিয়া তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করেন। ডায়েজিনিসের Tub (টব) ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন, এই টবে তিনি রাত্রিকালে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন বলিয়া উক্ত হয়। আহারের জন্য নরমাংস ভিন্ন আর যাহা কিছু

হইলেই চলে, বসনের জন্য একমাত্র পরিধেয়ই যথেষ্ট, জলপানের নিমিত্ত পাত্র পর্য্যন্তও অনাবশ্যক—এইরূপ চরম পন্থা তিনি প্রচার করিয়াছিলেন।

এই সম্প্রদায়ের মতামত এইরূপ জীবনী মধ্যেই বেশ পরিস্ফুট। তাই এণ্টীস্থিনিস্ ও ডায়োজিনিসের সম্বন্ধে কয়েকটী প্রচলিত ইতিবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিলাম। আশা করি দার্শনিক পাঠক এই বাহুল্যটুকু মার্জ্জন করিবেন।

অতঃপর আমরা এই সম্প্রদায়ের মতামত আলোচনা করিব। এইস্থলে মনে রাখা আবশ্যক যে সক্রেটীস্ প্রচারিত তত্ত্বের সহিত ইলিয়াটীক ও সোফিষ্ট প্রচারিত তত্ত্বের সংমিশ্রণে সিনিক দর্শনের উৎপত্তি। ধর্ম্ম ও জ্ঞান মূলে এক, ধর্ম্মই মানবকে কল্যাণপথে পরিচালিত করে, এবং কল্যাণ সাধনই জীবনের লক্ষ্য—সক্রেটীস প্রচারিত এই তত্ত্ব এণ্টীস্থিসিনের দর্শনমূলে বিদ্যমান। কিন্তু ধর্ম্ম বলিতে তিনি সক্রেটীসের অমানুষিক চরিত্র বলই বুঝিতেন। যে শক্তি বলে সক্রেটীস্ সকল অবস্থায় সকল প্রকার কষ্ট হাস্যমুখে সহ্য করিতে পারিতেন সেই শক্তিলাভই তাঁহার ও তৎসম্প্রদায়ের আদর্শ ছিল। অভাবনাশে মানুষ দেবত্বের প্রতি অগ্রসর হয়, সক্রেটীসের এই বাণী তিনি সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু যে অসাধারণ প্রতিভাবলে সক্রেটীস জ্ঞান ও ধর্ম্মকে এক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত বলিয়া বুঝিয়াছিলেন সে প্রতিভা এণ্টিস্থিনিস বা সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে কাহারও ছিল না বলিয়াই মনে হয়। সক্রেটীস প্রচারিত তত্ত্বের একদেশ মাত্র তাঁহাদের বোধগম্য ছিল। নৈতিক নিয়ম যে বিজ্ঞানানুমোদিত এবং দার্শনিক চিন্তার সাহায্যে উভয়ের সম্বন্ধ নিরূপণ সম্ভব, ইহা তাহারা বুঝিয়াছিলেন কি না সন্দেহ।

সক্রেটীসের জীবনে যে স্বাধীনতার ভাব প্রকাশ পায় সেই স্বাধীনতাই তাঁহাদের প্রাণের সামগ্রী ছিল এবং চরিত্র বলই তাহাদের মতে তল্লাভের একমাত্র উপায়। এই বললাভে আত্মত্যাগই প্রধান সহায়। দর্শন, অনুশীলন ও বিজ্ঞান চর্চ্চা সেই বললাভে যতটুকু সাহায্য করে ততটুকুই প্রয়োজনীয়, যে জ্ঞান মানবের নৈতিক বলকে পুষ্ট না করে তাহার কোন মূল্য নাই, তাহা বর্জ্জনীয়। (মান, যশ বা সুখলিপ্সায় কেহ কেহ জ্ঞানানুশীলনে ব্যাপৃত থাকেন তাহাদের প্রতি একথাটী বোধ হয় কটাক্ষপাত।)

ডায়োজিনিস বলেন আত্মানুশীলনই মনুষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য (এই আত্মানুশীলন বলিতে আত্মত্যাগ,আপনাকে অভাব হইতে মুক্ত করাই,তিনি বুঝিতেন)

সুতরাং অন্য চর্চ্চায় ব্যাপৃত হইলে মনুষ্যের আপনার প্রতি পূর্ণমাত্রায় দৃষ্টি থাকা সম্ভব নয়। এই হেতু অপর চর্চ্চা পরিহার্য্য।

পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝিতে পারি অতীন্দ্রিয় জগতের ব্যাপার তাহাদের চিন্তার বিষয় ছিল না; পরন্তু তাহারা ভাবরাজ্যে বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চ্চা এক প্রকার নিস্ফল বলিয়াই প্রচার করেন এবং এই কারণেই দেখি (concept) "ভাব" পদার্থের বা (conception) জাতিসামান্যজ্ঞাণের অস্তিত্ব তাহারা অস্বীকার করিতেন। তাহারা বলেন কোনও একটী ঘোটক প্রত্যক্ষ হয় কিন্তু ঘোটকত্ব(horsenss) বুদ্ধির অগম্য। বস্তুর সংজ্ঞানির্দ্দেশ দার্শনিকের প্রথম কর্ত্তব্য, সক্রেটীস এই কথা প্রথম প্রচার করেন। তাঁহার শিষ্য হইয়া এন্টিস্থিনিস সে কথা একেবারে বিস্মৃত হন নাই, তিনি ও সেই প্রণালী অবলম্বনে দার্শনিক পথে অগ্রসর হইতে প্রয়াসী কিন্তু যে প্রণালী অবলম্বন করিলে গন্তব্য স্থানে পৌছান সম্ভব হইত, তাহা তিনি সম্যক হৃদয়ঙ্গম করেন নাই বলিয়া মনে হয়।

বস্তুর অপরিবর্ত্তনীয় ভাবটীকে উপলব্ধি করিতে পারিলে তবে বস্তু সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ হয়, এবং সেই ভাব নামের দ্বারা প্রকাশ পায়, এইরূপে সক্রেটীস "নামের" সহিত "ভাবের" সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। এন্টিস্থিনিস বলেন, এ "ভাব" কল্পনা মাত্র, প্রত্যেক পদার্থের নাম ব্যতিরেকে আর কিছুই আমরা জানিতে পারি না। এক একটী নামের দ্বারা এক একটী পদার্থ বুঝাইতে হয়। তাহাই যদি হয় তবে অভিন্নাত্মক প্রতিজ্ঞা (Identical proposition) (প্রত্যভিজ্ঞা) ভিন্ন অন্য বাক্য প্রয়োগ করা অসম্ভব। উদ্দেশ্য পদ যে বস্তুকে বুঝায় তাহা একটী নাম মাত্র, বিধেয় পদ অপর একটী নাম মাত্র, উদ্দেশ্য পদ ও বিধেয় পদ বিভিন্ন নামাত্মক হইলে সত্য বাক্য বলা হইল না। (stilpo ষ্টিলপোর দার্শনিক মত দ্রষ্টব্য)। তাহার পর সমস্ত বাক্যই যদি অভিন্নাত্মক হইয়া দাঁড়াইল তখন কোন বস্তুর স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে যাওয়া নিস্ফল, কারণ একের সাহায্যে অপরের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদের মধ্যে মূলতঃ ভেদ লোপ করা অসম্ভব। ন্যূনাধিক পরিমাণে সাদৃশ্য প্রদর্শন করা চলে বটে কিন্তু সাদৃশ্য প্রমাণের মূল্য কি তাহাও বিবেচ্য (মেগেরা সম্প্রদায়ের দার্শমিক মত দ্রষ্টব্য)।

পদার্থ মাত্রেই নাম মাত্র এই কথা উল্লেখ করিয়া এন্টিস্থিনিস এক শূন্য গর্ভ নামবাদের প্রচার করেন। তিনি পদার্থ সমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন।

(ক) (simple) মৌলিক (খ) (compoud) যৌগিব। তাহাদেব মতে যৌগিক পদার্থ বলিতে কতকগুলি মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণ বুঝায়। এই যৌগিক পদার্থকে বিশ্লেষণ করা চলে এবং সেই বিশ্লেষণের ফলে যৌগিক পদার্থের স্বরূপ আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু মৌলিক পদার্থের বিশ্লেষণ অসম্ভব, সুতরাং তাহাদের ব্যাখাও অসম্ভব। সেই মৌলিক পদার্থের নাম করণ করা চলে মাত্র, তাহার অধিক কিছু বলা যুক্তিসঙ্গত নহে।

পদার্থ যদি "নাম" ভিন্ন কিছুই নয় তবে সাধারণ ভাব বা জাতিসামান্যজ্ঞান (general conception) অসিদ্ধ হইয়া পড়ে, কারণ নাম বলিতে ব্যক্তিত্ব বা বিশেষ ভাব বুঝায়। এই সম্প্রদায়ের মতে contradiction is madness বিরোধ জগতে অলীক ও অসম্ভব। অভিন্নাত্মক বাক্যই যদি একমাত্র সত্য প্রতিজ্ঞা হয় তবে আর বিরোধের সম্ভাবনা কোথায়? এণ্টিস্থিনিস বস্তুর "ভাব"-টীকে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া (Plato) প্লেটোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে প্লেটোর ভাষায় বলিতে পারা যায় "এণ্টিস্থিনিস। ঘোটকত্ব তোমার জ্ঞানের অতীত, কারণ তোমার সে জ্ঞানচক্ষু এখনও উন্মীলিত হয় নাই।" শুনা যায় ধারণা (opinion) ও জ্ঞানের (knowledge) পার্থক্য দেখাইয়া এণ্টিস্থিনিস চারখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং ভ্রান্ত ধারণার সীমা অতিক্রম করিয়া সত্য রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিতেন। কিন্তু সে সকল পুস্তকের প্রামাণিকতা সন্দেহের স্থল।

সক্রেটীস প্রচারিত নীতি সম্বন্ধীয় মতামত এণ্টিস্থিনিস সম্পূর্ণ ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম মূলে এক, এই ধর্ম্ম সাধনার ধন, এই ধর্ম্মের আচরণেই যথার্থ সুখ, অধর্ম্মই একমাত্র পাপ এবং সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়; যাহা ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের অন্তর্গত নয় তাহা মানুষের পক্ষে শুভ বা অশুভ কিছুই নয়, এক অদ্বিতীয় অনন্ত জ্ঞান সম্পন্ন কল্যাণময় ঈশ্বরের এই জগতের নিয়ামকতাই জগত কল্যাণ পথে চলিয়াছে। এণ্টিস্থিনিস সক্রেটীসের পুনরুক্তি করেন মাত্র। তাঁহাদের মতে:—স্বাধীনতা লাভই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, মনের উপর আধিপত্য লাভেই সেই স্বাধীনতা লাভ সম্ভব, বাহ্য জগতের উপর অন্য উপায়ে প্রভুত্ব লাভের চেষ্টা নিষ্ফল। যিনি মনকে জয় করিয়াছেন তিনিই জ্ঞানী। ধন নির্ধন, যশঃ অপযশঃ, মান অপমান, সুখ দুঃখ, জন্ম মৃত্যু, জ্ঞানী লোক তুচ্ছ জ্ঞান করে। এই মনকে জয় করিতে হইলে সুখভোগেচ্ছা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হয়। কথিত আছে এণ্টিস্থিনিস বলিয়াছিলেন,

I would rather be mad than glad, সুখ ভোগ করা অপেক্ষা আমি বরং পাগল হইব। জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে শারীরিক পরিশ্রম ও কর্ম্ম সহায়, জড়তা নৈতিক বল লাভের প্রতিকূল, সুতরাং লোকে স্বভাবতঃ পরিশ্রমকাতর হইলেও তাহাদের পক্ষে কর্ম্ম ব্যতিরেকে আদর্শ জীবন লাভের অন্য কোন উপায় নাই। তামসিক পুরুষের কর্ম্মহীন জড়তা দূর করিবার জন্যই বুঝি তাহারা কর্ম্মের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

তাহারা বলেন এই কর্ম্মের পর বিরামকেই যদি সুখ বলিতে হয় বলিতে পার কিন্তু ইহাই যদি সুখের নিদর্শন হয় তবে কর্ম্ম ব্যতিরেকে সুখলাভের চেষ্টা নিষ্ফল। তাহাদের মতে সুখের পর দুঃখের আবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী সুতরাং জ্ঞানী-লোক সে সুখের প্রত্যাশা করে না। কর্ম্মের অবসানে বা বিরামে যে শান্তি লাভ হয় তাহাই একমাত্র সুখপদবাচ্য কারণ তাহার পর আর তজ্জন্য দুঃখের বেদনা জাগিয়া উঠে না। অন্য কথায়, অভাবনাশে মনের যে শান্তিলাভ হয় তাহাই যথার্থ সুখ। নৈতিক বলে বলীয়ান হইয়া অভাব দূর করাই জীবনের উদ্দেশ্য, সুখলাভ জীবনের উদ্দেশ্য নহে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে নৈতিক বলের সহিত জ্ঞানের যে সংযোগ নিয়ত বর্ত্তমান সে কথা এণ্টিস্থিনিস হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ; তথাপি তিনি "ধর্ম্মই জ্ঞান" (Virtue is knowledge)—সক্রেটীসের এ বাণীর পুনরুক্তি করেন। শুধু তাহাই নয়, এতৎ সম্বন্ধেও সক্রেটীসের মত সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই তিনিও বলেন virtue is one ধর্ম্ম মূলে এক, virtue is teachable ধর্ম্ম শিক্ষণীয়। যে ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছে সে কখনও অধর্ম্ম করে না কিন্তু এই জ্ঞান বলিতে কি বুঝায়, এণ্টিস্থিনিস কিছুই বলেন নাই। নীতি ও জ্ঞানের সংযোগ সূত্রই বা কোথায় তাহাদের মধ্যে প্রভেদই বা কি,—এই সকল কথা তিনি বা তাহার সম্প্রদায় বিচার করেন নাই। তাহারা শিক্ষা বলিতে শক্তি সাধন বুঝিতেন। এই নৈতিক শক্তিলাভই তাহাদের জ্ঞানের স্থান পূরণ করিয়াছিল; মানব স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয়ানুভূতির দাস কিন্তু জ্ঞান সেই অনুভূতির উপর প্রভুত্বস্থাপন করিয়া স্বাধীন হইতে চায়। নৈতিক বলে এই প্রভুত্বলাভ অসম্ভব নয়, তাই জ্ঞানকে ধর্ম্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রচার করায় তাহাদের মতে কোন স্ববিরোধ দোষ ঘটে নাই। কিন্তু ইন্দ্রিয়চর্য্যারূপ প্রতিপক্ষের উপর আধিপত্যলাভে অগ্রসর হইয়া তাহারা সেই প্রতিপক্ষকে সমূলে ধ্বংস করিতে বসিলেন,—সকল প্রকার সুখ একেবারে বিসর্জ্জন দিতে বসিলেন।

জগতের মূলে ঈশ্বর বিদ্যমান তাই জগৎ ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে। সুতরাং যিনি ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছেন তিনিই একমাত্র সুখী। একটী গল্প প্রচলিত আছে যে ডায়োজিনিস দিবাভাগেই আলোক হস্তে এই জ্ঞানীর অনুসন্ধান করিতেন; তাহাতেই বুঝিতে পারি এই জ্ঞানীর সংখ্যা তাহারা জগতে কত বিরল মনে করিতেন।

এইরূপ মতবাদ প্রচারিত হইলে সামাজিক বা সাংসারিক জীবন অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়, এবং সন্ন্যাসীর ন্যায় কঠোর জীবন লাভই লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। সক্রেটীসের অসাধারণ চরিত্র বলে মুগ্ধ হইয়া তাহারা সক্রেটীসের প্রতিভার একদেশমাত্র বিকশিত করেন। সুতরাং তাহাদের মত একদেশ-দর্শিতা দোষে দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। সক্রেটীস আনন্দের সময় সুখে অভিভূত না হইয়া সে আনন্দ পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিতে সক্ষম ছিলেন, সে আনন্দ হইতে একেবারে দূরে থাকিতে উপদেশ দেন নাই একথা সিনিক সম্প্রদায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাই তাহারা সুখ মাত্রকেই বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। জ্ঞান বলে মনের উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারিলে সুখ দুঃখের আবর্ত্তনে ঘুরিয়া মরিতে হয় না। সুখবর্জ্জনের প্রকৃত মূল্য আছে সত্য কিন্তু সে শুধু আপনাকে জয় করিবার জন্য। সুতরাং সিনিকের চরম পন্থার প্রতিবাদ স্বরূপেই cyreanic সিরিয়ানিক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি বলিয়া মনে হয়। আমরা আগামী প্রবন্ধে এই সম্প্রদায়ের মতামত আলোচনা করিব।

ভারতের সাধনা।

(১) নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—সন্ন্যাসাশ্রম।

"কেবল ত্যাগের দ্বারাই এই অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে, (ন প্রজয়া ধনেন ন চেজ্যয়া ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ) ত্যাগই মহাশক্তি। যাহার ভিতর এই মহাশক্তির আবির্ভাব হয়, সে সমগ্র জগৎকে পর্য্যন্ত গ্রাহ্যের ভিতর আনে না। তখন তাহার নিকট সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড গোষ্পদ তুল্য হইয়া যায়— 'ব্রহ্মাণ্ডং গোষ্পদায়তে।' ত্যাগই ভারতের সনাতন পতাকা। ঐ পতাকা

সমগ্র জগতে উড়াইয়া, যে সকল জাতি মরিতে বসিয়াছে, ভারত তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে—সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার, সর্ব্বপ্রকার অসাধুতার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে, তাহাদিগকে যেন বলিতেছে, সাবধান, ত্যাগের পথ, শান্তির পথ অবলম্বন কর, নতুবা মরিবে। হিন্দুগণ, ঐ ত্যাগের পতাকাকে পরিত্যাগ করিও না, উহা সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধর। * * * ”

“সংগ্রামে যে লক্ষ লক্ষ লোকের পতন হয়, তাহারা ধন্য। কারণ, তাহাদের শোণিতমূল্যেই সংগ্রামবিজয় ক্রীত হয়। * * * এই ত্যাগের আদর্শ রক্ষা করিতে গিয়া যদি গোঁড়ামি,—অতি বীভৎস গোঁড়ামি—আশ্রয় করিতে হয়, ভস্মমাখা উর্দ্ধবাহু জটাজুটধারীদিগকে প্রশ্রয় দিতে হয়, সেও ভাল। কারণ, যদিও ঐগুলি অস্বাভাবিক, তথাপি যে মনুষ্যত্বহারিণী বিলাসিতা ভারতে প্রবেশ করিয়া আমাদের মজ্জা মাংস পর্য্যন্ত শুষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই বিলাসিতার স্থানে ত্যাগের আদর্শ ধরিয়া সমগ্র জাতিকে সাবধান করিবার জন্য ইহার প্রয়োজন। আমাদিগকে ত্যাগ অবলম্বন করিতে হইবেই হইবে। প্রাচীন কালে এই ত্যাগ সমগ্র ভারতকে জয় করিয়াছিল, এখনও আবার এই ত্যাগই ভারত জয় করিবে।” “ভারতে বিবেকানন্দ।”

গতবারে আমরা নেশন-প্রতিষ্ঠার পথ নির্দ্দেশ করিয়াছি। ভারতের চিরন্তন লক্ষটী আশ্রয় করিয়া একযোগ হওয়াই ভারতীয় নেশনের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। লৌহকে তাতাইয়া না লইলে যেমন কর্ম্মকারের গড়াপিটার কাজ সুরু করা যায় না, সেইরূপ আমাদের দেশকে ধর্ম্মভাবে উদ্দীপিত না করিয়া লইলে নেশন-গড়ার কাজ আরম্ভই করা যায় না। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে ত্যাগ ও সেবার আদর্শেই দেশে ধর্ম্মজীবন জাগাইয়া তুলিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে দেশে এমন শক্তিকেন্দ্র থাকা চাই, যেখান থেকে নেশন গড়িয়া উঠিবে—যাহার সহিত চারিদিক হইতে সংলগ্ন হইয়া দেশের লোক জমাট বাঁধিবে ও নেশনাকারে পরিণত হইবে। ইহাও আমরা ইঙ্গিত করিয়াছি যে ঐরূপ শক্তিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করাই রামকৃষ্ণ-মিশনের জীবনব্রত।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে ভারতের পুনর্জাগরণে সন্ন্যাসীর আবার কি কাজ? ভারতের উত্থান-পতনের সঙ্গে সন্ন্যাসাশ্রমের সম্বন্ধ কি? দেশের কাছে এক এক মুষ্টি ভিক্ষা পাইলেই ত সন্ন্যাসীর চুকিয়া গেল,

দেশের সঙ্গে তার আর কি সম্বন্ধ? এমন কি এমন শিক্ষিত লোক আজ কাল অনেক আছেন, যাঁহারা বলেন যে দেশে সন্ন্যাসাশ্রমকে প্রশ্রয় দেওয়ার মানে দেশের গলগ্রহ অকর্ম্মণ্য ভিক্ষুকদলের অযথা পরিপুষ্টি করা,—তা' ছাড়া আর কিছু নহে।

"ভারতের সাধনা" যিনি নিয়মিত পাঠ করেন, তাঁহার পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন নহে। তথাপি বিশদভাবে প্রশ্নটীর বিচার করা আবশ্যক, কারণ ভারতীয় নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠারূপ মহাযজ্ঞে সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর।

আমাদের পুরাণ বলেন যে জগৎ সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মা দেখিলেন, প্রথম সৃষ্ট মানুষ প্রবৃত্তির পথ না লইয়া নিবৃত্তির পথে ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী হইয়া যাইতে লাগিল,—এইরূপে সংসারস্জনের পূর্ব্বেই সনক, সনন্দন প্রভৃতি সন্ন্যাসাশ্রমের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দক্ষ মনু প্রভৃতি সংসারী গড়িবার পূর্ব্বেই ভগবান্ ব্রহ্মাকে সন্ন্যাসী সৃজন করিতে হইয়াছিল। তার পর দেখি, যখন সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া ভোগধন্দের মধ্যে মানুষ পথহারা হইয়া যাইতেছে, তখন স্বয়ং ব্রহ্মা অথবা তাঁহার সন্ন্যাসী পুত্রগণ সেই মানুষকে পরম সুখ ও শান্তির পথ দেখাইয়া দিতেছেন। এই পৌরাণিক কথার মধ্যে মানবসৃষ্টির একটা বিশেষ বিধি নিহিত রহিয়াছে। উহা বুঝা আবশ্যক।

প্রবৃত্তিনিবৃত্তিরূপ দ্বন্দ্ব মানবসৃষ্টির মূলে বিদ্যমান। মানুষকে প্রবৃত্তির পথে লইবার সকল আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গেই নিবৃত্তির পথে লইয়া যাইবার বন্দোবস্তও মানবসৃষ্টির অঙ্গীভূত। এই জন্য ভারতের সনাতন ধর্ম্ম, সংসার ও সন্ন্যাস—এই উভয় আশ্রমের কোনটীকেই বাদ দিতে পারেন নাই। সংসা-রের মূল মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, সেই প্রবৃত্তি যতদিন থাকিবে, সংসার ততদিন থাকিবেই। আবার প্রবৃত্তির লীলা যতদিন থাকিবে, উহার উপরতি বা নিবৃত্তির আদর্শও ততদিন থাকিবে। এই আদর্শ রক্ষার ভার সন্ন্যাসাশ্রমের উপর সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতেই অর্পিত।

নিবৃত্তির আদর্শ পাশ্চাত্য সমাজেও অভিব্যক্ত হইয়াছে,—প্রাচ্যের প্রভাব-বশতঃই হউক, বা না হউক। কিন্তু সেই আদর্শকে অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্য সমাজ গড়িয়া উঠে নাই; সে আদর্শ পাশ্চাত্যে সমাজস্রোতের গতি নির্ণয় করে না। পাশ্চাত্যে নিবৃত্তি সাক্ষাৎভাবে প্রতিপদে প্রবৃত্তিকে নিয়মিত

করে না, প্রবৃত্তি স্বীয় তৃপ্তির সন্ধানে কার্য্যগতিকে নিবৃত্তির হাতে ধরা পড়িয়া যায়। নিবৃত্তির রসান না দিলে প্রবৃত্তি সমাজে উৎকট উশৃঙ্খলতা আনিয়া ফেলে, কাজে কাজেই সমাজে নিবৃত্তির একটা আসন নির্দ্দিষ্ট রাখা আবশ্যক।

ভারতীয় সমাজ গোড়া থেকেই অকুণ্ঠিতভাবে নিবৃত্তির হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ভারতে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কোন পথে চলিবে, তাহা আদিযুগ হইতেই নিবৃত্তি স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। যেখানে সমাজকে প্রতিপদে নিবৃত্তির এইরূপ নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে হয়, সেখানে সন্ন্যাসাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

যদি আপত্তি হয় যে নিবৃত্তির নির্দ্দেশে সংসার গড়িলে, সাংসারিক উন্নতির কোনও নিশ্চয়তা নাই, তবে প্রশ্ন এই যে সংসারের উন্নতি কাহাকে বলিব,—ভোগোৎকর্ষকে, না কর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীনতাকে? যদি বল ভোগের যখন চরম উৎকর্ষ, তখনই সংসারের উন্নতি, তাহা হইলে ইতিহাস তোমার বিরোধী। শাস্ত্রমতে ভোগে রোগ নিহিত, ইতিহাস যেন সেই মতেরই পোষকতায় ও ব্যাখ্যানে প্রমাণ করিয়াছেন যে ভোগে সর্ব্ববিধ রোগের উৎপত্তি,—শুধু শারীরিক ব্যাধি নহে, মানসিক ও আধ্যাত্মিক রোগেরও উৎপত্তি। রোমক প্রভৃতি প্রাচীন জাতির ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে উহারা যখন নিজ নিজ ভোগলক্ষ্যে অনেক চেষ্টার ফলে উপনীত হইয়াছেন, তখন সেই ভোগ বা বিলাসিতা নিশ্চিতরূপেই তাহাদের স্বভাব বিগড়াইয়া দিয়াছে এবং তাহাদিগকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া মৃত্যুকবলে নিক্ষেপ করিয়াছে। আধুনিক যুগেও ভোগোৎকর্ষ যে একটা নেশনকে স্থূলচিত্ত ও বিলাসী করিয়া উচ্চাঙ্গের সাধনাসমূহে অক্ষম ও পরাঙ্মুখ করে, তাহা ইতিমধ্যেই ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে,—বিশেষজ্ঞমাত্রেই এ কথা জানেন।

ভোগোৎকর্ষে সাংসারিক উন্নতির বীজ নিহিত নহে, উহার পতনবীজই নিহিত। সম্যক দৃষ্টিতে দেখিলে সংসারকে ভোগভূমি বলা যায় না, কর্ম্মভূমি বলিতে হয়, ভোগোৎকর্ষ কর্ম্মের একটা অবাস্তর ফলবিশেষ। কর্ম্মের এই ভোগরূপ অবাস্তর ফলে লুব্ধ হইয়া ভারতেতর অনেক প্রাচীন দেশ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য বিষ্ণুপুরাণ সাক্ষ্য দিতেছেন যে একমাত্র ভারতবর্ষই কর্ম্মভূমি, অপরাপর দেশ ভোগভূমি মাত্র। সাংসারিক উন্নতির প্রকৃত মাপকাটী কর্ম্ম, ভোগ নহে। সর্ব্ববিধ্বংসী কাল হইতে কর্ম্মই সংসারকে

রক্ষা করিতেছে, কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা দিয়া সংসারকে বজায় রাখিতেছে। কাল যখন কর্ম্মকে অতিক্রম করে, অর্থাৎ-কর্ম্ম যখন সব দিক দিয়া সম্পূর্ণরূপে কালকে অনুসরণ করিতে না পারিয়া পিছাইয়া পড়ে, তখন সংসারে অবনতি ঘটে। সব রকম অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা দেওয়াই কর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীনতা, এই সর্ব্বাঙ্গীনতাই সাংসারিক উন্নতির প্রকৃত পরিচয়। এখন কথা এই যে নিবৃত্তির নির্দ্দেশে সংসার গড়িলে, কর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গীনতা না আসিবে কেন,—নিবৃত্তি বলিতে কি কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি বুঝায়? তাহা ত নহে। ভোগাসক্তি ত্যাগ মানে কি কর্ম্মত্যাগ? ভোগরূপ ফলের প্রতি লোলুপতা না রাখিয়া কি কর্ম্মী হওয়া যায় না? নিশ্চয়ই যায়, সেই কৌশলের নামই কর্ম্মযোগ—যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং। নিবৃত্তির নির্দ্দেশে সংসার পাতিয়া ভারত সেই কৌশলটী আয়ত্ত করিয়াছে। অতএব, নিবৃত্তির নির্দ্দেশ ও নিয়স্তৃত্ব মানিলে সাংসারিক উন্নতির ভরসা নাই, এই আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক।

ভারতীয় নেশন কখনও এ আশঙ্কা করে নাই। আশঙ্কার অবসরই বা সে পাইবে কেমন করিয়া? তাহার সূতিকাগৃহে নিবৃত্তিই যে ধাত্রীস্বরূপিণী। যাহার ক্রোড়ে ভারতীয় নেশনের জন্ম, যাহার অঙ্গুলিনির্দ্দেশে সেই নেশন শৈশবে বর্দ্ধিত,—যৌবনে কর্ম্মসংগ্রামে জয়াভিলাষী,—তাহার নিয়স্তৃত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আজ কাল যে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোক নিবৃত্তির প্রতি আস্থাহীন ও সন্দিহান, তাহার কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব ও ভারতীয় নেশন গৌরবের অভাব। সেই গৌরব যদি আবার ফিরিয়া পাইতে হয়, তবে নিবৃত্তির হাতে জাতীয় কর্ম্মতরীর হাল সংন্যস্ত করিতে হইবে।

আর এক আপত্তি উঠিতে পারে। কেহ কেহ বলেন, সংসারীই নিবৃত্তির আদর্শ রক্ষা করিবেন, সন্ন্যাসীর প্রয়োজন নাই। আমরা কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে নিবৃত্তির আদর্শ রক্ষা করিবার ভার সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে সন্ন্যাসাশ্রমের উপরই সমর্পিত। এখন প্রশ্ন এই যে সংসারী কেন সে ভার গ্রহণ করে নাই।

এ প্রশ্নের উত্তর পরমহংসদেব দিয়াছেন,—যে ভাঁড়ে দই পাতা হয়, সে ভাঁড়ে দুধ রাখিতে নাই, দুধ শীঘ্রই নষ্ট হয়। সাংসারিকতারূপ দধি সংসারীর হাড়ে ঢুকিয়াছে, ত্যাগাদর্শরূপ দুগ্ধ সে পাত্রে রক্ষা করা বুদ্ধির কার্য্য নহে। কালের আবর্ত্তনে কখনও সংসারের উত্থান, কখনও বা পতন, এই উত্থানপতনের

সঙ্গে সঙ্গে সাংসারীর অবস্থাবিপর্য্যয়ও অবশ্যম্ভাবী, তিনি ব্রাহ্মণই হউন বা নিম্নবর্ণই হউন। সংসারচক্রে যিনি সংলগ্ন, তাহাকে কালের পাকে উঠিতে নামিতে হইবেই হইবে। এই জন্য যিনি সংসারের হিতার্থে উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিবেন, তাহাকে সংসারচক্রের যথাসম্ভব অতীতে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। সন্ন্যাসীকে এইজন্য ভারতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ রক্ষা করিবার ভার অর্পিত হইয়াছিল।

সৃষ্টির প্রারম্ভে সনকসনন্দননারদাদি ঐরূপ ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।, তার পর প্রাচীন ভারতে যখন সমাজ গড়িতে আরম্ভ হইল, তখন প্রজাবৃদ্ধি করা একটা অবশ্যকর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। সেইজন্য প্রাচীন যুগে আদর্শ রক্ষার ভার গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়বিধ ঋষির উপরই সংন্যস্ত ছিল, কিন্তু সুর ঠিক ছিল—'ন প্রজয়া ধনেন ন চেজ্যয়া"। যখন সমাজগঠনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় নেশনের আদর্শসমূহ ব্যক্ত করা হইল, যখন লক্ষ্যস্থাপনার কার্য্য শেষ হইল, তখন হইতেই সন্ন্যাসাশ্রমের প্রতি দেশের ঝোঁক বাড়িতে লাগিল। যথার্থ গৃহস্থঋষি পরবর্ত্তী যুগে ক্রমশঃই কমিয়া আসিয়াছে, কিন্তু বেদরক্ষক বেদাধ্যাপক যজ্ঞকৃৎ ব্রাহ্মণের যেমন অভাব হয় নাই, উপনিষদকার সন্ন্যাসী সম্প্রদায়েরও তেমনি অভাব হয় নাই। বেদের কর্ম্মকাণ্ড যেমন ব্রাহ্মণ রক্ষা করিয়াছেন, বেদের জ্ঞানকাণ্ড তেমনি সন্ন্যাসী রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। মহর্ষি বেদব্যাসের বেদবিভাগের পরবর্ত্তীকালে এবং বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে বেদের জ্ঞানকাণ্ড যে সন্ন্যাস সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

কিন্তু নিবৃত্তির আদর্শ রক্ষা করা যে বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের জন্যই কেবল নহে, সমগ্র দেশের জন্য,—এই সত্য যখন সন্ন্যাসীদের মধ্যে তিরোহিত হইতেছিল, যখন তাহাদের সহিত যোগাযোগ না থাকায় জ্ঞানকাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দেশের ব্রাহ্মণগণ চারিদিকে নব নব জাতির অভ্যুদয়ের অন্তরালে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডকে প্রকৃত জ্ঞানহবির অভাবে যজ্ঞকাষ্ঠ ঠেলিয়া ঠেলিয়া ধূমায়িত যজ্ঞক্ষেত্রে রক্ষা করিতেছিল, সেই সময় ভগবান বুদ্ধ অবতীর্ণ হইয়া জাতিসংমিশ্রণে মথিত, নবোত্থিত ভারতীয় সমাজকে নিবৃত্তির আদর্শ শিখাইবার জন্য নিজে সন্ন্যাসী হইলেন, এবং সহচরদিগকে অভিসম্পদা বা সন্ন্যাস দান করিলেন। সন্ন্যাসী গভীর নিবৃত্তির নামে ডাক দিয়াছেন, ভারত শুনিতে বাধ্য; তাই পাঁচ শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র ভারত শ্রমণের পদানত।

ভারতীয় নেশনের একটী মহাসমস্যা ভঞ্জন করিবার জন্য ভারতেতিহাসে বৌদ্ধযুগের উদয় হইয়াছিল। আর্য্যেতর নূতন জাতিদিগের সংমিশ্রণে ভারতে এমনে একটা নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিতেছিল, যাহাদের সহিত প্রাচীন আর্য্য-দিগের একীকরণার্থে একটা সেতুর প্রয়োজন হইয়াছিল। যদি একটা সেতুর সাহায্যে প্রাচীন আর্য্যগণ অনার্য্যদিগকে অঙ্গীভূত করিয়া না লইত, তবে আজ আমরা আর্য্যসভ্যতার কোন নিদর্শন খুঁজিয়া পাইতাম না। আর্য্যের জীবনাদর্শ ত্যাগমূলক, আগন্তুক অনার্য্যের জীবনে সহজ স্বাভাবিক ভোগ বাসনাই বলবতী। জীবনাদর্শের এই ঘোর সংঘর্ষে কুরুক্ষেত্রের পরবর্ত্তী আর্য্যসমাজ কোনমতেই জয়লাভ করিতে পারিত না, এমন কি রণে ভঙ্গ দিয়া মৃত্যুযবনিকার পারে সরিয়া যাইতে হইত। আর্য্য ও অনার্য্যের এই ঘোর সংঘর্ষে সনাতন ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত মহাশক্তির আবার প্রকাশ হইল,—যুগাবতার ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং মহাসেতুরূপে আবির্ভূত হইলেন। আর্য্যসমাজের গণ্ডীর বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রবল নিবৃত্তির আদর্শের দ্বারা অনার্য্যের স্বভাবকে বুদ্ধদেব এমন পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলেন যে দশ শতাব্দীর পর আর্য্য ও অনার্য্যের পূর্ব্ব ব্যবধান লুপ্ত হইয়া গেল এবং যখন আচার্য্য শঙ্করের সময় হইতে আর্য্যসমাজের প্রাচীন ভিত্তির উপর দাঁড়াইবার জন্য শুভ আহ্বান দেশমধ্যে ঘোষণা করা হইল, তখন বৌদ্ধযুগের নবগঠিত ভারতবর্ষ একযোগে সে আহ্বান শুনিল। আর্য্যেতর মানবকে আপনাতে অঙ্গীভূত করিবার জন্য বুদ্ধে আর্য্যসমাজের স্বগৃহ হইতে নিষ্ক্রামণ ও আচার্য্য শঙ্করে আবার স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন। এই নিষ্ক্রামণ ও প্রত্যাবর্ত্তনরূপ দুইটী বিরাট ঘটনা ভারতীয় নেশনের ইতিহাসে যে শক্তির দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহার কেন্দ্ররূপে সন্ন্যাসী বিরাজমান। বুদ্ধ এবং শঙ্কর উভয়েই সন্ন্যাসাশ্রমের দ্বারা আপনা-দিগের ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। ভারতীয় নেশনের উদ্ভব ও অভি-ব্যক্তিতে সন্ন্যাসীর নেতৃত্ব অপরিহার্য্য।

কিন্তু ভগবান শঙ্করের যুগ হইতে ভারতীয় নেশন প্রাচীন বৈদিক ভিত্তির উপর আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেও, সেই ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়া ভারতে নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটিয়া উঠে নাই। বৌদ্ধ ভিক্ষু তাৎকালীন নব্য ভারতকে নিবৃত্তিমূলক সাধনায় এক করিয়াছিলেন, কিন্তু বৈদিক যুগের সহিত পারম্পর্য্য রক্ষা করিতে পারেন নাই, পরবর্ত্তী যুগের সন্ন্যাসী সেই পারম্পর্য্য ও সংযোগ স্থাপন করিলেন বটে, কিন্তু সাধনার মধ্য দিয়া সমগ্র

ভারতকে সংহত ও একযোগ করিতে পারেন নাই। বিশাল ভারতকে প্রকৃতভাবে সংহত ও একযোগ করা দু এক শতাব্দীর কাজও নহে। কিন্তু ইতিহাস মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে বুদ্ধের আবির্ভাব হইতে পরবর্ত্তী কালে ভারত করায়ত্ত-যন্ত্রের মত সন্ন্যাসীর হাতে পরিচালিত হইয়াছে।

বেদগুপ্তির সুব্যবস্থা হইলে আর্য্যেতর জাতিপ্রবাহকে ভারতীয় মেশনে অঙ্গীভূত করিবার জন্য ভারত যখন বেদসীমা অতিক্রম করিয়াও প্রাচীন ত্যাগাদর্শই ঘোষণা করিল, তখন ভারতের নেতা সন্ন্যাসী; যখন সেই আদর্শের প্রভাবে ভারতের আগন্তুক সমাজ রূপান্তরিত হইয়া প্রাচীন আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য হইল, তখন নব বেশে সন্ন্যাসী আবির্ভূত হইয়া সেই প্রাচীন আদর্শের আকরস্বরূপ বেদভূমির উপর ভারতকে আকর্ষণ করিলেন। তারপর ভারতবর্ষ সেই বেদভূমির উপর অবস্থিত হইলে, সেই ভূমি হইতে ভিন্ন ভিন্ন সাধনপ্রবাহ প্রকটিত হইতে লাগিল, এই সকল প্রাক্‌পরিপোষিত সাধন-প্রবাহ যেন এক এক জন সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক সন্ন্যাসীর দ্বারা উৎখাত হইয়া অন্তঃসলিলতা পরিহার করিল। এইরূপে জ্ঞানভক্তিযোগমার্গে সাধনার অনেক পন্থা বা সম্প্রদায় উদ্ভূত হইতে লাগিল। পাশ্চাত্যে যেমন একটী প্রকাণ্ড কারখানা গড়িবার সময় শত শত বিঘা জমির নানাদিকে নানারকম কাজ সুরু হইয়া যায়, নানাস্থানে নানারকম যন্ত্র বসে, ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রশিল্প, ভিন্ন ভিন্ন পূর্ত্তকার্য্য, ভিন্ন ভিন্ন বস্তু সরবরাহ—শত শত প্রকারের অনুষ্ঠান—যাহা আপাতদৃষ্টিতে সংযোগহীন ও এমন কি স্থানে স্থানে পরস্পরবিরোধী,—তেমনি বৌদ্ধযুগের অবসানে বেদভিত্তির পুনরধিকার হইতে প্রায় সহস্র বৎসর ভারতবর্ষে পরমার্থসাধনার যেন একটা বিশাল কারখানা গড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। এই কারখানার সর্ব্বত্রই শিল্পী, একমাত্র সন্ন্যাসী,—উপকরণ, সাধারণ ভারতবাসীর জীবন। প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া কারখানার শত শত বিভিন্ন অঙ্গ গড়িয়া উঠিয়াছে, অবশেষে এমন একজন সুনিপুণ যন্ত্রশিল্পী ইঞ্জিনিয়ার আবির্ভূত হইয়াছেন, যিনি সকল বিভাগেই পারদর্শী এবং যিনি এই বিশাল কারখানার সমস্ত ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত অঙ্গগুলি এক মূল অভিপ্রায়ের দ্বারা সন্নিবিষ্ট ও সংযুক্ত করিয়া দিয়া ভারতব্যাপী বিরাট যন্ত্রটী এক লক্ষ্যপথে চালাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন,—ইনিই শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণ।

ভারতের ইতিহাস পরমার্থসাধনার ইতিহাস, রাজনীতি বা সমাজনীতির ইতিহাস নহে। তাই ভারতেতিবৃত্তের রচয়িতা সন্ন্যাসী, রাজরাজড়া বা

নেপোলিয়ঁ বিসমার্ক নহে। ভারতের ইতিহাস খুঁজিয়া বাহির করিতে চাও ত, গৈরিকদীপ্তির অনুসরণ করিয়া কালের অন্ধকারে পথ চলিতে শিক্ষা কর। ভারতে গৈরিকপ্রভায় ইতিহাসের পথ আলোকিত, তরবারির ঝন্‌ঝনা বা রাজমুকুটদীপ্তি সে পথে আলেয়ামাত্র—কুহকসৃষ্টি করে, পথ ভুলায়, পথের প্রকৃত পরিচয় দেয় না।

যিনি ভারতের ইতিহাসবচয়িতা, অতীতের সংযোগসূত্র, ভবিষ্যতের কর্ম্ম-বীজ যাহার হস্তে সুরক্ষিত, হে ভারতবাসি, আজ তুমি সেই সন্ন্যাসী বা তাঁহার আশ্রমকে দুপাতা ইংরাজী পড়িয়া অবহেলা করিতে পার না। নিবৃত্তিরূপ নেশনরথরশ্মি সন্ন্যাসী ব্যতীত আজ ভারতে কে চালাইতে সমর্থ? আধুনিক কর্ম্মজগতের মহাকুরুক্ষেত্রে তোমাকে যদি বিজয়ী অর্জ্জুন হইয়া দাঁড়াইতে হয়, তবে সারথীনির্ব্বাচনে ভুল করিয়া বসিও না। কে বুঝাইয়া দিবে ভারতের নেশনত্ব কোথায়? কে বুঝাইয়া দিবে তোমার চিবন্তন নেশন-লক্ষ্য কি? কে সেই লক্ষ্যসাধনের প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে? যিনি চরম লক্ষ্য লাভ করিয়া-ছেন, যিনি পরমার্থবিৎ, তাঁহার নিয়ন্তৃত্ব ব্যতীত ভারতে নেশন গড়িতে পারে না,—ইহা এত দিনে ঠেকিয়াও বুঝা উচিৎ।

বৌদ্ধযুগের জন্য বুদ্ধদেব শ্রমণসম্প্রদায় গড়িয়াছিলেন। তার পর বেদ-পুনঃস্থাপনার যুগে বৈদিক সাধনবৈচিত্রের সম্যক্ প্রকটনোদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন সন্ন্যাসীসম্প্রদায় ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এক সময় দক্ষিণেশ্বরের কালী-বাড়ীতে এই সমস্ত সম্প্রদায়ের সাধনপ্রবাহ এক উদার হৃদয়সঙ্গমক্ষেত্রে আত্মোৎ-সর্গ করিয়া গিয়াছিল, সেই শুভক্ষণে, লোকচক্ষুর অন্তরালে এক অভিনব যুগপ্রবর্ত্তক সন্ন্যাসাশ্রম ভারতের জন্য বীজাকারে আত্মপ্রকাশ করে। যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সেই সন্ন্যাস প্রকাশ পায়, তিনি ব্যতীত আর কেহ সে ঘটনা জানিত না, তাই একদিন তদাশ্রিত কোন সাধক সন্ন্যাসীর জন্য ভিক্ষায়োজন করিয়া বাহিরে সাধুর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি আপন ঘরে বর্ত্তমান যুগের ভাবী সন্ন্যাসীদের দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, "এদের খাওয়ালে যথার্থ সাধুভোজন করান হয়"। পরমহংসদেবের এ বাণী একটা রূপক নহে—একটা রূপকের দোহাইয়ে সদাচারমর্য্যাদা ভাঙ্গিবার মানুষ তিনি ছিলেন না। বাস্তবিকই দিনের পর দিন ভারতীয় নানা সন্ন্যাসীসম্প্রদায় দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া পূজারী ব্রাহ্মণের হাতে আপন আপন জীবনীশক্তির সূক্ষ্মসূত্রগুলি গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া যাইত, বাস্তবিকই সেই সূত্রগুলি আপনার সর্ব্বসমন্বয়কারী সাধনতাঁতে

ফেলিয়া পরমহংসদেব এক নূতন সন্ন্যাস রচনা করিয়া তদর্থসর্ব্বত্যাগী ভক্ত-দের প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন ব্যাকুলভাবে কাটাইয়াছেন। তাই যে দিন তাঁহার সন্ন্যাসপ্রবর্ত্তক শঙ্করমূর্ত্তির প্রথম দর্শন পাইলেন, সে দিন আনন্দে তিনি আত্মহারা। সন্ন্যাসস্বরূপ যেন মূর্ত্তির অভাবে অপ্রকাশ ছিল,—যেন মূর্ত্তি সমীপাগত হইবামাত্র সেই স্বরূপ তাহার অন্তর বাহির অধিকার করিল। ভারতে আধুনিক যুগের সন্ন্যাস শ্রীরামকৃষ্ণে স্বরূপ লাভ করিল, এবং স্বপ্রবর্ত্তক শ্রীবিবেকানন্দে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল।

গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়েই ঠাকুরের আশ্রয় পাইয়াছে, তাঁহার প্রেম ও করুণা উভয়ত্রই সমভাবে বর্ষিত,—কেহ কম পাইবার বা কেহ বেশী পাইবার দাবী রাখে না। কিন্তু তিনি যাহাকে সংসার ছাড়াইয়া, গৃহসমাজ ছাড়াইয়া, সন্ন্যাসী করেন, তাঁহার বিশেষ একটা ভাব, একটা দায় আছে,—সে দায় দেশের জন্য, জগতের জন্য, স্বপ্রদর্শিত আদর্শের সংরক্ষণ ও প্রচার। এই দায়পূরণের যোগ্যতা যতদিন থাকিবে, ততদিন তৎপ্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসের বিলোপ নাই, বিনাশ নাই। আবার যতদিন এই দায় পূরণে তাঁহার প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত সন্ন্যাসি-জীবনে প্রকটিত হইবে, ততদিন যোগ্যতারও অভাব হইবে না।

এই দায় বা ট্রাষ্ট একটা শাশ্বত, নিত্য ব্যাপার। সন্ন্যাস বলিতে মূলে একটা দায় বা ট্রাষ্ট বুঝায়। কথাটা শুনিলেই বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস এই যে সন্ন্যাসে কোন রকম দায়দায়িত্ব নাই,—যে সমস্ত সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত, তার আবার দায় কি? দায় বলিতে যদি দায়ী ছাড়া আর কাহারও নিয়োগ বুঝায়, তবে বলিতে হইবে জীবন্মুক্তের কোনও দায় নাই. যে প্রকৃতি ভগবল্লাভের পথ রোধ করিয়া আছে, তাহার নিয়োগ যদি দায় হয়, তবে সন্ন্যাসীর সেরূপ দায়ও থাকে না। কিন্তু যে প্রকৃতি চরমসিদ্ধি দান করিয়াছে বা করিতেছে, সেই প্রকৃতির যে নিয়োগ বা প্রেরণায় সন্ন্যাসী জগদ্ধিতায় প্রবৃত্ত হন, তাহাকেই আমরা দায় বলিয়াছি। পুরাণোক্ত নিবৃত্তিমার্গপ্রবর্ত্তক সনকসনন্দনাদি সর্ব্ব মায়াবন্ধনের অতীত হওয়ায় যদিও পিতামহ ব্রহ্মার সংসারসৃজনরূপ কার্য্যে সহায়রূপে গণ্য হইলেন না, তথাপি যে আত্মশক্তিতে তাঁহারা সৃজিত, সেই শক্তির যে নিয়োগ বা প্রেরণায় সংসারে নিবৃত্তির পথ দেখাইতে তাঁহারা ব্রতী হইলেন, তাহাকেই আমরা সন্ন্যাসের দায় বলিয়াছি। আজন্ম সর্ব্ববন্ধনহীন শুকদেব উন্মত্তবৎ জগতে বিচরণ করিলেও যে নিয়োগ বা প্রেরণা উপেক্ষা না করিয়া

সভাস্থলে ভাগবতকথা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাকেই আমরা সন্ন্যাসের দায় বলিয়াছি। বোধিবৃক্ষমূলে চরমজ্ঞান লাভ করিয়া যখন শাক্যসিংহের সমস্ত বন্ধন তিরোহিত হইল, তখন আপনার নির্ব্বাণপ্রদায়িনী প্রকৃতির মধ্যেই যে নিয়োগ অনুভব করিয়া তিনি ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, তাহাকেই আমরা সন্ন্যাসের দায় বলিয়াছি। সর্ব্বকর্ম্মাতীত ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হইয়াও যে দায় পূরণে জ্ঞানগুরু শঙ্কর সেই ব্রহ্মতত্বপ্রচাররূপ কর্ম্মের অধীনতা স্বীকার করিলেন, তাহাকেই সন্ন্যাসের দায় বলিতে হয়। প্রেমাবতার অভিন্নযুগলমূর্ত্তি গৌরাঙ্গদেব যে দায় মাথায় লইবার জন্য সন্ন্যাস লইলেন, অতএব গৃহবাসী বৈষ্ণব হইয়া থাকিলে যে দায় প্রকৃতভাবে স্বীকার করা হইত না বলিয়া তিনিই বুঝাইতেছেন, সেই দায়কেই সন্ন্যাসের দায় বলিতে হয়। যে দায় স্কন্ধে চাপাইবার জন্য পরমহংসদেব স্বনির্দ্দেশে সাধননিরত যুবকপ্রবরকে বুঝাইতেছেন যে চব্বিশ ঘণ্টা সমাধিবিলীন অবস্থায় কাটানর ইচ্ছা তাঁহার পক্ষে হীনবুদ্ধি, সেই দায়কেই সন্ন্যাসের দায় বলিতে হয়। আচার্য্য বিবেকানন্দ এই দায় সর্ব্বদা স্মরণ করাইবার জন্য তৎপ্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসের উদ্দেশ্যব্যাখ্যায় বলিতেছেন, "আত্মন মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"।

প্রত্যেক সন্ন্যাসীর জীবনে এই দায় সম্যক্ লক্ষিত না হইলেও, সন্ন্যাসের মূলে উহা বিদ্যমান। এই অন্তর্নিহিত ভাবটীকে সুপ্রণালীর ভিতর দিয়া সন্ন্যাসে অভিব্যক্ত করিবার জন্য স্বামীজি ত্যাগসাধনার সঙ্গে সেবাতত্ত্বকে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের সন্ন্যাসী সংসারে শুধু ত্যাগের পথ দেখাইবে না, প্রকৃত সেবার পথও দেখাইবে। যে ত্যাগ ও সেবার আদর্শ ভারতে নেশনকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবে ও ভবিষ্যতে উহাকে জগতের কল্যাণে নিয়ন্ত্রিত ও নিযুক্ত রাখিবে, সেই ত্যাগ ও সেবার আদর্শ বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করা আধুনিক সন্ন্যাসের দায়ভুক্ত। এই ভগবৎপ্রদত্ত দায় শিরে বহন করিয়া নবোদিত সন্ন্যাসাশ্রম আজ ভারতীয় নেশন গড়িবার সনাতন পন্থা ঘোষণা করিতেছেন। যে সময় আচার্য্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে জাতীয় জীবন গড়িবার পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহার পর নানা জন নানা মতে সেই চেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়া বিফলতার সহিত সংগ্রাম করিতেছেন। হে পাঠকবৃন্দ, আপনারা সকলেই সে সমস্ত দেখিতেছেন; এখন জিজ্ঞাস্য এই যে আর কত কাল আমরা পাশ্চাত্যানুচিকীর্ষার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত, ভ্রান্তির দ্বারা পদে পদে বিড়ম্বিত, এবং উদ্যমের উপযুক্ত ক্ষেত্র অভাবে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বৃথা কালক্ষেপ করিব?

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসী গোড়াথেকেই সন্ন্যাসের বড় পক্ষপাতী নহেন। এ কথা আমরা পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি। অনেক দিন পূর্ব্বে জষ্টিস্ র্যাণাডের মত বিচক্ষণ লোকও সমাজসংস্কার-সভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির আসন হইতে সন্ন্যাসের বিপক্ষে প্রতিবাদ করায় স্বামীজি "প্রবুদ্ধ-ভারতে" লিখিয়াছিলেন, "চিরজীবী হও, হে র্যাণাডে ও সমাজসংস্কারকদল।—কিন্তু হায় ভারত পাশ্চাত্যভাবভাবিত ভারত। এ কথা, বৎস, ভুলোনা যে আমাদের সমাজে এমন সব সমস্যা আছে, যাহার মীমাংসাত দূরের কথা, যাহার অর্থ পর্য্যন্ত তোমার বা তোমার পাশ্চাত্য গুরুদেব এখনও বোধগম্য নহে।"

পাশ্চাত্যশিক্ষার পরিপক্ক ফলস্বরূপ একটী নূতন মত আজকাল শুনা যায়, যাহার ভিত্তি পাশ্চাত্য মনীষী হিগেলের Concrete Universal, অর্থাৎ অভিব্যক্ত সমষ্টিতত্ত্ব। ইংরাজি সাহিত্যে Abstract শব্দের মধ্যে একটা শ্লেষ নিহিত আছে, যাহা ধরা ছোঁয়া যায়, তাহা Concrete,, এবং যাহা চিন্তা বা কল্পনাদণ্ডে মথিত করিয়া, Concrete ছাঁকিয়া, উদ্ধৃত করিয়া বুদ্ধিতে ধারণ করিতে হয়, তাহা abstract। সূক্ষ্ম শব্দে কতকটা সে ভাব বুঝায়। হিগেল দর্শনে যে পরমসূক্ষ্মতত্ত্বকে সর্ব্বদ্বন্দ্বাতীত শুদ্ধ সৎ বলা হয়, তাহার নাম abstract universal, সেই অব্যক্ত অবস্থায় অবস্থিত শুদ্ধ সৎস্বরূপ সমষ্টিতত্ত্ব স্বনিহিত অলঙ্ঘ্য প্রকাশশক্তিতে ব্যক্ত অবস্থায় বিলসিত হইয়া জগদাকার ধারণ করে। এই অভিব্যক্ত সমষ্টি অব্যক্ত সমষ্টির সত্য পরিণাম, অতএব আমাদের পক্ষে ব্যক্ত পরিণামকে ত্যাগ করিয়া অব্যক্ত পরিণামীকে লাভ করার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র,—পরিণামকে পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়াই তন্মধ্যে পরিণামীর তুরীয় রস উপলব্ধি করিতে হইবে। এই "তন্মধ্যে" টুকুর জের টানিয়া, কেবলই যে সংসারবিহিত সকল কর্ম্মকে বজায় করা হইল তাহা নহে, "নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" ইহাও নিষ্পত্তি করা হইল। এই মতে সংসারত্যাগ একটা বিষম ত্রুটি, কেন না সংসার না করিলে, ব্যক্তকে অবলম্বন করা রূপ অব্যক্তানুভূতির যে একমাত্র সাধন তাহাতে গলদ রহিয়া গেল। পাশ্চাত্যের বিশিষ্টাদ্বৈত কোন কোন স্থলে সন্ন্যাসের এইরূপে প্রতিবাদ করিতেছে। এই প্রতিবাদের প্রতিধ্বনিতে অনেক স্থলে শুনা যাইতেছে যে মানুষের যতগুলি বৃত্তি তাহার সহজাত, তন্মধ্যে কোনটীর যদি অনুশীলনে অবহেলা হয়, তবে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয় না,—সন্ন্যাস এই কারণে একটা নিখুঁত বা উৎকৃষ্ট আদর্শ নহে।

আমাদের দেশেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচলিত আছে, এবং জগৎপরিণাম আমাদের দেশেও কোন কোন সম্প্রদায় সত্য বলিয়া স্বীকার করে। কিন্তু তাহারা কই সংসারকে অনন্তগতি হইয়া ত বুকে আঁকড়াইয়া ধরে না? তাহারা সংসারের অনিত্যতা, মায়াময়ত্ব পুরাপুরি স্বীকার করে। সন্ন্যাসের সহিত ভারতে প্রচলিত কোনও মতবাদেরই বিরোধ নাই। পাশ্চাত্য পরিণামবাদী ও ভারতীয় পরিণামবাদীর মধ্যে এই বৈষম্য কেন রহিয়াছে?

এই রহস্যের সদুত্তর আছে। "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"—যাহা আছে, তাহার নাই হয় না, যাহা নাই তাহার আর আছে হয় না—এই মহাসত্যটী পাশ্চাত্য পরিণামবাদে যথোপযুক্ত স্থান পায় নাই! কিন্তু ভারতের চিন্তা ও সাধনায় এই সত্যটি বরাবরই ষোল আনা মর্য্যাদা পাইয়াছে। পাশ্চাত্যে evolved বা অভিব্যক্ত শব্দটী ব্যবহার করিলেই, একটা অভাব থেকে ভাবে পৌঁছান বুঝায়,—ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আসা বুঝায়, কিন্তু ভারতে অভিব্যক্তি শব্দের অর্থ—যাহা ছিল, তাহারই উপস্থিতক্ষেত্রে আবর্ত্তন বা প্রবেশ—জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ। এই প্রকৃতির আপূরণ—যেমন বাঁধের এক ধারে জল ছিল, আবরণভেদে আর একদিক পূরণ করিতেছে—এ ভাবটী পাশ্চাত্য দার্শনিকদের ধাতে নাই। তারা evolution বুঝে, involution (অন্তর্নিহিতত্ব) তেমন বুঝে না। ধরা ছোঁয়ায় পাওয়া যায় না বলিয়া যাহা স্থূলাতীত বা abstract, তাহার সহিত স্থূল বা concreteকে পাশ্চাত্য বুদ্ধি তুল্যমূল্য বলিয়া স্বীকার করে না। মতবাদের ভূমিকায় সাজগোছ করিবার সময় পাশ্চাত্য দার্শনিক পূর্ণত্বের যেরূপই ব্যাখ্যা দিন, আখেরে প্রতিপন্ন হইয়া যায় যে concrete বা স্থূলেই পূর্ণত্ব খুঁজিতে হইবে, স্থূলাতীত সত্তায় পূর্ণত্ব নাই। পাশ্চাত্য ক্রমোন্নতিবাদ স্থূলে পূর্ণত্ব পাইবারই আশা ও আশ্বাসবাণী।

Abstract বলিতে ভূত-দেখা যেন পাশ্চাত্যের স্বভাব, দার্শনিকরা ও দেশে কেবল চেষ্টা করিয়াছে যে ঐ জায়গাটায় ভূত না দেখিয়া, একটা ভাল-মন্দ ঘরোয়ানা রকমের কিছু দেখা,—কেহ কেহ বা ও হাঙ্গামাই একেবারে তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিয়াছে, যথা জড়বাদী। মনস্বী হিগেলের বাহাদুরি এই যে তিনি স্থূল সৃষ্টির মূলে পরিণামক্রমে একটা ন্যায় সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, এই ন্যায়সাহায্যে abstract স্থূলাতীত সত্তা ও তাহার পরিণামেও একটা সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়—ভূত দেখিতে হয় না। কিন্তু এই সঙ্গতি মস্তিষ্কমন্থনে উদ্ভূত, গভীর

অধ্যাত্মসাধনায় প্রত্যক্ষীকৃত নহে, সেই জন্য ভারতের কাছে সে মতবাদের কোনও prestige বা মর্য্যাদাই নাই।

কিন্তু "প্রকৃতির আপূরণ" বুঝিতে না পারায় হিগেলের ন্যায় পাশ্চাত্য পরিণামবাদী কেবল সংসারেই যে পূর্ণত্ব পাইবার আশা রাখেন, ভারতীয় বিশিষ্টাদ্বৈতের সাধক সংসার হইতে হটিয়া আসিয়াও, স্থূল হইতে নিবৃত্ত হইয়াও সেই পূর্ণত্বের ভরসা বজায় রাখিতে পারেন। ভারতের সত্যান্বেষী সাধক পরিণামের আদিতেও পূর্ণত্ব দেখে, মধ্যেও দেখে, অন্তেও দেখে; তাঁহার শ্রুতি তাহাকে বলিয়া রাখিয়াছে—পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে, পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে—স্থূলের অতীতে পূর্ণত্ব, স্থূলে ব্যাপ্ত হইয়াও পূর্ণ রহিয়াছে, পূর্ণ হইতে পূর্ণ অভিব্যক্ত হইয়াছে—পূর্ণ হইতে পূর্ণ লইলেও পূর্ণই বাকি থাকিতেছে।

অতএব concrete universal, বা বৃত্তির অনুশীলন প্রভৃতি বড় বড় কথায় এ দেশও ভুলিবে না, সন্ন্যাসও উঠিয়া যাইবে না। এ দেশে concrete যেমন প্রত্যক্ষ, abstract ও তেমনি প্রত্যক্ষ, উপরন্তু concrete বা স্থূলে জড়ত্ব, বন্ধন, দুঃখ এবং পূর্ণত্বের ব্যঞ্জনা (suggestion) আছে, পূর্ণত্ব নাই, abstract বা স্থূলাতীতে, পূর্ণত্ব, চিন্ময়ত্ব, মুক্তভাব ও আনন্দ। এই জন্য ভারতে কেহ স্থূল সংসারভোগ ছাড়িয়া নিবৃত্তির পথে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, লোকে ভাবে না, সে বিকৃডাইল,—ভাবে, সে সার গ্রহণ করিল। পাশ্চাত্য পরিণামবাদী ভ্রান্ত,তাই সে স্থলে তাহার মনে হইবে যে লোকটা সংসার ছাড়িয়া অসম্পূর্ণতার কূপে পড়িল, কারণ যাহা কিছু সম্পূর্ণতা তাহা সংসারে, সংসার ছাড়িয়া পূর্ণতার সহিত সংযোগ কোথায় পাইব? শুনিয়াছি পথ চলিতে চলিতে এক উট কাঁটা শাক চিবাইতেছে—রক্তও ঝরিতেছে, সুখও পাইতেছে—এবং চোখ বুজিয়া বলিতেছে, "ভোজন ত একেই বলে। আয়সা শাক কোথায় মেলে বাবা।" দূরে একটা বলীবর্দ্দও আহারে নিযুক্ত, সে কোমল তৃণ চিবাইতে চিবাইতে উটের কথায় বলিল, "শালা কাটমুখ্যু, আবার বেয়াদব"?

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে, নতুবা পাশ্চাত্য পরিণামবাদের কুফল আরও বিশদভাবে বিচার করা যাইত। পাশ্চাত্য আধুনিক যুগে ঐহিকতাকে যত মাথায় তুলিয়াছে, ততই সন্ন্যাসকে গালি দিয়াছে। তুমি যেখানে রস পাইবে, সেইটিকেই সত্য বলিয়া জাহির করিবে,—প্রকৃতির নিয়মই এই। সংসারচক্রে বসিয়া পাশ্চাত্য বেশ মধু চুষিতেছে, এ অবস্থায় সে চাকাটী সে ছাড়িবে কেন?

সে বলিবে ঐ সংসারচাকায় পাক খাইতে খাইতে, আকাশ পাতাল যাহা ভাবিতে হয় ভাব, ধর্ম্ম কর্ম্ম যাহা করিতে হয় কর—কারণ ঐ চাকা ঠিক তোমায় উন্নতির ধ্রুব লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিবে। প্রাচ্য ঋষিদের মত ভায়াদের এ হুঁস নাই যে সংসারচাকা ঘুরে ও চলে বটে, কিন্তু গ্রহ তারা সূর্য্যাদির মত, বিশ্বাকাশের সমস্ত আবর্ত্তনের মত, ফিরে ফিরে চিরকালই এক জায়গায় আসে—এ স্থূল সংসারে সোজাসুজি সিদা চলিয়া যাওয়া বলে কোনও গতিই নাই। সংসারের প্রবৃত্তিচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে মানবজীবনের লক্ষ্যে পৌঁছিবার ভরসা বকাণ্ডপ্রত্যাশা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ভারতবর্ষে সেই জন্য আদিযুগ হইতে নিবৃত্তির বাণী ঘোষিত হইয়াছে, ভারতের যাঁরা নেতা ও নিয়ন্তা, সেই সন্ন্যাসীগণ মানুষকে শিখাইয়াছে যে তাহারা প্রবৃত্তি লইয়াই জন্মিয়াছে বটে, "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"—কিন্তু নিবৃত্তিরই অনুসরণ করিতে হইবে, সংসারচক্রের পাকে জগতে আসিয়াছ, কিন্তু অনাসক্তির দ্বারা সেই চাকার সহিত সংযোগ ছাড়াইয়া রাখ, যাহাতে আর না পাক খাইতে হয়। ঐ সংসারচক্রকে বিফল করিবার জন্য সৃষ্টিতে সাগরাম্বু হইতে ভারতবর্ষ সমুত্থিত হইয়াছে, ঐ চক্রকে বৃথা করিয়া দিবার জন্য ভারতের আদিযুগ হইতে ব্রহ্মজ্ঞের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, ঐ চক্রকে বিফল করিবার মহাবিদ্যা ও কৌশল জগতের কল্যাণে বাঁচাইয়া রাখিতে ভারতে নেশনপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, এবং সেই মহাবিদ্যা যাঁহাদের আয়ত্ত সেই সন্ন্যাসীগণও নেশনের শীর্ষস্থানে আসন পাইয়াছিলেন। সংসারচক্রকে বিফল করিতে না জানিলে, কি ভারত আজও বাঁচিয়া থাকিত? হে পাশ্চাত্যশিক্ষাগর্ব্বিত অবিশ্বাসী, তোমার কোন্ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ভারতের এই অদ্ভুত সঞ্জীবনী শক্তির ব্যাখ্যা হয়, তাহা জানিতে চাই!

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা দেখিলাম যে ভারতীয় নেশনের স্থাপনা ও লক্ষ্য-সাধনে সন্ন্যাসাশ্রম ও সন্ন্যাসীর নেতৃত্ব অপরিহার্য্য। সন্ন্যাস হইতেই কেন্দ্রশক্তি বিস্ফুরিত হইয়া দেশের লোককে প্রকৃতভাবে পথ দেখাইয়া দিবে। স্বামী বিবেকানন্দ সেই নূতন সন্ন্যাস আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, এখন কোথায় দেশের ত্যাগী, পরমার্থনিষ্ঠ যুবকবৃন্দ, তোমরা আজও কি স্বামীজির সেই গগনভেদী প্রাণস্পর্শী গম্ভীর আহ্বান শ্রবণ কর নাই?

অদ্বৈতপ্রসঙ্গ।

১। বুদ্ধোৎসব।

গত বৈশাখী পূর্ণিমার দিন বৌদ্ধজগৎ মহোৎসবে মগ্ন হইয়াছিল।

সে দিন ভারতীয় সনাতন সমাজের যে সামান্য সাড়া পাওয়া গিয়াছিল, তাহা ফুলদোলের আঙ্গিনায়।* কিন্তু আমাদের সমাজ একদিন বুঝিবে যে অনার্য্য-প্রভাবকে জয় করিবার জন্য প্রাচীন আর্য্যের জীবনাদর্শ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল,—নির্ব্বাণমুক্ত বুদ্ধ সেই সিদ্ধির প্রকটমূর্ত্তি।

প্রয়োজন হইলেই অবতার পুরুষকে প্রকটিত করা আর্য্যসমাজের পুরাকালের স্বোপার্জ্জিত শক্তি। বুদ্ধাবতারে এই শক্তির যে অপূর্ব্ব লীলা হইয়াছে, এক হিসাবে আর কোনও অবতারে তাহা হয় নাই। কেন না আর কোনও অবতারে কেল্লার বাহিরে যাইয়া আর্য্যাদর্শ রক্ষা করিবার জন্য যুঝিতে হয় নাই, ভগবান্ বুদ্ধকে তাহাই করিতে হইয়াছে।

আর্য্যসমাজ তখন আপনাকে আপনি চিনিত না, সেইজন্য বুদ্ধকেও চিনে নাই। সে দেখিল বুদ্ধ বুদ্ধত্বের পরিচয়ে তাহারই, কিন্তু মতবাদের পরিচয়ে?— একটী প্রহেলিকা। জল্পনা বলিল, অসুরদিগকে বেদপথ হইতে ভুলাইয়া বিনষ্ট করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ মায়ামোহরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শেষে দাঁড়াইল এই যে,

> নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
> সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং
> কেশবধৃতবুদ্ধশরীরং।

কুরুক্ষেত্রের পর হইতে বুদ্ধাবির্ভাবের বীজ উপ্ত হইতেছে,—কালনাট্য-মঞ্চের সাজঘরে অভিনয়ের সাজগোছ হইতেছে। সমাজে ক্ষত্রিয় নাই, অতএব বীর্য্য নাই, আছেন আদর্শরক্ষক ঋষি। প্রহরী ক্ষত্রিয়ের অভাবে অনার্য্যের গতি অব্যাহত এবং তাহার হীন আদর্শসংস্পর্শে ক্ষত্রিয়হীন, বীর্য্য-হীন সমাজ বিপন্ন হইল। বেদের যাজনার জন্য যে সমস্ত ঋষির সমাজেই গতিবিধি ছিল, তাঁহারা ক্রমে সমাজেই সংসার পাতিলেন। কর্ম্মকাণ্ডে

---

* কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটী ও বেলুড় মঠে বুদ্ধের লীলাস্মরণার্থ যৎকিঞ্চিৎ ব্যবস্থা আছে।

আস্থাহীন জ্ঞানযাজী ঋষি কালচক্রবিড়ম্বিত সমাজে ফিরিলেন না। সমাজের বাহিরে সন্ন্যাসমূলক সাধনার পত্তন হইল।

তখন প্রাচীন ও আধুনিকের সংযোগসূত্র ছিল বেদ ও ব্রাহ্মণ। সমাজ হীনবীর্য্য, অতএব নূতন। ক্ষত্রিয়রূপ প্রদীপ প্রায় নিবিয়া আসিয়াছে, বাহির হইতে তৈলসংযোগে নূতন বর্ণে ও আভায় কোথাও কোথাও জ্বলিয়া উঠিতেছে। সেইরূপ কমবেশী বর্ণসঙ্কর ও অনার্য্যপ্রভাব সমাজকে রূপান্তরিত করিতেছে। এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রাচীন আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টায় নিয়োজিত, অবলম্বন,—বেদের পঠনপাঠনা ও যাজনা। স্মৃতি ও প্রয়োগের সুবিধার জন্য সূত্রযুগ প্রবর্ত্তিত হইল, বেদবিধি শ্রৌত, ধর্ম্ম ও গৃহ্যসূত্রে গ্রথিত হইতে লাগিল। বেদাঙ্গ সংকলন প্রভৃতি বেদগুপ্তির আরও অনুষ্ঠান সংঘটিত হইতে লাগিল।

আপনাকে সামলাইতে ও বজায় রাখিতে যাহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত, সে অনার্য্যসমস্যা কিরূপে পূরণ করিবে? অনার্য্যসমস্যা কি?—না, অনার্য্যজুষ্ট ভোগভাবের দ্বারা নিবৃত্তিমূলক আর্য্য সমাজাদর্শের অভিভবাশঙ্কা। এই আশঙ্কা ক্রমশঃ ভারতাকাশ আচ্ছন্ন করিল, আর এদিকে সঙ্কোচনশীল, স্থূল কর্ম্মকাণ্ডমাত্রের যাজক, আর্য্যসমাজ নির্বীর্য্য হইয়া পড়িতে লাগিল। বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভে অথবা চন্দ্রগুপ্তের সময় দেখিতেছি,—সেই সমাজ আছে, কিন্তু চেনা যায় না; পরাবিদ্যার চর্চ্চা লুপ্তপ্রায়, অপরাবিদ্যার শুষ্ক চর্চ্চায় অযাজ্যযাজী পরমুখাপেক্ষী ব্রাহ্মণের গৃহ মুখরিত, সর্ব্বত্র ভোগৈশ্বর্য্যের উপাসনা, নিবৃত্তিভাব সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত।

কুরুক্ষেত্রের পর বাস্তবিকই ঘোর অবসাদ আসিয়াছিল, নতুবা এমন হয় না। ঋষির ঋষিত্ব গেল, মৌলিকতা গেল, ক্রমে পরতন্ত্র যাজক ব্রাহ্মণে পরিণত। আবার যাঁহারা সমাজে মিশিলেন না, যাহারা সম্প্রদায়বিশেষে উপনিষৎ বিদ্যা পোষণ করিলেন, পরে উহার পুষ্টিসাধন করিলেন, ভিক্ষাসূত্রাদি প্রণয়ন করিলেন, দর্শনচর্চ্চা করিলেন, তাঁহাদের পরিণাম কি? সন্ন্যাস প্রবর্ত্তিত রহিল, কিন্তু বানের জল আসিয়া সাবেক জল বাহির করিয়া দিল। যে সন্ন্যাস প্রথম প্রথম বেদমূলক ব্রহ্মজ্ঞানজ্যোতি ধারণ করিয়াছিল, ক্রমশঃ দেখি উহা শ্রৌতভূমি হইতে নোঙ্গর তুলিয়া লইয়া সম্প্রদায়গত তত্ত্ববিদ্যা ও যোগবিদ্যায় ভাসিতেছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের তত্ত্ব ও যোগ যেন "পেটেণ্ট"-করা, বেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংযোগ নাই। কোন কোনও

স্থলে আবার স্পষ্ট বেদবিরোধিতা। কারণ সামাজিক শুদ্ধতাপ্রয়াসী বৈদিকদের দ্বারা সমাজে কোনও প্রকারে যিনি বঞ্চিত, সংসারবৈরাগ্য থাকিলে সন্ন্যাস তাহার জন্য মুক্তদ্বার, কারণ সেখানে বর্ণভেদের কোনও আঁট নাই। অতএব বেদবিরোধিতা সন্ন্যাসে স্বাভাবিকরূপে অনেকস্থলেই প্রকাশ পাইয়াছিল। কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি অবজ্ঞা ত গোড়াথেকে ছিলই। সামাজিক ব্রাহ্মণ প্রতিশোধ লইয়াছিল,—কলিতে সন্ন্যাস নাই,—এই বিধান দিয়া, আর ইহাও প্রচার করিয়াছিল যে যজ্ঞস্থলে সন্ন্যাসীর উপস্থিতিতে মহৎ অকল্যাণ।

সমাজের সহিত সন্ন্যাস, কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের বিচ্ছেদে কর্ম্ম পঙ্গুত্বে ও জড়যন্ত্রে পরিণত,—জ্ঞান বা সন্ন্যাসও ভেক রাখিয়া প্রয়োজনাভাবে পূর্ব্বেই একপ্রকার অন্তর্হিত। যাহারা সন্ন্যাসের ভেক বজায় রাখিতেছিল, তাহারা পরোক্ষভাবে বেদমূলক, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে বেদবিরোধী বা উদাসীন। উপনিষদের যোগ ও তত্ত্ববিদ্যায় তাহারাও পরোক্ষভাবে উত্তরাধিকারী,—যদিও হীন অধিকারীর প্রাবল্যে তত্ত্বদৃষ্টি বিকৃত।

অতএব অনার্য্যসমস্যা কে ভঞ্জন করিবে? সত্যই কি অনার্য্য-প্রভাবের বৃদ্ধিতে নিবৃত্তিমূলক আর্য্যাদর্শ লোপ পাইবে? কিন্তু উপায় কি? দেশময় অনার্য্যজুষ্ট ভাব অপ্রতিহতগতিতে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। চিত্তশুদ্ধি, নিবৃত্তির আদর্শ তিরোহিতপ্রায়। সনাতন আর্য্যসমাজের কায়া ছায়ায় পরিণত। কে করাল মৃত্যুর কবল হইতে ইহাকে রক্ষা করে?

রক্ষার একমাত্র উপায়—আর্য্যাদর্শের দ্বারা অনার্য্যের অভিভব। কিন্তু যে শাস্ত্রাদিতে ঐ আদর্শ লিপিবদ্ধ তাহা দেড় হাজার বছর ধরিয়া ব্রাহ্মণের কুক্ষিতে লুক্কায়িত। সে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রাদি অনার্য্যের কাছে বাহির করা দূরে থাক্, সমাজের প্রাচীর নিজেই লঙ্ঘন করিবে না। যদি কেহ লঙ্ঘন করিয়া সাধারণে শাস্ত্র প্রচার করে, তবে শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও ব্রাহ্মণ অযোগ্যকে সমাজে লইবে না। আবার ব্রাহ্মণসমাজে তখন কর্ম্মকাণ্ডই প্রচলিত ছিল, সেই কর্ম্মকাণ্ডের প্রচারে অনার্য্যকে আর্য্যাদর্শের দ্বারা সংস্কৃত করার সম্ভাবনা নাই, কারণ কর্ম্মকাণ্ডে অনার্য্যজুষ্ট ভোগভাবকে প্রশ্রয় দিবার ও পরিপুষ্ট করিবার যথেষ্ট আয়োজন আছে। কর্ম্মকে ভোগলক্ষ্য হইতে ফিরাইতে হইলে, প্রবল ত্যাগতার প্রচার করা চাই। যদি সেই প্রচারে শাস্ত্রের সাহায্য লওয়া যায়, তবে তদানীন্তন

সমাজের কর্ম্মকাণ্ড আবার প্রাদুর্ভূত হইবে। শাস্ত্রীয় জ্ঞানকাণ্ড কোথায় গুপ্তভাবে ধারা রক্ষা করিতেছে, তাহারই সন্ধান নাই। উত্তর ভারতের সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের অবস্থাও দেখিয়াছি। আবার শাস্ত্র সংস্কৃতে লেখা, সংস্কৃত সাধারণ লোকে ভাল বুঝে না।

সে সময় শাস্ত্রের উপর অযথা নির্ভর আর্য্যসমাজের অস্থিমজ্জায় ঢুকিয়া গিয়াছে। শাস্ত্র মানুষের জন্য, মানুষ শাস্ত্রের জন্য নহে—এ ভাব তখন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যখন দেশের আব-হাওয়া এইরূপ, তখন শাস্ত্রের দোহাই দিয়া সত্য প্রচার করিলে, উহার সাধনা আবার সহজেই শাস্ত্রজল্পনায় পর্য্যবসিত হইবে।

এই সমস্ত কারণে, সে সময় অনার্য্যবিজয়ের জন্য প্রকৃত অস্ত্র দেবমানবে খুঁজিয়া পায় নাই। কুরুক্ষেত্রের পরবর্ত্তী বেদগুপ্তির কাল হইতে, আর্য্যাদর্শকে সংগোপনে সর্ব্বশক্তিপ্রয়োগে রক্ষা করার ভাব আর্য্যসমাজে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে; এই রক্ষাকার্য্য ভারতের নানাস্থানে অত্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে চলিতে থাকিলেও, সমাজে যাহা কিছু সার ছিল, তাহা ঐ কার্য্যেই নিয়োজিত ও ব্যয়িত। অতএব আর্য্যসমাজের মূলে সে সময় যে ভাব কার্য্য করিতেছে, তাহা দ্বারা অনার্য্যবিজয়ে কোনও সহায়তা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং আর্য্যসমাজের বাহিরে দাড়াইয়া অনার্য্যকে আহ্বান করিতে হইবে।

আবার বাহিরে দাঁড়াইয়া আর্য্যাদর্শের সহিত যোগরক্ষা করার ব্যবস্থাও পূর্ব্ব হইতে হইয়া আছে। আমরা দেখিয়াছি সন্ন্যাস উপনিষৎমূলক হইয়াও প্রথম থেকেই সমাজ হইতে ক্রমশঃই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিল। সমাজ ও বেদভিত্তির প্রতি উদাসীন হইয়া সন্ন্যাস যেন কি একটী চরম ফল প্রকটিত করিবার জন্য সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় গড়িতেছে ও ভাঙ্গিতেছে। বুদ্ধই কি সেই চরম ফল নহে?

বুদ্ধ ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রচার করিলেন, অথচ বেদকে মর্য্যাদা দিলেন না কেন, তাহা এইবার বুঝিব। সন্ন্যাসে তখন ঐরূপ রীতি অধিকাংশ স্থলেই ছিল না। যে বেদমূর্ত্তির তখন সমাজে প্রকাশ, তাহা দ্বারা কাজের ক্ষতিই হইত, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। অতএব আর্য্যাদর্শের চরমে পৌছিয়াও, আর্য্যাদর্শের প্রচার করিয়াও, বুদ্ধদেব সেই আদর্শের দুর্গস্থানীয় বেদ ও বৈদিকসমাজকে আশ্রয় করেন নাই। কালোচিত ব্যবস্থাপ্রদানেই অবতার পুরুষের মাহাত্ম্য।

বৌদ্ধমত যে আর্য্যাদর্শমূলক তাহাতে সন্দেহ কি? নির্ব্বাণ ও ব্রহ্মনির্ব্বাণে

কোনও প্রভেদ নাই,—বলিবার একটু রকমভেদ আছে। বেদ অস্তি-প্রত্যয়কে অবলম্বন করে, তার পর নেতি নেতি করিয়া উহারই অনবস্থার মধ্য দিয়া নির্ব্বাণে পৌছিতে চায়। বুদ্ধ অস্তি-প্রত্যয়কে বিশ্বাস করেন নাই, গোড়া থেকেই রদ করিতেছেন। ঐ প্রত্যয়ের যত রকম প্রয়োগ আছে, তন্মধ্যে সকলের মূল অহংভাবে উহার প্রয়োগ। এই প্রয়োগের ফলে 'অহং'কে আমরা বস্তুত্ব অর্পণ করি। অস্মিতাই মায়াপ্রপঞ্চের প্রসূতি। গোড়া থেকেই বুদ্ধ প্রচার করিলেন—নাহং অস্মি। নির্ব্বাণ যদি বৌদ্ধতত্ত্বগৃহের প্রতিষ্ঠা হয়, "অহং"এর অবস্তুত্ব উহার দ্বারস্বরূপ। পঞ্চ স্কন্ধ ও দ্বাদশ'নিদান তার পর বুঝিতে হইবে। বেদান্ত গোড়া থেকেই অহংএর আরোপ একেবারে না ঘুচাইযা, অন্যত্র উহার আরোপকে অপলাপ করিয়া নির্ব্বাণতত্ত্ব প্রথমে উহার আরোপ করাইতে চান, তাই বলেন "অহং ব্রহ্মাস্মি"। তার পর সমাধি দ্বারা নির্ব্বাণে উহার লয় শিক্ষা দেন। বুদ্ধ ঐ অস্থায়ী অহং-আরোপরূপ সোপানটীও বাদ দিয়াছেন। দার্শনিকদের বাদবিচার এই প্রভেদটুকুর উপর।

অদ্বৈত বেদান্ত অপেক্ষা এই হিসাবে বুদ্ধদেব তত্ত্বাজে যেন আরও uncompromising—আরও আপোস-নিরপেক্ষ। পরমহংসদেব বলিয়াছেন, পেঁয়াজের খোসার মত "অহং" ছাড়াইয়া গেলে, শেষে কিছুই থাকে না। বুদ্ধ দেখিলেন, কিছু পাইবার ভাবে খোসা ছাড়াইতে গিয়া মানুষ নিঃশেষে ছাড়ায় না, প্রায়ই একটু বাকি রাখে,—প্রায়ই অহং ও ভোগভাব একটু থাকিয়া যায়, সেই জন্য তিনি যেন সমস্ত বেধটা লইয়া কুটিতে বলিয়াছেন, খোসা ছাড়াইতে দেন নাই। এই মতের সহিত বৈদান্তিক অদ্বৈততত্ত্বের কোনও বিরোধ নাই, কেবল সাধনার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে।

আপোসের কোনও প্রসঙ্গ না তুলিয়া অস্মিতার সহিত এই কঠোর বিরোধ, নিবৃত্তির বজ্রাস্ত্রের মত অনার্য্য জীবনে পতিত হইল। আবার এই অস্ত্রও অনার্য্যের মস্তকে পড়িত না, যদি বুদ্ধের ব্যক্তিগত প্রভাব সূর্য্যের মত অমোঘ, অব্যর্থ না হইত। বুদ্ধ বিদ্যুজ্জড়িত মূর্ত্তিতে যেখানে দাঁড়াইয়াছেন, সেখানে মানবহৃদয়ে স্তব্ধতা সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে; তার পর বুদ্ধবাণী সেই হৃদয়কে লইয়া যেমন ইচ্ছা তেমনি গড়িয়াছেন। তাহা যদি না হইত তবে অষ্টাঙ্গ মার্গ ও নানাবিধ ধ্যানভাবনাদ্বারা নির্ব্বাণসাধনায় নিষ্ঠা রক্ষা করা অসাধারণ শক্তির কার্য্য। বুদ্ধ দেশের মধ্যে সেই শক্তি সঞ্চার করিয়া গিয়াছিলেন;

সে কালে, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" বলিতে কি অলৌকিক তাড়িতশক্তি লোকের হৃদয়ে খেলিয়া যাইত, তাহা আজ আমাদের বোধগম্য হইবে না। সাধে কি বুদ্ধের স্পর্শে অনার্য্যভাব তুলার গাদার মত জ্বলিয়া উঠিয়াছিল?

ব্রহ্মসমুদ্র হইতে বুদ্ধদেব দেশের মধ্যে যে শক্তির জোয়ার আনিয়াছিলেন, তাহা অনার্য্যের ভোগসর্ব্বস্বভাব বিনষ্ট করিল এবং সাধকের অবলম্বন-সাপেক্ষতা ভাসাইয়া দিল। তার পর বৌদ্ধেতিহাসে দেখিতে পাই, অদীর্ঘকালের মধ্যেই বৌদ্ধসাধক অবলম্বনের জন্য নানাস্থানে হাতড়াইয়া বেড়াইয়াছে। শেষে বৌদ্ধসাধন সেতুরূপে অনার্য্যকে আর্য্যের সাধনভূমিতে পৌঁছিয়া দিয়াছে, কিন্তু সে সেখানে দাঁড়াইয়া নিজ মত ও সাধনার বিশেষত্ব ও বেদবিরোধিতা বজায় রাখিবার জন্য আজ পর্য্যন্ত বৃথা চেষ্টায় উদ্যত হইতেছে।

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বেশ পরিষ্কার বুঝা যায় যে বুদ্ধাবতারের প্রধান লীলা অনার্য্যকে আর্য্যসমাজভুক্ত করিবার যোগ্যতা দান করা। নির্ব্বাণ, নিবৃত্তি ও অনহমিকার দ্বারা এই যোগ্যতা সম্পাদিত হয়। ভারতের বৌদ্ধ এই যোগ্যতা লাভ করিয়া সনাতন সমাজেই দশ শতাব্দীর মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। যাহারা মিশিতে পারে নাই, তাহাদের ভীষণ বিড়ম্বনার কথা ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছে।

এই প্রধান লীলারই একটী অঙ্গ—আর্য্য ভিন্ন অপর প্রাচ্যজাতির মধ্যে আর্য্যাদর্শের প্রচার। সাক্ষাৎভাবে বৈদিক ভিত্তির উপর এই প্রচার কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই বলিয়া কিছুই আসিয়া যায় না। ভবিষ্যতে সনাতন ধর্ম্ম ভগবান্ বুদ্ধের সাধনতত্ত্বকে অঙ্গীভূত করিয়া লইবে এবং বৌদ্ধসমাজকে আপনার সাধকসমাজেরই একটী শাখা বলিয়া গণ্য করিবে।

কাল ও ক্ষেত্র যেরূপ সাজাইয়াছে সেইরূপ অদ্ভুত সাজ পরিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া, যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ তিনিই যে বুদ্ধাভিনয় করিয়াছেন, তাহা এখনও পর্য্যন্ত ভাল করিয়া সনাতন সমাজ বুঝিতে পারে নাই। ঐ সমাজই একদিন তিলে তিলে মরিতেছিল, বাঁচিবার কোনও আশা ছিল না, বেদগুপ্তি, সৌত্রযুগ সমস্ত নিষ্ফল হইয়া যাইত। হীনাদর্শের প্রাধান্যে আর্য্যাদর্শ লোপ পাইত। হীনাদর্শরূপ কালবিষসঞ্চারের স্থানে ভারতদেহে বুদ্ধদেব (আপাতদৃষ্টিতে অবৈদিক) বৌদ্ধধর্ম্মরূপ তিক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছিলেন। বিষরোগ মুমূর্ষাবস্থায় মারিয়া ফেলিত, ঔষধ না হয় সাময়িক যাতনা দিয়া সেই বিষ নষ্ট করিয়াছে। তার পর সুস্থকে স্বকার্য্যে যথাপূর্ব্ব নিযুক্ত করিতে, সেই

বুদ্ধরূপী চিকিৎসকই কি আবার শঙ্কররূপে দেখা দেন নাই? ছেলেমানুষি ত্যাগ করিয়া আজ সনাতন সমাজকে ভক্তিকৃতজ্ঞতায় বুদ্ধের পদে আপনাকে বিকাইতে হইবে। হে আর্য্যসমাজ! তাক্ লাগিয়া গিয়াছিল, তাই একদিন অবতার বলিয়াছিলে, আজ এই মহাযুগ সম্মিলনে, অপূর্ব্ব চৈতন্যসঞ্চারের দিনে, অবতার-লীলার দ্বারা অবতারমাহাত্ম্য যদি বুঝিয়া থাক, তবে বুদ্ধাবতারের পদে আন্তরিক অর্ঘ্য প্রদান কর।

---

(২) "ব্রহ্মবিদ্যা"। *

বঙ্গীয় তত্ত্ববিদ্যা সভা গত বৈশাখ মাস হইতে একখানি নূতন মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন,—নাম "ব্রহ্মবিদ্যা"। "ব্রহ্মবিদ্যা"কে আমরা সাদরে সম্ভাষণ করি। বঙ্গসাহিত্য ইহার উপর অনেক আশা রাখেন।

ব্রহ্মবিদ্যার কথা আমাদের সাহিত্যে শীর্ষস্থান অধিকার করুক, কেন না ব্রহ্মবিদ্যাই পরা বিদ্যা, আর সমস্ত বিদ্যা অপরা—অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।

জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবেই হউক, ব্রহ্মবিদ্যাই সকল ধর্ম্মমতের চরমপ্রতিষ্ঠা। ঐ বিদ্যালোচনার ফলে ধর্ম্মসমন্বয়ের ভাব মানবহৃদয়ে জাগ্রত হইবে, সন্দেহ নাই। প্রত্যেকে আমরা একই পরমতত্ত্বের সাধক, এ কথা জগতের লোক যে পরিমাণে বুঝিতে সক্ষম হইবে, জগতে শান্তি ও ঐক্য সেই পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

আর আমরা ইহাও বিশ্বাস করি যে ভারতীয় আর্য্যসমাজ বিশেষ একটী লক্ষ্যের অবলম্বনে পৃথিবীতে আবির্ভূত ও অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং এখনও জীবিত রহিয়াছে, ব্রহ্মবিদ্যা বা পরমার্থের সাধনা, সংরক্ষণ ও প্রচারই সেই লক্ষ্যস্থানী। অতএব আমাদের সাহিত্যে ব্রহ্মবিদ্যার কথাই মূলপ্রসঙ্গ হওয়া উচিত। এই সমস্ত কারণে "ব্রহ্মবিদ্যা"র আবির্ভাব, আমাদের পক্ষে একটী বিশেষ শুভসংবাদ।

এই শুভ উপলক্ষে একটা কথা আমরা স্মরণ করিব। বিদ্যাপ্রসঙ্গ ও বিদ্যা-

---

* ৮৭ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত ও রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ মহোদয়গণের সম্পাদকতায় প্রকাশিত।

লাভের মধ্যে প্রভেদ আছে। সাগরে মণিমুক্তাদি আছে, ইহা অবগত হওয়া ও সেই মণিমুক্তাদির অধিকারী হওয়া, দুইটী পৃথক্ ব্যাপার। সাহিত্যে বিদ্যা-প্রসঙ্গেরই অবকাশ আছে মাত্র, কিন্তু তথাপি ব্রহ্মবিদ্যার প্রসঙ্গে কি সামান্য লাভ?

পাশ্চাত্যে বিদ্যার চর্চ্চা একসময় মানুষকে পরমার্থপরাঙ্মুখ ও ঐহিক প্রত্যক্ষবাদী করিয়া তুলিয়াছিল। সংসারে যাহা প্রত্যক্ষ করা যায়, তদতীত তদতিরিক্ত আর কিছু নাই,—এই বিষম বিশ্বাস পাশ্চাত্য শিক্ষিতসম্প্রদায়ের হৃদয় অধিকার করিতেছিল। এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তিবল প্রকাশ করিয়া খ্রীষ্টীয় চার্চ্চ হার মানিয়াছিল এবং উপেক্ষার আড়ালে যথাশক্তি জীবনধারণ করিতেছিল। কিন্তু উপেক্ষাদ্বারা সমস্যার সমাধান হয় না, সেই জন্য তেজস্বী জিজ্ঞাসু দুর্ব্বল, গতানুগতিক চার্চ্চের সঙ্গ পরিহার করিল, অথচ প্রাণে স্থূলাতীত সত্তার অস্ফুট প্রভাব অনুভব করায় ইহসর্ব্বস্ববাদীর সহিত মিলিত হইতে পারিল না। এই স্বাধীনচেতা জিজ্ঞাসুর দল রহস্যময় স্থূলাতীতের প্রমাণসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল।

স্থূলাতীতের রহস্য সকল দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র ও ঐতিহ্যকিম্বদন্তীতে বিক্ষিপ্তভাবে নিবদ্ধ রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত স্থূলাতীতে বিশ্বাসী, স্বাধীনচেতা, জিজ্ঞাসু-সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ সকল রহস্যের অনুসন্ধান ও সংগ্রহ বহুদিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছিল। অবশ্য সকলেই যে চার্চ্চের সহিত সংযোগ হারাইয়াছিল, তাহা নহে। কিন্তু তাহারা সাধারণতঃ এমন একটা সূক্ষ্ম ধর্ম্মতত্ত্ব স্বীকার করিত, যাহা প্রচলিত চার্চ্চ ও বিজ্ঞানের দুরধিগম্য নিগূঢ় রহস্যসমূহের আকরস্বরূপ।

গত শতাব্দীতে এই রহস্যবাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে অসামান্য মেধার উন্মেষ ও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইহার ফলে সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে নিগূঢ় রহস্যের মধ্যে একটা সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য দেখিতে পাইয়া, এই সম্প্রদায় অসাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর আপনাকে স্থাপিত করিল। অবশেষে আমাদের সনাতনধর্ম্মে ঋষি-প্রচারিত অধ্যাত্মরহস্যের বিজ্ঞানে সার্ব্বজনীন সিদ্ধান্তের বিশেষ প্রসার ও বিকাশ লক্ষ্য করিয়া, এই পাশ্চাত্য রহস্যবাদী সম্প্রদায় সনাতন ধর্ম্মকেই আপনাদের অনুশীলনকেন্দ্রে স্থাপিত করিয়াছেন। এই সূক্ষ্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু রহস্যবাদের নামই থিয়সফি।

বিশেষ কারণে থিয়সফির নিকট ভারতবাসী কৃতজ্ঞ। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহাদের আস্থা ও অনুসন্ধিৎসা পাশ্চাত্যশিক্ষায় বিকৃতবুদ্ধি ভারতবাসীর প্রভূত

কল্যাণ সাধিত করিয়াছে। ইহাদের এই সৎপ্রভাবের নিকট আধুনিক বিজ্ঞানের "নষ্টামি" পরাস্ত হইয়াছে এবং অনেক হিন্দু সনাতনধর্ম্মে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়াছেন।

কিন্তু পাশ্চাত্য হইতে আমাদের দেশে যে মাল আমদানি হয়, তাহার মধ্যে দেখি একটা না একটা গলদ আছে। সব মালেই পাশ্চাত্য স্বভাবগত দোষের একটা ছাপ মারা থাকে। আর কোনও জিনিসে এই ছাপ তত আসে যায় না, কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্বের পক্ষে উহা অত্যন্ত দূষণীয়।

ইউরোপের পুরাতত্ত্ব সাক্ষ্য দেয় যে সে দেশে আদিযুগ হইতে মানুষের স্বভাব কিছু বা খাম্বিরাসংযোগে উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে। তাহার বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তিপরায়ণ স্বভাবে প্রাচ্য মাঝে মাঝে ধর্ম্মভাবের খাম্বিরাসংযোগ করিয়া দিয়াছে, ফলে রাজসিক বর্ব্বরভাব সংযত হইয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে। খ্রীষ্টপূর্ব্ব যুগে এইরূপ ব্যাপার কয়েকবার সঙ্ঘটিত হইলেও, প্রাচ্য-প্রদত্ত খ্রীষ্টধর্ম্মরূপ খাম্বিরার প্রভাব ইতিহাসজ্ঞমাত্রেরই প্রত্যক্ষীভূত। আজ প্রাচ্যের নিকট পাশ্চাত্য যে সভ্যমূর্ত্তিতে সমাগত, ইহা খ্রীষ্টধর্ম্মের দ্বারা গঠিত ও পোষিত, নতুবা আজও ইউরোপ গল্‌জাতিতুল্য বর্ব্বরতায় পূর্ণ থাকিত। বাহির হইতে এইরূপ খাম্বিরাসংযোগে যে স্বভাব বিকাশপ্রাপ্ত হয়, তাহার মধ্যে একটা বিশেষত্ব থাকে,—সে বিশেষত্ব, মত ও সাধনার মধ্যে অযথা ব্যবধান। যীশুপ্রচারিত আদর্শ বা বাইবেল ও সাধারণ খ্রীষ্টানচরিত্রের মধ্যে অযথা ব্যবধান এই বিশেষত্বের দৃষ্টান্ত। তোমার জীবনসমাপ্ত যদি সম্পূর্ণরূপে তুমি নিজেই ভজন কর, তবে তোমার মধ্যে মত ও সাধনের এই অযথা ব্যবধান থাকে না। কিন্তু পাশ্চাত্যের স্বভাব এইরূপ ব্যবধানপ্রবণ, সেই জন্য পাশ্চাত্যে দার্শনিককে যে সাধক হইতে হইবে এমন কোনও কথা নাই।

আমাদের দেশে পাশ্চাত্যপ্রভাব সঞ্চারিত হইবার পূর্ব্বে ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম-সাধনার মধ্যে অযথা ব্যবধান ছিল না। কিন্তু সে ভাব বর্ত্তমানে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। মস্তিষ্কচালনায় শিক্ষিত ভারত-বাসীকে বর্ত্তমানযুগে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিতে হইয়াছে, সেই জন্য কেবল ধর্ম্মমতের পোষণেই একটা মস্ত সার্থকতা আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি। মতের সূক্ষ্মতা ও মতের পোষণ মেধাশক্তির লীলা। আমাদের ধর্ম্মজীবনে এই মেধাশক্তি অনেক পরিমাণে প্রত্যক্ষোপলব্ধির উচ্চাসন দখল করিয়া বসিয়াছে।

মেধাশক্তিরও যে একটা লীলাক্ষেত্র আছে, তাহা অস্বীকার করিতেছি না।

শাস্ত্রে তত্ত্বের অনুসন্ধান, সাহিত্যে বা বক্তৃতামঞ্চে তত্ত্বের অনুশীলন, এ সমস্তই মেধাশক্তির লীলাভুক্ত ব্যাপার। কিন্তু এই ক্ষেত্র হইতে মানুষ গড়িয়া উঠে না, দেশ জাগিয়া উঠে না। শ্রেষ্ঠ মতের আলোচনায় দেশ গড়িয়া উঠে না, শ্রেষ্ঠ জীবনের উদ্দীপনা চাই *। সেই শ্রেষ্ঠ জীবন আবার দেশের মাটি হইতে গড়িয়া উঠা চাই, দেশের সনাতন সাধন-প্রবাহের মন্থনে উদ্ভূত হওয়া চাই।

নিখুঁত মতের পোষণে বুদ্ধি বৃত্তির যে তৃপ্তি (intellectual satisfaction) দেশের শিক্ষিত লোকে সেই তৃপ্তির প্রতি অতিমাত্রায় অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কুফলও বেশ দেখা যাইতেছে। একদিকে দেখিতেছি মতপোষক নব্য ব্রহ্মবাদী প্রাচীন সাধকের প্রতীক ও প্রতিমা ভাঙ্গিয়া দিতে উদ্যতহস্ত, কারণ অরূপব্রহ্মের সাধনায় মূর্ত্তিপূজারূপ তথাকথিত সোপান তাহার মতে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। আর এক দিকে দেখিতেছি সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে নিখুঁত মতের পোষণ করিতে যাইয়া পরোক্ষ ধারণাদ্বারা অনেকের বুদ্ধিবৃত্তি সূক্ষ্ম ধর্ম্মতত্ত্বের সহিত যে সংযোগে সংযুক্ত হইয়াছে, সাধনার দ্বারা ব্যবহারিক জীবনের সহিত সেই ধর্ম্ম-তত্ত্বের সেরূপ সংযোগ স্থাপিত হইতেছে না। সেক্ষেত্রে বুদ্ধির দৌড় অনেক ঊর্দ্ধে, অথচ জীবন সংসারে আবদ্ধ, কিসের দ্বারা এই অবাস্তবতার, এই অক্ষমতার পূরণ করা যায়? আবার ধর্ম্মতত্ত্বসকল আশ্রয়হীন হইয়া অবস্থিত থাকিতে পারে না, সেই জন্য স্থূল জগতে যখন উহাদিগকে আমাদের মত মানুষে প্রত্যক্ষ ভাবে আশ্রিত হইতে দেখিতে পাই না, তখন একটা মস্ত অভাব থাকিয়া যায়। বুদ্ধিগত ধারণার অবাস্তবতা, সম্যক সাধনবিহীনতার অনাশ্বাস এবং সর্ব্বসিদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যক্ষীভূত মহাপুরুষের অদর্শন—এই ত্রিবিধ অভাব মোচন করিবার জন্য বুদ্ধি বৃত্তিই একটা নিগূঢ় রহস্য উদ্ভাবন করিয়াছে, ইহার নাম মহাত্মাসংযোগরহস্য। আমার বুদ্ধিতে যে অনন্যসাধারণ সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রকাশ হয়, তাহার কারণ আমার জীবনের সহিত অলক্ষ্যে সূক্ষ্মজগৎস্থিত মহাত্মাদের সাক্ষাৎ সংযোগ। এই সংযোগসূত্রের দ্বারা আমার এবং জগতের যাহা আবশ্যক, তাহা সেই মানব সমাজের একমাত্র অভিভাবক মহাত্মাদের নিকট হইতে আমি পাইব। আমাদের সনাতন ধর্ম্মের ঋষিরা নাকি সম্প্রতি এই মহাত্মাদের স্থান-ভাগী হইয়াছেন—ইত্যাদি ইত্যাদি।

---

* কোনও কোনও থিয়সফিষ্ট এ কথা স্বীকার করেন, সেই জন্য সম্প্রতি হিন্দুস্থানে সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের পরিবর্ত্তে শিক্ষানবীস্ এ্যালসিয়নের উপর তাঁহারা আশাসৌধ গড়িতেছেন।

বুদ্ধি কেবল মত পোষণ করিয়া পরমার্থতত্ত্ব দখল করিতে যাইলে, দখলে আসে—একটী অশ্বডিম্ব! ঐকান্তিক সাধনাপেক্ষায় বুদ্ধির দ্বারা মত পোষণ কর, তত্ত্বপ্রসঙ্গ কর, সে বুদ্ধি আঙ্গুল ফুলিয়া কলা গাছ হইবে না। কিন্তু কেবল মত পোষণের জন্য দলবদ্ধ হওয়াই যদি তোমার পেশা হইয়া দাঁড়ায়,তবে কঠোর সাধনায় জাতীয় গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে আজ যে ভারতবর্ষ বদ্ধপরিকর, সে যুক্তকরে বিধাতার কাছে প্রার্থনা করিতেছে "এমন বন্ধুত্ব হইতে হে ভগবান্ আমায় রক্ষা কর।"

বঙ্গসাহিত্যে ব্রহ্মবিদ্যার প্রসঙ্গ তুলিয়া "ব্রহ্মবিদ্যার" আবির্ভাব যে আজ ঘটিয়াছে, সেই উপলক্ষে এই সমস্ত সাবধানতা-সতর্কতার কথা শুধু আমরাই উত্থাপন করিতেছি না, "ব্রহ্মবিদ্যায়" ব্রহ্মবিদ্যাশীর্ষক প্রবন্ধে একজন প্রবীণ লেখকও এইরূপ কথা বলিয়াছেন। বাস্তবিকই এ সমস্ত ভাবিবার কথা, কারণ হেমেন্দ্র বাবুর ভাষায় বলিতে হয়—"যদি মনে করি যে এক শরে ব্রহ্ম ও সংসার উভয়কেই বিদ্ধ করিব, তবে আমাদিগের ন্যায় মোহাচ্ছন্ন আর কে আছে? সেই জন্যই মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন—Ye cannot serve God and Mammon"

ব্রহ্মবিদ্যার প্রসঙ্গ উপাদেয় ও চিত্তশুদ্ধিকর সন্দেহ নাই, সেই জন্য বলিয়াছি, "ব্রহ্মবিদ্যা" পত্রিকার উপর আমরা অনেক আশা রাখি। কিন্তু ভারতবর্ষ আজ কি চায়? হেমেন্দ্র বাবু "ব্রহ্মবিদ্যায়" দেশের সেই কাতর প্রার্থনায় ভাষাসংযোগ করিয়াছেন—

"কে এমন সাবধান গুরু আছেন, যিনি আমাদিগকে সেই অমৃতের সন্ধান বলিয়া দিবেন? কে এমন ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসিত আছেন, যিনি তৃষিতা হরিণীর ন্যায় সেই অশেষলতাগুল্মপত্রাচ্ছাদিত অমৃত-উৎসের উদ্দেশে ঊর্দ্ধগ্রীব হইয়া, এই সংসার অরণ্যে ধাবিত হইবেন? শাক্যসিংহের ন্যায় কে এমন বীর সাধক আছেন, যিনি ব্রহ্মবিদ্যা সাধন করিয়া, ভারতের মৃত কঙ্কালের মধ্যে নবজীবনের তাড়িত প্রবাহ ছুটাইয়া দিবেন? হায়! হায়! কবে ব্রহ্মনামের গুণে মৃত ভারত মৃত্যুঞ্জয় হইবে,—অমৃতরূপ ব্রহ্মবিদ্যার গুণে পুনরায় জাগিয়া উঠিবে! হে ব্রহ্মবাদি! তুমি কি সেই মৃতসঞ্জীবনী ব্রহ্মবিদ্যা জান?"

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বারাণসী।

রামকৃষ্ণ মিশন কাশীর সেবাশ্রমের জন্য নিম্নলিখিত চাঁদার প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছেন :—

১। ফরিদপুর জেলাস্থ কোয়ারপুরনিবাসিনী শ্রীমতী মুক্তাকেশী গুপ্তা তাঁহার স্বামী ৺দ্বারকা নাথ রায়ের স্মৃতিরক্ষার্থে দুই হাজার টাকা (২০০০৲) সেবাশ্রমে দান করিয়াছেন। এই টাকার সুদ হইতে একজন রোগীর ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে।

২। পানিহাটীর পরলোকগত শ্রীযুক্ত রাধিকা নাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ তৎসহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বসন্ত কুমারী দেবী একটী ভাণ্ডার গৃহ নির্ম্মাণার্থ ৬৫০ টাকা সেবাশ্রমে দান করিয়াছেন এবং চিকিৎসাশাস্ত্রীয় শস্ত্রাদি ক্রয়ার্থ ৩৫০ টাকা দিয়াছেন।

৩। কলিকাতার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহোদয় চিকিৎসা-শাস্ত্রীয় শস্ত্রাদি ক্রয়ার্থ সেবাশ্রমে ১০০ টাকা দান করিয়াছেন।

৪। ২৪ পরগণাস্থ বারুইপুর নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস চৌধুরী মহাশয় শ্রীমতী মুক্তাকেশী ও শ্রীযুক্ত তুলসীদাসের স্মৃতিরক্ষার্থ সেবাশ্রমভুক্ত আতুরাশ্রমে একখানি গৃহনির্ম্মাণব্যয়স্বরূপ [illegible] টাকা দান করিয়াছেন।

৫। বীরভূম জেলাস্থ [illegible] শ্রীমতী কাদম্বিনী দেবী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাখাল [illegible] বত্ন মহাশয়ের মারফত সেবাশ্রমে ১২০ টাকা দান করিয়াছেন।

৬। ৺বামাসুন্দরী দেবীর স্মৃতিরক্ষার্থ শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাগবাজার, কলিকাতা, সেবাশ্রমে ১০০ টাকা দান করিয়াছেন।

সংবাদ

বিগত ৫ই এপ্রিল, ১৯১২, বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণমিশনের তৃতীয় বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মিশনের প্রেসিডেণ্ট এবং সহকারী প্রেসিডেণ্ট উভয়েই অনুপস্থিত থাকায়, পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মিশনের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ মহারাজ অতঃপর মিশনের বাৎসরিক কার্য্যবিবরণ সভায় উপস্থাপিত করেন। সাময়িক সদনুষ্ঠানগুলির মধ্যে তিনি গঙ্গাসাগরযাত্রীদের সেবাশুশ্রূষাদির জন্য সেবক

প্রেরণ ও ভাগলপুরে প্লেগরিলিফ কার্য্যের কথা উল্লেখ করেন এবং মিশনের অঙ্গীভূত কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটীর উদ্যোগে সিষ্টার নিবেদিতার স্মৃতিরক্ষার্থ যে সভা আহূত ও অর্থভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে, তাহার কথাও উল্লেখ করেন। স্থায়ী সদনুষ্ঠানগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণও দেওয়া হইয়াছিল, অর্থাৎ কাশী, কনখল, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, মান্দ্রাজ, প্রভৃতি ভারতীয় সেবা ও প্রচার কেন্দ্র এবং মার্কিনদেশীয় কেন্দ্রাদির সংবাদ সভায় জ্ঞাপিত হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে নানাস্থানের আয় ব্যয়ের হিসাবও সভায় উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। পরে নানাস্থানের জন্য হিসাব পরিদর্শক ও চার জন্য নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইলে, বিগত বৎসরের মধ্যে মিশন যে সমস্ত সভ্য ও বন্ধুদিগকে হারাইয়াছেন, তাহাদের প্রসঙ্গ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ উত্থাপন করেন। তৎপরে কর্ম্মযোগ ও সেবাতত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা হইলে ও প্রসাদ বিতরণ হইলে সভাভঙ্গ হয়।

গতবৎসর (১৩১৮) শীতকালে ভাগলপুরে প্লেগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের উদ্যোগে সহরের কতিপয় ভদ্রমহোদয় ঐ দারুণ মহামারির সহিত যথাসাধ্য যুঝিবার জন্য একটা সমিতি স্থাপন করেন এবং রামকৃষ্ণমিশনের সাহায্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর দুইবার প্লেগনিবারণ কার্য্যে আশানুরূপ কৃতকার্য্যতা লাভ করায় এবৎসরও উক্ত সমিতি মিশন হইতে সেবক চাহিয়া পাঠান। গতবারের প্লেগনিবারণকার্য্যে অভিজ্ঞ স্বামী শঙ্করানন্দ, চারিটী সেবকের সহিত বিগত ৭ই মার্চ্চ ভাগলপুরে, উপস্থিত হন এবং সহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে উহাদিগের ঘরবাড়ীরাস্তা পরিষ্কার, রোগীর চিকিৎসার তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া ফিরিয়া আসেন। মার্চ্চ মাসের শেষাশেষি দেখা যায় সে নবস্থাপিত প্লেগ-হাঁসপাতালে সেবক শুশ্রূষাকারীর বিশেষ আবশ্যক। অগত্যা ব্রহ্মচারী সুষেণ কুমারকে হাঁসপাতালের কাজ গ্রহণ করিতে হয়। পারফেক্ট নামক পাদরী সাহেবের উদ্যোগে ঐ হাঁসপাতালটী খোলা হয়। তিনি ব্রহ্মচারী সুষেণের সহায়তায় রোগীর সেবাশুশ্রূষা কার্য্যে আশ্চর্য্য সফলতা লাভ করেন। এইরূপে ক্রমশঃ প্লেগ উপশমিত হইয়া আসিলে, গত ১৬ই এপ্রেল তারিখে কার্য্য বন্ধ করা হয় এবং ১৯শে তারিখে প্লেগনিবারণ সমিতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক সেবকদিগকে বিদায় দেন। বিধাতার কৃপায় এবারেও ভাগলপুরের কার্য্যে বিশেষ সফলতা লাভ করা গিয়াছে।

হুগলী জেলার অন্তর্গত তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী দ্বারহাট্টা গ্রামে একটী রামকৃষ্ণ দরিদ্র ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার প্রথম বর্ষের কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য নিঃসম্বল, অসহায় ব্যক্তির জীবিকানির্ব্বাহার্থ অর্থসাহায্য করা, অর্থাভাবে বিদ্যার্জ্জনে অক্ষম বালকদিগকে সাহায্য করা ও উপস্থিত পরহিতে সাধ্যমত চেষ্টা করা। সমিতির আয়ের পথ তিনটী—পয়সা ও চাউল ভিক্ষা, সাময়িক বা মাসিক দান এবং গ্রামভাটী প্রভৃতি। ভাণ্ডারের একটী কার্য্যকরী সভা আছে,—সভাপতি শ্রীমৎস্বামী শুদ্ধানন্দ, সহকারী সভাপতি জমীদার শ্রীযুত পরিতোষ সিংহ রায় এবং সম্পাদক শ্রীযুত হরিদাস সিংহ রায়। ১২টী সেবাব্রতী যুবকের দ্বারা ভাণ্ডারের কার্য্য সম্পন্ন হয়। শ্রীরামপুর মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট জেমিসন সাহেব এই ভাণ্ডারটী পরিদর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করেন এবং আরমবাগ মহাকুমার মুন্সেফ শ্রীযুত চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয় উৎসাহ সহকারে ভাণ্ডারের গত বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য দ্বারহাটা ও তৎসমীপবর্ত্তী আরও কয়েকটী গ্রাম দরিদ্র ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা হওয়ায় বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছে। এইরূপ জেলার স্থানে স্থানে সেবা কেন্দ্র স্থাপিত হইলে, দেশের লোককে প্রকৃত দেশের কাজে নিযুক্ত করা হইবে এবং প্রকৃতভাবে দেশ জাগিবে। দেশের কায়িক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অভাবমোচনরূপ লোকসেবাকার্য্যে প্রণোদিত হইয়া ৮।১০টী গ্রামের কেন্দ্রস্থলে সেবাশ্রম স্থাপনা করা ও দেশের লোককে সেবা-ব্রতে যথাসম্ভব ব্রতী করাই নবজীবনলাভে আমাদের পক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ প্রদর্শিত অন্যতম পন্থা।

বিগত ২৫শে চৈত্র, ৭ই এপ্রেল, ইটালীর রামকৃষ্ণ মিশন বিশেষ সমারোহে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। স্থানীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা পরমভক্ত দেবেন্দ্র বাবুর দারুণ অভাবেও ইঁহাদের নিষ্ঠা ও আয়োজন অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, ইহা উৎসাহপ্রদ সন্দেহ নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—উদ্বোধনের বৈশাখ-সংখ্যায় প্রকাশিত "নিবেদিতা" শীর্ষক প্রবন্ধটী সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। বিক্রয়লভ্য অর্থ প্রণেত্রী শ্রীমতী সরলাবালা দাসী: সিষ্টার নিবেদিতার বিদ্যালয়ে দান করিতেছেন। মূল্য ॥০ আট আনা; প্রাপ্তিস্থান, উদ্বোধন অফিস।

REGISTERED No. C 295.

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"।

সূচী।

কলিকাতা।

উদ্বোধন আফিস—১২, ১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন, বাগবাজার।

মাসিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য, সডাক ২৲ দুই টাকা।

প্রতি সংখ্যা ।০ আনা।

১৪শ বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা। আষাঢ়, ১৩১৯ সাল।

৬। গ্রাহকগণ ভি, পি, ফেরৎ দিলে, অথবা আমাদের অজ্ঞাতসারে ঠিকানা পরিবর্ত্তন-জন্য উহা ফেরৎ আসিলে, জমা টাকা হইতে খরচ বাদ যাইবে এবং পুনরায় পত্র না পাওয়া পর্য্যন্ত পুস্তক পাঠান বন্ধ থাকিবে।

৭। পুস্তক বেশী ছাপা হইতেছে না; সত্বর গ্রাহক হউন, নচেৎ সুযোগ হারাইবেন।

ওঁ

ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা

এবং

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা

চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ মূল্য ৮॥৹

ইহারই তৃতীয় খণ্ডে বেদান্ত দর্শনের

অনুবাদ সহ দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত নিম্বার্কভাষ্য আছে।

শ্রীযুক্ত তারাকিশোর শর্ম্মা চৌধুরী এম এ, বি. এল, দ্বারা

অনূদিত ও সম্পাদিত।

ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা　…　…

ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে—

১। ভূমিকা ২। উদ্বোধন ৩। বৈদিক ব্রহ্মবিদ্যা ৪। দর্শনাধিকার নির্ণয় ৫। উপসংহার।

প্রথম খণ্ড—দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা　…　…　২৲

ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে—

১। বৈশেষিক দর্শন ২। ন্যায় দর্শন ৩। গৌতম সূত্র ৪। পূর্ব্ব মীমাংসা ৫। সাংখ্যদর্শন ৬। সাংখ্যদর্শনের শিক্ষা ৭। তত্ত্ব সমাস ৮। সাংখ্য কারিকা।

দ্বিতীয় খণ্ড—দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা　১॥৹

ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে—

১। পাতঞ্জল দর্শন ২। উপসংহার।

তৃতীয় খণ্ড—দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা　…　৩৲

ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে—

১। বেদান্ত দর্শন ২। উপসংহার।

এরূপ ষড়্দর্শনের সুন্দর সংস্করণ আর হয় নাই। ইহার অন্তর্গত বেদান্ত-দর্শনে শঙ্কর-মতের সহিত এই মতের সম্যক্ তুলনা করা হইয়াছে।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়-
সম্পাদিত সটীক ও সানুবাদ।

গীতা	...	।৵০
চণ্ডী	...	।৵০
বৃহৎ স্তব কবচ মালা	...	১
শ্রীগীতগোবিন্দ (উৎকৃষ্ট বাঁধা)	...	৸০
ঐ (কাগজের মলাটে)	...	॥৵০

জ্যোতিঃপথ শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ॥০

শ্রীমদ্ যজ্ঞেশ্বর সংযোগী ব্রহ্মচারী প্রণীত।

সাধনা বা ঈশ্বরদর্শনোপায় ৸০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তান লয় সংযুক্ত বাঙ্গালা সঙ্গীতানুবাদ

গীতালহরী শ্রীযোগেন্দ্রলাল চৌধুরী প্রণীত ৸০

৺রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই মহোদয় দ্বারা অনূদিত ও সম্পাদিত

ঋগ্বেদ (বঙ্গানুবাদ) ৫

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী কর্তৃক অনূদিত ... ৩

শতপথ ব্রাহ্মণ ১ম খণ্ড ৩

সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (টীকাদি সহিত) ৫

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল,
বেদান্ত-রত্ন-প্রণীত।

উপনিষদ্ (ব্রহ্মতত্ত্ব)	...	১।০
গীতায় ঈশ্বরবাদ	...	১।০
উপনিষদ্ (জীবতত্ত্ব) যন্ত্রস্থ	...	

প্রসূনমালিকা গ্রন্থাবলী সমগ্র। মূল্য

১। জীবন ও মরণান্তে জীবন। মূল্য ৵০, শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য এম. এ, বি. এল প্রণীত। মৃত্যুর পর জীবের অবস্থার কথা।

২। ধর্ম্মজীবন ও ভক্তি। মূল্য ৶০, শ্রীমতী এনিবেসেণ্টের Devotion of Spiritual Life এর অনুবাদ।

৩। সদ্‌গুরু ও শিষ্য মূল্য ৵০ আনা।

৪। প্রকৃতদীক্ষা মূল্য ৵০ এই মহৎ তত্ত্ব অনেকেই জানেন না, দীক্ষা ভিন্ন মানব মনের প্রসার হয় না, গ্রন্থে এই সম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে।

৫। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা ।৵০, শ্রীমতী এনিবেসেণ্টের Reality of the unseen প্রবন্ধের অনুবাদ।

৬। আত্মোন্নয়ন ৵০। কি প্রকারে মনুষ্যত্ব লাভ হয়, এই পুস্তিকার তাহাই আলোচ্য বিষয়।

শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—

পদ্মিনী ... ... ॥০

গুলবাহার ... ৵০

সপ্তপর্ণী ... ... ।৵০

বঙ্গসাহিত্যের এক পৃষ্ঠা ... ।৵০

রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব ... ।০

শ্রীহরিচরণ রায় এম. এ, প্রণীত

সনাতন ধর্ম্ম বা তত্ত্বজ্ঞান সমিতি ।৵০

ইহাতে হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান সমিতির মতামত ও কয়েকটি প্রশ্ন আছে।

শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার প্রণীত—

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ... ৸০

চাতুর্ব্বর্ণ্য সম্বন্ধে শাস্ত্রসম্মত উপদেশ পূর্ণ পুস্তক

শ্রীসতীশচন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত

বিনা ঔষধে কেবল পথ্য ও নিয়মদ্বারা রোগ মুক্ত হইবার উপায়।

রোগীর প্রতি উপদেশ ... ॥০

শ্রীমতী নির্ম্মলা বালা চৌধুরী প্রণীত

সতীশতক ... ১৲

ইহাতে আদর্শ সতী মহিলাদিগের জীবনী আছে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দাস কবিরাজ প্রণীত

জ্ঞানগর্ভ ... ১৲

নামেই প্রমাণ হয় ইহা জ্ঞানের আকর

রায় সাহেব শ্রীদুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী Retired Engineer প্রণীত

স্থপতি-বিজ্ঞান ... ॥০

পাকা ঘরবাড়ী তৈয়ারী করিতে হইলে ইহা একান্ত প্রয়োজনীয়, ইহা বিশেষ রূপে পাঠ করিলে বিশেষ কার্য্যদক্ষ হওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দাস প্রণীত

রামকৃষ্ণ মদিরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ১৲

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

সচ্চিদানন্দ গীতা ... ।০

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

কাশীর সেণ্ট্রাল হিন্দুকলেজে প্রকাশিত।

সনাতনধর্ম্ম প্রশ্নোত্তরী ... ৴০

বালক বালিকাদের ধর্ম্ম শিক্ষার উৎকৃষ্ট পুস্তিকা

শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবত রত্ন বি. এ, প্রণীত

নবযুগের সাধনা ॥০

বর্ত্তমান সময়ে সাধক জগতে যাহা সমস্যা তাহার মীমাংসা এই গ্রন্থে পাইবেন।

২৮।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মেট্‌কাফ প্রেস, ৭৯ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

(স্বামী সারদানন্দ।)

কালীবাটীতে পূজকের পদগ্রহণ।

রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরে কালীবাটী প্রতিষ্ঠা করা সম্বন্ধে ঠাকুর স্বয়ং আমাদিগকে অনেক সময়ে অনেক কথা বলিতেন। বলিতেন—রাণী কাশী-ধামে যাইবার জন্য সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন; যাত্রার দিন স্থির করিয়া এক শত খানা কিস্তি নৌকা ধন রত্ন ও বিবিধ দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ করিয়া ঘাটে বাঁধাইয়া রাখিয়াছিলেন; যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্ব্ব রাত্রে স্বপ্নে ৺দেবীর নিকট হইতে প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াই ঐ সংকল্প পরিত্যাগ করেন এবং ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠার জন্য যথাযোগ্য স্থানের অনুসন্ধানে নিযুক্তা হন।

বলিতেন—রাণী প্রথমে, 'গঙ্গার পশ্চিম কুল, বারাণসী সমতুল'—এই ধারণার বশবর্ত্তিনী হইয়া ভাগীরথীর পশ্চিমকুলে বালি, উত্তরপাড়া প্রভৃতি গ্রামে স্থানান্বেষণ করিয়া বিফলমনোরথ হয়েন; * কারণ ঐ কুলের 'দশ আনি' 'ছয় আনি' খ্যাত প্রসিদ্ধ জমিদারেরা, রাণী প্রভূত অর্থ দানে স্বীকৃতা হইলেও নাকি বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকৃত স্থানের কোথায়ও তাঁহারা অপরের ব্যয়ে নির্ম্মিত ঘাট দিয়া গঙ্গায় অবতরণ করিবেন না! রাণী বাধ্য হইয়াই পরি-শেষে ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে এই স্থানটি ক্রয় করেন।

বলিতেন—রাণী দক্ষিণেশ্বরে যে স্থানটি মনোনীত করিলেন উহার কিয়-দংশ এক সাহেবের ছিল, এবং অপরাংশে মুসলমানদিগের কবরডাঙ্গা ও গাজি সাহেব পীরের স্থান ছিল; স্থানটির কূর্ম্মপৃষ্ঠের মত আকার ছিল; ঐরূপ কূর্ম্মপৃষ্ঠাকৃতি শ্মশানই শক্তিপ্রতিষ্ঠা ও সাধনার জন্য বিশেষ প্রশস্ত বলিয়া তন্ত্র-নির্দ্দিষ্ট; অতএব দৈবাধীন হইয়াই রাণী যেন ঐ স্থানটি মনোনীত করেন।

আবার শক্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য নির্দ্দিষ্ট অন্যান্য বিশেষ প্রশস্ত দিবসে উহা না করিয়া স্নানযাত্রার দিনে বিষ্ণুপর্ব্বকালে রাণী শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতিষ্ঠা কেন করিয়া-ছিলেন তদ্বিষয়ে কথা উত্থাপন করিয়া ঠাকুর কখন কখন আমাদিগকে বলি-তেন—দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণারম্ভের দিবস হইতে রাণী যথাশাস্ত্র কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্ন ভোজন, মাটিতে শয়ন ও যথাশক্তি জপ পূজাদি করিয়াছিলেন; পরে মন্দির ও দেবীমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইলে প্রতিষ্ঠার জন্য ধীরে সুস্থে ঐরূপ বিশেষ প্রশস্ত দিবসের নির্দ্ধারণ হইতেছিল এবং মূর্ত্তিটি ভগ্ন হইবার আশঙ্কায় বাক্সবন্দি করিয়া রাখা হইয়াছিল; এমন সময়ে যে কোন কারণেই হউক ঐ মূর্ত্তি ঘামিয়া উঠে এবং রাণীকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ হয়—'আমাকে আর কতদিন এই ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিবি?

---

* বালি, উত্তরপাড়া প্রভৃতি গ্রামের প্রাচীন লোকেরা এখনও একথা সত্য বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন।

আমার যে এরূপে থাকিতে কষ্ট হইতেছে, যত শীঘ্র পারিস্ আমাকে স্বপ্রতিষ্ঠিতা কর্!'—ঐরূপ প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াই রাণী দেব-প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত হইয়া দিন দেখাইতে থাকেন এবং স্নানযাত্রার পূর্ণিমার অগ্রে অন্য কোন প্রশস্ত দিন না পাইয়া ঐ দিনেই ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে সঙ্কল্প স্থির করেন।

তদ্ভিন্ন দেবীকে অন্নভোগ দিতে পারিবেন বলিয়া নিজ গুরুর নামে রাণীর উক্ত ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি পূর্ব্বপ্রবন্ধে লিখিত প্রায় সকল বিষয়ই আমরা ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছিলাম। কেবল ঐরূপে ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠার জন্য রাণীকে রামকুমারের ব্যবস্থা দানের কথা ও ঠাকুরকে বুঝাইবার জন্য রামকুমারের ধর্ম্মপত্রানুষ্ঠানের কথা, এই দুইটি আমরা ঠাকুরের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত হৃদয় ও তৎকনিষ্ঠ রাজারাম মুখোপাধ্যায়ের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি।

আবার মন্দিরসংক্রান্ত দলিল পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, রাণী ঠাকুরবাটী নির্ম্মাণের জন্য ঐ স্থানটি সন ১২৫৪ সালে অথবা ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসের ৬ তারিখে ক্রয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দিনাজপুর বিভাগের (২,২৬০০০) দুই লক্ষ ছাব্বিশ সহস্র টাকা মূল্যের জমিদারী মহলের সহিত উক্ত ঠাকুরবাটী সন ১২৬৮ সালে অথবা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসের ২৭ তারিখে দেবোত্তর সম্পত্তি রূপে রেজেষ্টারি করিয়া দিয়াছিলেন। মন্দির সংক্রান্ত দেবোত্তরের লেখাপড়ার কাজ ঐরূপে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে পরিসমাপ্ত হওয়ায় কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন সন ১২৬০-৬১ সালে অথবা ১৮৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দে দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঠাকুরের জীবনের অন্যান্য ঘটনার সহিত মিলাইয়া আমরা ঐ কথার অনুমোদন করিতে পারিলাম না। আইন আদালত সংক্রান্ত কাজকর্ম্ম নিষ্পত্তি হইতে যে কত বিলম্ব হয় তাহা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝেন। অতএব সন ১২৬২ সালে দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া উহার লেখা পড়া ১২৬৮ সালে অথবা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সম্পন্ন হওয়াই আমরা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলাম। হৃদয় ও মন্দিরের অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের নিকটেও আমরা ঐরূপ শুনিয়াছি।

সে যাহা হউক, মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছুকাল পরেই ঠাকুরের সৌম্য দর্শন, কোমল প্রকৃতি, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও অল্প বয়স রাণী রাসমণির জামাতা মথুর বাবুর নয়নাকর্ষণ করিয়াছিল। রামকুমার ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ সহোদর বলিয়া পরিচয় পাইয়া তিনি ঠাকুরকেও তাঁহার অগ্রজের ন্যায় দেবালয়ে কোন একটি কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত করিয়া রাখিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছিলেন। মথুর বাবুর মন কেন যে ঠাকুরের প্রতি ঐরূপে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! তবে দেখিতে পাওয়া যায়, জীবনে যাহাদিগের সহিত বহুকালব্যাপী বিশেষ নিগূঢ় একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে তাহাদিগের প্রথম দর্শনমাত্রেই মানবহৃদয়ে কেমন একটা প্রবল প্রীতির আকর্ষণ অকস্মাৎ আসিয়া উপস্থিত হয়। শাস্ত্র বলেন উহা উভয় পক্ষের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মগত সম্বন্ধের সংস্কার হইতে উদিত হইয়া থাকে। যাহাই হউক, ঐরূপ কিন্তু সত্য সত্যই হয়। অতএব ঠাকুরকে দেখিয়াই মথুর বাবুর মনে

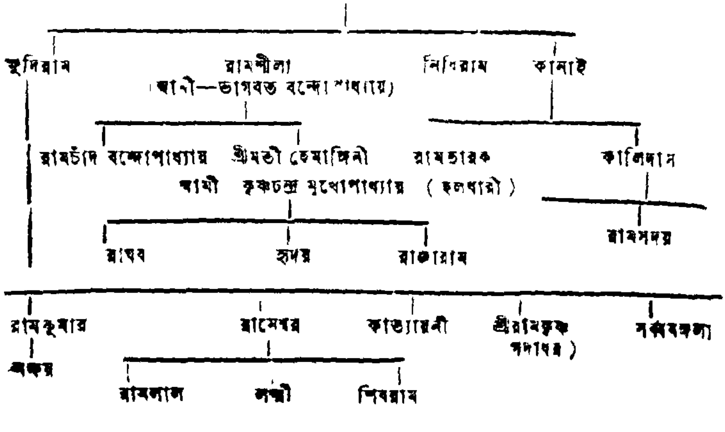
এখন যে ঐরূপ একটা অনির্দ্দিষ্ট আকর্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল, ইহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি।

দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে এক মাস কাল পর্য্যন্ত ঠাকুর কিংকর্ত্তব্য-অনিশ্চয় ভাবে দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়াছিলেন। মথুর বাবু ইতিমধ্যে তাঁহাকে দেবীর বেশকারীর কার্য্যে নিযুক্ত করিবার সংকল্প মনে মনে স্থির করিয়া রামকুমার ভট্টাচার্য্যের নিকট ঐ বিষয়ক প্রসঙ্গও উত্থাপিত করিয়াছিলেন। রামকুমারও তাহাতে ভ্রাতার মানসিক অবস্থার কথা তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সরলভাবে বলিয়া উহার সিদ্ধিসংকল্পে তাঁহাকে নিরুৎসাহিত করেন। কিন্তু নিজ মনোগত সংকল্পে বাধা পাইলেও মথুর সহজে নিরস্ত হইবার পাত্র ছিলেন না। ঐরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়াও তিনি ঐ সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে অবসরানুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংযুক্ত আর এক ব্যক্তি এখন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুরের পিতৃষ্বস্রীয়া ভগিনী* শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর পুত্র শ্রীহৃদয় নাথ মুখোপাধ্যায় এই সময়ে কোনরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার আশায় বর্দ্ধমান সহরে আসিয়া উপস্থিত হয়। হৃদয়ের বয়স তখন ষোল বৎসর হইবে। যুবক ঐ স্থানে নিজগ্রামস্থ পরিচিত ব্যক্তিদিগের নিকটে কিছুকাল থাকিয়া নিজ সংকল্পসিদ্ধির কোনরূপ সুবিধা করিতে

---

* পাঠকের সুবিধার জন্য আমরা ঠাকুরের বংশতালিকা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, এখানে প্রদান করিতেছি—



পারিতেছিল না, এমন সময়ে লোক মুখে সংবাদ পাইল তাহার মাতুলেরা রাণী রাসমনির নব দেবালয়ে সসম্মানে অবস্থান করিতেছেন, সেখানে উপস্থিত হইতে পারিলে নিজ অভিপ্রায়সিদ্ধির বিশেষ সুযোগ আছে। শুনিয়াই, কাল বিলম্ব না করিয়া হৃদয় দক্ষিণেশ্বর-দেবালয়ে উপস্থিত হইল এবং বাল্যকাল হইতে সুপরিচিত, প্রায় সমবয়স্ক মাতুল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত মিলিত হইয়া তথায় সানন্দে কালযাপন করিতে লাগিল।

হৃদয় দীর্ঘাকৃতি এবং দেখিতে সুশ্রী সুপুরুষ ছিল। তাহার শরীর যেমন সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ ছিল, মনও তদ্রূপ উদ্যমশীল ও ভয়শূন্য ছিল। কঠোর পরিশ্রম ও অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে—প্রতিকূলাবস্থায় পড়িয়া স্থির থাকিয়া অদ্ভুত উপায় সকলের উদ্ভাবন করিয়া উহা অতিক্রম করিতে, হৃদয় পারদর্শী ছিল। তদুপরি নিজ কনিষ্ঠ মাতুলকে হৃদয় সত্য সত্যই ভালবাসিত এবং তাঁহাকে সুখী করিতে অশেষ শারীরিক কষ্টস্বীকারেও কুণ্ঠিত হইত না। হৃদয় সর্ব্বদা অনলস ছিল, কিন্তু তাহার অন্তরে ভাবুকতার বিন্দুবিসর্গও ছিল না; একজন কর্ম্মী সংসারী মানবের যেমন হইয়া থাকে, হৃদয়ের চিত্ত নিজ স্বার্থচেষ্টা হইতে কখনও সম্পূর্ণ বিযুক্ত হইতে পারিত না। ঠাকুরের সহিত হৃদয়ের এখন হইতে সম্বন্ধের কথার আমরা যতই আলোচনা করিব ততই দেখিতে পাইব, হৃদয়ের জীবনে ভবিষ্যতে যতটুকু ভাবুকতা ও নিঃস্বার্থচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা ভাবময় ঠাকুরের নিরন্তর সঙ্গগুণে ও কখন কখন তাঁহার চেষ্টার অনুকরণেই আসিয়া উপস্থিত হইত। আহার বিহার প্রভৃতি সর্ব্ববিধ শারীর চেষ্টায় উদাসীন, সর্ব্বদা চিন্তাশীল, স্বার্থগন্ধশূন্য ভাবুক জীবনের সফলতার জন্য ঐরূপ একজন স্বাধীনচিন্তাপরাঙ্মুখ শ্রদ্ধাসম্পন্ন বুদ্ধিমান হুঁসিয়ার কর্ম্মীর সহায়তা নিতান্ত প্রয়োজন। শ্রীশ্রীজগদম্বা কি সেইজন্য ঠাকুরের সাধনকালে হৃদয়ের ন্যায় পুরুষকে ঠাকুরের সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিয়াছিলেন?—কে বলিবে। তবে একথা সত্য, হৃদয় না থাকিলে সাধনকালে ঠাকুরের শরীর রক্ষা নিশ্চয়ই অসম্ভব হইত, শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের সহিত হৃদয়ের নাম তজ্জন্য নিত্যসংযুক্ত হইয়াছে এবং চিরকাল হৃদয় আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধার অধিকারী হইয়া আমাদিগের প্রণম্য হইয়া রহিয়াছেন।

হৃদয়ের দক্ষিণেশ্বরে আসিবার কালে ঠাকুর সপ্তদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া অষ্টাদশে কয়েক মাস মাত্র পদার্পণ করিয়াছেন। হৃদয়কে সহচররূপে পাইয়া ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে বাস যে, এখন হইতে অনেকটা সহজ হইয়াছিল একথা

আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। ঠাকুর তাহাকে লইয়া একত্রে স্নান, ভ্রমণ, শয়ন, উপবেশনাদি সকল কার্য্য করিতে লাগিলেন। আবার চিরকাল বালক-ভাবাপন্ন শ্রীরামকৃষ্ণের, সাধারণনয়নে নিষ্কারণ, চেষ্টা সকলের প্রতিবাদ না করিয়া সর্ব্বদা অন্তরের সহিত অনুমোদন ও সহানুভূতি করায়, হৃদয় এখন হইতে ঠাকুরের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিল।

হৃদয় আমাদিগকে নিজমুখে কতবার বলিয়াছেন—'এই সময় হইতেই ঠাকুরের প্রতি আমি কি একটা অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণ অনুভব করিতাম ও ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। তাঁহাকে ছাড়িয়া একদণ্ড কোথাও থাকিতে হইলে কষ্ট বোধ হইত। শয়ন ভ্রমণ উপবেশনাদি সকল কাজ একত্রে করিতাম। কেবল মধ্যাহ্নে ভোজনকালে কিছুক্ষণের জন্য আমাদিগকে পৃথক্ হইতে হইত। কারণ, ঠাকুর সিধা লইয়া পঞ্চবটীতে স্বহস্তে পাক করিয়া খাইতেন এবং আমি ঠাকুর বাড়ীতে প্রসাদ পাইতাম। তবে ঠাকুরের রন্ধনাদির জন্য সমস্ত জোগাড় করিয়া দিয়া যাইতাম। ঐরূপে রন্ধন করিয়া খাইয়াও তিনি মনে শান্তি পাইতেন না—আহার সম্বন্ধে নিষ্ঠা তাঁহার তখন এত প্রবল ছিল। মধ্যাহ্নে ঐরূপে রন্ধন করিলেও রাত্রে কিন্তু ঠাকুর আমাদিগের ন্যায় শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নিবেদিত প্রসাদী লুচিই খাইতেন। কতদিন দেখিয়াছি ঐরূপে লুচি খাইতে খাইতে তাঁহার চক্ষে জল আসিয়াছে এবং আক্ষেপ করিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে বলিয়াছেন, "মা, আমাকে কৈবর্ত্তের অন্নটা খাওয়ালি!"—এই সময়ের কথা বলিবার সময় ঠাকুরের নিজমুখেও আমরা ঐরূপ আক্ষেপের কথা শুনিয়াছি, এবং শুনিয়াছি, 'কৈবর্ত্তের অন্ন খাইতে হবে বলিয়া তখন গরিব কাঙ্গালেরাও অনেকে রাসমণির ঠাকুর বাড়ীতে খাইতে আসিত না। খাইবার লোক জুটিত না বলিয়া তখন কতদিন প্রসাদী অন্ন কতক গরুকে খাওয়াইতে এবং কতক গঙ্গায় ফেলিয়া দিতে হইয়াছে!' তবে ঐরূপে রন্ধন করিয়া ঠাকুরকে বহুদিন যে খাইতে হয় নাই, একথাও আমরা হৃদয় ও ঠাকুর উভয়ের মুখেই শুনিয়াছি। ঐ কথা শুনিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে যে, কালীবাটীতে পূজকের পদে ঠাকুর যতদিন না ব্রতী হইয়াছিলেন ততদিনই ঐরূপ করিয়াছিলেন—এবং ঠাকুরের পূজকপদে ব্রতী হওয়া উক্ত দেবালয়প্রতিষ্ঠার দুই তিনমাস পরেই হইয়াছিল।

ঠাকুর যে তাহাকে বিশেষ ভালবাসেন একথা হৃদয় বুঝিত। ঠাকুরের সম্বন্ধে একটী কথা কেবল সে কিছুতেই বুঝিতে পারিত না। উহা এই—

হৃদয় জ্যেষ্ঠ মাতুল রামকুমারকে যখন কোন বিষয়ে সহায়তা করিতে যাইত, মধ্যাহ্নে আহারাদির পর যখন একটু শয়ন করিত, অথবা সায়াহ্নে যখন সে মন্দিরে আরাত্রিক দর্শন করিত, তখন ঠাকুর তাহাকে ফেলিয়া পাশ কাটাইয়া কিছুক্ষণের জন্য কোথায় অন্তর্দ্ধান হইতেন। হৃদয় অনেক খুঁজিয়াও তখন তাঁহার সন্ধান পাইত না। পরে দুই এক ঘণ্টা গত হইলে আবার ঠাকুর ফিরিতেন। জিজ্ঞাসা করিলে স্পষ্ট কিছু বলিতেন না, বলিতেন 'এই এইখানেই ছিলাম।' ঐরূপ সময়ে কোন কোন দিন সন্ধান করিতে যাইয়া হৃদয় দেখিত ঠাকুর পুষ্করটীর দিক হইতে ফিরিতেছেন। দেখিয়া সে ভাবিত তিনি শৌচাদির জন্য ঐদিকে গিয়াছিলেন এবং আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিত না।

হৃদয় বলেন এই সময়ে একদিন মূর্ত্তিগঠন করিয়া ঠাকুরের শিবপূজা করিতে ইচ্ছা হয়। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, বাল্যকালে কামারপুকুরে ঠাকুর কখন কখন ঐরূপ করিতেন। ঐরূপ ইচ্ছা হইবামাত্র তিনি গঙ্গা গর্ভ হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিয়া বৃষ, ডমরু ও ত্রিশূল সহিত একটি শিবমূর্ত্তি স্বহস্তে গঠন করিয়া উহার পূজা করিতে থাকেন। মথুর বাবু ঐ সময়ে ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে পূজা স্থানের কিয়দ্দূরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং ঠাকুর ঐরূপে তন্ময় হইয়া কি পূজা করিতেছেন জানিতে উৎসুক হইয়া নিকটে আসিয়া ঐ মূর্ত্তিটি দেখিতে পান। বৃহৎ না হইলেও মূর্ত্তিটি সুন্দর হইয়াছিল। মথুর উহা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং বাজারে ঐরূপ ঢংয়ের মূর্ত্তি যে পাওয়া যায় না ইহাও দেখিয়াই বুঝিলেন। অতঃপর কৌতূহলপরবশ হইয়া মথুর হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ মূর্ত্তি কোথায় পাইলে, কে গড়িয়াছে? হৃদয়ের উত্তরে ঠাকুর স্বয়ং দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়িতে এবং ভগ্ন মূর্ত্তি সুন্দর ভাবে যুড়তে জানেন একথা জানিতে পারিয়া মথুর বিস্মিত হইলেন এবং পূজান্তে মূর্ত্তিটি তাঁহাকে দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। হৃদয়ও ঐ কথায় স্বীকৃত হইয়া পূজাশেষে ঠাকুরকে বলিয়া মূর্ত্তিটি লইয়া তাহাকে দিয়া আসিলেন। মূর্ত্তিটি হস্তে পাইয়া মথুর এখন উহা তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং মুগ্ধ হইয়া রাণীকে উহা দেখাইতে পাঠাইলেন। রাণীও উহা দেখিয়া নির্ম্মাতার বিশেষ প্রশংসা করিলেন এবং ঠাকুর উহা গড়িয়াছেন জানিয়া মথুরের ন্যায় বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। * ঠাকুরকে দেবালয়ের কার্য্যে

* কেহ কেহ বলেন এই ঘটনা ঠাকুরের পূজাকালে হইয়াছিল এবং মথুর উহা রাণী

নিযুক্ত করিতে মথুরের ইতিপূর্ব্বেই ইচ্ছা হইয়াছিল, এখন আবার তাঁহার এই নূতন গুণপনার পরিচয় পাইয়া ঐ ইচ্ছা অধিকতর বলবতী হইল। ঠাকুরও মথুর বাবুর ঐরূপ অভিপ্রায়ের কথা ইতিপূর্ব্বে অগ্রজের নিকটে শুনিয়াছিলেন কিন্তু ভগবান ভিন্ন অপর আবার কাহার চাকরি করিব—এইরূপ একটা ভাব বাল্যকাল হইতে তাঁহার মনে দৃঢ় নিবদ্ধ থাকায়, ঐ কথায় কর্ণপাত করেন নাই।

চাকরি করা সম্বন্ধে ঐরূপ একটা ভাব প্রকাশ করিতে আমরাও অনেক সময় ঠাকুরকে শুনিয়াছি। বিশেষ অভাবে না পড়িয়া কেহ স্বেচ্ছায় চাকরি স্বীকার করিলে ঠাকুর ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে বড় উচ্চ ধারণা করিতেন না। তাঁহার বালক ভক্তদিগের মধ্যে একজন * এক সময়ে চাকরি স্বীকার করিয়াছে জানিয়া আমরা তাঁহাকে বিশেষ ব্যথিত হইয়া বলিতে শুনিয়াছি, 'সে মরিয়াছে শুনিলে আমার যত না কষ্ট হইত, সে চাকরি করিতেছে শুনিয়া ততোধিক কষ্ট হইয়াছে।' পরে কিছুকাল অতীত হইলে ঐ ব্যক্তির সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইয়া যখন জানিলেন যে ঐ ব্যক্তি তাহার অসহায়া বৃদ্ধা মাতার ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হইতেছে না দেখিয়াই চাকরি স্বীকার করিয়াছে, তখন ঠাকুর সস্নেহে তাহার গাত্রে ও মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিয়াছিলেন, 'তাতে দোষ নাই, ঐজন্য চাকরি করায় তোকে দোষ স্পর্শ করবে না, কিন্তু ঐরূপে মার জন্য না হয়ে, যদি তুই স্বেচ্ছায় চাকরি করতে যেতিস তাহা হলে তোকে আর স্পর্শ করতে পারতুম্ না। তাইতো বলি আমার নিরঞ্জনে এতটুকু অঞ্জন (কাল দাগ) নাই, তার ঐরূপ হীনবুদ্ধি কেন হবে?'

নিত্যনিরঞ্জনকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত কথা শুনিয়া অন্যান্য আগন্তুক ব্যক্তির সকলেই বিস্মিত হইল। একজন বলিয়াও বসিল—মহাশয়, আপনি চাকরির নিন্দা করিতেছেন, কিন্তু চাকরি না করিলে সংসার পোষণ করিব কি রূপে? তদুত্তরে ঠাকুর বলিলেন, "যে করবে করুক না, আমিত সকলকে ঐরূপে নিষেধ করছি না (নিরঞ্জনকে ও তাঁহার অন্যান্য বালক ভক্তদিগকে দেখাইয়া) এদের ঐ কথা বলছি, এদের কথা আলাদা।" ঠাকুর তাঁহার বালক ভক্তদিগের জীবন অন্য ভাবে গড়িতেছিলেন এবং ঐরূপ আধ্যাত্মিক ভাবের সহিত চাকরি করাটার কখন সামঞ্জস্য হয় না বলিয়াই যে ঐ কথা বলিয়াছিলেন ইহা বলা বাহুল্য।

রাসমণিকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—যে রূপ উপযুক্ত পূজক পাইয়াছি, তাহাতে ৺দেবী শীঘ্র জাগ্রতা হইয়া উঠিবেন।

* স্বামী নিরঞ্জনানন্দ।

অগ্রজের নিকট হইতে মথুর বাবুর ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ঠাকুর তখন হইতে তাঁহার সম্মুখে আর বড় একটা অগ্রসর হইতেন না; যতটা পারেন তাঁহার চক্ষুর অন্তরালে থাকিবার চেষ্টা করিতেন। কারণ, কায়-মন বাক্যে সত্য ও ধর্ম্ম পালন করিতে তিনি যেমন কখন কাহারও অপেক্ষা রাখিতেন না, তেমনি আবার বিশেষ কারণ না থাকিলে কাহাকেও উপেক্ষা করিয়া বৃথা কষ্ট দিতে তিনি চিরকালই কুণ্ঠিত হইতেন। আবার কোনরূপ প্রত্যাশা না করিয়া গুণী ব্যক্তির গুণের আদর করা এবং মানী ব্যক্তিকে সরল স্বাভাবিক ভাবে সম্মান দেওয়াটা ঠাকুরের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম ছিল। অতএব দেবালয়ে পূজকপদ গ্রহণ করিবেন কিনা, এই প্রশ্নের যাহা হয় একটা মীমাংসায় স্বয়ং উপনীত হইবার পূর্ব্বে মথুর বাবু তাঁহাকে উহা স্বীকার করিতে অনুরোধ করিয়া ধরিয়া বসিলে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া প্রত্যাখ্যান করিয়া মথুরের মনে কষ্ট দিতে হইবে, এই আশঙ্কাই যে ঠাকুরের ঐরূপ চেষ্টার মূলে ছিল তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। বিশেষতঃ তিনি একজন নগণ্য বালক মাত্র এবং রাণী রাসমণির দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ মথুর মহামাননীয় ব্যক্তি, এ অবস্থায় মথুরের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করাটা তাঁহার পক্ষে ভাল দেখাইবে না এবং বালসুলভ চপলতা বলিয়াই নিশ্চিত পরিগণিত হইবে। তবে যতই দিন যাইতেছে ততই দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে অবস্থান করাটা যে তাঁহার বিশেষ প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইতেছে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুরের নিকট নিজ মনোগত এই ভাবটিও লুক্কায়িত ছিল না। অতএব কোন বিশেষ হাঙ্গামার কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিতে পাইলে তাঁহার যে এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় আপত্তি ছিল না এবং জন্মভূমি কামারপুকুরে ফিরিবার জন্য তাঁহার মনও যে পূর্ব্বের ন্যায় চঞ্চল ছিলনা, একথা আমরা এখনকার ঘটনাবলী হইতে বেশ বুঝিতে পারি।

সে যাহা হউক, ঠাকুর যাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন তাহাই একদিন এই সময়ে হইয়া বসিল। মথুর বাবু কালীমন্দিরে দর্শনাদি করিতে আসিয়া কিছু-দূরে ঠাকুরকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ঠাকুর তখন হৃদয়ের সহিত বেড়াইতেছিলেন। মথুর বাবুকে দূরে দেখিতে পাইয়া সেখান হইতে সরিয়া অন্যত্র যাইতেছিলেন, এমন সময়ে মথুরের ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "বাবু আপনাকে ডাকিতেছেন।" ঠাকুর মথুরের নিকট যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া হৃদয় কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন—'যাইলেই, আমাকে

এখানে থাকিতে বলিবে, চাকরি স্বীকার করিতে বলিবে।' হৃদয় বলিল, 'তাহাতে দোষ কি? এমন স্থানে ও আশ্রয়ে কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া তো ভাল বৈ মন্দ নয়। তবে কেন ইতস্ততঃ করিতেছ!'

ঠাকুর—আমার চাকরিতে চিরকাল আবদ্ধ হইয়া থাকিতে ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ এখানে পূজা করিতে স্বীকার করিলে দেবীর অঙ্গে যে সমস্ত অলঙ্কারাদি আছে তাহার জন্য দায়ী থাকিতে হইবে, সে বড় হাঙ্গামার কাজ, আমার দ্বারা উহা সম্ভব হইবে না, তবে যদি তুমি ঐ কার্য্যের ভার লইয়া এখানে থাক তাহা হইলে আমার পূজা করিতে আপত্তি নাই।

হৃদয় এখানে চাকরির অন্বেষণেই আসিয়াছিল। সুতরাং ঠাকুরের ঐ কথায় আনন্দে স্বীকৃত হইল। ঠাকুর তখন মথুর বাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার দ্বারা দেবালয়ে কর্ম্মস্বীকার করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। মথুরও ঐ কথায় স্বীকৃত হইয়া ঠাকুরকে ঐ দিন হইতে কালীমন্দিরে বেশকারীর পদে নিযুক্ত করিলেন এবং হৃদয়কে ঠাকুর ও রামকুমারকে সাহায্য করিতে আদেশ করিলেন। রামকুমারও মথুর বাবুর অনুরোধে ভ্রাতাকে ঐরূপে কার্য্যে নিযুক্ত হইতে দেখিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

দেবালয়প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলি হইয়া গেল। সন ১২৬২ সালের ভাদ্র মাস উপস্থিত। মন্দিরে জন্মাষ্টমী কৃত্য যথাযথ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আজ নন্দোৎসব। মধ্যাহ্নে ৺রাধাগোবিন্দজীর বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদি যথাকালে হইয়া গেলে পূজক ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৺রাধারাণীকে কক্ষান্তরে শয়ন করাইয়া আসিয়া ৺গোবিন্দজীকে শয়ন করাইতে লইয়া যাইবার সময় বিগ্রহহস্তে পড়িয়া গেলেন, বিগ্রহের একটি পদ ভাঙ্গিয়া যাইল। ঐ ঘটনায় মন্দিরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। নানা পণ্ডিতের মতামত লইবার পর ঠাকুরের পরামর্শে ৺গোবিন্দজীর বিগ্রহটির ভগ্নাংশ জুড়িয়া পূজা চলিতে লাগিল। * ইতিপূর্ব্বে আধ্যাত্মিকপ্রসঙ্গে ঠাকুরের মধ্যে মধ্যে ভাবাবেশ দেখিয়াই বোধ হয় মথুর বাবু এখন ঐ বিষয়ে তাঁহার পরামর্শগ্রহণে সমুৎসুক হইয়াছিলেন। আবার, ঠাকুর যে ভগ্নবিগ্রহ মূর্ত্তি সুন্দরভাবে জুড়িতে পারেন একথাও মথুর বাবুর অবিদিত ছিল না। সুতরাং মথুর বাবুর অনুরোধে ঠাকুরকেই এখন ঐ বিগ্রহ জুড়িয়া দিতে হইয়াছিল। ঠাকুর উহা এমন সুন্দররূপে

---

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—ষষ্ঠ অধ্যায়, ১৯০ পৃষ্ঠা দেখ।

জুড়িয়াছিলেন যে বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেও বিগ্রহমূর্ত্তি যে কোনকালে ভগ্ন হইয়াছিল একথা বুঝিতে পারা যায় না। সে যাহা হউক, পূজক ক্ষেত্রনাথ অনবধানতার অপরাধে কর্ম্মচ্যুত হইলেন। ৺রাধাগোবিন্দজীর পূজার ভার তদবধি ঠাকুরের উপরেই ন্যস্ত হইল এবং হৃদয় শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজাকালে বেশ করিয়া রামকুমারকে সাহায্য করিতে লাগিল।

৺রাধাগোবিন্দজীর বিগ্রহ ঐরূপে ভগ্ন হইলে ভগ্ন বিগ্রহে পূজা সিদ্ধ হয় না বলিয়া অনেকে অনেক কথা তখন বলাবলি করিত। রাণী রাসমণি ও মথুর বাবু কিন্তু ঠাকুরের যুক্তিযুক্ত পরামর্শে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া উহার কোন কথায় কর্ণপাত করিতেন না। হৃদয় বলে ঠাকুর মথুর বাবুকে ঐরূপ পরামর্শ দিবার কালে বিশেষ ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন। হৃদয়ের ঐ কথা আমাদিগের অসম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাল্যকাল হইতেই ঠাকুরের মধ্যে মধ্যে ভাবাবেশ হইত।

এই প্রসঙ্গে হৃদয় এক সময়ে আমাদিগের নিকট আর একটি কথারও উল্লেখ করিয়াছিল। উহাও পাঠককে এইখানে বলা ভাল। কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে বরানগরে কুটিঘাটার নিকটে নড়ালের প্রসিদ্ধ জমিদার ৺রতন রায়ের ঘাট বিদ্যমান। ঐ ঘাটের নিকটেই একটি ঠাকুরবাটী আছে। উহাতে দশমহাবিদ্যা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা। পূর্ব্বে উক্ত ঠাকুরবাটীতে পূজাদির বেশ বন্দোবস্ত থাকিলেও ঠাকুরের সাধনকালে উহা হীনদশাপন্ন হইয়াছিল মথুর বাবু যখন ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেছেন তখন ঠাকুর এক সময়ে উক্ত দেবালয়ে দর্শনাদি করিতে আসেন এবং এখানকার অভাব দেখিয়া মথুর বাবুকে বলিয়া ভোগের জন্য দুই মন চাউল ও দুইটি করিয়া টাকার মাসিক বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এখানে দর্শনাদি করিয়া ফিরিবার কালে ঠাকুর, এখানকার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার জয় নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেকগুলি লোকের সহিত স্বপ্রতিষ্ঠিত ঘাটে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাঁহার সহিত পূর্ব্ব পরিচয় থাকায় দেখা করিতে যান। জয় নারায়ণ বাবু তাঁহাকে নমস্কার ও সাদরে আহ্বান করিয়া অপর সকলকে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিলেন। পরে কথাপ্রসঙ্গে রাণী রাসমণির কালিবাটীর কথা তুলিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয় ওখানকার ৺গোবিন্দজী কি ভাঙ্গা? ঠাকুর তাহাতে হাসিতে হাসিতে পরিহাস ছলে তাঁহার অঙ্গ ঠেলিয়া বলিলেন, "দূর শালা, অখণ্ডমণ্ডলাকার যিনি, তিনি কি কখন ভাঙ্গা হন?" জয়নারায়ণ বাবুর প্রশ্নে নিরর্থক নানা কথা উঠিবার

সম্ভাবনা দেখিয়াই যে, ঠাকুর ঐরূপে ঐপ্রসঙ্গ পাল্‌টাইয়া দেন এবং গভীর আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়া তাঁহাকে সকল বস্তুর অসার ভাগ ছাড়িয়া সার ভাগ গ্রহণ করিতে বলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। সুবুদ্ধিসম্পন্ন জয় নারায়ণ বাবুও ঠাকুরের ইঙ্গিতে উহা তখনি বুঝিয়া ঐরূপ প্রশ্ন করার জন্য নিজকৃত অপরাধ স্বীকার করিয়াছিলেন।

এখন হইতেই ঠাকুরের পূজা একটা দেখিবার বিষয় ছিল, যে দেখিত সেই মুগ্ধ হইত। আর ঠাকুরের সেই প্রাণের উচ্ছ্বাসে মধুর কণ্ঠে গান, সে গান যে একবার শুনিত সে আর কখন উহা ভুলিতে পারিত না। তাহাতে ওস্তাদি কালোয়াতি ঢং ঢাং কিছুই ছিল না, ছিল কেবল, গীতোক্ত বিষয়ের ভাবটি আপনাতে সম্পূর্ণ আরোপ করিয়া মর্ম্মস্পর্শী মধুর স্বরে ঐ ভাবের যথাযথ প্রকাশ এবং তাল লয়ের বিশুদ্ধতা। ভাবই যে সংগীতের প্রাণস্বরূপ একথা, যে তাঁহার গান শুনিয়াছে সেই বুঝিয়াছে। আবার তাল লয় বিশুদ্ধ না হইলে ঐ ভাবই যে আত্মপ্রকাশে বাধা পাইয়া থাকে একথাও ঠাকুরের মুখনিঃসৃত সঙ্গীত শুনিয়া এবং অপরের সঙ্গীতের সহিত উহার তুলনা করিয়া বেশ বুঝা যাইত। শুনিয়াছি, রাণী রাসমণি যখনই দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন তখনই ঠাকুরকে ডাকাইয়া তাঁহার গান শুনিতেন এবং নিম্ন লিখিত গীতটি তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল—

কোন্ হিসাবে হর হৃদে দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে।
সাধ করে জিব বাড়ায়েছ, যেন কত ন্যাকা মেয়ে॥
জেনেছি জেনেছি তারা
তারা কি তোর এমনি ধারা
তোর মা কি তোর বাপের বুকে দাঁড়িয়েছিল অম্‌নি কোরে॥

ঠাকুরের গীত অত মধুর লাগিবার আর একটি কারণ ছিল। গান করিবার সময়ে তিনি নিজে গীতোক্ত ভাবে এত মুগ্ধ হইতেন যে, অপর কাহারও প্রীতির জন্য যে গান গাহিতেছেন একথা একেবারে ভুলিয়া যাইতেন! গীতোক্ত ভাবে মুগ্ধ হইয়া ঐরূপে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইতে আমরা জীবনে আর কাহাকেও দেখি নাই। ভাবুক গায়কেরাও শ্রোতার নিকট হইতে প্রশংসার প্রত্যাশা কিছু না কিছু রাখিয়া থাকেন। ঠাকুরকেই কেবল দেখিয়াছি, তাঁহার গীত শুনিয়া কেহ প্রশংসা করিলে, যথার্থই ভাবিতেন ঐ ব্যক্তি গীতোক্ত ভাবের প্রশংসা করিতেছে এবং উহার বিন্দুমাত্র ভাগও তাঁহার প্রাপ্য নহে।

হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, এই সময়ে গীত গাহিতে গাহিতে দুই চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত, এবং যখন পূজা করিতেন তখন এমন তন্ময় ভাবে পূজা করিতেন যে, ঐ সময়ে পূজাস্থানে কেহ আসিলে বা নিকটে দাঁড়াইয়া কথা কহিলে তিনি উহা আদৌ টের পাইতেন না। শুধু তাহাই নহে ঠাকুর বলিতেন অঙ্গন্যাস করন্যাস প্রভৃতি পূজাঙ্গ সকল সম্পন্ন করিবার কালে তিনি ঐ সকল মন্ত্রবর্ণ সর্ব্বাঙ্গে উজ্জ্বল বর্ণে সন্নিবেশিত রহিয়াছে বলিয়া বাস্তবিক দেখিতে পাইতেন। বাস্তবিকই দেখিতেন, সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনী শক্তি সুষুম্না মার্গ দিয়া সহস্রারে উঠিতেছেন এবং শরীরের যে যে অংশকে ঐ শক্তি ত্যাগ করিতেছে সেই সেই অংশগুলি এককালে নিস্পন্দ অসাড় ও মৃতবৎ হইয়া যাইতেছে। আবার পূজাপদ্ধতির বিধানানুসারে যখন "বং ইতি জলধারয়া বহ্নিপ্রাকারং বিচিন্ত্য' অর্থাৎ বং—এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পূজক আপনার চতুর্দ্দিকে জল ছড়াইয়া ভাবিবে যেন অগ্নির প্রাচীর দ্বারা পূজাস্থান বেষ্টিত রহিয়াছে এবং তজ্জন্য কোন প্রকার বিঘ্নবাধাই তথায় প্রবেশ করিতে পারিতেছে না—প্রভৃতি কথার উচ্চারণ করিতেন তখন দেখিতে পাইতেন তাঁহার চতুর্দ্দিকে শত জিহ্বা বিস্তার করিয়া অনুল্লঙ্ঘনীয় অগ্নির প্রাচীর সত্য সত্যই বিদ্যমান থাকিয়া পূজাস্থানকে সর্ব্ববিধ বিঘ্নের হস্ত হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছে! হৃদয় বলিত, পূজার সময় ঠাকুরের তেজঃপুঞ্জ শরীর ও তন্মনস্ক ভাব দেখিয়া অপর ব্রাহ্মণগণ বলাবলি করিতেন—সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব যেন নরশরীর পরিগ্রহ করিয়া পূজা করিতে বসিয়াছেন।

এ দিকে দেবীভক্ত রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া অবধি আত্মীয়বর্গের ভরণ পোষণ সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেও অন্য এক বিষয়ের জন্য মধ্যে মধ্যে বড় চিন্তিত হইতেন। কারণ, দেখিতেন, এখানে আসিয়া অবধি কনিষ্ঠের নির্জ্জন-প্রিয়তা ও সংসার সম্বন্ধে কেমন একটা উদাসীন উদাসীন ভাব, কোন কাজেই যেন তাহার আর আঁট দেখিতে পাইতেন না। প্রথমে ভাবিতেন, বালক বোধ হয় কামার পুকুরে মাতার নিকট ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, এবং ঐ বিষয়ই সদা সর্ব্বদা চিন্তা করিতেছে। কারণ, দেখিতেন বালক সকাল সন্ধ্যা যখন তখন একাকী মন্দির হইতে দূরে গঙ্গাতীরে পদচারণ করিতেছে, পঞ্চবটী বৃক্ষমূলে স্থির হইয়া বসিয়া আছে অথবা পঞ্চবটীর চতুর্দ্দিকে তখন যে জঙ্গল-পূর্ণ স্থান ছিল বহুক্ষণ পরে তন্মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে। কিন্তু দিনের পর দিন যাইলেও বালক যখন সে কথা তাঁহাকে মুখ ফুটিয়া বলিল না এবং কখন

কখন তাঁহাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াও তিনি যখন উহা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না, তখন তাহাকে বাড়িতে ফিরিয়া পাঠাইবার কথা ছাড়িয়া দিলেন। ভাবিলেন, তাঁহার নিজের বয়স হইয়াছে, শরীর ও দিন দিন অপটু হইয়া পড়িতেছে, কবে পরমায়ু ফুরাইবে কে বলিতে পারে ?—এ অবস্থায় আর সময় নষ্ট করিতে না দিয়া, তাঁহার অবর্ত্তমানে বালক যাহাতে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া দুপয়সা উপার্জ্জন করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতে পারে এমন ভাবে তাহাকে মানুষ করিয়া দিয়া যাওয়া তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য। সুতরাং মথুর বাবু যখন বালককে স্থনয়নে দেখিয়া দেবালয়ে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন তখন তিনি বিশেষ আনন্দিত হয়েন। কিন্তু কনিষ্ঠের নিকট ঐ কথা পাড়িয়া এবং তাহার চাকরী করিবার ইচ্ছা নাই দেখিয়া তিনি পুনরায় কিং কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন। পরে, দিনের পর দিন যাইলে কনিষ্ঠের মন ফিরিয়া যখন সে মথুর বাবুর অনুরোধে প্রথমে বেশকারী ও পরে পূজকের পদে ব্রতী হইল এবং দক্ষতার সহিত ঐ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে লাগিল তখন রামকুমার অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন এবং এখন হইতে তাহাকে চণ্ডীপাঠ ও শ্রীশ্রীকালিকা মাতার পূজাকার্য্য প্রভৃতি আদ্যোপান্ত শিখাইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, উহাতে সে মানুষ হইবে এবং তিনিও কোন দিন পূজা করিতে অপারক হইলে জগদম্বার, পূজা ও সেবা কার্য্যে গোলযোগ ঘটিবে না। অদ্ভুত মেধা-সম্পন্ন ঠাকুর অচিরে ঐ সকল শিখিয়া লইলেন, এবং শাক্তীদীক্ষা না লইয়া দেবী পূজা প্রশস্ত নহে জানিয়া শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার সংকল্প স্থির করিলেন।

শ্রীযুক্ত কেনারাম ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক প্রবীণ শক্তিসাধক তখন কলিকাতার বৈঠকখানার বাজারে বাস করিতেন। দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির দেবালয়ে তাঁহার মধ্যে মধ্যে গতায়াত ছিল। মথুর বাবু প্রমুখ রাণীর পরিবার বর্গের সহিত তাঁহার পরিচয় থাকা অসম্ভব না হইলেও আমাদের ঐ বিষয় জানা নাই। তবে হৃদয়ের মুখে শুনিয়াছি যাহারা তাঁহাকে চিনিতেন, অনুরাগী সাধক বলিয়া তাহারা তাঁহাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। ঠাকুরের অগ্রজ রামকুমার ভট্টাচার্য্যের সহিত ইনি বহু পূর্ব্বে হইতেই পরিচিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ঠাকুর ইঁহার নিকট হইতেই দীক্ষা গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন। শুনিয়াছি, দীক্ষাগ্রহণ করিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবেশে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, এবং শ্রীযুক্ত কেনারাম তাঁহার অসাধারণ ভক্তি ও আধ্যাত্মিক শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ইষ্টলাভ বিষয়ে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক রামকুমারের শরীর এখন হইতে মধ্যে মধ্যে অপটু হউক, অথবা ঠাকুরকে ঐ কার্য্যে অভ্যস্ত করাইবার জন্যই হউক, তিনি এই সময়ে প্রায়ই ৺ রাধাগোবিন্দ জীর সেবা স্বয়ং সম্পন্ন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীশ্রীকালী মাতার পূজাকার্য্যে ঠাকুরকে নিযুক্ত করিতে থাকিলেন। কয়েক দিন এইরূপ হইলে মথুর বাবু একদিন ঐকথা জানিতে পারিয়া রাণীকে বলিয়া রামকুমারকে এখন হইতে বরাবর বিষ্ণুঘরেই পূজা করিতে অনুরোধ করিলেন। অতএব এখন হইতে কালীঘরে ঠাকুর পূজক ও হৃদয় বেশকারী রূপে নিযুক্ত থাকিলেন। ঐরূপে পূজার বন্দোবস্ত পরিবর্ত্তন করিবার কারণ এই যে মথুরবাবু তিনি ভাবিয়া ছিলেন—কালী ঘরের সেবা কার্য্যে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, বৃদ্ধ রামকুমারের শরীর অপটু হওয়ায় ঐ কার্য্যভারবহন করা তাঁহার শক্তিতে কুলাইতেছে না। রামকুমারও ঐরূপ বন্দোবস্তে বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কনিষ্ঠকে কালী ঘরের পূজা ও সেবা কার্য্য যথাযথ সম্পন্ন করিতে শিখাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। ইহার কিছুকাল পরে রামকুমার, মথুর বাবুকে বলিয়া হৃদয়কে ৺রাধাগোবিন্দজীর পূজায় নিযুক্ত করিলেন এবং অবসর লইয়া কিছু দিনের জন্য গৃহে ফিরিবার যোগাড় করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামকুমারকে আর গৃহে ফিরিতে হয় নাই। কারণ, গৃহে ফিরিবার পূর্ব্বে কলিকাতার উত্তরে শ্যামনগর মূলাজোড় নামক স্থানে কার্য্যান্তরে গমন করিয়া তিনি ঐস্থানেই সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রামকুমার ভট্টাচার্য্য রাণী রাসমণির দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে এক বৎসরকাল মাত্র জীবিত থাকিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূজা করিয়াছিলেন। অতএব সন ১২৬০ সালে তাঁহার শরীর ত্যাগ হইয়াছিল।

উন্মত্ত ব্যাকুলতা, দর্শন ও বিবাহ।

অতি অল্প বয়সেই ঠাকুরের পিতার মৃত্যু হয়। সুতরাং প্রায় জ্ঞানোন্মেষের প্রারম্ভ হইতে তিনি জননী চন্দ্রমণি ও অগ্রজ রামকুমারের স্নেহেই লালিত পালিত হইয়াছিলেন। আবার ঠাকুরের অপেক্ষা রামকুমার সাঁইত্রিশ বৎসরের বড় ছিলেন। অতএব ঠাকুরের পিতৃভক্তির কিয়দংশও তিনি পাইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং পিতৃতুল্য অগ্রজের এখন ঐরূপে সহসা মৃত্যু হওয়ায় ঠাকুর যে নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন—একথা নিশ্চয়। জরাগ্রস্ত, ব্যাধিত ও মৃত ব্যক্তির দর্শনে শ্রীভগবান্ বুদ্ধাবতারের সংসারত্যাগের

কথা লোকপ্রসিদ্ধ। কে বলিবে, ঠাকুরের জীবনে এই ঘটনা তাঁহার শুদ্ধ মনে সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধীয় দৃঢ় ধারণা আনয়ন করিয়া উহাতে প্রবল বৈরাগ্যানল প্রজ্বলিত করিয়াছিল কি না? কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, এই সময় হইতেই ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূজায় সমধিক মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং তৃষিত মানব তাঁহার দর্শনে বাস্তবিক কৃতকৃতার্থ হয় কি না এ বিষয় জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। দেখিতে পাওয়া যায়, এই সময় হইতেই তিনি পূজান্তে মন্দিরমধ্যে শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকটে বসিয়া তন্মনস্কভাবে দিন যাপন করিতেছেন এবং রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত প্রমুখ ভক্তগণরচিত সঙ্গীত সকল ৺দেবীকে শুনাইতে শুনাইতে প্রেমে বিহ্বল ও আত্মহারা হইয়া পড়িতেছেন। দেখিতে পাওয়া যায়, এখন হইতেই তিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতার স্মরণ মননাদি ভিন্ন বৃথা বাক্যালাপাদি করিয়া তিল মাত্র সময় ব্যয় করিতে নিতান্ত কুণ্ঠিত হইতেছেন। আবার মধ্যাহ্নে ও রাত্রে যখন ৺দেবীর মন্দির-দ্বার রুদ্ধ, দেখিতে পাওয়া যায়, তখনও তিনি লোকসঙ্গ পরিহার করিয়া পঞ্চবটীর চতুঃপার্শ্বস্থ জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জগন্মাতার চিন্তা ও ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া কালযাপন করিতেছেন।

ঠাকুরের ঐ প্রকার চেষ্টাসমূহ হৃদয়ের প্রীতিকর হয় নাই। কিন্তু কি করিবে? বাল্যকাল হইতেই ঠাকুর যখন যাহা ধরিয়াছেন তখনি তাহা সম্পাদন করিয়াছেন, কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে পারে নাই, একথা তাহার অবিদিত ছিল না। সুতরাং প্রতিবাদ বা বাধা দেওয়া বৃথা। তবে দিনের পর দিন ঠাকুরের ঐ ভাব প্রবল বেগে বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া হৃদয় কখন কখন একটু আধটু না বলিয়াও থাকিতে পারিত না। আবার রাত্রে নিদ্রা না যাইয়া শয্যাত্যাগ করিয়া ঠাকুর কোথায় চলিয়া যান, একথা জানিতে পারিয়া হৃদয় বিশেষ চিন্তান্বিত হয়। কারণ, মন্দিরে ঠাকুরসেবার পরিশ্রম, তাহার উপর পূর্ব্ববৎ আহার নাই এবং লোকজনের সহিত পূর্ব্ববৎ বাক্যালাপও নাই, এ অবস্থায় রাত্রে নিদ্রা না যাইলে শরীর ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা। হৃদয় স্থির করিল ঐ বিষয়ের সন্ধান এবং যথাসাধ্য প্রতিবিধান করিতে হইবে।

পঞ্চবটীর চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান তখন এখনকার মত সমতল ছিল না, নীচু জমি, খানাখন্দ ও জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। নানা বুনো গাছের সহিত একটি ধাত্রী বা আমলকি বৃক্ষও তথায় জন্মিয়াছিল। একে কবরডাঙ্গা তাহার উপর জঙ্গল, সে জন্য দিবাভাগেও ঐ স্থানে বড় একটা কেহ যাইত না। যাইলেও জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইত না। আর, রাত্রে?—ভূতের ভয়ে কেহই ঐ দিক মাড়াইত না। হৃদয়ের মুখে শুনিয়াছি, পূর্ব্বোক্ত আমলকি বৃক্ষটি নীচু জমিতে থাকায় তাহার তলে কেহ বসিয়া থাকিলে জঙ্গলের বাহিরের উচ্চ জমি হইতে কাহারও নয়ন গোচর হইত না। ঠাকুর এই সময়ে উহারই তলে বসিয়া রাত্রে ধ্যান ধারণা করিতেন।

এক দিন রাত্রে ঠাকুর ঐ স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিলে হৃদয়ও অলক্ষ্যে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া ঐ স্থানের নিকটে উপস্থিত হইল। অনন্তর ঠাকুর

জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, দেখিতে পাইলে তিনি বিরক্ত হইবেন ভাবিয়া সে আর অগ্রসর হইল না। কিন্তু তাঁহাকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত কিছুক্ষণ আশে পাশে ঢিল্ ঢাল্ ছুড়িতে থাকিল। ঠাকুর তাহাতে ফিরিলেন না দেখিয়া অগত্যা সে স্বয়ং গৃহে ফিরিল। পরদিন অবসরকালে হৃদয় তাঁহাকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিল, 'জঙ্গলের ভিতর রাত্রে যাইয়া কি কর বল দেখি?' ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বলিলেন, 'ঐ স্থানে একটা আমলকি গাছ আছে, তাহার তলায় বসিয়া ধ্যান করি, শাস্ত্রে বলে শুনিয়াছি, আমলকি গাছের তলায় যে যাহা কামনা করিয়া ধ্যান করে তাহার তাহা সিদ্ধ হয়।'

ঐ ঘটনার পরে কয়েক দিন ঠাকুর পূর্ব্বোক্ত আমলকি বৃক্ষের তলায় ধ্যান ধারণা করিতে বসিলেই মধ্যে মধ্যে লোষ্ট্রাদি নিক্ষিপ্ত হওয়া প্রভৃতি নানাবিধ উৎপাত হইতে লাগিল। উহা হৃদয়ের কর্ম্ম বুঝিয়াও ঠাকুর তাহাকে কিছুই বলিলেন না। হৃদয় কিন্তু ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না। এক দিন ঠাকুর বৃক্ষতলে যাইবার কিছুক্ষণ পরে নিঃশব্দে জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দূর হইতে দেখিল, তিনি পরিধেয় বস্ত্র ও যজ্ঞসূত্রটি পর্য্যন্ত বৃক্ষে লম্বিত করিয়া রাখিয়া সুখাসীন হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। দেখিয়াই ভাবিল, মামা কি পাগল হইল না কি? এরূপ ত পাগলেই করে, ধ্যান করিবে, কর, কিন্তু এরূপ উলঙ্গ হইয়া কেন?

হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, ঐরূপ ভাবিয়া সে আর কালবিলম্ব করিল না। ঠাকুরের নিকটে সহসা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ডাকিতে ডাকিতে বলিতে লাগিল, 'এ কি হচ্চে? পৈতে কাপড় ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে বসেছ যে?' কয়েকবার ঐরূপ ডাকাডাকির পর ঠাকুরের হুঁস হইল এবং হৃদয়কে নিকটে দাঁড়াইয়া ঐরূপ প্রশ্ন করিতে দেখিয়া ও শুনিয়া তাহাকে শান্ত করিয়া বলিলেন, "তুই কি জানিস্? এইরূপে সব পাশ মুক্ত হয়ে ধ্যান কর্‌তে হয়, জন্মাবধি মানুষ ঘৃণা লজ্জা কুল শীল ভয় মান জাতি ও অভিমান এই অষ্ট পাশে বদ্ধ হয়ে রয়েছে, পৈতেগাছটাও 'আমি ব্রাহ্মণ, সকলের চেয়ে বড়'—এই অভিমানের চিহ্ন এবং একটা পাশ, মাকে (জগদম্বাকে) ডাকৃতে হলে ঐ সব পাশ ফেলে দিয়ে এক মনে ডাকতে হয়, তাই ঐ সব খুলে রেখেছি, ধ্যান করা শেষ হলে ফির্‌বার সময় আবার পরে যাব।" হৃদয় ঐরূপ কথা পূর্ব্বে আর কোথাও শুনে নাই, শুনিয়া, অবাক্ হইয়া রহিল, এবং উত্তরে কিছুই আর বলিতে না পারিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল। ইতিপূর্ব্বে সে ভাবিয়াছিল, মাতুলকে অনেক কথা অদ্য বুঝাইয়া বলিবে ও তিরস্কার করিবে।

ক্রমশঃ।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দ।

(স্বামীজি ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ্চ আমেরিকার যুক্তরাজ্যের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়-সংসৃষ্ট গ্রাজুয়েট দার্শনিক সভায় বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাবসানে শ্রোতৃবৃন্দের সহিত তাঁহার নিম্নলিখিতরূপ প্রশ্নোত্তর হইয়াছিল।)

(১)

প্র। ভারতে দার্শনিক চিন্তার বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। এ সকল বিষয় আজকাল কি পরিমাণে আলোচিত হইয়া থাকে?

উ। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতের অধিকাংশ লোকই প্রকৃতপক্ষে দ্বৈতবাদী। অতি অল্পসংখ্যকই অদ্বৈতবাদী। সে দেশে প্রধান আলোচনার বিষয়—মায়াবাদ ও জীবতত্ত্ব। আমি এদেশে আসিয়া দেখিলাম, এখানকার শ্রমজীবীরা রাজনৈতিক জগতের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত বিশেষ পরিচিত, কিন্তু যখন আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ধর্ম্ম বলিতে তোমরা কি বুঝ, অমুক অমুক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত কি প্রকার, তাহারা বলিল, "তাহা আমরা জানি না, আমরা চার্চ্চে গিয়া থাকি মাত্র।" ভারতে কিন্তু কোন চাষার কাছে গিয়া যদি আমি জিজ্ঞাসা করি, "তোমাদের শাসনকর্ত্তা কে?"—সে বলিবে, "তাহা আমরা জানি না, আমরা টেক্স দিয়া থাকি মাত্র।" কিন্তু যদি তাহাকে তাহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি, সে অমনি বুঝাইয়া দিবে সে দ্বৈতবাদী, আর সে মায়া ও জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে তাহার ধারণা বিস্তারিতভাবে বলিতে প্রস্তুত হইবে। তাহারা লিখিতে পড়িতে জানে না, কিন্তু এ সকল তাহারা সন্ন্যাসীদের নিকট হইতে শিখিয়াছে, আর ঐ সব বিষয় আলোচনা করিতে খুব ভালবাসে। সারা দিনের কাযের পর চাষারা গাছতলায় বসিয়া ঐ সব তত্ত্ব আলোচনা করিয়া থাকে।

প্র। কি হইলে 'গোঁড়া হিন্দু' হওয়া যায়?

উ। বর্ত্তমান কালে আহার, পান ও বিবাহ সম্বন্ধে জাতিগত বিধি-নিষেধ প্রতিপালন করিলেই 'গোঁড়া হিন্দু' হওয়া যায়। তার পর সে যে কোন মতে বিশ্বাস করুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ভারতে কখন বিধিবদ্ধ ধর্ম্মমণ্ডলী বা চার্চ্চ ছিল না, সুতরাং গোঁড়া বা খাঁটি হিন্দুয়ানির মত

গঠিত ও বিধিবদ্ধ করিবার জন্য একদল লোক কোনকালেই ছিল না। মোটামুটিভাবে আমরা বলিয়া থাকি, যাহারা বেদবিশ্বাসী, তাহারাই গোঁড়া বা খাঁটি হিন্দু, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখিতে পাই, দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়সমূহের অনেকেই কেবল বেদবিশ্বাসী না হইয়া পুরাণেই অধিক বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

প্র। আপনাদের হিন্দু দর্শন গ্রীকদের ষ্টোয়িক * দর্শনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ?

উ। খুব সম্ভবতঃ আলেকজান্দ্রিয়াবাসিগণের মধ্য দিয়া হিন্দুদর্শন উহার উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পিথাগোরসের উপদেশের মধ্যে যে সাংখ্যমতের কিছু প্রভাব বিদ্যমান, এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ আছে। যাহাই হউক, আমাদের ধারণা—সাংখ্যদর্শনেই বেদনিবদ্ধ দার্শনিকতত্ত্বসমূহকে যুক্তিবিচার দ্বারা সমন্বয় করিবার প্রথম চেষ্টা। আমরা, এমন কি, বেদে পর্য্যন্ত কপিলের নামোল্লেখ দেখিতে পাই—

"ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে।"

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্।)

"যিনি সেই কপিল ঋষিকে প্রথমে প্রসব করিয়াছিলেন।"

প্র। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত এই মতের কি বিরোধ ?

উ। কিছুমাত্র বিরোধ নাই, বরং আমাদের সহিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মিল আছে। আমাদের পরিণামবাদ এবং আকাশ ও প্রাণতত্ত্ব ঠিক আপনাদের আধুনিক দর্শনের সিদ্ধান্তের মত। আপনাদের পরিণামবাদ বা ক্রমবিকাশবাদ আমাদের যোগ ও সাংখ্যদর্শনের ভিতর রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন—পতঞ্জলি প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা একজাতি অন্য জাতিতে পরিণত হইবার কথা বলিয়াছেন। "জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।" তবে ইহার কারণ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতভেদ আছে। তাঁহার পরিণামের ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিক। তিনি বলেন, যেমন কৃষক তাহার ক্ষেত্রে নিকটবর্ত্তী জলাশয় হইতে জলসেচনের ইচ্ছা করিলে তাহাকে কেবল জলাবরোধ দ্বারটী তুলিয়া ফেলিতে হয় মাত্র ("নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং

* সম্ভবতঃ ৩০৮ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে গ্রীক দার্শনিক জিনো (Zeno) কর্তৃক এই দর্শন প্রচারিত হয়। ইহার মতে সুখদুঃখ ভালমন্দ সকল বিষয়ে সমভাবসম্পন্ন হওয়া ও সমুদয় স্থিরভাবে সহ্য করাই মানব জীবনের পরম পুরুষার্থ।

বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ") তদ্রূপ সকল মানবই পূর্ব্ব হইতেই অনন্ত-শক্তিসম্পন্ন—কেবল এই সকল বিভিন্ন অবস্থাচক্ররূপ দ্বার বা প্রতিবন্ধকরাশি তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সেইগুলি সরাইয়া ফেলিলেই তাঁহার সেই অনন্ত শক্তি মহাবেগে বাহির হইয়া অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। তির্য্যগ্‌জাতির ভিতর গূঢ়ভাবে মনুষ্যত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে—যখন শুভযোগ উপস্থিত হয়, তখনই সে মানবরূপে অভিব্যক্ত হয়। আবার যখন উপযুক্ত সুযোগ ও অবসর উপস্থিত হয়, তখনই মানবের মধ্যে যে ঈশ্বরত্ব বর্ত্তমান, তাহা অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং আমাদের আধুনিক নূতন মতবাদসমূহের সহিত বিবাদ করিবার বিশেষ কিছু নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, বিষয়প্রত্যক্ষের প্রণালী সম্বন্ধে সাংখ্যদের মতের সহিত আধুনিক শারীরবিজ্ঞান শাস্ত্রের মতভেদ খুব অল্প।

প্র। কিন্তু আপনাদের জ্ঞানার্জ্জনের প্রণালী বিভিন্ন।

উ। হাঁ। আমরা বলি, মনের শক্তিসমূহকে একমুখী করাই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। বহির্বিজ্ঞানে বাহ্য বিষয়ের উপর মনকে একাগ্র করিতে হয়—আর অন্তর্বিজ্ঞানে মনের গতিকে আত্মাভিমুখীন করিতে হয়। আমরা মনের এই একাগ্রতাকে যোগ আখ্যা দিয়া থাকি।

প্র। একাগ্রতার অবস্থায় কি এই সকল তত্ত্বের সত্যতা স্বতঃসিদ্ধ হইয়া পড়ে?

উ। যোগীরা এই একাগ্রতাশক্তির ফল অতি মহৎ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, মনের একাগ্রতার দ্বারা জগতের সমুদয় সত্য—বাহ্য ও অন্তর উভয় জগতের সত্যই করামলকবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

প্র। অদ্বৈতবাদী সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কি বলেন?

উ। অদ্বৈতবাদী বলেন, এই সব সৃষ্টিতত্ত্ব ও অন্যান্য যাহা কিছু, সবই মায়ার—এই আপাতপ্রতীয়মান প্রপঞ্চের—অন্তর্গত। বাস্তবপক্ষে উহাদের অস্তিত্বই নাই। তবে আমরা যতদিন বদ্ধ, ততদিন আমাদিগকে এই দৃশ্যজগৎ দেখিতে হয়। এই দৃশ্যজগতের মধ্যে ঘটনাবলী কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ক্রমানুসারে ঘটিয়া থাকে। উহাদের অতীতে আর কোন নিয়ম বা ক্রম নাই—তথায় সম্পূর্ণ মুক্তি—সম্পূর্ণ স্বাধীনতা।

প্র। অদ্বৈতবাদ কি দ্বৈতবাদের বিরোধী?

উ। উপনিষদ্ প্রণালীবদ্ধভাবে লিখিত নহে বলিয়া, দার্শনিকেরা যখন কোন প্রণালীবদ্ধ দর্শনশাস্ত্র গঠনে ইচ্ছা করিয়াছেন, তখনই তাঁহারা উহাদের

মধ্য হইতে নিজেদের অভিপ্রায়ানুযায়ী প্রমাণীভূত বচনাবলী বাছিয়া লইয়াছেন। সেই কারণে সকল দর্শনকারই উপনিষদকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন—নতুবা তাঁহাদের দর্শনের কোনরূপ ভিত্তিই হইতে পারিত না। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, উপনিষদের মধ্যে বিভিন্ন সর্ব্বপ্রকার চিন্তাপ্রণালীই বিদ্যমান। আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। আমরা বলি, চরমজ্ঞানে আরোহণের তিনটী সোপানের মধ্যে দ্বৈতবাদ একটী সোপান মাত্র। ধর্ম্মের ভিতর সর্ব্বদাই তিনটী সোপান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, দ্বৈতবাদ। তার পর মানব অপেক্ষাকৃত উচ্চতর অবস্থায় উপস্থিত হয়—উহা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। আর—অবশেষে সে দেখিতে পায় যে, সে জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের সহিত অভিন্ন। সুতরাং এই তিনটী পরস্পর পরস্পরের বিরোধী নহে, কিন্তু পরস্পর পরস্পরের সহায়ক।

প্র। মায়া বা অজ্ঞানের অস্তিত্বের কারণ কি?

উ। কার্য্যকারণসংঘাতের সীমার বাহিরে 'কেন' এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে না। মায়ারাজ্যের ভিতরেই 'কেন' জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। আমরা বলি, যদি ঐ প্রশ্নটীকে ন্যায়শাস্ত্রসঙ্গত আকারে প্রকাশ করিতে পারা যায়, তবেই আমরা উহার উত্তর দিব। তৎপূর্ব্বে আমাদের উহার উত্তরলাভের অধিকার নাই।

প্র। সগুণ ঈশ্বর কি মায়ার অন্তর্গত?

উ। হাঁ, তবে এই সগুণ ঈশ্বর মায়াবরণ মধ্য দিয়া দৃষ্ট, সেই নির্গুণব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নহে। মায়া বা প্রকৃতির অধীন হইলে সেই নির্গুণব্রহ্ম জীবাত্মা শব্দবাচ্য আর মায়াধীশ বা প্রকৃতির নিয়ন্তারূপে সেই নির্গুণব্রহ্মই ঈশ্বর বা সগুণ-ব্রহ্ম-শব্দবাচ্য। যদি কোন ব্যক্তি সূর্য্যদর্শনার্থ এখান হইতে উর্দ্ধে যাত্রা করে, তবে সে যতদিন না আসল সূর্য্যের নিকট পঁহুছিতেছে, ততদিন উহাকে ক্রমশঃ বৃহত্তর হইতে বৃহত্তররূপে দেখিবে। সে যতই অগ্রসর হয়, সে যেন ভিন্ন ভিন্ন সূর্য্য দেখিতেছে বলিয়া মনে করিতে পারে, কিন্তু সে যে সেই এক সূর্য্যই দেখিতেছে, তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ আমরা এই সব যাহা কিছু দেখিতেছি, সমুদয়ই সেই নির্গুণ ব্রহ্মসত্তারই বিভিন্ন রূপ মাত্র, সুতরাং সেই হিসাবে তাহারা সত্য। ইহাদের মধ্যে কোনটীই মিথ্যা নহে, তবে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ও গুলি নিম্নতর সোপানমাত্র।

প্র। সেই পূর্ণ নিরপেক্ষ সত্তাকে জানিবার বিশেষ প্রণালী কি ?

উ। আমরা বলি, দুইটী প্রণালী আছে। একটী অস্তিভাবদ্যোতক বা প্রবৃত্তিমার্গ, অপরটী নাস্তিভাবদ্যোতক বা নিবৃত্তিমার্গ। প্রথমোক্ত মার্গে সমগ্র জগৎ চলিতেছে—এই পথে আমরা প্রেমের দ্বারা সেই পূর্ণ বস্তুতে পঁহুছিবার চেষ্টা করিতেছি। যদি প্রেমের পরিধি অনন্তগুণে বাড়াইয়া যাওয়া যায়, তবে আমরা সেই এক সার্ব্বজনীন প্রেমে উপনীত হই। অপর পথে 'নেতি', 'নেতি', অর্থাৎ ইহা নহে, ইহা নহে, এইরূপে সাধন করিতে হয়—যে কোন চিত্তের তরঙ্গ মনকে বহির্ম্মুখী করিতে চেষ্টা করে, এই প্রণালীতে তাহাকেই নিবারণ করিতে হয়। পরিশেষে মনটীই যেন মরিয়া যায়, তখন সত্য স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমরা এই অবস্থাকে সমাধি বা জ্ঞানাতীত অবস্থা বা পূর্ণ জ্ঞানাবস্থা বলিয়া থাকি।

প্র। ইহা তাহা হইলে বিষয়ীকে (জ্ঞাতা বা দ্রষ্টাকে) বিষয়ে (জ্ঞেয় বা দৃশ্যে) ডুবাইয়া দেওয়ার অবস্থা ?

উ। বিষয়ীকে বিষয়ে নহে, বিষয়কে বিষয়ীতে ডুবাইয়া দেওয়া, বাস্তবিক এই জগৎ উড়িয়া যায়, কেবল আমি থাকি—একমাত্র কেবল আমিই বর্ত্তমান থাকি।

প্র। আমাদের কয়েকজন জর্ম্মান দার্শনিকের মত—ভারতের ভক্তিবাদ খুব সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলস্বরূপ।

উ। আমি ইঁহাদের সহিত একমত নহি—এরূপ অনুমান মুহূর্ত্তমাত্রও টিকিতে পারে না। ভারতীয় ভক্তি পাশ্চাত্যদেশের ভক্তির মত নহে। ভক্তি সম্বন্ধে আমাদের মুখ্য ধারণা এই যে, উহাতে ভয়ের ভাব আদৌ নাই—কেবল ভগবান্‌কে ভালবাসা। দ্বিতীয়তঃ, এইরূপ অনুমান সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। ভক্তির কথা প্রাচীনতম উপনিষৎ সমূহে পর্য্যন্ত রহিয়াছে , ঐ উপনিষদ্‌গুলি খ্রীষ্টানদের বাইবেল গ্রন্থ হইতে অনেক প্রাচীন। সংহিতার মধ্যে পর্য্যন্ত ভক্তির বীজ রহিয়াছে। ভক্তি শব্দটীও একটী পাশ্চাত্য শব্দ নহে। বেদমন্ত্রে উল্লিখিত শ্রদ্ধা শব্দ হইতে ক্রমশঃ ভক্তিবাদের উদ্ভব হইয়াছিল।

প্র। খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে ভারতবাসীর কিরূপ ধারণা ?

উ। খুব ভাল বলিয়াই ধারণা। বেদান্ত সকলকেই গ্রহণ করিয়া থাকে। ভারতে আমাদের ধর্ম্মশিক্ষাসম্বন্ধে অন্যান্য দেশ হইতে একটী বিশেষত্ব আছে। মনে করুন, আমার একটী ছেলে আছে। আমি তাহাকে কোন প্রকার

ধর্ম্মমত শিক্ষা দিব না—তাহাকে প্রাণায়াম শিখাইব, মনকে একাগ্র করিতে শিখাইব আর একটু সামান্য প্রার্থনা শিখাইব—আপনারা প্রার্থনা বলিতে যেরূপ বুঝেন, তাহা নহে, কেবল কতকটা এই ভাবের প্রার্থনা শিখাইব—"যিনি এই জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে ধ্যান করি—তিনি আমার মনকে জ্ঞানালোকে আলোকিত করুন *"। তাহার ধর্ম্ম শিক্ষা এইরূপ চলিবে, তার পর সে বিভিন্ন মতাবলম্বী দার্শনিক ও আচার্য্যগণের মত শুনিতে থাকিবে। সে ইঁহাদের মধ্যে যাঁহার মত নিজের সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী বলিয়া মনে করিবে, তাঁহাকেই গ্রহণ করিবে—এই ব্যক্তিই তাহার গুরু হইবেন—সে শিষ্য হইবে। সে তাঁহাকে বলিবে, "আপনি যে দর্শন প্রচার করিতেছেন, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অতএব আমাকে উহা শিক্ষা দিন।" আমাদের মূল কথাটা এই যে, আপনার মত আমার উপযোগী হইতে পারে না, আবার আমার মত আপনার উপযোগী হইতে পারে না। প্রত্যেকের সাধন পথ ভিন্ন ভিন্ন। আমার কন্যার সাধন পথ এক প্রকার, আমার পুত্রের অন্য প্রকার, আমার আবার সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। সুতরাং প্রত্যেকেরই ইষ্ট বা নির্ব্বাচিত পথ ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে—আর এই সাধনপথের বিষয় প্রত্যেকেই নিজ নিজ অন্তরে গোপন রাখিয়া থাকেন। ঐ পথের বিষয় আমি জানি ও আমার গুরু জানেন—আর কাহাকেও আমরা উহা জানাই না, কারণ, আমরা লোকের সঙ্গে অনর্থক বিবাদ করিতে চাহি না। উহা অপরের নিকট প্রকাশ করিলে তাহার কোন উপকার হইবে না, কারণ প্রত্যেককেই নিজ নিজ পথ বাছিয়া লইতে হইবে। এই কারণে সর্ব্বসাধারণের নিকট কেবল সর্ব্বসাধারণসম্মত দর্শন ও সাধনপ্রণালী সমূহই শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি—অবশ্য দৃষ্টান্তটী শুনিলে হাসি আসিবে—এক পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিলে তাহাতে হয়ত আমার উন্নতির সহায়তা হইতে পারে। এখন উহা আমার পক্ষে উপযোগী হইলেও আমি যদি সকলকে এক পায়ে দাঁড়াইতে উপদেশ দিই, সকলেই আমার কথা শুনিয়া হাসিবে। এরূপ হওয়া খুব সম্ভব যে, আমি হয়ত দ্বৈতবাদী, আমার স্ত্রী হয়ত অদ্বৈতবাদী। আমার কোন পুত্র ইচ্ছা করিলে খ্রীষ্ট, বুদ্ধ বা মহম্মদের উপাসক হইতে পারে, উহা তাহার ইষ্ট। অবশ্য তাহাকে জাতিগত সামাজিক নিয়ম প্রতিপালন করিতেই হইবে।

* ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।

প্র। সকল হিন্দুই কি জাতি বিভাগে বিশ্বাসী?

উ। বাধ্য হইয়া জাতিগত নিয়ম মানিতে হয়। আস্থা আপাততঃ না থাকিলেও সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করিবার জো নাই।

প্র। এই প্রাণায়াম ও একাগ্রতার অভ্যাস কি সর্ব্বসাধারণে করিয়া থাকে?

উ। হাঁ, তবে কেহ কেহ অতি অল্পমাত্রই অভ্যাস করিয়া থাকে—যতটুকু না করিলে ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ লঙ্ঘন হয়—ততটুকুই করিয়া থাকে। ভারতের মন্দিরসমূহ এখানকার চার্চ্চের মত নহে। কালই সমুদয় মন্দির অন্তর্হিত হইতে পারে, লোকে উহার একান্ত অভাববোধ করিবে না। স্বর্গকাম বা পুত্রকাম হইয়া অথবা ঐ রূপ অন্য কিছুর জন্য লোকে মন্দির নির্ম্মাণ করায়। কেহ হয়ত খুব একটা বড় মন্দির প্রতিষ্ঠা করাইল ও তথায় পূজার জন্য কয়েক জন পুরোহিত নিযুক্ত করিয়া দিল, কিন্তু আমার তথায় যাইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কারণ, আমার যাহা কিছু পূজা পাঠ, তাহা আমার ঘরেই হইয়া থাকে। প্রত্যেক বাড়ীতেই একটী আলাদা ঘর থাকে—তাহাকে ঠাকুরঘর বা পূজা গৃহ বলে। দীক্ষা গ্রহণের পর প্রত্যেক বালক বালিকার জীবনে কর্ত্তব্য—প্রথমে স্নান, তার পর পূজাহ্নিক করা। আর তাহার পূজা বা উপাসনা—এই প্রাণায়াম, ও ধ্যান এবং বিশেষ একটী নাম জপ করা। আর একটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়—সাধনের সময় শরীরটাকে সোজা করিয়া রাখিতে হয়। আমাদের বিশ্বাস—মনের শক্তির দ্বারা শরীরটাকে সুস্থ রাখা যাইতে পারে। একজন এইরূপ পূজা করিয়া উঠিয়া গেল, আর একজন আসিয়া সেই আসনে বসিয়া পূজা করিতে লাগিল—সকলেই নিস্তব্ধভাবে নিজের নিজের পূজা করিয়া চলিয়া গেল। সময়ে সময়ে এক ঘরে তিন চার জন বসিয়া উপাসনা করে, কিন্তু প্রত্যেকেরই উপাসনাপ্রণালী হয়ত ভিন্ন ভিন্ন। এইরূপ পূজা প্রত্যহ অন্ততঃ দুইবার করিয়া করিতে হয়।

(আগামীবারে সমাপ্য)

ইতিহাস বনাম রূপক।

(শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।)

শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব, জড়বাদী চৈতন্যবাদীর বিবাদ, Boyle and Bentley controversyর ন্যায় ইতিহাস ও রূপকের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। এই দ্বন্দ্বের এক চিরপ্রিয় রঙ্গমঞ্চ হইতেছে—আমাদের রামায়ণ ও মহাভারতাদি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ। এই দুই দল উক্ত গ্রন্থাদিবর্ণিত উপাখ্যানগুলি লইয়া এক মহা সাহিত্যিক রজ্জ্বাকর্ষণ (literary tug-of-war) লাগাইয়া দেন। টানের চোটে বেচারাগুলি পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে। এ অকূল সাহিত্যিক পাথারে তাহাদের ন মাতা ন পিতা বলিলেও চলে। যদিও বা লোকপরম্পরাশ্রুত পরিচয়ে বাপ থাকে, যেমন বাল্মীকি বা বেদব্যাস—তা সে না থাকারই মধ্যে। অনেকের বিবেচনায় তাঁরা এখন সাহিত্যিক স্তরের প্রস্তরীভূত অস্থির (fossil) সামিল—তাঁদের এমন যোগ্যতা নাই যে অধুনাতন তর্কবিশারদদের এজলাসে আসিয়া নিজের নিজের পিতৃত্বের প্রতিপাদন করেন। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সযত্নে তাঁহাদিগকে সাহিত্যিক যাদুঘরে (literary museum) তুলিয়া রাখিবেন, বড় জোর তাঁহাদের অদৃষ্টে এতটা খাতির হইতে পারে। কিন্তু জীবন্ত বিশ্বস্ত সাক্ষীদের ন্যায় তাঁহাদের সাক্ষ্যও যে গ্রাহ্য হইবে, সে আশা সুদূর-পরাহত। সুতরাং এই অনাথদের লইয়া একটা সাহিত্যিক-কুস্তীর বল ও প্যাঁচ প্রকাশ করিবার যে দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি তাহা পালোয়ানেরা সামলাইতে পারেন না। এই উভয় বিবাদীপক্ষের মামলাটা সংক্ষেপে এইরূপ:—এক প্রান্তে রূপকবাদীরা বলেন:—রামায়ণ মহাভারতাদি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে যাহা কিছু সবই রূপক—কতকগুলি আধ্যাত্মিক বা আধিভৌতিক শিক্ষা তোমাদের মুখরোচক করিয়া শিখাইবার জন্য কবিকপোলকল্পিত উপাখ্যানাদির ভিতর দিয়া বর্ণিত আছে—যেমন কুইনাইনের বটিকাটীর চারিধারে একটা চিনির আবরণ দেওয়া থাকে ঠিক তদ্রূপ। একেত ইতিহাস জিনিষটাই আদৌ বিশ্বাস যোগ্য নহে—যখন কালকার ঘটনা আজ বিবৃত করিতে গেলে পাঁচরকম লোক পাঁচরকম বিবরণ দেয় ও তাহার প্রত্যেকেরই মধ্যে অল্পাধিক পরিমাণে মিথ্যা ও অতিরঞ্জনের খাদ থাকিয়া যায়, তখন সহস্র সহস্র অতীত বৎসরের

তিমির ভেদ করিয়া তোমরা ঐতিহাসিকেরা যে নিজ নিজ অনুমানরূপ দূরবীণ লাগাইয়া দেখিতেছ তার বোল কড়াই কাণা কিনা কে জানে? আজ এক জন তাল ঠুকিয়া তারস্বরে এক ঐতিহাসিক তথ্য ঘোষণা করিলেন—কাল আর একজন ওস্তাদ আসিয়া সেটী সমূলে উৎপাটিত করিয়া আর এক নূতন তথ্য আরও জোরে তাল ঠুকিয়া তারতরস্বরে ঘোষিত করিয়া দিলেন। এইরূপ কাটাকাটীত চলিয়াছেই।

পৌরাণিক যুগ ত বহু দূরের কথা, অপেক্ষাকৃত অধুনাতন দুই একটা ব্যাপার লইয়াই—দেখ না কেন। সপ্তদশ অশ্বারোহীর সাহায্যে বক্তিয়ার কর্তৃক বঙ্গবিজয় বা আরও অধুনাতন ব্যাপার সিরাজুদ্দৌলা কর্তৃক অন্ধকূপ হত্যা ইহাদেরও ঐতিহাসিকতা কি বাত্যাবিতাড়িত কদলী বৃক্ষের অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই? বেহুলার চাম্পানগরকে একাধিকক্রমে যে ৪।৫ জেলা দাবী করিয়া বসিয়াছে—তাহার মধ্যে কোনটিরই কি সন্তোষজনকরূপে সত্য সত্ত্ব সাব্যস্ত হইয়াছে? সুতরাং ও সব মনকে চোখ ঠারিবার আবশ্যক নাই। গাছে কত আম আছে, সেগুলি কলমের বা বীজের, ল্যাংড়া বা বোম্বাই, সে তর্কের অপেক্ষা—আমগুলিকে ভক্ষণ করাই ত সমধিক বুদ্ধির পরিচায়ক। রামচন্দ্র সত্য সত্যই ছিলেন কিনা, বা যদি ছিলেন ত অযোধ্যার রাজা ছিলেন বা কাশীর রাজা ছিলেন, তিনি যে রাক্ষসকে বধ করিয়াছিলেন তাহার দশ মুণ্ড ছিল বা বিশ মুণ্ড ছিল, যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচ ভাই ছিলেন কি ছয় ভাই ছিলেন, অর্জ্জুন ঠিক কোন অস্ত্রের দ্বারা কোন মহারথীর রথধ্বজ কাটিয়াছিলেন, কোন্ কোন্ জেলার কোন্ কোন্ মহকুমার, কোন্ কোন্ পল্লীর কোন্ কোন্ রাস্তা দিয়া পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন—এ সব খুঁটি নাটি লইয়া মাথা কুটাকুটি করিতে হয় তোমরা কর। আমাদের মতে কিন্তু মহাকবি বর্ণিত তাঁহাদের উপাখ্যান হইতে কি সার সত্য, কি সনাতনী শিক্ষা পাই—তাহার পর্য্যালোচনাতে ঢের অধিক লাভ। এই গেল রূপকবাদীদের কথা—ইঁহাদের প্রতিপক্ষেরা কিছু দলে পুরু—ইঁহাদের ভিতর আবার দুই তিন সরিক্ আছেন। প্রথম গোঁড়া ভক্তেরা—দ্বিতীয় খাঁটি ইতিহাসবাদীরা ও তদনুবর্ত্তী প্রত্নতত্ত্ববাদীরা। প্রথম, গোঁড়া ভক্তেরা উত্তরে বলেন:—তোমাদের স্পর্দ্ধা দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। যে ভগবানের অবতার শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণাদির লীলাসমূহে সন্দিহান—বা ভগবানের পরম ভক্ত—ভীমার্জ্জুনাদির অস্তিত্ব বা কার্য্যকলাপ একেবারে উড়াইয়া দিতে চায়, সে ত অবিশ্বাসী, অর্দ্ধ নাস্তিক,

তাহার আবার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার মূল্য কি? ভগবান যে যুগে যুগে অধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিতে অবতীর্ণ হন্, সে কথা যদি অস্বীকার কর, তাহা হইলে ভগবানের অপার করুণা, অসীম ক্ষমতাও অস্বীকার কর, তাহা হইলে ভগবানকেও অস্বীকার কর—তবে আর বাকিটা রহিল কি? এই রকম ভগবানে অনাস্থা ও ভগবানের বিভূতিতে অবিশ্বাস হইতেই ত দেশটা অধঃপাতে যাইতেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

দ্বিতীয়,—ইতিহাসবাদী ও তদনুবর্ত্তী প্রত্নতত্ত্ববাদীগণের জবাব—মিথ্যা কল্পনাপ্রসূত ঘটনাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা যেমন পাপ, তেমনি সত্য ইতিহাসমূলক ঘটনাকে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াটাও পাপ,—আবার ইহার দ্বারা যদি স্বদেশ সম্বন্ধে সত্য কথা নির্দ্ধারণের ইচ্ছা ও উপায় তিরোহিত হইয়া যায় ত সেটা আবার ততোধিক পাপ। ওসব রূপক ফূপক একটা বেশ ফাঁকি দিবার উপায়। ভগবানে ভক্তি বিশ্বাস, গবেষণা-প্রবৃত্তি, সত্যানুসন্ধিৎসা প্রভৃতি দুরূহ—অথচ ভাল জিনিষগুলিকে দিব্য কল্পনার কলিকায় চড়াইয়া রূপকের আগুনে সাজিয়া এক দমে ফুঁকিয়া দেওটা খুব সহজ—উহাতে কাল্পনিক ও বাস্তবিক, সূক্ষ্ম ও জড়, নানাপ্রকার দ্রব্যাদি সাজিয়া ফুঁকিয়া দিবার অভ্যাস এবঞ্চ তাহাতে পারদর্শিতা—উভয়ই প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হয় বটে, তবে আমরা ও সবে ভুলিব না—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইরূপ দ্বন্দ্ব ও মতসংঘর্ষের মধ্যে একটা আপোষে নিষ্পত্তি হয় কিনা দেখা উচিত। এক দিকে দেখা যাইতেছে যে সর্ব্বস্ব রূপকের হস্তে সঁপিয়া দিলে—কিছু বাড়াবাড়ি হইয়া দাঁড়ায়? গীতার আধ্যাত্মিক—রৌপক ব্যাখ্যা ত বরং পদে আছে, যে মহাভারতের ঐতিহাসিকতা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও স্বীকার করিয়াছেন, সেই মহাভারতটাকেও জ্যোতিষিক রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টাও সম্প্রতি আপনারা দেখিয়াছেন। আমার একজন সুবিজ্ঞ ভীষক্ বন্ধু সেদিন বিধিমতে আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে মহাভারতে খাণ্ডবদাহ উপাখ্যানটা—একটা—ভৈষজিক রূপক মাত্র। অনেক হব্যাহারের পর অগ্নির অগ্নিমান্দ্য হওয়াতে তৎকর্ত্তৃক নানা পশু পক্ষী, বৃক্ষলতাদি পূর্ণ খাণ্ডব দহন ব্যাপারটা আর কিছুই নহে—অনেক লুচি পলান্নাদি—গুরুপাক, ঘৃতপক্ক দ্রব্য আহারে যাঁহাদের যকৃতের ক্রিয়াবৈগুণ্য ও তাহার ফলস্বরূপ অজীর্ণ রোগ দাঁড়াইয়াছে তাঁহাদের পক্ষে টাটকা শাক্ সবজী ও ভাল ভাল সন্তোশিকারলব্ধ পশুপক্ষী 'রোষ্ট' করিয়া খাইবার ব্যবস্থা মাত্র। এই কার্য্যের সহায় কৃষ্ণার্জ্জুন

—আর কিছুই নহে—২।১ জন license প্রাপ্ত বন্দুকধারী শিকারী বন্ধু। কিন্তু বন্ধুবরের গুরু গম্ভীর তত্বটী অপেক্ষা তদ্বর্ণিত সন্তোশিকারলব্ধ, গরম-মশলা সুরভিত বস্তুগুলির গলাধঃকরণটা যে ঢের বেশী সহজ, তাহা বলাই বাহুল্য। আবার পক্ষান্তরে ঐ সকল ধর্ম্মগ্রন্থে যা কিছু বর্ণিত আছে, ভৃগু মুনি কর্ত্তৃক বিষ্ণুবক্ষে পদাঘাত হইতে আরম্ভ করিয়া বীরবর অঞ্জনানন্দন কর্ত্তৃক স্বদেহের অংশবিশেষের পঞ্চাশৎ যোজনব্যাপী দৈর্ঘ্যসম্পাদন পর্য্যন্ত—সমস্তগুলিকেই যে অভ্রান্ত, নির্জ্জলা, ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে এটাও কিছু অন্যায় আবদার। বিশ্বাস বেচারার যেন মা বাপ নাই, যে যিনি যা কিছু ফরমাইস করিবেন তাহাকে তাহাই করিতে হইবে। জ্ঞানের লাগামের দ্বারা তাহাকে সংযত না রাখিলে সে যে সদর রাস্তা ছাড়াইয়া কোন খানায় ডোবায় পড়িয়া মরিবে, বিচার বুদ্ধিকে তাহার কর্ণধার না করিয়া দুস্তর খেয়াল পারাবারে তাহাকে ভাসাইয়া দিলে সে যে কোন ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া মরিবে বা কোন আঘাটায় আসিয়া লাগিবে, তাহার ঠিকানা কি? অতএব এরূপ স্থলে চরমপন্থী হওয়ার চেয়ে মধ্যপন্থী হওয়া ভাল। এটা ঠিক যে রামায়ণ মহাভারতাদির ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করিবার জো নাই—তাহা হইলে যে শুধু আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্মের কতকগুলি ভিত্তিগত তত্ত্বের মূলে কুঠারাঘাত করা হয় তাহা নহে, আমাদের এই বহুপুণ্যস্মৃতিপূত ভারতভূমির গৌরবের অযথা খর্ব্বতা প্রতিপাদিতও হয়। রাম, লক্ষ্মণ, কৃষ্ণার্জ্জুন, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, সীতাসাবিত্রী প্রভৃতি পুণ্যশ্লোকদের কাহিনী আবহমান কাল হইতে আমাদের দেশের লোকের মনে কত শত উচ্চাদর্শ, কত শত দেবভাব জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে গড়িয়া তুলিয়া আসিতেছে সে সবের ভিত্তি যে একেবারে কল্পনামূলক তাহা কোন সহৃদয় ব্যক্তি সজ্ঞানে ও সুস্থ শরীরে স্বীকার করিবেন না। কিন্তু তাই বলিয়া ঐ সকল মহাত্মাগণের চরিত্র ও লীলা বর্ণনকে অবলম্বন করিয়া মহাকবিগণ যে কাল্পনিক বা অতিরঞ্জিত কিছুই লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই সে কথাও কোন বুদ্ধিমান লোকে মানিবেন না। কতকগুলি উপাখ্যান এরূপ আছে, তাহা দেখিলেই সেগুলি যে আসল ঐতিহাসিক গুঁড়িটার শোভাবর্দ্ধক কল্পনারচিত ডালপালা তাহা বেশ বোধ হয়। কিন্তু আমাদের আসল কথাটার তাহাতে বড় আসিয়া যায় না। কেননা উপাখ্যানগুলি কল্পনাপ্রসূত রূপক রাজ্যভুক্তই হউক, বা বাস্তবরাজ্যান্তর্গতই হউক, আমরা এই সহস্র সহস্র যুগের ব্যবধান ভেদ করিয়া তাহা হইতে

কি শিক্ষা লাভ করি তাহার আলোচনাতে লাভও আছে, আনন্দও আছে। ঐতিহাসিক ঘটনা হইলেই যে তাহার অভ্যন্তরে কোন রূপক বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা থাকিতে পারে না এ কথার কোন মানে নাই। জড়বাদী পাশ্চাত্যেরা ত ইতিহাস সমুদ্র হইতে যথেষ্ট রাষ্ট্রনৈতিক ও সমাজনৈতিক শিক্ষা মথিত করিয়া ইতিহাসতত্ত্ব (Philosophy of History) বলিয়া এক স্বতন্ত্র তত্ত্বেরই সৃষ্টি করিয়াছে! আর আমরা অধ্যাত্মবাদী, আমরা যদি আমাদের এই অচলায়তনটীর উত্তর দিকের আধ্যাত্মিক জানালাকে খুলিতে যাই তাহা হইলেই কি আমাদের যত পাপের ভাগী হইতে হয়? রাম লক্ষ্মণ, কৃষ্ণার্জ্জুনাদি মহাত্মাগণের জীবন যে আমাদের ন্যায় প্রাকৃত ব্যক্তিগণের জীবনতুল্য কেবলমাত্র ঘটনাসমষ্টি একথা ত কিছুতেই মনে লাগে না। তবে যাঁহারা রূপকের নামটী শ্রবণ মাত্র রক্তবস্ত্র দর্শনে ভগবান্ পিনাকপাণির বাহনটীর অবস্থাপন্ন হন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। ঐ মহাত্মাদের চরিত্রে, তাহাদের কার্য্যকলাপে তাঁহাদের লীলার স্তরে স্তরে যদি আধ্যাত্মিক শিক্ষা না পাই ত কোথায় পাইব? আধ্যাত্মিক শিক্ষা জিনিষটা কি কেবলই কাল্পনিকের খেয়ালে অশরীরী আত্মার ন্যায় ভাসিতে থাকে? আধারের যেমন আধেয়কে পাইয়া তৃপ্তি, আত্মার যেমন দেহকে আশ্রয়রূপে পাইয়া বিকাশ, সেইরূপ আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুলিরও যে ঐরূপ মহাত্মাগণের জীবনকে পাইয়াই স্ফূর্ত্তি ও সার্থকতা তাহা যেন আমরা না ভুলি। বাস্তবিক, এক হিসাবে ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সবই রূপক। অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, আপনি, আমি, ইনি, সকলেই ত এক এক ভাবের বিকাশ বা শরীরবদ্ধ এক এক রূপক বা শিক্ষা। তবে আপনার আমার ভাব বা জীবনের শিক্ষা—রামায়ণ-মহাভারতাদির চরিত্রগুলির তুলনায় নগণ্য ও যৎসামান্য এই যা প্রভেদ। মহা মনস্বী Carlyle-এর একটি সারগর্ভ উক্তি এ স্থলে মনে পড়ে—"Matter exists only spiritually, and to represent some idea and body it forth Heaven and Earth are but the time-vesture of eternity"—তাৎপর্য্যটা এই যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাবৎ স্থূল পদার্থের অস্তিত্বই কেবলমাত্র একটা সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয় ভাবের বিকাশের নিমিত্ত—স্বর্গ, মর্ত্ত, সেই অনন্তের কালাত্মক সান্ত পরিচ্ছদমাত্র। আমরা অধ্যাত্মবাদী ভাবপ্রধান হিন্দু—আমরা এ কথার মর্ম্ম বুঝি। আমরা বুঝি পুষ্পগুলি পুষ্পভাব বা পুষ্পত্বের একটা সাবয়ব বিকাশ, পশু পশুত্বের একটা সাবয়ব বিকাশ।

এইরূপে মানুষও মনুষ্যত্বের এই চৌদ্দপোয়া শরীরবদ্ধ বিকাশ। আবার বিশেষভাবে ধরিতে গেলে প্রত্যেক মনুষ্যই এক একটী বিশেষভাবের আধার ও প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শিক্ষার সমষ্টিমাত্র। অতএব রামায়ণ মহাভারতাদির মহৎ চরিত্রগুলি এক এক মহৎ, সূক্ষ্ম, অধ্যাত্ম-ভাবের স্থূলবিকাশ ও এক একটী বিশেষ উপাখ্যানও (তা সে বাস্তবিকই হউক আর কাল্পনিকই হউক) এক একটী সুন্দর আধ্যাত্মিক শিক্ষা বা রূপকের আধার। এক্ষণে এইরূপ দুই একটী উপাখ্যান ও তাহাদের অন্তর্নিহিত শিক্ষা আপনাদের প্রণিধানের নিমিত্ত উপস্থাপিত করিতেছি। *

---

* স্বামী বিবেকানন্দ মাদ্রাজে কোনও জিজ্ঞাসুকে বলিয়াছিলেন :—Some historical truth is the nucleus of every Purana The object of the Puranas is to teach mankind the sublime truth in various forms, and even if they do not contain any historical truth, they form a great authority in respect of the highest truth which they inculcate তাৎপর্য্য এই যে প্রত্যেক পুরাণকথার ভিতরে ঐতিহাসিক তথ্য সার-অবলম্বনরূপে বীজাকারে নিহিত আছে। মানুষকে বিচিত্র আকারে সূক্ষ্ম সত্য শিক্ষা দেওয়াই পুরাণের উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিক তথ্য পুরাণকথাগুলির মধ্যে যদি নাও দেখা যায়, তথাপিও যে উচ্চ সত্য তাহারা প্রচার করে, তৎসম্বন্ধে তাহারা আমাদের নিকট প্রামাণিক।

অতএব কোনও একটা সুপ্রচলিত পুরাণকথার আবরণের মধ্যে একেবারেই যে ঐতিহাসিক তথ্য নাই, একরূপ সিদ্ধান্ত ঝটিতি করিয়া ফেলা সঙ্গত নহে। অথচ সেরূপ তথ্যের সন্ধান যাবৎ নাও পাওয়া যায়, তাবৎ সেই পুরাণকথার কোনও মূল্য নাই, এমন নহে। কেন না আমাদের ব্যক্তিগত ও সমাজগত শিক্ষা ও সাধনার পক্ষে উহার যে প্রভাব, তাহা আমরা অসংশয়িতভাবে গ্রহণ করিতে পারি। কেন পারি, তাহা প্রবন্ধলেখক তত্ত্বদর্শী কার্লাইল সাহেবের উক্তি দ্বারা সুন্দররূপে ইঙ্গিত করিয়াছেন। কেবল অতীন্দ্রিয় ভাবেরই বস্তুত্ব আছে, উহার ঘটনাগত লীলার কোনও স্বতন্ত্র বস্তুত্ব নাই,—এই সত্য যদি হৃদয়ঙ্গম হয়, তবে পুরাণের কাছে শিক্ষা ও উদ্দীপনা গ্রহণ করিতে যাইয়া ইতিহাসের সুপারিস্ যোগাড় করা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া অনুভূত হয় না। প্রাচীন পুরাণকথক বা সূত যজ্ঞস্থলে দাঁড়াইবার পূর্ব্বে কেন যে অগ্রে প্রত্নতাত্ত্বিক হইবার জন্য একান্ত যত্ন করেন নাই ঘটনামূলক ইতিকথার উপর কেন যে প্রায়ই সময়োচিত আদর্শব্যাখ্যার আবরণ পড়িয়াছে— ঐ সত্যই তাহার হেতুস্থল।

আর একটা ভাবিবার কথা আছে। কালপ্রবাহে স্থূল ঘটনা যতই আমাদের নিকট হইতে দূরবর্ত্তী হইয়া যায়, ততই উহার মূর্ত্তি বদলাইয়া যায়। আবার লিপিবদ্ধ করিলেই উহাকে কালের হাত হইতে রক্ষা করা হয় না, কারণ যে ক্ষেত্রে মানুষ,—তাহার সম্পাদ

(১) গঙ্গার উৎপত্তি ও মর্ত্তে আগমন।

সগর রাজার পুত্রগণকে মহর্ষি কপিল কোপানলে ভস্মীভূত করেন। ঋষির ক্রোধ আতসবাজীর ন্যায়,—দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেও যতক্ষণ নিবিয়া যাইতেও ততক্ষণ। মহর্ষির ক্রোধাগ্নি শীতল হইবার পর সগর রাজার অপর পুত্র অংশুমান তাঁহাকে অনেক স্তবস্তুতি দ্বারা প্রসন্ন করিয়া ভস্মীভূত ভ্রাতৃগণের উদ্ধারের উপায় জানিতে চাহিলেন। ঋষিবর বলিলেন যে "গঙ্গাকে আনিয়া—তাঁহার জলে ইঁহাদের তর্পণ কর, সদ্গতি হইবে"। একে একে অসমঞ্জস, অংশুমান ও দিলীপ, এই তিন পুরুষ ক্রমান্বয়ে গঙ্গার নিমিত্ত বহু তপস্যা করিয়াও স্বর্গের গঙ্গাকে মর্ত্তে আনিতে পারিলেন না। না পারিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া তিনজনেই দেহ ত্যাগ করিলেন। তাহার পর ভগীরথের পালা। তিনি অল্পে ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। অতি কঠোর তপস্যা করিয়া তিনি প্রথমতঃ *পিতামহ ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিলেন। পিতামহ উপদেশ দিলেন যে গঙ্গাকে আনিতে* হইলে অগ্রে মহাদেবকে প্রসন্ন করা চাই। তিনি জটা পাতিয়া গঙ্গার বেগ ধারণ না করিলে পৃথিবীর সাধ্য কি যে সে বেগ ধারণ করে? পুনরায় কঠোর তপস্যা করিয়া ভগীরথ দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিলেন। মহাদেব ত স্বীকৃত হইলেনই, উপরন্তু গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিবার আশায় ও উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিলেন ও গঙ্গাকে ধারণ করিবার জন্য মাথা

রাজ্য, অট্টালিকা সমস্তই ধূলিসাৎ হইয়া যায়, সেখানে লিপি আর কতদিন টিকিতে পারে। তবে কি অতীত ঘটনার নিদর্শন রক্ষা করিবার কোনও উপায় নাই? নিশ্চয় আছে। সমাজ-জীবনে যাহা মৌলিক শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন, তাহারই যুগপরম্পরাগত সাধনায় যে ঘটনাকে খোদিত করিয়া রাখা যায়, সমাজ বাঁচিয়া থাকিতে তাহার স্মৃতি ও নিদর্শনের মৃত্যু নাই। এই জন্য আমাদের দেশে যাহা আধ্যাত্মিক ঘটনা নহে, তাহাকেও তদাকারে পরিণত করিয়া সুদীর্ঘ কালপ্রবাহে ভাসাইয়া রাখা হইয়াছে। যদি সেরূপ না করা হইত, তবে বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বেকার কোনও ঐতিহাসিক ঘটনার সন্ধান এদেশে মিলিত না। অতএব আমাদের দেশে প্রত্নতত্ত্বকে অনন্যশরণ হইয়া পুরাণের দ্বারস্থ হইয়া থাকিতে হইবে। শ্রদ্ধাহীন পাশ্চাত্যভাবভাবিত ইতিজ্ঞগণ কি সেরূপ করিতে পারিবেন?

শ্রদ্ধাসম্পন্ন,সনাতন আর্য্যাদর্শাভিজ্ঞ হইয়া,এবং পূর্ব্বাচার্য্য ও সন্তগণের চরিত্রাভিজ্ঞ হইয়া ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে পুরাণাদি পাঠ করিলে, গঙ্গাবতরণ প্রভৃতি ঐতিহ্যের মধ্যে প্রকৃত ঘটনারূপ মর্ম্মও উদ্ঘাটন করা যায়। কিন্তু "ইতিহাস বনাম রূপকে" প্রবন্ধলেখক রূপকের পক্ষে রায় স্পষ্টতঃ না দিলেও, কার্য্যক্ষেত্রে স্পষ্টই ইতিহাসকে বিশেষ আমল দেন নাই।

উঃ—সঃ—।

পাতিয়া বহিলেন। তখন ঝর ঝর করিয়া সেই নির্ম্মল, সুশীতল, উচ্ছল অমৃত-নিস্যন্দী প্রবাহ স্বর্গ হইতে সেই জ্ঞান-বৈরাগ্য-পবিত্রতার মহাতীর্থরূপ শিবের জটামধ্যে পড়িতে লাগিল। ঝর ঝর করিয়া সেই শীতল বারিকণাসম্পৃক্ত মলয়ানিল রুদ্রদেবের জটাজূট বিকম্পিত করিয়া সমবেত তেত্রিশকোটী দেবগণকে সুস্নিগ্ধ করিয়া বহিতে লাগিল। স্বর্গ, মর্ত্ত পাতাল, অবাক্ হইয়া সেই অপরূপ দৃশ্য দেখিতে লাগিল। কিন্তু সেই গভীর জটাজাল মধ্যে আবদ্ধ হইয়া গঙ্গাদেবী কলিকাতার রাজপথে সঙ্গীবিযুক্ত পথভ্রান্ত পঞ্চমবর্ষীয় বালকের অবস্থাপন্না হইলেন, অর্থাৎ পথ ভুলিয়া ঘুরিতে লাগিলেন। মহাদেবেরও তাঁহাকে ছাড়িবার কোন উদ্যোগই নাই। অগত্যা ভগীরথ বেচারাকে পুনরায় তপস্যা দ্বারা ভোলানাথকে তুষ্ট করিয়া মা গঙ্গার জটামুক্তির ব্যবস্থা করিতে হইল। জটাভ্রষ্ট গঙ্গাধারার শোভা ও তৎকর্ত্তৃক ভস্মীভূত সগর বংশের উদ্ধার ও পরিশেষে সাগরের সহিত মিলন অমর রামায়ণ কবির অমৃতময়ী ভাষাতে কিরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা আপনারা অবগত আছেন। এই ত গেল স্থূল আখ্যানটী। এখন ইহার মধ্যে অন্তর্নিহিত কোন সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বা রূপক আছে কিনা দেখা যাউক। আধুনিক শিক্ষিত জড়বাদী হয়ত বলিবেন, যে "ইহার ভিতর এমন আর কি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব থাকিতে পারে? হয়ত অতি পুরাকালে ভগীরথনামক কোন রাজার আমলে গঙ্গানদী আবিষ্কৃতা হন। হিমালয়ে তপস্যান্তে আনিয়াছেন, মহাদেবের জটাগহ্বরে ঘুরিয়া তবে বাহির হইয়া বঙ্গসাগরে পড়িয়াছেন, ওসব কেবল একটা প্রাকৃতিক ভূগোলের সুপরিজ্ঞাত তত্ত্বের উপরে গড়িকা প্রস্তুত অতিরঞ্জনমাত্র। গঙ্গানদী যে হিমালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন, একথা ত সামান্য স্কুলের অষ্টম বর্ষীয় ছাত্রেরাও জানে। আর নির্গত হইবার পথে ২।১টা বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ গহ্বর মধ্যে পড়িয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিবে ইহাই বা বিচিত্র কি? অবশ্য এ প্রাকৃতিক তত্ত্বটা সর্ব্বস্বীকার্য্য —ইহা লইয়া কেহ ঝগড়া বিবাদ করিতে চাহে না। কিন্তু কথাটা হইতেছে এই যে সামান্য প্রাকৃতিক তত্ত্বটীর উপর এক জন মহাকবি যে এতটা কবিত্ব খরচ করিলেন সেটা কি একেবারেই বাজে খরচ, না ইহা উপলক্ষ্য করিয়া কোন মহাভাবপূর্ণ শিক্ষা বা তত্ত্ব ফুটাইয়া তুলিতে চাহিলেন? যদি চাহিয়া থাকেন ত সেটী কি? ইহার পর্য্যালোচনায় আমোদও আছে লাভও আছে।

আমার বোধ হয় যে কবি এই গঙ্গার উৎপত্তি বর্ণনার উপলক্ষ্য করিয়া প্রেমের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য ব্যক্ত করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। প্রেমের স্নিগ্ধ

অমৃতপ্রবাহ স্বর্গ হইতে—ভগবানের রাজ্য হইতে—ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছে। প্রেম যে এ মর্ত্ত্যধামের নহে স্বর্গধামের, একথাটী পাশ্চাত্য কবি Scuthey ও নিজ ভাষায় ও ভাবে প্রকটিত করিয়াছেন :—

Its holy flame for ever burneth
From Heaven it came to Heaven returneth."

অর্থাৎ প্রেমবহ্নির পবিত্র শিখা কখনও নির্ব্বাপিত হয় না—স্বর্গ হইতে আসিয়া স্বর্গেই ফিরিয়া যায়। আমাদের উষ্ণপ্রধান দেশে যা কিছু শীতল তাই সুখদায়ক তাই শৈত্যবাচক উপমাই কবিদিগের প্রিয়। আমরা সুখ পাইলে আমাদের শরীর জুড়ায়, হৃদয় সুশীতল হয়, চন্দন রস, গিরিনির্ঝরতুষার সম্পৃক্ত মলয়ানিল, স্নিগ্ধছায় বৃক্ষাবলী, শীতল মাত্রই সুখদায়ক, হিমাংশু কবিদের চিরন্তন প্রিয় দেবতা; চিরতুষার মণ্ডিত নগাধিরাজ হিমালয় এখানে শ্রেষ্ঠতম তপস্যার স্থান। পক্ষান্তরে শীত প্রধান পাশ্চাত্য দেশের পক্ষে যাহা কিছু উষ্ণ তাহাই সুখদায়ক, তাহাই বাঞ্ছনীয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ। সেখানকার ভালবাসা, উষ্ণ আলিঙ্গনে (warm embrace) অভিব্যক্ত, প্রিয়জনকে উষ্ণ অভ্যর্থনা (warm welcome) দানে আপ্যায়িত করিতে হয় উপকারীকে উষ্ণ ধন্যবাদ (warm thanks) দানে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে হয়। অপিচ, উষ্ণগৃহ, উষ্ণবাতাস, উষ্ণ আহার্য্য, উষ্ণপানীয় সব রকম উষ্ণই বাঞ্ছনীয়। তাই সর্ব্বদেশের কবিকল্পনার শ্রেষ্ঠতম আরাধ্য বস্তু যে প্রেম তাহা আমাদের দেশে শীতল ধারা, আবার তাহাই পাশ্চাত্য দেশে জলন্ত অগ্নি শিখা।

যাক্, এখন আমাদের আসল কথাটাতে আসা যাউক। এই শীতল প্রেম-ধারা, এই স্বর্গের সামগ্রী, অতি কঠোর তপস্যার দ্বারাই প্রাপ্য—যেরূপ কঠোর সাধনা ও তপস্যা ভস্মীভূত পূর্ব্বপুরুষের উদ্ধারার্থ ভগীরথ করিয়াছিলেন, সেই রূপ। যখন শোক-দুঃখ-পাপতাপ-দিগ্ধ সংসারী জীবগণের জন্য রাজর্ষি ভগীরথের ন্যায় মহাপ্রাণের প্রাণ ব্যাকুল হয় ও এইরূপ সংযম, কঠোর তপস্যার মধ্যে আপনাকে ঢালিয়া দেয়, তখনই ভগবান তাঁহার তপস্যার চরিতার্থতা সাধনের ও সংসারের দগ্ধ প্রাণ জুড়াইবার জন্য স্বর্গ হইতে তাঁহারে প্রেমধারা পাঠাইয়া দেন। ভগীরথের ন্যায় কর্ম্মী অথচ সন্ন্যাসীরই এই প্রেমের ধারার অগ্রগামী পথপ্রদর্শক হইবার অধিকার, অপর কাহারও নহে। প্রেম যে উৎকট সাধনার ধন, কঠোর তপস্যার ধন, ভোগবিলাসের সামগ্রী নহে; এই কথাটী কবি এত করিয়া পরিস্ফুট করিতে গিয়াছেন। এই প্রেমের নিবাস সামান্য বিষয়াভিলাষী,

ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব, ভোগবিলাসপরায়ণ, সংসারীর হৃদয়ে নহে, এক স্বর্গ হইতে স্বর্গান্তরে ইহা আপনার আবাস খুঁজিয়া লয়। দিব্যধাম হইতে চ্যুত হইয়া মহাসন্ন্যাসী মহাদেবের গভীর জটাগহ্বরের মধ্যে আপনাকে ঢালিয়া তবেই ইহার তৃপ্তি। যেখানে ভোগ, যেখানে লালসা, যেখানে সঙ্কীর্ণতা, যেখানে অগভীরতা, যেখানে চাঞ্চল্য, যেখানে খণ্ডতা, যেখানে মৃত্যু সেখানে ইহার স্থান নাই—সে স্থানও ইহাকে ধারণ করিতে পারে না। যেখানে ত্যাগ, যেখানে কামবিজয়ী সন্ন্যাস, যেখানে জ্ঞান বৈরাগ্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ, যেখানে গভীরতা, যেখানে ধৈর্য্য, যেখানে পূর্ণতা, যেখানে মৃত্যুঞ্জয়িত্ব, সেখানেই ইহার বাস।* ইহাতে ইহারও থাকিয়া তৃপ্তি, আর যাঁহার মধ্যে ইনি থাকেন তিনিও আনন্দময়। সৎস্বরূপ, চিদ্‌ঘন মহাযোগী মহাদেব এই আনন্দপ্রবাহে ভোরপুর হইলে তবেই তাঁর সচ্চিদানন্দত্ব, ও তবেই এই বিশ্বেশ্বরের আনন্দস্ফূরিত তাণ্ডব নৃত্যে বিশ্বের সচলতা ও প্রাণস্পন্দন।

আমাদের বঙ্গকবি কৃত্তিবাস মহাকবি বাল্মীকির এই তত্ত্বটী বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার রামায়ণে এই অংশটী আরো কিছু ডালপালা দিয়া বিবৃত করিয়াছেন। হউক ডালপালা কিন্তু তাহাতে বৃক্ষের শোভা বর্দ্ধিত বই নষ্ট হয় নাই। তিনি মহাকবির মহাভাবের ভিতর প্রবেশ করিয়া ও তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই এগুলির সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং ঐ ভাবটী আরও সুন্দররূপে, আরও হৃদয়স্পর্শিরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রথমতঃ গঙ্গার উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন এইরূপঃ—গোলকে লক্ষ্মীসহ নারায়ণ বিরাজ করিতেছেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ আসীন—মহাদেব হরিপ্রেমে বিভোর হইয়া শিঙ্গাডুম্বুর বাজাইয়া গান করিতেছেন। সকলে নিস্তব্ধ, অবাক্ হইয়া ব্রহ্মাদিদেবগণ সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছেন। নারায়ণও ভাবাবেশে দ্রবময় হইয়া গেলেন। সেই দ্রবীভূত নারায়ণই পতিতপাবনী গঙ্গা। ব্রহ্মা সযত্নে সেই দ্রবময়ী পতিতোদ্ধারিণীকে আপন কমণ্ডলু মধ্যে রাখিলেন। কল্পনাটী যেমন মধুর তেমনি সুগভীর। প্রলয়ের দেবতা কালভৈরবের ভৈরবতানে সচরাচর বিশ্ব স্থির, সৃষ্টি নিশ্চল, নিস্পন্দ, দেশকাল লয়প্রাপ্ত—যা কিছু সব সেই মহাসঙ্গীতলহরীতে লীন—কেবল ঐ যে নবজলধরশ্যাম, অগাধ, অনন্ত প্রেমসাগর, এতক্ষণ স্থির নিশ্চল ছিলেন তাহাতে একটু হিল্লোল দেখা দিল, তাহাতে ভাবতরঙ্গ খেলিতে লাগিল—ক্রমে উদ্বেল,

* ইনি ভাল জায়গাতেই বাসা করেন, সেই জন্যই বুঝি ইহার নাম ভালবাসা।

উচ্ছল হইয়া এক অমৃতনির্ঝরিণী প্রবাহিত করিল। সংহারের দেবতার প্রেম-সঙ্গীতমন্থনে পালনের দেবতার ওতপ্রোত প্রেমামৃত মথিত হইয়া উঠিয়া সৃষ্টির বীজস্বরূপ সৃজনের দেবতার নিকট নিহিত রহিল। প্রেমময় ত্রিগুণাত্মক ভগবানের সৃষ্টিস্থিতিলয় সবই প্রেম। এই অমৃতময়ী ধারার বিন্দুমাত্র স্পর্শে মহাপাপীও উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। কান্তার মুনির ন্যায় আজীবন মিথ্যাচারী পাপাচারীও এই ধারা স্পর্শে অনায়াসে স্বর্গলাভ করিল। যাহার হৃদয়ে এক জনের নিমিত্তও প্রেম আছে সে ঐখানেই অজর অমর—সে অন্য হিসাবে অতি নীচ, অতি ঘৃণ্য হউক তাহার আর মার নাই—সে যে ঐ অমৃতবিন্দু স্পর্শ করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ ঐরাবত হস্তীর কথা।

প্রকৃত প্রেমের নিকট মত্ততা, দাম্ভিকতা, পশুভাব অসহায় তৃণ গাছটীর ন্যায় কিরূপে ভাসিয়া যায় তাহা এখানে কেমন নিপুণ ভাবে চিত্রিত রহিয়াছে। পরিশেষে সগরবংশের উদ্ধারান্তে গঙ্গার সাগরসঙ্গম। ভস্মীভূত সগর পুত্রগণকে উদ্ধার করিতে গঙ্গা শতমুখী হইলেন ও তদন্তে অপার বারিধি-বক্ষে লীন হইলেন। প্রেম সঙ্কীর্ণ বা সীমাবদ্ধ থাকিতে চায় না—সদাই আর্ত্ত দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার জন্য, পাপতাপদগ্ধগণকে জুড়াইবার জন্য, অবিশ্রান্ত ছুটিতেছে, যত ছুটিতেছে ততই ইহার প্রসার বৃদ্ধি—ক্রমে সর্ব্বতোমুখী, বিশ্ব-ব্যাপ্ত হইয়া অনন্তের মাঝখানে আপনাকে হারাইয়া ফেলে।

দেখা গেল কৃত্তিবাসের কল্পনাগুলি বাল্মীকির কল্পনার সঙ্গে বেশ খাপ খায়। বেশ করিয়া ঠুকিয়া ঠাকিয়া জোড়া দিলে কোন জোড়ের দাগ থাকে না, বেশ সুসঙ্গত, সমঞ্জস, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একটী রূপক পাওয়া যায়! প্রেম সাক্ষাৎ প্রেমময় ভগবানের পাদপদ্মনিঃসৃত, সংসারতাপে দগ্ধজীবগণকে জুড়াইবার নিমিত্ত মর্ত্ত্যধামে প্রেরিত। পাষাণ ভেদ করিয়াও আপনার গতি অব্যাহত রাখে। ইহাকে যে ধারণ করে সে সুমেরুগহ্বরতুল্য গভীর ও মহাদেব তুল্য সর্ব্বত্যাগী মহাযোগী। পাশবিক ভাব ইহার নিকট এক দণ্ডও টিকিতে পারে না। অতি কঠোর সংযম সাধনার দ্বারা ইহা প্রাপ্য। প্রেমের প্রসার শতসহস্রাভিমুখে দিগ্বিদিকে। শেষে আপনাহারা হইয়া ইহা অগাধে, অপারেই লীন হয়। ধন্য কল্পনা! যাহা স্বর্গ মর্ত্ত্যের এই নিবিড় সম্বন্ধের পরিচয় আমাদের দৃষ্টিগোচর করাইয়াছে। ধন্য কবি! যাঁহার এরূপ কল্পনা! ধন্য দেশ! যাহা এরূপ কবি প্রসব করিয়াছে! ধন্য আমরা! যাহারা এরূপ দেশে জন্মিয়াছি।

(২) সমুদ্র মন্থন।

অমৃতের নিমিত্ত দেবতারা অসুরদের সহিত সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন, এ কথা আমরা মহাভারতের আদিপর্ব্বে পড়িয়াছি। জড়বাদী ভূতত্ত্বজ্ঞেরা বলেন বহুকাল পূর্ব্বে একটা খণ্ড প্রলয় (Cataclysm) গোছ হইয়া গিয়াছিল—সমুদ্রে পর্ব্বতে একটা মহা তোলাপাড়া হইয়া গিয়াছিল। সেই খণ্ড প্রলয়টী অঘনঘটনপটীয়সী কবিকল্পনার ফেরে পড়িয়া এই সমুদ্রমন্থন বৃত্তান্তরূপে রূপান্তরিত। এখন দেখিতে হইবে কেবল মাত্র এই ব্যখ্যাতে তৃপ্ত হইতে আমাদের প্রাণ চায় কিনা। বৃত্তান্তটী সংক্ষেপে এই :—একদা দেবগণ সুমেরু শিখরদেশে বৈঠক করিয়া অমৃত প্রাপ্তির মন্ত্রণা করিতেছেন। এ তোমার আমার বৈঠক নহে—যে বুদ্ধিমান লোকে মন্ত্রণাটীর বিষয় শ্রবণ মাত্র সরাসর আমাদের বৈঠকটীকে বাগবাজারে বা বহরমপুরে উঠাইয়া লইবার পরামর্শ দিবেন। এ যে দেবতাদের বৈঠক, সুতরাং তাঁদের আগ্রহ দেখিবামাত্র নারায়ণ স্বয়ং আসিয়া ব্রহ্মাকে পরামর্শ দিলেন যে দেবগণ ও অসুরগণ একত্র মিলিত হইয়া জলধি-মন্থন করিতে থাকুন, তাহা হইলে অমৃত উঠিবে। আর এটাও ভাল করিয়া বলিয়া দিলেন যে তোমরা সমুদ্রমন্থন করিবে কিন্তু বহুবিধ ঔষধি ও রত্নসমূহ পাইয়াও যেন মন্থনে ক্ষান্ত হইও না। ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অনবরতই মন্থন করিতে থাকিবে। তাহা হইলেই পরিশেষে অমৃত লাভ হইবে সন্দেহ নাই। দেবগণ এই পরামর্শ প্রাপ্তি মাত্রই মন্দর ভূধরকে মন্থন দণ্ড, অনন্ত নাগকে মন্থন রজ্জু, ও কূর্ম্মরাজকে মন্থনদণ্ডের ভিত্তি করিয়া অসুরগণের সহিত মন্থন আরম্ভ করিয়া দিলেন। অসুরগণকে অনন্তের মুখের দিকে ধরিতে দিলেন ও নিজেরা তাহার পুচ্ছের দিক ধারণ করিলেন—এটী বোধ হয় বৃহস্পতির পরামর্শে। খানিকটা টানাটানি করিয়া সকলে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন ও "আর চলেনা" বলিয়া এলাইয়া পড়িলেন। তখন ব্রহ্মা নারায়ণের নিকট বল প্রার্থনা করিলেন। নারায়ণ বল দিলে তাঁহারা পুনরায় কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেলেন। এইবার পরিশ্রমের ফল ফলিল। যথাক্রমে কৌস্তভাদি মণিমাণিক্য, ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা, চন্দ্রমা, লক্ষ্মী, ওষধিসমূহ ও পরিশেষে অমৃত উত্থিত হইল। মন্থনকারীদের কিন্তু তখন বিষম ঝোঁক চাগিয়াছে—আর মন্থন ছাড়েন না—তাহার ফলে কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হইল "সধূম জলদগ্নির ন্যায় সেই ভয়ঙ্কর গরল ধরণীতল আকুল করিল। কালকূটের তীব্র গন্ধে ত্রিলোকী মূর্চ্ছিত হইল।" দেবগণ অসুরগণ পরিত্রাহি

ডাক ছাড়িতে লাগিল। হালে পাণি না পাইলে উপরওয়ালাদের নিকট আবেদন-নিবেদন করাটা ব্রহ্মারই কাজ, সুতরাং সেই সনাতন প্রথানুসারে পিতামহ এবারে দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন, কেননা এ সব মকদ্দমা বিশেষরূপে তাঁহারই এলাকাধীন। আর এমন ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলাই বা কে আর আছে? শ্মশানের হাড়গোড় ছাই ভস্ম ও বিষধর ফণী যাঁর ভূষণ, ভূত প্রেত যাঁহার সঙ্গী, বৃষভ যাঁর বাহন, গুতুরা সিদ্ধি প্রভৃতিতে যাঁর শরীরটী অষ্ট প্রহর আবকারিমহল হইয়া আছে, তিনি ছাড়া এই বিষের ধাক্কা আর কে সামলাইবে? ইহাতে অন্য লোকের পক্ষে মরণ বটে কিন্তু তাঁহার কাছে ইহা খেলামাত্র, বড় জোর বোঝার উপর শাকের আঁটিগাছটী বই আর কিছুই নয়। সুতরাং যাই ব্রহ্মার আরজী পেশ, অমনি আশুতোষ আসিয়া অম্লান বদনে, সোণাহেন মুখ করিয়া সেই কালকূট রাশি পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইলেন। ত্রৈলোক্য রক্ষা পাইল। দেবতারা বিষের ভাগ মহাদেবকে খাইতে দিয়া নিজেরা অমৃত পানের ব্যবস্থা করিতে গেলেন। এইবার যদি আমাদের স্থূল চর্ম্মচক্ষু দুটার উপর আমাদের চিরন্তন সম্বল, পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশনানুক্রমে প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক চশমাটী পরি, তাহা হইলে এই অপূর্ব্ব উপাখ্যানটীর অন্তর্নিহিত তত্ত্বটী উপলব্ধি করিতে পারিব। মানব-হৃদ্-সমুদ্রে দেবাসুরের—দৈবভাব ও আসুর ভাবের যে অষ্টপ্রহর মন্থন চলিতেছে, ইহা বোধ হয় সেই শিক্ষাই দেয়। অনন্ত বাসনারজ্জুর এক দিক ধরিয়া একবার দৈবভাব টান দিতেছে, আর এক দিক ধরিয়া আসুরভাব টান দিতেছে। উভয় প্রান্তের এই টানাটানিতে হৃদ্‌সমুদ্র অষ্টপ্রহর বিক্ষুব্ধ, আলোড়িত। মধ্যে মধ্যে আমরা যখন বহির্জ্জগত হইতে অবসর লইয়া অন্তর্জ্জগতের দিকে কাণ পাতিয়া থাকি, তখন এই আলোড়নের ভৈরব কল্লোল শুনিতে পাই—ইহার তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাত অনুভব করিতে পারি। কিন্তু এই বিপরীত দিকে আকর্ষণ বিকর্ষণ, এই "সু"তে "কু"তে সংগ্রাম, এ রিপুর সহিত নিয়মসংযমের দ্বন্দ্ব, এই অবিশ্রান্ত আলোড়নের ফলেই পরিণামে অমৃতোৎপত্তি। কেবল মন্দারের ন্যায় অটল, নিশ্চল, সুদৃঢ় বিশ্বাসরূপ মন্থন দণ্ড আবশ্যক ও জগদুদ্ধারকারী কূর্ম্মরূপী ভগবানের উপর সেই বিশ্বাসের ভিত্তি হওয়া প্রয়োজন। প্রথমেই কিছু অমৃত উঠে না—অনেক ধাপ ছাড়াইয়া না উঠিলে মনুষ্যমানুষ কিছু অমরত্বের কোঠায় উঠিতে পারে না, লক্ষ সিঁড়ি না ভাঙ্গিলে স্বর্গে উঠা যায় না। নানাদিক হইতে ঘা খাইয়া, নানাপ্রকার সংগ্রামে

ক্ষতবিক্ষত হইয়া তবে মানুষ দেবভাবে গড়িয়া উঠে। মূৰ্ত্তিহীন অসংস্কৃত শিলাখণ্ড নিপুণ ভাস্করের হাতে বাটালীর ঘা খাইয়া তবে সুন্দর মূৰ্ত্তিতে পরিণত হয়। মানুষও তাহার ভাস্করের হাতে অনেক ঘা খাইলে তবেই তাহার অন্তর্নিহিত দৈবমূৰ্ত্তিটী প্রকটিত হইয়া উঠে। এই ঘা খাইতে খাইতে গড়িয়া উঠার চরম বিকাশ—অসম্পূর্ণ মানুষের সম্পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবত্ত্ব সম্পাদন। সংগ্রামের স্তরে স্তরে জয়ী হইয়া তবেই জীবের শিবত্ব প্রাপ্তি, জীবাত্মার পরমাত্মায় উদ্বর্ত্তন। কোন স্তরে ঐশ্বর্য্যলাভ, কোন স্তরে বীর্য্যলাভ, কোন স্তরে শ্রী লাভ, কোন স্তরে বা যশোলাভ, চরম স্তরে জ্ঞানবৈরাগ্য লাভ। কৌস্তুভাদি মণি ঐশ্বর্য্যসূচক, ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা বীর্য্যসূচক, লক্ষ্মী ও চন্দ্রমা শ্রীসূচক, অমৃত যশঃসূচক কেননা যশস্বী লোকেরাই যথার্থ অমর এ কথা বোধ হয় আর বলিয়া না দিলেও চলে।* সর্ব্বশেষে কালকূট—এটীর সম্বন্ধে দুই একটী বিশেষ কথা বলিবার আছে। অমৃতলাভ করিলে মানুষ দেবতামাত্র—মৃত্যুঞ্জয়ী মহাদেব

* লেখক মহাশয় ভগবত্তাসম্পাদনের কথা লিখিয়াছেন। "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ, জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা"। অতএব প্রকৃত হিসাবে, কৌস্তুভাদি মণি ঐশ্বর্য্যসূচক, ঐরাবত উচ্চৈশ্রবা বীর্য্যসূচক চন্দ্রমা যশঃসূচক, লক্ষ্মী শ্রীসূচক, অমৃত বৈদিকসাহিত্যে সর্ব্বত্রই পরমার্থসূচক। দ্বন্দ্বরূপ কালকূটে সংসার কানায় কানায় ভরা, যিনি পরমার্থলাভ করিয়াছেন, জ্ঞানবৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া তাহাকে সংসারে থাকিতে হয়, শিবের মত দ্বন্দ্বরূপ কালকূট কণ্ঠে ধারণ করিতে হয়,—তা ছাড়া অন্য উপায় আর নাই।

ব্যক্তিগত সাধনার তত্ত্ব যেমন সমুদ্রমন্থনের দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে, তেমনি আমাদের আদিম বৈদিক সমাজের সাধনক্রমও এই উপাখ্যানের আবরণে ঐতিহাসিকের অজ্ঞ কালতরঙ্গে আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে। একসময় পৃথিবীপৃষ্ঠে চক্রবাল বা দিঙ্‌নাগ-বেষ্টিত মন্দারপর্ব্বতে স্থূলতঃ দ্বিবিধপ্রকৃতিসমন্বিত আদিম মানব বেদোক্ত অমৃতের সাধনায় প্রাণপণ করিয়াছিল, আদিযুগের সেই সাধনবৃত্তান্ত পুরাণ ধর্ম্মকথার আবরণে আমাদের নিকট পৌঁছিয়া দিয়াছে।

পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদ বলেন যে জীবপরিণামের ইতিহাসে যে সংগ্রাম বহু বহু যুগের পর একটা সিদ্ধি প্রসব করিয়াছে সেই সংগ্রাম অবশেষে উচ্চতর জীবের জীবনে সংক্ষিপ্তসার হইয়া অচিরকালব্যাপী ব্যক্তিগত চেষ্টার আকারে উদ্বর্ত্তিত হয়, যথা, সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া চলিবার চেষ্টা। মানবীয় সাধনার ইতিহাসেও সেই নিয়ম দেখা যায়। অতএব আদিম মানবসমাজের যে সাধনার বিবরণ "সমুদ্রমন্থনে" নিহিত রহিয়াছে, তাহাই কালে ব্যক্তিগত জীবনে উদ্বর্ত্তিত হইবার পথ খুঁজিতেছে। অতএব লেখক মহাশয়ের রূপক ব্যাখ্যানেরও সুসঙ্গতি আছে। উঃ—সঃ—

নয়। সুতরাং ঐখানেই থামিয়া যাইতে আর প্রাণ চায় না,—সংগ্রামের শেষ পৈঠা পর্য্যন্ত, বিকাশের শীর্ষ স্থান পর্য্যন্ত যাইবার জন্য আত্মার একটা প্রবল ছটফটানি ধরে। মাধ্যাকর্ষণনিয়মের বলে এই বৃহত্তর জগৎ যখন ক্ষুদ্রতর বস্তুকে আকর্ষণ করে, তখন পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বেগ বৃদ্ধি হয়, একথা সকলেরই জানা আছে। সেইরূপ জীবাত্মা পরমাত্মার যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে ততই আকর্ষণের বেগ বৃদ্ধি, তুতই সংগ্রামের তীব্রতা—সেই শেষ পৈঠার তীব্রতম সংগ্রামই হইল তীব্র কালকূট। এ কালকূটের জ্বালা বড় বিষম জ্বালা—এখন আর নিজের ধৈর্য্য, নিজের ঐশ্বর্য্য শ্রী—এ সব লইয়া সংগ্রাম নহে—এখন জ্ঞানে প্রেমে শক্তিতে সামঞ্জস্য ঘটাইবার, বিশ্ব সমস্যার উৎকৃষ্ট সমাধান করিবার, সংসারের আর্ত্তনাদ হাহাকার মিটাইবার, জীবের দুঃখ ঘুচাইবার দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি, প্রবল আকাঙ্ক্ষা, উদ্দীপিত হইয়া তীক্ষ্ণ হলাহলের ন্যায় প্রদৃপ্ত হইয়া অন্তরাত্মাকে জর্জ্জরীভূত করে। এই হলাহলের জ্বালায় বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব, যীশুখৃষ্ট ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেহ জ্ঞান বিলাইয়াও সর্ব্বজীবে দয়া প্রচার করিয়া, কেহ আচণ্ডালে প্রেম সুধা বিলাইয়া, কেহ বা জীবের কল্যাণকামনায় ক্রুশের উপর শরীরপাত করিয়া এই বিষের পরিপাক করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যখন অমৃত হলাহল সমদর্শী জ্ঞানবৈরাগ্যের আধার হইয়া এই কালকূট পান ও পরিপাক করিতে পারিবে, যখন নির্ব্বিকার হইয়া সকলের দুঃখ জ্বালা, বেদনা যাতনা বুক পাতিয়া লইতে পারিবে, তখন তুমি আর কেবলমাত্র অমর দেবতা নহ—তখন তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী, মৃত্যু অমরত্বের অতীত, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান মহাদেব, তখন তুমি সোঽহং বলিবার অধিকারী। এতক্ষণে সংগ্রাম থামিল—মন্থন বন্ধ হইল।

এই সংগ্রামে দুইটী বিশেষ কথা মনে রাখিতে হইবে—১ম, এলাইয়া হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। সংগ্রামে ক্লান্ত, অবসন্ন ক্ষতবিক্ষত হইতেছ? দুর্ব্বলের বল, অশক্তের শক্তি নারায়ণের নিকট প্রার্থনা কর, তিনি বল দিবেন। ২য়—অল্প লাভেই থামিলে চলিবে না। ঐশ্বর্য্য পাইলে? নিশ্চিন্ত হইও না—মন্থন চলুক। বীর্য্যলাভ করিলে? থামিও না—সংগ্রাম চলুক—ক্রমে শ্রীলাভ —অমৃতরূপ যশোলাভ করিলে? মন্থন যেন বন্ধ না হয়—এখনও তোমার কাজ বাকি আছে—এখনও হলাহল পাও নাই। হলাহল উঠিল? বড় জ্বালা? বড় যন্ত্রণা? ত্রিলোকের পাপতাপনাশন, অমৃতহলাহলসমদর্শী, ত্যাগীশ্রেষ্ঠ মহাযোগী মহাদেবের শরণাপন্ন হও—তিনি তোমার বিষপান করিয়া তোমায়

সকল জ্বালা-যন্ত্রণা দূর করিয়া নিশ্চিন্তে, স্বচ্ছন্দে তোমাকে তোমার আহৃত অমৃত উপভোগ করিতে দিবেন—তিনি তোমাকে দেখাইয়া দিবেন আত্ম-ত্যাগেই আত্মোৎকর্ষের চরম পরিণতি, অমৃতহলাহলের সেতুতে জীবাত্মা পরমাত্মার ব্যবধান দূরীকৃত।

পাশ্চাত্য মহাকবি টেনিসনের একটী অপ্রকাশিত ক্ষুদ্র কবিতা হইতে এই সুন্দর আধ্যাত্মিকভাবের বেশ একটু ঝঙ্কার পাইয়াছি। জানিনা তিনি আমাদের এই গভীর ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়া লিখিয়াছিলেন কিনা, তথাপি তাঁহার কবিতাটী এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না :—

"To———————"

"Thou may'st remember what I said
When *thine own spirit* was at strife
With thine own spirit, from the tomb
And charnel-place of purpose dead,
Through spiritual dark we come
Into the light of spiritual life.'
"*God walked the waters of thy soul*
And stilled them When from Change to Change
Led silently by power devine,
Thy thought did scale a purer range
Of prospect up to self-control,
My joy was only less than thine."

একটু প্রণিধান করিলেই বেশ বুঝা যাইবে যে "thine spirit was at strife with thine own spirit"—সেই হৃদ্‌সমুদ্রের মধ্যে দেবাসুরের বিপরীত দিকে টানাটানি বই আর কিছুই নয়। তাহার পর "God walked the waters of they soul and stilled them"—ইহাতেও ঈশ্বরত্ব লাভ হইলে মন্থনের বিরাম বেশ স্পষ্টভাবেই সূচিত হইতেছে—আর "Led silenlty by power divine"—ইহাও মন্থনকালে সেই নারায়ণ কর্ত্তৃক বলদান। পাশ্চাত্য প্রদেশে এরূপ কবিতার আদর হইবে না এই ভাবিয়াই বুঝি কবি এটীকে প্রকাশিত করেন নাই। প্রেরণাবলে ভাবজগতের শীর্ষস্থানে আসিয়া

পৌঁছিলে, আর প্রাচ্য ভাবের ও পাশ্চাত্যভাবের কোন প্রভেদ থাকে না—ইহা হইতে এটীও বেশ উপলব্ধ হয়।

এইবার পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের একটী সুন্দর গল্প উদ্ধৃত করিয়া উপসংহার করিব। "এক জন কাঠুরে বনে কাঠ কাট্‌তে গিছ্‌লো। হঠাৎ একজন ব্রহ্মচারীর সহিত দেখা হ'ল। ব্রহ্মচারী বল্লেন "ওহে এগিয়ে পড"। কাঠুরে বাড়ীতে ফিরে এসে ভাবতে লাগ্‌লো, ব্রহ্মচারী এগিয়ে যেতে বল্লেন কেন?

"এই রকমে কিছুদিন যায়। একদিন সে বসে আছে, এমন সময় সেই ব্রহ্মচারীর কথাগুলি তাহার মনে পড়লো। তখন সে মনে মনে বল্লে আজ আমি আরও এগিয়ে যাব। বনে গিয়ে আরও এগিয়ে দেখে যে অসংখ্য চন্দনের গাছ। তখন আনন্দে গাড়ী গাড়ী চন্দনের কাঠ নিয়ে এলো, আর বাজারে বেচে খুব বড় মানুষ হ'ল। এই রকমে কিছু দিন যায়। আবার একদিন মনে পড়লো, ব্রহ্মচারী বলেছেন এগিয়ে পড। তখন আবার বনে গিয়ে এগিয়ে দেখে, নদীর ধারে রূপোর খনি। একথা কখন সে স্বপ্নেও ভাবেনি। তখন সে খনি থেকে কেবল রূপো নিয়ে গিয়ে বিক্রী কর্‌তে লাগলো। এত টাকা হল যে আণ্ডিল হয়ে গেল।

"আবার কিছুদিন যায়। একদিন বসে ভাবছে, ব্রহ্মচারী ত আমাকে রূপোর খনি পর্য্যন্ত যেতে বলেন নি—তিনি যে আমাকে এগিয়ে যেতে বলেছেন। এবার নদীর পারে গিয়ে দেখে সোণার খনি। তখন বল্লে ওহো! তাই আমাকে ব্রহ্মচারী বলেছিলেন এগিয়ে পড।

"আবার কিছুদিন পরে এগিয়ে দেখে হীরে মাণিক রাশীকৃত হয়ে পড়ে আছে। তখন তার কুবেরের ঐশ্বর্য্য হল।

"তাই বলছি, যা কিছু করনা কেন, এগিয়ে গেলে আরো ভাল জিনিষ পাবে।"

আমরা দেখিলাম, মহাপুরুষের এই "এগিয়ে পড" নীতি অবলম্বন করিয়া দরিদ্র, দুর্ব্বল, অসম্পূর্ণ, মর্ত্ত্য মনুষ্য কেমন করিয়া ক্রমে ক্রমে দেবত্ব ও চরমে মহাদেবত্ব লাভ করে। যতদিন না এই হীরকের খনি এই ষড়ৈশ্বর্য্যের খনি লাভ হয় ততদিন এই "এগিয়ে পড়ার," এই সাগরমন্থনের বিরাম নাই। পাশ্চাত্যবাদীরা বলেন, হিন্দুধর্ম্ম লোককে অলস, কর্ম্মবিমুখ, প্রাণহীন, জড়বৎ করিয়া দেয়। যাঁরা এই কথা বলেন তাঁরা হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে যে সমুদ্রমন্থন উপা-

খ্যানের ন্যায় কত অপূর্ব্বশিক্ষা ছড়ান আছে, তাহা না দেখিয়াই—হিন্দুধর্ম্মের শাঁস না খাইয়া কেবল খোসা খাইয়াই,—এই কথা বলেন। জগতের কোন্ ধর্ম্ম এই সমুদ্রমন্থনের ন্যায় জীবনসংগ্রামের উপযোগী, উচ্চতম আদর্শপূর্ণ অমূল্য শিক্ষা দেয়? এইরূপ কত অমূল্য উপদেশ হেলায় খোয়াইয়া আমরা কথামালার সেই কুক্কুরের ন্যায় সারবস্তু ফেলিয়া অসার প্রতিবিম্বের প্রতি ধাবমান হইতেছি তাহা কে বলিতে পারে?

ভারতের সাধনা।

(৬) নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—সমাজ।

"আমি যে প্রণালীতে কাজ করিতে চাই তাহা এই,—আমি হিন্দুদিগকে বুঝাইতে চাই যে যাহা বরাবরই তাহাদের আছে তাহার কিছুই তাহাদিগকে বর্জ্জন করিতে হইবে না, কেবল ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যগণ যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, সেই পথেই তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, বহুশতাব্দীর দাসত্ব-জনিত জড়তা তাহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে। মুসলমানবিজয়ের সময় অবশ্যই আমাদিগকে যাত্রা বন্ধ করিতে হইয়াছিল, কারণ অগ্রসর হওয়ার কথা দূরে থাক, তখন জীবনমরণ সমস্যা উপস্থিত। সে সমস্ত নিষ্পেষণ এখন আর নাই, অতএব এখন আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, কিন্তু সে অগ্রসর হওয়া সমাজত্যাগিদের অথবা পাদরিদের নির্দ্দেশমত ধ্বংশপথে অগ্রসর হওয়া নহে, আমাদেরই নিত্যনির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হওয়া। গৃহনির্ম্মাণ এখনও শেষ হয় নাই, তাই প্রত্যেক স্থানই কদর্য্য দেখাইতেছে। বহুশতাব্দীর নির্য্যাতনের মধ্যে আমাদিগকে গঠন কাজ বন্ধ করিতে হইয়াছিল। এখন এস, আবার গৃহনির্ম্মাণ কাজ সমাপ্ত কর, দেখিবে প্রত্যেক স্থান কদর্য্য না থাকিয়া সুসঙ্গতিলাভে সৌন্দর্য্যে বিমণ্ডিত হইবে। ইহাই আমার অভিপ্রেত কার্য্যপ্রণালী।" *

বেদাদি শাস্ত্রের সাহায্যে আমাদের দৃষ্টি অতীতে যতদূর অগ্রসর হইতে

* ১৮৯৫ খৃঃ চিকাগো হইতে লিখিত স্বামী বিবেকানন্দের একখানি ইংরাজী পত্র হইতে উদ্ধৃত ও ভাষান্তরিত হইল।

পারে, তাহাতে বুঝা যায় যে প্রাচ্য ভূখণ্ডের কোনও স্থানে মানুষের আদিম অবস্থা হইতেই বিশ্বরহস্যের প্রতি গভীর জিজ্ঞাসার ভাব মানবহৃদয়ে উদ্রিক্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বস্মৃতি বা সংস্কার বলিতে যাহা বুঝায়, যাহা অন্তর্নিহিত তাহারই প্রকটন বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাই আদিম মানুষের জীবনবিকাশে দেখা যাইতেছে, হাজার ঘষামাজায় পশুত্ব, অর্থাৎ মনুষ্যত্বের অভাব, মনুষ্যত্বে পরিণত হয় না। যাহা পূর্ব্বে একসময় (বা এক কল্পে) ছিল, যাহা আমাদের দৃষ্টিতে বীজাকারে পরিণত হইয়াছিল বলা যায়, তাহাই আবার বিকাশ পায়। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, "every evolution is the outcome of a preceding involution,"—প্রত্যেক অভিব্যক্তি বা বিকাশ পূর্ব্ববিহিত সঙ্কোচনের ফল বা কার্য্যস্বরূপ।

সে যাহা হউক, সেই আদিযুগে মানুষ আপনার সংসারসুলভ অভাবাদি মোচন করিতে করিতে বিশ্বরহস্যকে ভুলিতে পারে নাই,—নানামতে উহাকে উদ্ঘাটিত করিবার জন্য যত্ন করিয়াছে। সেই চেষ্টা, সেই যত্ন আজও বেদমন্ত্রে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আবার এই চেষ্টার একটীমাত্র ধারা যে খুব সামান্য একটী রেখাপাত হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ—পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদের হিসাব নিকাশ দিতে দিতে—একটী বৃহৎ প্রবাহে পরিণত হইয়াছে, তাহা নহে। সরল কৃষকের আবেগবিজৃম্ভিত গাথা যে যজ্ঞকর্ম্মে পরিণত হইয়াছে, আবার যজ্ঞকর্ম্ম যে জ্ঞান ও ভক্তির সাধনায় পরিণত হইয়াছে, তাহা নহে। বিশ্বরহস্যের সম্মুখীন হইয়া মানুষ প্রথম হইতেই নানাভাবে উহার মীমাংসা খুঁজিতে ধাবমান হইয়াছে। প্রথম হইতেই রহস্যভেদের চেষ্টা নানাবিধ ধারায় আদিম মানবসমাজে উৎসারিত হইয়াছে। এমন কি সেই ধারাগুলি সমস্তই যে বেদসঙ্গমে পৌছিয়াছে, তাহা নহে, তবে বেদের মধ্যে যে উহাদেরই একটী বৃহৎ সম্মিলিত ধারা নিজ প্রবাহ রক্ষা করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই প্রথমনিঃসৃত ধারাসমূহের মধ্যে কতকগুলি নিশ্চয়ই সম্প্রদায়বিশেষের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্ববিকাশের সেই আদিকেন্দ্র হইতে নানা দেশখণ্ডে সমানীত হইয়াছিল। যেমন অনুমান করা যায় যে ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়া মানুষের প্রথম উদ্যমেই ভাববৈচিত্র্য নিহিত ছিল, তেমনি ইহাও বুঝা যায় যে ভাবের বৈষম্যের সঙ্গে সঙ্গে বাসেরও বৈষম্য ঘটিয়াছিল। উহাকে উপনিবেশ বলিতে হয় বল, কিন্তু ইহা একপ্রকার সুনিশ্চিত যে পৃথিবীর ইতিহাসে একটী কেন্দ্রে প্রথমতঃ মনুষ্যত্বের উন্মেষ হইয়া ক্রমশঃ নানা দেশখণ্ডে সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছিল।

আধুনিক Geology বা ভূতত্ত্ববিজ্ঞানের সাহায্যে বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ধরাপৃষ্ঠে মনুষ্যবাসযোগ্য ভূমির সম্ভাবনা দেখা যায়; আবার পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদ জীবতত্ত্বের বিচারে পশুজীবনের একটা সীমান্ত রেখা খুঁজিয়া পাইয়াছে। অতএব আধুনিক বিজ্ঞান একটা যুগের সংবাদ দিতেছে, যখন পৃথিবীর নানা স্থান এমন একটা জীবের দ্বারা অধিকৃত ছিল যাহারা না মানুষ, না জানোয়ার। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ঠিক এইখানে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং স্বীকার করিতেছে যে মনুষ্যত্বে পৌছিবার আর একটী মাত্র সোপানের সন্ধান আর কোন মতে পাওয়া যাইতেছে না। জড়বাদ সে সন্ধান কি করিয়া পাইবে বল, কারণ জড়বাদ যে হলপ করিয়া বসিয়াছে যে সে স্থূল হইতেই সূক্ষ্মের বিকাশ বা উৎপত্তি প্রমাণ করিবে।

যথাসম্ভব পরিণতমস্তিষ্ক, নরাকারপ্রায় পশুকে মানুষ বলা যায় না, একটা অভাবের জন্য। মানুষের এমন একটা বোধশক্তি খুলিয়া গিয়াছে, যাহা সেই নরতুল্য পশুতে বিকাশ পায় নাই। বিশ্বরহস্যের মধ্যে অবস্থিত হইয়াও পশুর সেই রহস্যের হুঁস থাকে না, মানুষের থাকে,—ইহাই পশুত্ব ও মনুষ্যত্বের প্রভেদ বা ব্যবধান। সেই বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে দিন নরাকারপ্রাপ্ত জীবের প্রাণে সেই হুঁস উদ্রিক্ত হইয়াছিল, সেই দিন হইতে সে মনুষ্যপদ লাভ করিয়াছে। পরমহংসদেব মানুষ বলিতে কি বুঝায় তাহা এই হুঁস শব্দে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। জীবতত্ত্বের বিচারে যত উন্নতি হইবে, ততই তাঁহার সেই তত্ত্বকথা প্রমাণিত হইবে সন্দেহ নাই।

স্থূল বিশ্বের পশ্চাতে যে সদ্বস্তু আছে এবং তাহা মানবের উপাস্য ও ও জিজ্ঞাস্য—এই ভাবটী নানা আকার ধারণ করিয়া মনুষ্যত্ববিকাশের একটী কেন্দ্র হইতে পৃথিবীর তদানীন্তন পশুপ্রকৃতি নানা জাতির মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল। * হয়ত তাহারও পূর্ব্বে মৃতপিতৃপিতামহাদির পূজা বা জড়ে চৈতন্য

* আরও পরিস্কুটভাবে বলিতে হইলে, বলা যায় যে, মানুষী প্রকৃতি ও ভাবের অতিরিক্ত হীন স্বভাববিশিষ্ট জীব সকলের দ্বারা পৃথিবীর অন্যান্য স্থান এক সময় অধিকৃত ছিল। নরাকার জীব যখন পৃথিবীতে অভিব্যক্ত হইল, তখন উহাদের স্বভাব যে বিচিত্র ছিল তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সৃষ্টিতে প্রকৃতির প্রতিপদক্ষেপে বৈচিত্র্য রহিয়াছে। অতএব শাস্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্বে যক্ষরাক্ষস অসুর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরাদি নানা জীবের সৃষ্টি যে নানা ভাবের স্থূলবিকাশ বলিয়া বর্ণিত হয়, তাহা খুবই যুক্তিযুক্ত; যথা—শ্রীমদ্ভাগবত, ৩য় স্কন্দ ২০ অধ্যায়। পৃথিবী এরূপ নানাভাবের বিকাশক্ষেত্র। আদিযুগে এইরূপ বিকাশগত প্রভেদ খুবই

কল্পনা প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানের দ্বারা নানা স্থানে উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছিল, কিন্তু একটী বিশেষ যুগ হইতে সমগ্র বিশ্বরহস্যের মূলে স্থূলাতীত সত্তার উপলব্ধি মানুষ যে করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সেই উপলব্ধি ধর্ম্মমতের আকার ধারণ করিয়া একটী কেন্দ্র হইতে ভূপৃষ্ঠে সঞ্চালিত হইয়া পশুকে মানুষে পরিণত করিয়াছে। যে ভূকেন্দ্র হইতে এইরূপ মনুষ্যত্বপরিণামের হেতুভূত ধর্ম্মভাবের তরঙ্গ humanising waves of spirituality) জগতে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার কথা বেদই স্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দেয়।

জগৎ-রহস্যভেদের সেই আদিম উদ্যম হইতে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের উৎপত্তি। বৈদিক যুগের মধ্যেই ঐ উদ্যমকেন্দ্র যে ভারতের বিশেষ বিশেষ স্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে তাহাও বেদ হইতেই বুঝা যায়। স্থান সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত কিছু না পাইলেও, এইটুকু সুনিশ্চিত পাওয়া যায় যে, বেদ যে সাধনার ফল তাহার মূল ধারাটী ভারতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই ধারার অনুসরণ করিয়াই আমরা ভারতীয় সমাজের উদ্ভব ও পরিণাম প্রত্যক্ষ করি।

ঋষিসঙ্ঘই ভারতীয় বেদবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারক। জগতে মনুষ্যত্বসূচক প্রথম উদ্যমের পৌর্ব্বাপর্য্য ঋষিরাই রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই প্রথম উদ্যমের যুগকে সত্যযুগ বলিয়াছেন। সেই সত্যযুগে দেখিতেছি জগতে মনুষ্যত্বের ভিত্তি যেন প্রোথিত হইতেছে। জড়ত্ব ও পশুত্বের পরাজয়ে মনুষ্যত্বরূপ বিজয়নিশান ভূপৃষ্ঠে প্রোথিত হইতেছে। জড় ও পশু যে জগৎরহস্যের নিকট অন্ধদাসত্বে আবদ্ধ ছিল, জগৎরহস্যের উদ্ঘাটনে সেই দাসত্ব তিরোহিত হইতেছে। মনুষ্যাবির্ভাবের পূর্ব্বে জীব বাসনাপূরণে কেবলই মৃত্যু ও ভয়ের দ্বারা অনিবার্য্যরূপে বিড়ম্বিত হইয়া আসিয়াছে, মানুষ জন্মিয়াই অমৃতত্ব ঘোষণা করিল,—বলিল, "য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরোবিমৃত্যুর্বিশোকোঽবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্য স বিজিজ্ঞাসিতব্য স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতীহ প্রজাপতি-

---

সুপরিস্ফুট ছিল, ক্রমশঃ সংমিশ্রণ ও আদানপ্রদানাদির দ্বারা ভেদরেখা ম্লান হইয়া মানুষের প্রকৃতিতে জটিলতা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আদিযুগে নানা ভাববিশিষ্ট জীবের মধ্যে [illegible] একটী স্থানে যে প্রকৃত মানুষভাবাশ্রিত, অথবা দৈবীপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্রহ্মসাধকদের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা উচ্চাবচ ভাববৈচিত্র্যের নিত্যত্ব হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে। ইতি—

লেখকস্য।

রুবাচ।" প্রজাপতি বলিয়াছেন, সেই আত্মাকে অন্বেষণ কর, জানিবার চেষ্টা কর, যিনি অপাপ, অজর, অমর, অশোক, ক্ষুধাপিপাসাহীন, সত্যকাম ও সত্য-সঙ্কল্প। তাঁহাকে বিচার দ্বারা জানিলে সমস্ত লোক ও সমস্ত কামনা লাভ করা যায়।

মনুষ্যেতর জীবসুলভ এই পাপ, জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধাপিপাসা, বিফলতা, নৈরাশ্য প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিজয়ঘোষণা করিয়া আত্মবাদরূপ ভিত্তির উপর ভারতীয় সমাজ বৈদিকযুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই আত্মবাদের ভিত্তি, এই মনুষ্যত্বের ভিত্তি পৃথিবীতে প্রোথিত করিবার জন্য সত্যযুগ অবতীর্ণ হইয়াছিল। সেই যুগোচিত উদ্যমে উদ্যোক্তার নাম ঋষি বা ব্রাহ্মণ, সে যুগে অন্যপ্রকার উদ্যমের অবকাশ নাই, সেই জন্য চাতুর্ব্বর্ণ্যও নাই। তপোপ্রভাবে ধরার বহুকালপুষ্ট পশুত্বকে নিরাকৃত করিয়া পূর্ব্বকল্পলব্ধ সিদ্ধির পুনঃপ্রকাশই সত্যযুগোচিত উদ্যমের বিশেষ লক্ষ্য।

"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি, ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ"—যদি ইহসংসারেই ব্রহ্মকে জানা হয়, তবেই সত্যতা বা নিত্যতা থাকে, নতুবা ইহসংসারে তাহাকে না জানিলে সর্ব্বনাশ। সত্যযুগের এই অমৃতত্বপ্রয়াসী ঋষিসমাজ ব্রহ্মসাধনার দ্বারা বাস্তবিকই আপনাকে জগতে অমর করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর আর কোনও সমাজই অমৃতত্বপ্রয়াসী হইয়া ব্রহ্মসাধনাব্যপদেশে আপনাকে গড়িয়া রাখিয়া যান নাই। সেই জন্য ইতিহাস কেবল সেই ঋষিপ্রতিষ্ঠিত সমাজের অমরত্ব ঘোষণা করিতেছে। সেই সমাজের ব্রহ্মলাভই একমাত্র লক্ষ্য ছিল,—তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ—আর সমস্ত প্রসঙ্গ পরিহার করিয়া একমাত্র ব্রহ্মেরই সাধনা কর, কেন না তিনিই যে অমৃতের সেতুস্বরূপ। এই মৃত্যুসঙ্কুল সংসাররহস্য ভেদ করিয়া ব্রহ্মসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার জন্যই ভারতে সেই সত্যযুগে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ব্রহ্মই সে সমাজের লক্ষ্য ছিল, আবার ব্রহ্মই সে সমাজের প্রতিষ্ঠা ছিল,—অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়।

আর একটী ভাবিবার কথা এই যে সেই আদিযুগের সমাজ আপনার বিশেষত্ব আপনি বুঝিত। ইংরাজীতে যাহাকে বলে Self-consciousness বা অস্মিতা, তাহা ঐ সমাজের মধ্যে দেখা যাইতেছে। এই আত্মবোধ বা অস্মিতার নিদর্শন দেব ও অসুরের ভেদস্বীকার। ছান্দোগ্য উপনিষদে ইন্দ্র-বিরোচনের যে আত্মবিদ্যাশিক্ষার উপাখ্যান আছে, তাহাও এই বিষয় সাক্ষ্য

দিতেছে। আপনাদিগকে দেবজাত ভাবিয়া একটা বিশেষত্ব স্বীকার করা সেই আদিযুগে সমাজগঠনের মূলে বিদ্যমান ছিল। পৃথিবীর যে সমস্ত জাতি প্রথম মনুষ্যত্ববিকাশে এক কেন্দ্র হইতে ধর্ম্মলাভ করিয়াও প্রবৃত্তিপরায়ণতার জন্য ব্রহ্মৈকলক্ষ্য হইতে পারে নাই, অতএব অমৃতত্বও লাভ করে নাই, তাহাদিগকে অসুর বলা হইত। অসুররা উপাসক ছিল, নিবৃত্তির সাধনাও কতকপরিমাণে করিত, কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিত না, সুতরাং প্রবৃত্তি বা ভোগভাবের বশ্যতাই শেষে স্বীকার করিত। এই সমস্ত অসুরনামধেয় মনুষ্যশ্রেণীর সহিত ঋষিদের পূর্ব্বপুরুষ দেবতাগণ যে প্রায়ই বিবাদবিরোধে জড়িত হইতেন, তাহা বেদ ও পুরাণে পাওয়া যায়। তবে বৈদিকযুগ হইতেই পুরাণের সেই সমস্ত উপাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কথকদের ধারণানুরূপ বর্ণনাযোগে অল্পে অল্পে রূপান্তরিত হইয়া যাওয়ায়, এখন উহা হইতে পুরাতত্ত্বের উদ্ধার করা খুবই কঠিন।

যাহা হউক একটা সমাজের উদ্ভব সেই আদিযুগ হইতেই স্পষ্টভাবে অনুমিত হইতেছে। যে মূল প্রয়োজনের প্রেরণায় এই সমাজ গঠিত হইয়াছিল তাহা আমরা দেখিয়াছি। প্রয়োজনের প্রেরণাশক্তির উপরই সমাজের উৎপত্তি ও পরিণতি নির্ভর করে। অতএব সেই ভারতীয় সমাজের পরিণতি বুঝিতে হইলে, কালাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নব নব প্রয়োজনের বিকাশেও সেই সমাজ আপনার মূল প্রয়োজনসিদ্ধির উপর কিরূপে পদে পদে স্থিতিলাভ করিয়া আসিয়াছে, তাহা যথাসম্ভব বুঝিয়া দেখিতে হইবে।

জগৎরহস্যভেদরূপ যে যজ্ঞে জগতে মনুষ্যত্বের বিকাশ হইল, সেই যজ্ঞাগ্নিকে একমাত্র ভারতীয় সমাজ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন,—উহাকে যুগে যুগে নির্ব্বাপিত হইতে দেন নাই। ব্রহ্মসাধনারূপ এই যজ্ঞাগ্নির রক্ষাব্যপদেশে ভারতীয় সমাজের উৎপত্তি হইল। অতএব এই মূল প্রয়োজনের সাধনায়ই ঐ সমাজের উদ্ভব ও স্থিতি। কিন্তু কালে নানা গৌণ প্রয়োজন একে একে দেখা দিতে লাগিল, এবং উহাদের সাধনব্যপদেশে সমাজের স্থিতিমূলক পরিণাম ঘটিতে লাগিল। চতুর্ব্বর্ণভেদ এইরূপ একটী পরিণাম। যে ব্রহ্মসাধনরূপ যজ্ঞাগ্নির কথা বলিয়াছি, কেবল মাত্র ইন্ধনসংযোগ করিয়া গেলেই ত উহাকে রক্ষা করা হইবে না। বহিঃশত্রু বা আততায়ী যথেষ্ট আছে। তাহাদের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে, বাহুবল এবং বিক্রম প্রকাশ করিবার একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত রাখা চাই। এই প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য ক্ষত্রিয়শক্তিকে ক্রমশঃ ঋষি-

প্রতিষ্ঠিত সমাজের অঙ্গীভূত করা হইল। এই ক্ষত্রিয়গণ সম্পূর্ণরূপে ঋষিদিগের নির্দ্দেশ মানিয়া চলিত। সমাজ ইহাদের সাহায্যে বহিঃশত্রু হইতে আপনাকে ও আপনার সাধনাকে রক্ষা করিত এবং আপনার মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা যেখানে বলপ্রয়োগে রক্ষা করিতে হয়, সেখানে সেইরূপে উহা রক্ষা করিত। বৈশ্যবর্ণের উদ্ভব ও পরিণাম সমাজে গ্রাসাচ্ছাদনমূলক কৃষিশিল্পাদির অনুশীলন ও উৎকর্ষের অনুরোধে। সমাজের পক্ষে উহাও একটী অলঙ্ঘনীয় প্রয়োজন। চতুর্থতঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যাদি গৃহস্থদিগের জন্য নীচজাতি হইতে সমাজ দাস সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়াছিল।

গীতা বলিয়াছেন যে গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্ট হইয়াছে। গুণ বলিতে সত্ত্বরজতমাদি গুণান্বিত মানুষের স্বভাব বুঝায়। কর্ম্ম বলিতে সামাজিক প্রয়োজনাদির পূরণ বুঝায়। অতএব দুইটী লক্ষণের দ্বারা মানুষের বর্ণ স্থিরীকৃত হইয়াছিল। প্রাচীন সমাজ চারিটী প্রয়োজন বা function স্বীকার করিত, একটী—মূলরক্ষা অর্থাৎ মূল প্রয়োজনসিদ্ধির ব্যবস্থা, দ্বিতীয়—আবশ্যকমত বলবিক্রমপ্রকাশের ব্যবস্থা, তৃতীয়—দেহধারণ পোষণের উপকরণাদির ব্যবস্থা, চতুর্থ—অবান্তর সেবাদি কার্য্যের ব্যবস্থা। এই চতুর্বিধ প্রয়োজনসাধনের উপযোগী চতুর্বিধ মনুষ্যস্বভাব আছে। অতএব প্রাচীন সমাজ উপযুক্ত প্রয়োজনের পূরণার্থ উপযুক্ত স্বভাববিশিষ্ট লোকদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিল। ঋষিগণ বহুযুগ ধরিয়া সমাজের মূল প্রয়োজনটী সাধন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের স্বভাব ঐ সাধনার জন্য বংশপরম্পরায় গঠিত হইয়া গিয়াছিল। ইহাদের দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে বৃত্তিকে বংশগত করায় প্রাচীন সমাজে সুবিধাই হইয়াছিল। মানুষের মধ্যে গুণগত ভেদ নির্ণয় করিবার পক্ষে জন্মই প্রধান মীমাংসক। মানুষ যে আপনার সংস্কারানুযায়ী জন্ম পরিগ্রহ করে, এই প্রাকৃতিক নিয়মের উপর প্রাচীন সমাজের যথেষ্ট আস্থা ছিল। অতএব সেই প্রাচীন যুগে সমাজ যখন নূতন গড়িয়া উঠিতেছে এবং মানুষের স্বভাবপরিণামে যখন জটিলতা আসে নাই, তখন জন্মকেই যোগ্যতার নির্ণায়ক স্থির করা অপেক্ষা ভাল উপায় আর কিছু ছিল না। এই জন্য দেখিতেছি জন্মগত বা বংশগত বর্ণভেদই তখন সমাজের নিয়ম ছিল, অন্য প্রকারে এক বর্ণ হইতে অন্য বর্ণে উন্নয়ন বা অবনয়ন ঐ নিয়মেরই ব্যতিক্রম।

কিন্তু এইখানে আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব বলিতে মূলে এক একটী সামাজিক function বা প্রয়োজনসিদ্ধি বুঝায়,

সমাজদেহের এক একটা চিরনির্দ্দিষ্ট পৃথক্‌ভাগ বুঝায় না। প্রাচীনযুগে এই সমস্ত প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য সমাজকে চারিটী পৃথক্ পৃথক্ স্তরে ভাগ করিয়া রাখিতে হইয়াছিল বলিয়াই যে ঐ প্রয়োজনসিদ্ধির উপায়ান্তর নাই, তাহা নহে। আবার এককালে প্রত্যেক বর্ণের বৃত্তিকে বংশানুক্রমে প্রচলিত করায় উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া সর্ব্বকালেই যে ঐ একটী মাত্র নিয়ম রক্ষা করিয়া যাইলেই সর্ব্বাপেক্ষা সুফল পাওয়া যাইবে, তাহারও কোন অর্থ নাই। মূল প্রয়োজনের অনুকূলে ও পোষকতায় সমাজের অন্যান্য প্রয়োজন যে কালে যে ভাবে সুসিদ্ধ করা যায় সেইরূপ ব্যবস্থা দেওয়াই সমাজের অক্ষুণ্ণ জীবনীশক্তির লক্ষণ।

ভারতীয় সমাজের ইতিহাসে ত্রেতাযুগেই এক গভীর সমস্যার উদয় হইয়াছিল। যথাক্ষেত্রে বল ও বিক্রম প্রকাশ এবং সমাজের সকল অঙ্গের স্বধর্ম্মপালনে সুবিধাবিধান ও বিদ্যাপ্রসারণ প্রভৃতি মহৎ কর্ত্তব্যই ক্ষত্রিয়ের ঋষিনির্দ্দিষ্ট স্বধর্ম্ম ছিল। এইরূপ স্বধর্ম্মপালনের সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্ব সংযুক্ত থাকা স্বাভাবিক। অথচ সমাজের লক্ষ্য ও প্রকৃতি অনুসারে উহার নিয়ন্তৃত্ব ত্যাগী ব্রহ্মসাধকের হস্তেই রক্ষিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ঐশ্বর্য্যভোগ ও প্রভুত্বের মধ্যে একটা উন্মাদনা নিহিত আছে, যাহা দ্বারা অভিমান ও দর্পের উদ্ভব হইয়া মানুষের বুদ্ধিকে বিকৃত করিয়া দেয়। সেই জন্য ত্রেতাযুগেই দেখা যাইতেছে ক্ষত্রিয়রাজার ঐরূপ বুদ্ধিবিভ্রম ঘটিয়া প্রাচীন সমাজের ভিত্তিকে বিপন্ন করিয়াছে। সেই পুরাকালে ক্ষত্রিয়গণ সমৃদ্ধি লাভ করিয়া নিজ প্রভুত্বের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিল এবং সমাজের নিয়ন্তৃপদভাগী ঋষিদিগকে অগ্রাহ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। চন্দ্রবংশীয় কার্ত্তবীর্য্য ও পুরুবংশীয় বিশ্বামিত্র ঐরূপ ব্যবহারের দৃষ্টান্তস্থল। প্রধান প্রধান রাজবংশে যখন ঐরূপ ভাব, তখন বেশ অনুমান হয়, অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণও বিকৃতবুদ্ধি হইয়াছিল। বাস্তবিকই বশিষ্ঠ বা ভৃগুর মত মহর্ষিগণের আশ্রমও যখন ক্ষত্রিয়দিগের বাহুবলে বিপন্ন হইতে পারে, তখন সমাজের কি গভীর সঙ্কটাবস্থা তাহা অনুমান করা যায়। যে বাহুবলের দর্পে ক্ষত্রিয়গণ সেই কালে সমাজে ব্রহ্মজ্ঞের সনাতন নিয়ন্তৃত্ব বিলোপ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেই বাহুবল আশ্রয় করিয়া ভগবান্ পরশুরাম অবতীর্ণ হইলেন এবং উদ্ধত ক্ষাত্রবলকে বিনষ্ট করিয়া সমাজকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন। তার পর ঋষিনির্দ্দিষ্ট স্বধর্ম্মকক্ষে আবার ক্ষত্রিয়শক্তির পুনরুদ্ভব হইল এবং ত্রেতার শেষভাগে সেই ক্ষত্রিয়শক্তিকে শ্রীরামচন্দ্রে যথাযুক্তভাবে উৎকর্ষ ও পরিণতি লাভ করিতে দেখা যায়।